নির্ব্বাণপ্রকরণের সূচীপত্র

সর্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম	দিবসীয় ব্যবহার বর্ণন—মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ সভাভঙ্গ কাল উপস্থিত দেখিয়া প্রস্তাবিত কথার উপসংহার করিলেন। ...	১
২য়	বিশ্রান্তি দৃঢ়ীকরণ—যে ব্যক্তি শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা অনন্ত চিত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছে এবং দৃশ্য জগৎ যাহার মনে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার "আমি জীব" এ বিভ্রম নিশ্চয়ই উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। ...	৪
৩য়	ব্রহ্মৈক্য প্রতিপাদন। বুদ্বুদ ও তরঙ্গ প্রভৃতির আস্পদ যেমন সমুদ্র, সেইরূপ অসংখ্য জগতের আস্পদ নির্ব্বিশেষ চিৎ। নির্ব্বিশেষ চিৎই ব্রহ্ম। এই জীব, আমি জীব, ইহা জগৎ, এ সকল কল্পনাও চিৎ-সমুদ্র হইতে ফেনাদির ন্যায় উত্থিত, সে জন্য চিৎ হইতে অপৃথক্। জগৎ চিৎ-সমুদ্রের উর্ম্মি। যেমন উষ্ণতা অনল হইতে পৃথক্ নহে, সৌগন্ধ যেমন পদ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কৃষ্ণতা যেমন কজ্জল হইতে ভিন্ন নহে, মধুরতা যেমন ইক্ষু হইতে স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ অনুভূতি পদবাচ্য বুদ্ধি প্রকাশ ও চিৎ হইতে অপৃথক্।	৯
৪র্থ	চিত্তাভাব প্রতিপাদন—মূর্খতা বিনষ্ট হইলে চিত্তও সপরিবারে বিনষ্ট হয়। চিত্ত যদি অচিত্ত হয়, তাহা হইলে বাসনাও বিনষ্ট হয়। যেমন বায়ুর শান্তিতে সরোবরের চঞ্চলতা উপশান্ত হয়, সেইরূপ মূর্খতা শান্তিতে দুর্বুদ্ধি-কল্পিত স্ত্র্যাদির শরীরের রম্যতাও উপশান্ত হয়।	১১
৫ম	বিশ্রান্তি বর্ণন—পরমা সত্তা প্রাপ্তি যে কি উচ্চপদ, তাহার তুলনা নাই। যাঁহারা এ পদে স্থিত, তাঁহাদের নিকট চন্দ্র সূর্য্য ও স্বর্গ পাতালের ন্যায় নিম্ন।	১২

ভগীরথোপাখ্যান।

পূর্ব্বার্দ্ধে নির্ব্বাণপ্রকরণের সূচীপত্র সমাপ্ত।

ছাড় ও শুদ্ধ্যাশুদ্ধি।

৮৭ সর্গের ৪৪ শ্লোকের অনুবাদ—বালক যেমন সরল চিত্তে পিতার কথা শ্রবণ ও বিশ্বাস করে, হেতু ও যুক্তি জানিতে চাহে না, তেমনি তুমিও আমার অভিহিত বাক্য সকল সরল ভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করিবেক।

৯০ সর্গের ২৭ শ্লোকের অনুবাদ—হে পদ্মপলাশলোচন! তোমার এই প্রযত্ন প্রাগুক্ত মণিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মণি-যত্নের সহিত সমান, ইহা তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম। এক্ষণে তুমি বিচার কর ও বুঝিয়া দেখ, যাহা বুঝিলে, তাহাই চিত্তে ধারণ করিবে।

৯২ সর্গের ৩২—৪১ শ্লোকের অনুবাদ—যাহা ত্যাগ করাই শ্রেয়, তাহা অবিলম্বে ত্যাগ করাই উচিত। অতএব, এখনই এই সমস্ত উপকরণ ত্যাগ করিব, এক সঙ্গে সমস্ত পরিত্যাগ করিলে অগ্নির তুষ্টি হইবে। আমি এই মুহূর্ত্তে নিষ্ক্রিয়তা সিদ্ধির জন্য ক্রিয়ার উপকরণ সকল নষ্ট করিব।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্ব্বাণ	২১	২৯	ক্যার্য	কার্য্য
”	২৪৭	২১	অগ্নিসোষাত্মক	অগ্নিসোমাত্মক
”	২৪৮	৩০	পরিণান	পরিণাম
”	৩৪৬	২৭	মেঘ্ব	মেঘ
”	৩৬২	৭	অ্যামি	আমি
”	৩৬৮	১৯	নির্ব্বন্ধন	নিবন্ধন
”	৩৮৪	১৩	আয়ুকে	পায়ুকে

———

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

নির্ব্বাণপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, তুমি উপশম প্রকরণ শ্রবণ করিলে, অতঃপর কৈবল্যপ্রদ নির্ব্বাণ প্রকরণ শ্রবণ কর[১]। মুনিনায়ক বশিষ্ঠ যখন বাল্মীকি মহর্ষির নামোল্লেখ করতঃ উপরি উক্ত কথা বলিলেন, তখন বেলা অবসান প্রায় হইয়াছে। এখন সভায় অবস্থা এইরূপ—

সভাগত রাজকুমার রাম একমন একচিত্তে বশিষ্ঠের উপদেশ শুনিতেছেন, রাজা ও সামন্ত রাজা সকলেই ঋষিবাক্যে মনোনিবেশ করায় চিত্রিত মনুষ্যের ন্যায় নিস্পন্দ রহিয়াছেন[২।৩]। শ্রোতৃবর্গ সকলেই বশিষ্ঠবাক্যের তাৎপর্য্য বিচারে তন্মনস্ক[৪], সকলেই নির্ব্বাক্ ও অঙ্গচালনা রহিত, সেজন্য সভাস্থলী নিঃশব্দ। পুরনারীগণও তদনুরূপ অবস্থায় অবস্থিত, দিনদেবতা সূর্য্য আকাশের শেষ সীমায় বিরাজিত, সভ্য সকল অল্প জ্ঞান ও অল্প উপশম প্রাপ্ত[৫।৬], সততপ্রবাহী অনিলদেবও যেন বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে শান্তি প্রাপ্ত। তত্রস্থ কুসুমস্রজে অবস্থিত ভ্রমরবৃন্দ যেন ধ্যানাবলম্বী ও মৌন। বিতানভূষণ মুক্তামালা সমূহ যেন সমধিক শোভা প্রাপ্ত। বহুতর সূর্য্যরশ্মি যেন তাপ ও শ্রান্তি বিনাশার্থে গবাক্ষ পথে সুরম্য ও সুশীতল শ্রবণ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। রাজাদিগের করে ও মস্তকে যে সকল ক্রীড়াপদ্ম স্থিতি করিতেছিল, তাহারাও যেন সুরস বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে নিশ্চল ও নিস্পন্দ[৭।১২] বালক, অন্তঃ ও পিঞ্জরস্থ ক্রীড়াপক্ষী ব্যতীত অন্য কাহার মুখে শব্দ নাই, কেবল তাহারাই ভোজনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বধূ-

লোক দিগকে আহ্বান করিতেছে। কুমুদবৃন্দ অল্পবিকাশোন্মুখ, তাহাতে ভ্রমরবৃন্দের গত্যাগতি ও গবাক্ষ পথে যেন ভয়াতুর সূর্য্যরশ্মির সমাগম হইয়াছে[১৩,১৫]। এই সময়ে দিবাবসান সূচক ভেরী পটহ শঙ্খ ও ঘণ্টাদির নিনাদ অতি গভীর শব্দে সমুত্থিত হইয়া শ্রবণ গৃহের অভ্যন্তর পরিপূরিত করিল[১৬]। যেমন মেঘনিঃস্বনে ময়ূরের রব অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ তুমুলতর ভেরী প্রভৃতির নিঃস্বনে বশিষ্ঠবাক্য অন্তর্হিত হইল। যেমন ভূকম্প কালে বনবৃক্ষ সকল বিকম্পিত হয়, সেইরূপ সেই বাদ্যকোলাহল কালে পিঞ্জরস্থ পালিত পক্ষিবৃন্দ সকল বিকম্পিত হইল[১৭,১৮]। শিশু সকল ভয়ে ও ত্রাসে ধাত্রী ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। রাজাদিগের শরীরশোভিনী কুসুম মালা হইতে ভ্রমরাবলী উড্ডীন হইতে লাগিল[১৯,২০]। ক্রমে বাদ্যকোলাহল বিনিবৃত্ত হইল, দিবাও অবসান প্রায় হইল, এবং রাজভবন অভিহিত প্রকারে ক্ষুভিত বা বিচলিত অর্থাৎ কোলাহলপূর্ণ হইল। মুনিশার্দূল বশিষ্ঠ সভাভঙ্গ কাল উপস্থিত দেখিয়া প্রস্তাবিত কথার উপসংহার করিলেন এবং রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাম! আমি যে তোমার সম্মুখে বাগ্‌জাল বিস্তৃত করিলাম, ইহারই দ্বারা তুমি চিত্তপক্ষীকে বন্ধন অর্থাৎ স্ববশীভূত করিবে[২১,২৩]। তুমি ত আমার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছ? হংস যেমন নীরমিশ্রিত ক্ষীর হইতে ক্ষীর মাত্র গ্রহণ করে সেইরূপ তুমিও মদ্বাক্যের অসার অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণ করিয়াছ কি না[২৪]? তুমি বুদ্ধিযোগে মদুপদেশ সমূহ বিচারারূঢ় করতঃ মদুপদিষ্ট পথে বিচরণ করিবে[২৫]। হে রাঘব! তুমি যদি মদুপদিষ্ট বুদ্ধি অবলম্বনে ব্যবহার তৎপর হও তাহা হইলে বন্ধন প্রাপ্ত হইবে না, নচেৎ হস্তীর গর্ত্ত পতনের ন্যায় অধঃপতিত হইবে[২৬]। যদি তুমি মদীয় উপদেশ অবহেলা কর তাহা হইলে অন্ধকার রাত্রে দীপ পরিত্যাগীর অথবা অন্ধের গর্ত্ত পতনের ন্যায় নিরর্থে পতিত হইবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া যদৃচ্ছাগত ব্যবহার নির্ব্বাহ করিলে তাহা সিদ্ধিবিঘ্নকর হয় না। অতএব, তুমিও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুগামী ও উদারচেতা হইবে[২৭,২৮]। অহে সভ্যগণ! অহে রাজন্যবর্গ! তোমরা এক্ষণে সায়ংকালকর্ত্তব্য আহ্নিক কৃত্যাদির জন্য উদ্যুক্ত হও, কল্য প্রাতে প্রস্তাবিত কথার শেষাংশ বর্ণন করিব[২৯,৩০]।

বাল্মীকি বলিলেন, মুনিবর বশিষ্ঠ ঐরূপ কহিলে তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ হইল। রাজগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিবৃন্দকে অভিবাদনাদি করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেবও বিশ্বামিত্র সহ স্বাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। দশরথ প্রভৃতি রাজা ও বিখ্যাত বিখ্যাত মুনি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বক্তৃপ্রবর বশিষ্ঠের অনুগমন করিলেন, পরে তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রাজগণ স্ব স্ব ভবনে ও মুনিগণ স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। রাজা দশরথ মহর্ষিগণ সহ বশিষ্ঠ চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক গৃহগামী হইলেন। রাম লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন এই তিন্ রাজকুমার গুরুদেব বশিষ্ঠের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাও গুরুচরণ বন্দনান্তে স্ব স্ব বাস ভবনে আগমন করিলেন৩১।৩৭। পরে স্নান, পূজা ও তর্পণাদি কার্য্য নির্ব্বাহের পর ব্রাহ্মণ অতিথি অভ্যাগত ও ভৃত্যদিগকে ভোজন করাইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ভোজন করিলেন। ক্রমে দিবাকর অস্তগত ও রজনীর সহিত রজনীকর সমাগত হইল। রাজা, রাজপুত্র, মুনি, ইঁহারা সকলেই একান্তে ও একাগ্রচিত্তে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করতঃ বশিষ্ঠোক্ত সংসার উত্তরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন৩৮।৪২। পরে প্রহর মাত্র নিদ্রাগত থাকিয়া পুনর্ব্বার বশিষ্ঠকথা শ্রবণার্থ উৎসাহযুক্ত হইতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন, ইঁহারা রাত্রের তিন্ প্রহর বশিষ্ঠোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য চিন্তা করিলেন, পরে অর্দ্ধ প্রহর নিদ্রার দ্বারা শ্রম বিনাশ করতঃ পুনর্ব্বার বশিষ্ঠ কথা শ্রবণে ত্বরাবান্ হইতে লাগিলেন৪৩।৪৫

উক্ত প্রকারে সেই সকল সুচিন্ত শুভাশয় ও জ্ঞাতজ্ঞেয় বিবেকীদিগের দ্বারা অভিহিত ত্রিযামা (রাত্রি) অতিবাহিত হইল৪৬।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

—০()০—

বাল্মীকি বলিলেন, রাত্রি শেষ হওয়ায় ক্রমে নৈশ অন্ধকারের ক্ষয় ও চন্দ্রমণ্ডলের ধূসরতা উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া সূর্য্যোদয়ের সূচনা করিল। শিশিরকণবাহী প্রভাতবায়ু মন্দবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল১।৩। রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তিন্ ভ্রাতা শয্যা ত্যাগ অন্তে কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া অনুচর সহ পবিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন।

এ দিকে বশিষ্ঠদেবও সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সভাগমনের নিমিত্ত উন্মুখ হইয়াছেন। ক্রমে রামাদি কর্ত্তৃক বন্দিত ও রাজা রাজপুত্র মুনি ও ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুরু বশিষ্ঠকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে সকল রাজা রাজপুত্র বশিষ্ঠাশ্রমে সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহাদের ভৃত্য ও অনুজীবীগণ কর্ত্তৃক ও হস্তী অশ্ব পদাতিগণ কর্ত্তৃক সেই আশ্রমপদ পরিপূর্ণ হইয়াছিল৪।৮। মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ এক্ষণে সেই সকল সেনা ও জনবৃন্দ সহ দশরথ গৃহে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে বৃদ্ধ রাজা দশরথ কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করতঃ সভাগৃহের অনতিদূরস্থ পথে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে গুরুসমাগমে তিনি হৃষ্ট তুষ্ট হইয়া গুরুচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অন্যান্য সদ্ব্যবহার সমাপন করিয়া গুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন৭।৯। যে সকল শ্রোতা পূর্ব্বদিনে উপস্থিত ছিলেন, ক্রমে তাঁহারা সকলেই একে একে সভাগত হইলেন। সভাপ্রবিষ্ট জনগণ প্রথমে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি সদ্ব্যবহার, তৎপরে যথানির্দ্দিষ্ট আসনাদি গ্রহণ করিলেন, অনন্তর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। সভা নিঃশব্দপ্রায় হইলে, বন্দীগণের স্তুতি পাঠ নিবৃত্ত হইলে, অর্করশ্মি গবাক্ষ রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, শঙ্করের অভিমুখে কার্ত্তিকেয়ের, দেবগুরু বৃহস্পতির অভিমুখে কচের, শুক্রাচার্য্যের অভিমুখে প্রহ্লাদের ও বিষ্ণুর অভিমুখে গরুড়ের

ন্যায় গুরু বশিষ্ঠের অভিমুখে রামচন্দ্র প্রথমতঃ দৃষ্টিপ্রার্থী হইলেন। রঘুবীর রাম গুরুদেবের মুখশোভার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিলে পর গুরু বশিষ্ঠ বাক্যভাৎপর্য্যন্ত রামের উদ্দেশে ধীরে ধীরে কথাবতার করিলেন অর্থাৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন[১০।১৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনন্দন! গত কল্য যে সকল গম্ভীরার্থ বাক্য বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ আছে ত? আজ্ আবার বোধজনক বাক্য বলিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবে[১৯।২০]। বৈরাগ্যের অভ্যাস ও তত্ত্বের অববোধ এই দুএর দ্বারা সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সেইজন্য বলিতেছি, তুমি বৈরাগ্যাভ্যাসে যত্নবান্ হইবে। সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে অসম্যক্ বোধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বাসনার আবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত বা বিগলিত হইলে বিশোক পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[২১।২২]। দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, পূর্ব্বাপর প্রান্ত দৃষ্ট হয় না, এরূপ এক ব্রহ্মই আছেন। তিনিই জগদ্ভাব প্রাপ্ত সুতরাং দ্বিভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৩]। যাহাতে আত্যন্তিক বৃহদ্রূপ ব্রহ্মভাব ব্যতিরিক্ত অন্য ভাব নাই, যাহা কোন ভাবে পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, যাহা শান্ত সমরস ও সমপ্রকাশ, তাহাতে অন্য ভাব থাকার সম্ভাবনা কি[২৩]? তুমি মনন দ্বারা ঐরূপ স্থির করিয়া অহং পরিত্যাগী ও জীবন্মুক্ত হও। তাহা হইলে তুমি একরূপ প্রশান্ত ও সাক্ষাৎ স্বাত্মসুখ প্রাপ্ত হইবে[২৫]। হে রামভদ্র! চিত্ত, অবিদ্যা, মন, জীব, এ সকল বস্তুভূত নহে। ঐ সকল ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, অন্য কিছু নহে। ভোগ বল, ভোগ্য বল, ভোগকর্ত্তা বল, সমস্তই ব্রহ্ম। পাতাল, ভূতল, স্বর্গ, আকাশ, তৃণ, সর্ব্বত্রই চিদ্রূপ ব্রহ্ম দৃষ্ট হইতেছেন[২৬।২৮]। হেয়, উপাদেয়, উপেক্ষ্য, এই সকল ভাব এবং বন্ধু বান্ধব বিভব ও শরীর প্রভৃতি যে কিছু ভাব, সে সমস্তই ব্রহ্মসমুদ্রের বিশেষ বিশেষ লহরী[২৯]। যাবৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞানের কার্য্য, যাবৎ পর্য্যন্ত অব্রহ্ম ভাবের অভিনিবেশ, যাবৎ পর্য্যন্ত জগতের প্রতি আস্থা বা আদর, তাবৎ পর্য্যন্ত চিত্তকল্পনার বিরাম নাই বা হয় না[৩০]। যাবৎ এই দেহে অহং জ্ঞান, যাবৎ দৃশ্যের সহিত আমি আমার এবম্বিধ সম্বন্ধের অধ্যাস, এবং যাবৎ আমার অমুক, ইত্যাকার ভাব অলুপ্ত থাকিবে, তাবৎ চিত্তে, মন জীব প্রভৃতি বিষয়ক ভ্রান্তি থাকিবেই থাকিবে, তাহার অন্যথা হইবে না[৩১]। সজ্জনসংসর্গ ব্যতীত উদারতার

অনুৎপত্তি থাকিবেই থাকিবে। অপিচ, মূর্খতার অবিনাশ প্রযুক্তই চিত্তে ব্রহ্মভাবের বৈপরীত্যে ক্ষুদ্র ভাব স্থিতি করে। ভুবন ভাব শিথিল বা বিগলিত ও তত্ত্বজ্ঞান সামর্থ্যের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তাদি কল্পনা দুর্নিবার্য্য[৩২।৩৩]। অজ্ঞতা, জ্ঞানদৃষ্টির অভাব, বিষয়াকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা, মূর্খতার দ্বারা মোহের বৃদ্ধি, আশাবিষে আমোদ, এ সকল থাকিতে চিত্তাদি ভ্রম বিনষ্ট হয় না। ভোগে অনাস্থা, আশাচ্ছেদ ও নির্ম্মল বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবিভ্রম অপগত হয়[৩৪।৩৬]। যে পুরুষ তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার মন শান্তিগুণে ভরিত হইয়াছে, যাহার সংবিদ্ (জ্ঞান) চন্দ্রিকা অপেক্ষাও সুশীতল, সেই পুরুষেরই প্রবোধ সফল[৩৭]। যে ব্যক্তি দেহকে অনুপযুক্ত, দূরস্থ ও তুচ্ছ বলিয়া জানে, বিশ্বাস করে, চিত্ত সে ব্যক্তির সম্বন্ধে উদিত হয় না[৩৮]। যে ব্যক্তি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা অনন্ত চিত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছে এবং দৃশ্য জগৎ যাহার মনে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার "আমি জীব" এ বিভ্রম নিশ্চয়ই উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে[৩৯]। ঘৃত যেমন বহ্নিসম্পর্কে দ্রবীভূত হয় ও প্রজ্বলিত বহ্নিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানে মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশ ও তৎপ্রযুক্ত চিত্তের ক্ষয় সংঘটন হয়[৪০।৪১]। যাহারা জীবন্মুক্ত, মহামনা, পরাবরদর্শী, তাহাদের যে চিত্ত, সে চিত্ত শাস্ত্রে সত্ত্ব আখ্যায় প্রসিদ্ধ। যেমন জল শুষ্ক হইলে বালুকাময় স্থানে জলের রেখা বা দাগ থাকে, সেইরূপ, জীবন্মুক্ত দিগের অন্তরে চিত্ত নাশের পর চিত্তের যৎসামান্য একটা আভাস বা সংস্কার থাকে, তাহাতেই তাঁহাদের দৈহিক ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়। জীবন্মুক্ত দিগের শরীরে যে দগ্ধকল্প চিত্ত থাকে, সে চিত্তের নাম সত্ত্ব, তাহা চিত্ত নহে[৪২।৪৩]। তাদৃশ সত্ত্বে অবস্থিত তত্ত্বজ্ঞগণ ইহ সংসারে লীলা সহকারে বিচরণ করেন। সত্ত্বে অবস্থিত সংযতেন্দ্রিয় ও শান্তি প্রাপ্ত মহাপুরুষেরা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ সর্ব্বদাই সেই নিত্য জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৪৪।৪৫]। সেই মননশীল মুনিরা স্বান্তঃস্থ চিৎ নামক বহ্নিতে এই জগদ্রূপ তৃণ নিক্ষেপ করেন বলিয়াই তাঁহাদের চিত্তাদিবিভ্রম লুপ্ত হয়[৪৬]। যেমন দগ্ধ বীজে অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ, বিবেকপরিষ্কৃত সত্ত্ব নামক চিত্তেও মোহ ফল ফলে না[৪৭]। মূঢ় দিগের অন্তরে যে চিত্ত, সেই চিত্তই জন্ম মরণাদি ধর্ম্মে বিরাজ করে এবং সেই চিত্তই আবার

বোধ দ্বারা বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ চিত্ত জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না[৪৮।৪৯]। তৃণ যেমন অস্ত্রছিন্ন ও অগ্নিদগ্ধ হইলেও বীজশক্তি থাকায় পুনর্ব্বার তাহা হইতে অঙ্কুরিত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ, চিত্ত যদি পুত্র বিত্ত ধনাদি বিষয়ের আশায় বিদ্ধ থাকে তাহা হইলে সে চিত্তের প্ররোহ অনিবার্য্য[৫০]। মোহের দ্বারা ব্রহ্মই জগদাকারে বৃংহিত ও মোহের বিনাশে এই জগদ্ভাব ব্রহ্মভাবের অনতিরিক্ত হইয়া যায়। অতএব, ব্রহ্ম ও জগৎ এই দ্বিত্ব কল্পনা কল্পনামাত্র, বাস্তব নহে[৫১]। যেমন মরিচ তীক্ষ্ণতার অতিরিক্ত না হইলেও তাহাতে মরিচের তীক্ষ্ণতা, ইত্যাদি আকারের ভেদ ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয় সেইরূপ ত্রিজগৎ চিত্তের অতিরিক্ত না হইলেও ব্রহ্ম সৃষ্ট জগৎ, এইরূপ ভেদ ব্যবহার কৃত হইয়া থাকে। সৎ ও অসৎ, আছে ও নাই, এ ব্যবহার মোহের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শব্দ, অর্থ, তদুভয়ের (সঙ্কেত) বোধকবোধ্যভাব ও তাহার সংস্কার ব্যোমরূপী চিদাত্মায় সংলগ্ন নহে। তাই আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি সৎ অসৎ, আছে ও নাই, এ ভাব (কল্পনা) পরিত্যাগ কর[৫২।৫৩]। তুমি আমি, এ সকল ব্যবহার শরীরসম্পর্কেই উৎপন্ন হইতেছে। পরন্তু শরীর চিদ্বিপরীত জড়, সেজন্য শরীর স্বাত্মবস্তু নহে। সুতরাং যাহা আত্মা তাহাতে শরীরাদি জনিত শোক দুঃখের সম্ভাবনা নাই। আর যদি সমস্তই সদা চিন্ময়স্বভাব হয় তাহা হইলেও বিচার দ্বারা বিদিত হইবে যে, শোক দুঃখ কেবল মোহেরই কল্পনা। অন্য কিছু নহে। বিচারে আরও বিদিত হওয়া যায় যে, চিদাত্মা নিরবয়ব, নিরংশ ও পারাবার বর্জ্জিত। হে রাঘব! তুমি তোমার স্বরূপ স্মরণ কর, বিস্মৃত হইও না[৫৪।৫৬]। তুমি চিৎ, শান্ত, ও ব্রহ্ম। তুমি আপনাকে পূর্ণ আত্মসত্তায় পরিভাবিত কর। প্রকৃত পক্ষে তুমি নানা নহ, কিন্তু এক। যাহা অলীক নামে প্রসিদ্ধ, তাহা অসৎ। তুমি তাহা নহ। তুমি সম্পূর্ণ, স্বস্থ ও চিদ্‌ঘন[৫৭।৫৯]।

হে রামচন্দ্র! তোমার আদি অন্ত মধ্য, কিছুই নাই। তুমি অন্তরে বাহিরে নিবিড়িত চিৎ। স্ফটিক যেমন অন্তরে বাহিরে স্ফটিক ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সেইরূপ তুমিও বাহিরে অন্তরে চিদ্ ব্যতীত অন্য কিছু নহ। সুতরাং দুঃখাদি বিকার তোমাতে হয় না, যাহা বিকারী

মন, তাহাতেই তাহা হয় ও বিরাজিত থাকে। তোমার অতিবিস্তীর্ণ চৈতন্যের উদরে এই মায়ার রেখা অর্থাৎ নিখিল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। হে রঘুনাথ! এতাদৃকরূপী তোমাকে আমারও নমস্কার৬০।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন, বুদ্বুদ ও তরঙ্গ প্রভৃতির আস্পদ সমুদ্র, তাহা যেমন কেবল জল, সেইরূপ, অসঙ্খ্য জগতের আস্পদ যে চিৎ-সামান্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিৎ, সেই নির্ব্বিশেষ চিৎ-ই তুমি[১], ইহা দ্বৈত ভাব পরিত্যাগ দ্বারা সম্ভাবিত হয়[২]। এই জীব, আমি জীব, ইহা জগৎ, এ সকল কল্পনাও চিৎ সমুদ্র হইতে ফেনাদির ন্যায় উত্থিত; সে জন্য চিৎ হইতে অপৃথক্[৩]। হে সৌম্যদর্শন! চিৎ সমুদ্র যার 'পর নাই গভীর ও মহামহা তরঙ্গ যুক্ত! তুমি সেই চিন্মহাসমুদ্রের উর্ম্মি। উষ্ণতা যেমন অনল হইতে পৃথক্ নহে, সৌগন্ধ যেমন পদ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কৃষ্ণতা যেমন কজ্জল হইতে পৃথগ্ভূত নহে, শুভ্রতা যেমন হিমপিণ্ড ছাড়া নহে, মধুরতা যেমন ইক্ষু হইতে স্বতন্ত্র নহে, আলোক যেমন প্রকাশের অনতিরিক্ত, লহরী যেমন জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ, অনুভূতিপদবাচ্য বুদ্ধিপ্রকাশও চিৎ হইতে অপৃথক্ সুতরাং জগৎ চিৎ হইতে অপৃথক্[৪।৬]। যাহাকে অনুভূতি ও অনুভব বলা যায়, তাহা বিভিন্ন নহে। যাহাকে অহং বা আমি বলিতেছি, তাহা অনুভব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহাকে অহং বা আমি বলি, তাহা জীব ভিন্ন নহে এবং জীবও মন বৈ অন্য পদার্থ নহে[৭]। এইরূপ, মনঃও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে, দেহও ইন্দ্রিয় ছাড়া নহে, এবং শরীরও জগৎ ছাড়া নহে। প্রদর্শিত ক্রম দীর্ঘকাল প্রবর্ত্তিত বটে, আবার অপ্রবর্ত্তিতও বটে। আকাশে আকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, সেইরূপ, ব্যোমবৎ দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব চিত্তত্ত্বেও চিৎ বৈ অন্য কিছু নাই। ভ্রান্তির দ্বারা আকাশে মেঘাদির স্থিতি প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, মহাচিৎসমুদ্রেও ভ্রান্তির দ্বারা জগতের স্থিতি প্রতীয়মান হইতেছে[৮।১০]। জগতের স্থিতি এইরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে যে, শূন্যে শূন্যেরই স্ফীতি, ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই বৃদ্ধি, সত্যে সত্যেরই বিজৃম্ভণ, এবং পূর্ণে পূর্ণেরই অবস্থিতি। ইহার ভাবার্থ—জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ ও অনধিক[১১]। যে ব্যক্তি অভিহিত রহস্য জানে, সেই তত্ত্বজ্ঞ অন্তরে

বাহিরে কোন কিছু করিয়াও করে না। অর্থাৎ তিনি অকর্ত্তা[১২]। উপাদেয় বুদ্ধিতে বিষয় গ্রহণ করিলেই তাহা সুখ দুঃখের কারণ হয়, অন্যথা তাহা কোন কিছুর কারণ হয় না। যেমন একই আকাশে নানা আকারের শব্দ জন্মে এবং সে সমস্ত শব্দও আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশস্বরূপ, তেমনি, একই ব্রহ্মে এই নানা আকারের বিশ্ব প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং বিশ্বও ব্রহ্মাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ। আশ্চর্য্য এই যে, নানা আকার সম্পন্ন এই জগৎ বাহিরে অথচ ইহার অন্তরে নির্ম্মল ব্যোম। হে রামচন্দ্র! যে অতিশয় শত্রু, বধ করিতে উদ্যত, যে ব্যক্তি তাহাকে পরম মিত্র বলিয়া জানে সে-ই ব্যক্তিকেই তুমি জ্ঞানী বলিয়া জানিবে[১৩।১৬]। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, সেই ব্যক্তিতে হর্ষ অমর্ষ বিষাদ কিছুই নাই। নদী যেমন স্বকীয় তটে স্থিত বৃক্ষাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে সেইরূপ পূর্ব্বোক্তবিধ জ্ঞানও হর্ষ অমর্ষ বিষাদের মূল (অজ্ঞান) বিনষ্ট করিয়া আপন আধারকে কৃতকৃত্য করে। যে সাধু রাগ, দ্বেষ ও বিকার এ সকলের স্বরূপ চিন্তা না করে সে সাধু হইয়াও অসাধু। অর্থাৎ তাহার সৎসঙ্গের ফল ফলিত হয় নাই। যাহার অন্তরে অহং নাই, যাহার বুদ্ধি বিষয়ে লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কোনও কিছুতে অভিসংহিত হয় না, সে যদি এ সমস্ত লোক বিনাশ করে তথাপি তাহার লোকবিনাশজনিত দুরদৃষ্ট জন্মে না। সে জন্য সে বদ্ধও হয় না[১৭।১৯]। যাহা নাই তাহা প্রতীতিগোচর হওয়ার নাম মায়া। এই মায়া জ্ঞাননাশ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে থাকে না[২০]। যেমন দীপ তৈলহীন অবস্থায় উপশম প্রাপ্ত হয়, তেমনি, জ্ঞানীর অন্তরও (চিত্তও) বাসনাশূন্য অবস্থায় উপশম প্রাপ্ত হয়। অতএব, বাসনা জয়ী শান্ত পুরুষেরই জয়, অন্যের নহে[২১]। এই সকল দৃশ্য যে মহাপুরুষের নিকট সৎ অথবা অসৎ বলিয়া গণ্য হয় না, সুতরাং, হেয় অথবা উপাদেয় বলিয়াও বিবেচিত হয় না, ইহ সংসারে সেই মহাপুরুষই জীবিত, এবং সেই মহাপুরুষই মুক্ত[২২]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ ॥

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই সেই এক মাত্র চিতের প্রকাশ। কেননা, চিৎ-ই আপনার সত্তা (অস্তিতা) ঐ সকলে অর্পণ করিতেছে। অর্থাৎ চিতের অস্তিতাতেই ঐ সকলের অস্তিতা, উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিতা নাই[১।২]। যেমন অন্ধকার ক্ষয়ে অন্ধতার অভাব, তেমনি, ভোগতৃষ্ণারূপ বিষের বিনাশে আত্মাজ্ঞানের অভাব সংঘটন হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপ মহামন্ত্রের দ্বারাই তৃষ্ণা বিষ বিনষ্ট হয়, অন্য কিছুতে হয় না[৩।৪]। হে রাম! তুমি ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, মূর্খতা বিনষ্ট হইলে চিত্তও সপরিবারে বিনষ্ট হয়[৫]। চিত্ত যদি অচিত্ত হয় তাহা হইলে বাসনা নামক ভ্রমও বিনষ্ট হয়[৬]। হে রঘুনাথ! যাহারা আত্মদৃষ্টির বৈপরীত্যে শাস্ত্রার্থ চিন্তন করে, অর্থাৎ অভিহিত বেদান্তরহস্যে অবিশ্বস্ত হয়, তাহারাই কৃমি-কীটাদি যোনি প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্তের সহিত মিলিত হয়[৭]। হে রাঘব! যেমন বায়ুর শান্তিতে সরোবরের চঞ্চলতা উপশান্ত হয়, সেইরূপ, মূর্খতার শান্তিতে দুর্ব্বুদ্ধিকল্পিত স্ত্র্যাদিশরীরের রম্যতাও উপশান্ত হয়[৮]।

রঘুনাথ! তুমি ভাব অভাবের অতীত, স্থিরতা প্রাপ্ত ও অতি বিস্তৃত পরম পদে আকাশে বায়ুর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ[৯]। আমার মনে হইতেছে, যেমন কোন সুপ্ত রাজা পটহ শব্দে প্রবুদ্ধ হয়, সেইরূপ, তুমিও আমার উপদেশ বাক্যে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। না হইবেই বা কেন? যখন কুলগুরুর বাক্যে সামান্য লোকের চিত্তও বিগলিত হয় তখন আর উদারমতি তোমার চিত্ত যে বিগলিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি[১০।১১]? যে হেতু তুমি মদ্বাক্যে বিশ্বস্ত, সেই হেতু আমার উপদেশ তোমার হৃদয়গামী হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছে। হে মহানুভব! আমরা ইক্ষ্বাকু বংশের, বিশেষতঃ রঘুকুলের গুরু, হিতো:

পদেষ্টা, তুমিও রঘুকুলে উৎপন্ন, সে জন্য তুমি অবশ্যই মদ্বাক্য হারের ন্যায় সাদরে হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) ধারণ করিয়াছ[১২।১৩]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

——(*)——

রঘুনাথ রাম বলিলেন, হে নাথ! আপনার বাক্যে আমার অহন্তা বিদূরিত হইয়াছে। আমিও এখন চিন্ময় হইয়াছি। এই যে জগজ্জাল, ইহা এখন আমার নিকট হইতে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে[১]। আমি এখন পরমাত্মায় যৎপরোনাস্তি নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত। আমি শীতল, সুখী, শান্ত ও প্রসন্নাকার। হে মুনে! সমস্ত দিক্ এখন আমার নিকট প্রসন্নাকার, এবং আমি এখন এই দৃশ্য বিশ্বের তত্ত্ব সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতেছি[২।৪]। আমি এখন সন্দেহশূন্য, আমার আশানাম্নী মৃগতৃষ্ণিকা এখন উপশম প্রাপ্ত, অনুরঞ্জনা এখন রাগনির্ম্মুক্ত, অর্থাৎ বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা পরিমার্জ্জিত, এবং আমি এখন শরৎ কালের ন্যায় শীতল। আমি এখন অসীম আত্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার নিকট রসায়নের অমৃতের আস্বাদ তুচ্ছ[৫।৬]। আমি এখন নির্ব্বিকার, স্বস্থ, মুদিত ও কেবল রাম নহি কিন্তু লোকারাম (সমুদায় জীবের রমণ স্থান অর্থাৎ পরমাত্মা)। হে প্রভো! এখন আমাকে ও আপনাকে নমস্কার[৭]। পূর্ব্বের সেই সেই সংশয় ও কল্পনা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে[৮]। আমার মন এখন অতিনির্ম্মল, অতিবিস্তৃত ও হিম অপেক্ষাও শীতল হৃদয়ে নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে[৯]। আমাতে অজ্ঞান কলঙ্ক ও চেত্যদর্শন কোথা হইতে আসিবে? সমস্তই আত্মা, সর্ব্বত্রই আত্মা, এবং তিনিই এখন সর্ব্বাকারে স্ফুরিত হইতেছেন। অতএব, ইহা, তাহা, ইত্যাদি ব্যবহার কল্পনা ব্যতীত বাস্তব নহে[১০,১১]। এখন আমি বিকাশবান্ অন্তরাত্মা ও ক্ষুৎপিপাসাদির অতীত। অহো! কি আশ্চর্য্য! আমিই যে এই সমস্তই ইহা আমি এতকাল বিস্মৃত ছিলাম,

আজ্ তাহা স্মৃতিগম্য হইতেছে। অহো! আজ্ আমি অতিবিস্তৃত পরম পবিত্র পদে আরোহণ করিয়াছি। যাঁহারা এ পদে স্থিত তাঁহাদের নিকট চন্দ্র সূর্য্য ও স্বর্গও পাতাল। অর্থাৎ এ পদ এত উচ্চ যে ইহার উচ্চতার তুলনা নাই[১২।১৪]। যে আমি আজ্ ভাবাভাব পরিপূর্ণ সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ ও পরমা সত্তা প্রাপ্ত, যে আমি আজ্ আপনিই আপনাতে জয়যুক্ত, সেই নমস্ত আমাকে আমার নমস্কার[১৫]।

হে নাথ! হে প্রভো! আপনার উৎকৃষ্ট বাক্যোপদেশে আজ্ আমি শোক মোহের অতীত নিত্যানন্দ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি[১৬]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু রাম! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে পরম শ্রেয়োজনক মহাবাক্য সকল বলিব, সাবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমারই হিতের জন্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদিও এক বৈ দুই নাই, অর্থাৎ দ্বৈত মিথ্যা ও অদ্বৈতই পরমার্থ, তথাপি তোমার জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি দ্বৈত অবলম্বনে তোমাকে উপদেশ করিব। দ্বৈতাবলম্বন ব্যতীত উপদেশ সম্ভব হয় না। যাহারা পূর্ণ প্রবুদ্ধ নহে, তাহাদের পক্ষে ভেদাশ্রয়ী উপদেশ বিশেষ উপকারক[১।২]। হে রামচন্দ্র! তুমি ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, যাহারই দেহে অহং-ভাবনা উদিত হয়, ইন্দ্রিয় শত্রু তাহাকেই অভিভব করে। এবং যে জ্ঞানী সত্য আত্মায় অবস্থিত, ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহার শত্রু হয় না[৩।৪]। যে ব্যক্তি ভোগ্য পদার্থের ব্যবহার করে পরন্তু সর্ব্বদাই সে সকলে দোষদর্শী হয়, সে ব্যক্তির বিষয়ে উত্তমতা বুদ্ধি থাকে না। সে জন্য তাহার দেহ থাকিলেও তদুপলক্ষ্যে কোনও প্রকার দুঃখ অনুভূত হয় না[৫]। আত্মা শরীরের কেহ নহে, এবং শরীরও আত্মার কেহ নহে। যেমন আলোক

ও অন্ধকার অত্যন্ত বিভিন্ন সেইরূপ আত্মা ও দেহ অত্যন্ত বিভিন্ন[৬]। সমুদায় জন্য বস্তু ছয় প্রকার বিকারে * অন্বিত, সে সকল বিকার আত্মায় লিপ্ত নহে। তাঁহার উদয় অস্ত নাই, তিনি সদা উদিত[৭]। জড়, অজ্ঞ, তুচ্ছ, কৃতঘ্ন, ও বিনাশী শরীররূপ উপলের যাহা হয় হউক, তাহাতে আত্মার কি[৮]? এমন মনে করিও না যে, দেহও চেতনাবান্, জড় নহে। কেননা চেতনার দ্বারাই জড় জানা যায়, সেজন্য দেহ ও আত্মা উভয় চেতন নহে। সুখ দুঃখ আপাততঃ উভয়ত্র দৃষ্ট হইলেও বুঝিতে হইবে তাহা একের সহিত অপরের সে সম্বন্ধ অধ্যাসমূলক। লৌহ যেমন বহ্নিতাদাত্ম্য প্রাপ্তে উষ্ণতাদি গুণ যুক্ত হয়, সেইরূপ, সুখ দুঃখাতীত আত্মাও দেহতাদাত্ম্য প্রাপ্তে সুখ দুঃখ ভাগী হইতেছেন। অতএব, আত্মা যদি দেহাধ্যাস হইতে বিযুক্ত হন তাহা হইলে তখন তাঁহার সুখ দুঃখের প্রসক্তি থাকে না। অপর বিবেচ্য এই যে, যার পর নাই সূক্ষ্ম ও অসঙ্গস্বভাব আত্মার স্থূলতম দেহের সহিত বাস্তব ঐক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই[৯।১১]। যেমন দিন ও রাত্রি এই দুএর একের বিদ্যমানে অপর অবিদ্যমান, সেইরূপ, জ্ঞান অজ্ঞান, এ দুএরও একের উদয় কালে অপরের অস্ত অনিবার্য্য। অপিচ, যেমন ছায়া আতপপ্রাপ্ত হয় না সেইরূপ জ্ঞানও অজ্ঞানপ্রাপ্ত হয় না[১২]। ব্রহ্ম সৎ, তিনি কস্মিন্ কালেও অসৎ হন না[১৩]। পদ্ম জলে থাকিলেও জলে অলিপ্ত, সেই-রূপ, ব্রহ্ম দেহে থাকিলেও দেহধর্ম্মে অলিপ্ত[১৪]। বায়ু আকাশে মিশিয়া থাকে পরন্তু নির্লেপস্বভাব আকাশ বায়ুজনিত শোষ কম্পন ও সমু-ড্ডীন ধূলি প্রভৃতির দ্বারা অলিপ্ত থাকে। এইরূপ আত্মাও দেহসংসর্গে থাকেন, অথচ জন্ম জরা মরণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দেহ ধর্ম্মে অস্পৃষ্ট থাকেন[১৫]। অতএব হে রাম! এই আত্মায় অল্পমাত্রও দেহধর্ম্ম নাই, ইহা জানিয়া তুমি নির্বৃত হও। জলে যেমন লহরী ও বুদ্বুদ, সেইরূপ ব্রহ্মেই ভ্রান্তিময় জন্ম জরা ও মরণ। দেহাদি পদার্থের স্বাধীন অস্তিতা নাই, সমস্তই আত্মার অস্তিতায় অস্তি হইতেছে[১৬।১৭]। জল যেমন আপনারই সত্তায় তরঙ্গ ভাব প্রাপ্ত হয়, প্রতিবিম্ব যেমন বিম্বের

* সামান্যাকারে থাকা, বিশেষাকারে উৎপন্ন হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া, বিকৃত বা রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়া, ক্ষয় ও বিনষ্ট হওয়া। এই ষড়্‌বিধ বিকার জন্মবান্ পদার্থ মাত্রেই আছে।

কম্পনে কম্পিতপ্রায় হয়, সেইরূপ, দেহের সংক্ষোভে অত্রস্থ চিদাভাসের সংক্ষোভ ও তদনুযায়ী চিদাত্মায় সুখ দুঃখাদি উদিত হইয়া থাকে, এ ভ্রান্তিও সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে নিবারিত হইয়া থাকে[১৮,১৯]। চিদাত্মার সত্যতা ও চিদাভাসাদির মিথ্যাত্ব যথাবৎ বিদিত হইলেই তদ্‌বিধ দ্বৈতভ্রান্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। অন্যথা ইহার (ভ্রান্তির) বৃদ্ধি ব্যতীত উপশম হয় না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে তাহাদেরই দেহের আবর্ত্তন পরাবর্ত্তন প্রভৃতি হয় অন্যের নহে। এই যে মোহরূপ অর্জ্জুন বৃক্ষ (এক প্রকার বন্য বৃক্ষ), ইহার স্থিতি ও স্ফূর্ত্তি অন্তঃসারবর্জ্জিত ও কেবল অবিচারমূলক[২০,২২]। জড়বুদ্ধি জীব তৃণের ন্যায় বৃথা স্পন্দিত (পর কর্তৃক চালিত) হয়। বস্তুতঃ তাহারা অজড় হইয়াও জড় এবং জড় হইলেও তাহারা প্রাণাদি বায়ুর প্রভাবে সঞ্চরণ করে অর্থাৎ তৃণ কাষ্ঠাদি আহরণ পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে[২৩]। এই সকল জড় শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতিতে আঢ্য, চঞ্চলাঙ্গ, ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত[২৪,২৫]। ইহারা আহার বিহার ও গত্যাগতি করে। এই সকল জড় জীব অজ্ঞানের বশে যার পর নাই দীনতা প্রাপ্ত। ইহারা ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে[২৬,২৭]। ইহারা আবার তর্জ্জন গর্জ্জন করে পরন্তু তাহাও বৃথা[২৮]। চিদাত্মবিষয়ক বোধ বর্জ্জিত এই সকল জড় জীব অরণ্যতরুর ন্যায় ফল লাভ বর্জ্জিত। তপ্ত শিলায় ও ছিন্নশাখ বৃক্ষের তলে এই দুই স্থানে বিশ্রাম যেরূপ, ইহাদের সাংসারিক বিশ্রামও সেইরূপ। অর্থাৎ সংসারে বিশ্রাম বিশ্রাম নহে[২৯,৩০]। ইহারা যে কিছু করে সেই সমস্তই ব্যোমরূপ দণ্ডের দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং ইহারা যে দান করে সে দানও কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত করার অনুরূপ হয়[৩১]। ইহাদের সহিত যে কথোপকথন, তাহাও কুক্কুরাহ্বানের তুল্য। অর্থাৎ ইহাদের সহিত তত্ত্ব কথা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অজ্ঞানই সমুদায় আপদের আস্পদ সেজন্য অজ্ঞানীরাই বিবিধ আপদ্দশা প্রাপ্ত হয়[৩২]। অজ্ঞেরাই এই সংসার রূপ পথের পথিক, অজ্ঞেরাই অত্রত্য সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং সে সকল অজ্ঞ দিগের নিকট অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়[৩৩]। যাহারা শরীর ধন ও দারা প্রভৃতিতে আস্থা বন্ধন করিয়া আছে তাহারাই পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের বশীভূত হয়[৩৪]। অতি শঠ (অবিশ্বস্ত) অনাত্মদেহে যাহাদের আত্মভাব, তাদৃশ অজ্ঞ জনের অভিহিত

প্রকারের দুঃখ নিচয় কদাচ উপশম প্রাপ্ত হয় না[৩৫]। মায়া কি? মায়া অসদ্বোধময়ী। সুতরাং যাহার দুর্ম্মতি বা দুর্ব্বুদ্ধি তাহাদের সম্বন্ধে মায়ার বিনাশ অসম্ভব[৩৬]। চক্ষু আছে, দেখিতে পায়, অথচ তাহারা পদে পদে অবস্তুতে লুণ্ঠিত হয়। তাহাদের সম্বন্ধে চন্দ্রও বিষ উৎপাদন করে[৩৭]। জল বা দুগ্ধও কণ্টক জন্মায়। যেমন কর্ষণ শোষিত ভূমিতে শালি ধান্য উত্তমরূপ জন্মে সেইরূপ অজ্ঞের সম্বন্ধে দিক্ সকল দেহরূপ শাল্মলিবৃক্ষের কোটরে মনোরূপ সর্প উৎপাদন করে। হে ধীর! অজ্ঞানই দুষ্কৃতরূপ সর্পে পরিবেষ্টিত নরক[৩৮,৩৯]। নারীরূপিণী বিষবল্লী মূর্খদিগের জন্যই পুষ্পিতা হয়, বিজ্ঞ দিগের জন্য নহে। উক্ত বিষবল্লীতে অতি চপল নেত্ররূপ ভ্রমর ও অধররূপ নবপল্লব মূর্খদিগের দৃষ্টিতে শোভমান বলিয়া নিপতিত হয়। অজ্ঞ দিগের মনোরূপ ভূমিতেই উক্ত বিষবল্লী আত্মলাভ করে, বিজ্ঞ দিগের মনোভূমিতে নহে। অজ্ঞ দিগের হৃদয়রূপ মরুভূমিতে দ্বেষরূপ দাবানল উৎপন্ন হইয়া শরীররূপ বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে। অজ্ঞ দিগের মনোরূপ সরোবর মাৎসর্য্য জলে পরিপূর্ণ। তাহাতে ঈর্ষ্যা কমলিনী ও চিন্তা ষট্পদ সর্ব্বদা বিরাজমান। মরণরূপ বাড়বাগ্নি অজ্ঞরূপ জলময় সমুদ্রকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে। জন্মের পর বাল্য, বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর জরা, তৎপরে পুনর্ম্মরণ, এ সকল মূঢ় জীবেরই প্রাপ্য। এই জগৎ একটী পুরাতন কূপ, সংসার ইহার জলোত্তলনের যন্ত্র, অজ্ঞ জীবেরা ইহাতে কলশ। কেননা কেবল তাহারাই ইহাতে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতেছে। যে জগৎ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ গোষ্পদ তুল্য, সেই জগৎ মূঢ় দিগের দৃষ্টিতে অগাধ ও অসীম[৪০,৪১]। অজ্ঞগণ পিঞ্জরাবরুদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ইহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না। অজ্ঞগণ বাসনা ভারে আক্রান্ত, সেইজন্য তাহারা জন্মচক্রের নাভি স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে শোধন করতঃ তাহার গতি-বিপর্য্যয় করিতে অপারক হয়। সংসার একটী অরণ্য, অজ্ঞগণের ইন্দ্রিয় ইহাতে গৃধ্র, তাহাদেরই অনুরাগে শরীররূপ আমিষ ইহাতে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। অধিক কি বলিব, এই যে কল্পনারূপ কল্পবৃক্ষ, ইহারই জন্য দৃষ্ট হয়[৪৮,৫২]। এক মাত্র অজ্ঞান হইতে উক্ত পাদপের জগৎরূপ অসঙ্খ্য পত্র আবির্ভূত হইতেছে, স্থিতি করিতেছে, আবার সেই অজ্ঞানে লীন হইতেছে (প্রলয় কালে)[৫৩]। বিবিধ ভোগেচ্ছু জীব উক্ত বৃক্ষের

বিহঙ্গ, তাহাদের জন্ম তদ্বৃক্ষের পল্লব এবং তাহাদের কর্ম্ম তদ্বৃক্ষের কলিকা, পুণ্য ও পাপ তাহার ফল, বিভব তাহার মঞ্জরী। ইন্দুর উদয়ে ওষধির শোভা, সেইরূপ, অজ্ঞান ইন্দুর উদয়ে যোষিৎ রূপ ওষধির শোভা। প্রসিদ্ধ চন্দ্রের ন্যায় অভিহিত অজ্ঞান চন্দ্রমার উদয় শূন্যে এবং এ চন্দ্রও দোষাকর অর্থাৎ দোষের ঈশ্বর। (প্রকৃত চন্দ্র পক্ষে দোষা শব্দে রাত্রি) সর্ব্বত্র ইহারই জয় এবং ইহারই প্রসাদে বাসনামৃত পানে চিত্ত চকোর পরিতৃপ্ত হইতেছে এবং তাহারা পুনঃ পুনঃ রত্নরসের অন্বেষণে তৎপর রহিয়াছে। এই অজ্ঞান ইন্দুর উদয়ে কান্তারূপিণী কুমুদিনী শোভাময়ী, তাহাদের লোচন ভ্রমর ও কেশ পাশ তিমির। যাহা যাহা বলিলাম সমস্তই অজ্ঞানকবলিত মুর্খতার বিলাস। হে রাম! অজ্ঞানরূপ বৃক্ষ হইতেই এই সকল আপাতমধুর, অনর্থ পূর্ণ, ক্ষণভঙ্গুর নানা আকৃতিযুক্ত ফল উৎপন্ন হইতেছে[৪।৬১]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অজ্ঞানের অসংখ্য বিভূতি। বলিতে কি, এই স্ত্রী শরীর, ইহা অজ্ঞানের ও তদ্বিভূতি কামের প্রধান বিভূতি। ঐ যে, মুক্তাদামে বিজড়িতা ও নানারত্নে বিভূষিতা যোষা, অজ্ঞানের মহিমায় উহারা কামরূপ ক্ষীর সাগরের লহরী বলিয়া উপমিত হয়[১]। স্বর্ণ পদ্মের মধ্যগত ভ্রমর উহাদের নেত্রের সহিত তুলিত হয়[২]। বসন্ত কালে জাত ও উদ্যান মধ্যে অবস্থিত পুষ্পসমূহ কামের প্রিয়তম দাস[৩]। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, যাহাদের অঙ্গ গৃধ্র, গোমায়ু ও কুক্কুর প্রভৃতি মাংসাশী জীবের ভক্ষ্য, কামকিঙ্করেরা সেই সকল রমণীর ক্রব্যাদভক্ষ্য অঙ্গসমূহকে কেহ চন্দ্রের সহিত কেহ চন্দনের সহিত কেহ বা চকোরের সহিত তুলিত করে[৪]। কামকিঙ্করেরা স্ত্রী লোকের বক্ষঃস্থস্থ

মাংসপিণ্ডকে কেহ স্বর্ণপদ্ম কেহ বা সুবর্ণকলশ দর্শন করে[৫]। তাহাদের অধর নামক মাংস খণ্ডের সহিত রসায়ন, ইন্দুদ্রব, মধুসম্পুট, ও আসব * প্রভৃতির উপমা দেয়[৬]। কবি নামক অজ্ঞানভৃত্যেরা তাহাদের মাংসলিপ্ত দীর্ঘাস্থি দিগকে বাহুলতা বলিয়া বর্ণন করে[৭]। কেবল বাহুলতার বর্ণন নহে, উরু নামক মাংস খণ্ডকে তাহারা রামরম্ভা প্রভৃতির দ্বারা তুলিত করে[৮]। যাবৎ অবিচার তাবৎ উহারা মূঢ় দিগের নিকট প্রথম প্রথম অতি মধুর, মধ্যে অর্থাৎ ব্যবহার কালে রাগ দ্বেষাদির উৎপাদক, এবং শেষে তাহারা ক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে[৯]। বুদ্ধি যতই দুঃখানুভব করে, ততই সুখও শত শাখায় বিস্তৃত হয়, আবার দুঃখও অনন্ত শাখায় বৃদ্ধি পায়। কর্ম্মফল যে নানা শোভায় প্রকাশ পায়, সে সমস্তই ঐ ঐ কল্পনা হইতে সমুদ্ভূত[১০]। এই সকল নারী কর্ম্মলিপ্ত মুগ্ধ নরের বন্ধন রজ্জু এবং অতি দুর্গম কণ্টকাচিত কর্ম্মারণ্যের শোভনীয় ফল[১১]। অপিচ, উহারা প্রবৃত্তিরূপ জল সেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মোহের কালুষ্যে শ্যামবর্ণা অর্থাৎ তমোময়ী হয়[১২]। উহারা প্রথমতঃ নানাসুখদায়িনী বলিয়া বিবেচিত হয় বটে; পরন্তু পরিণামে নানাদুঃখদায়িনী হইয়া থাকে[১৩]। শরীরই জন্মরূপ বিষ বৃক্ষের রস। তাহা যতই বর্দ্ধিত হয় ততই স্বীয় কর্ম্মরূপ পবন নানা প্রকার উৎকরবাহী হইয়া বহিতে থাকে[১৪]। উক্ত ক্রমে পুত্র পৌত্রাদি বিয়োগ দুঃখের ভোগ, তদবসানে স্বয়ং মৃত্যুর উদরে গমন করে ও করায়। হে রামচন্দ্র! ত্রিতাপবর্জ্জিত ব্রহ্মেরই প্রকাশ বিশেষ জীবেরা † ইহ সংসারের বিচিত্র সর্প। ইহারা মোহমারুত পান করে, করিয়া অবশেষে নানা কুটিল গতির অধীন হয়। ইহাদের যৌবন অন্ধকারময়ী রাত্রির অনুরূপ। কেননা ইহারা যৌবনরূপ তমসাচ্ছন্ন রাত্রে চিন্তা পিশাচের আবির্ভাবে বিবেক চন্দ্রের অদর্শনে অন্ধকল্প হইয়া থাকে। ইহাদের জিহ্বা ও চক্ষু প্রভৃতি বৃথা জল্প দর্শনাদির দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে, ক্রমে বিশীর্ণ হইয়া যায়[১৫।১৮]।

---

* রসায়ন—অমৃত, ইন্দুদ্রব—কর্দ্দমীকৃত চন্দ্র, মধুসম্পুট—মধুর আস্বাদের পেঁটরা, আসব—মিষ্টাস্বাদ মদ্য।

† ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার। এ দুঃখ ব্রহ্মে নাই। সুতরাং তদীয় অন্যতম প্রকাশ জীবেও উহা বাস্তবতঃ নাই। কিন্তু কল্পনায় আছে। তদনুসারিণী উক্তি—জীবেরা এই সংসারের সর্প।

হে রঘুনাথ! দরিদ্রতাও অজ্ঞানের বিভূতি। দুঃখ ও শোক যাহার অষ্ঠীলা (গ্রন্থি), কষ্ট যাহার কণ্টক, অজ্ঞানের প্রভাবে তাদৃশ দারিদ্র্য রূপ শাল্মলী সহস্র শাখায় বৃদ্ধি পায়[১৯]। যাহার অভ্যন্তর শূন্য, উন্নতি রহিত, চিত্ত নামক বৃক্ষে যাহার কুলায়, সেই লোভ নামক পেচক মায়া-রূপিণী অন্ধকারময়ী নিশায় সোৎসাহে পরিভ্রমণ করে[২০]। জরা নাম্নী বৃদ্ধা মার্জ্জারী যৌবন নামক আখুকে প্রথমে কপোল (আখু ইন্দুর। কপোল গণ্ডদেশ।) প্রদেশে গ্রহণ করে, ক্রমে তাহাকে বিনাশ করে[২১]। যেমন ফেনপিণ্ড অসার অথচ দেখিতে বিলক্ষণ পুষ্ট, এই সৃষ্টিও সেইরূপ অসার অথচ দেখিতে পুষ্ট। চিদাভাসরূপ (জীব) পুষ্পে ধবলিত, জগৎ-পল্লবে সুশোভিত ও ধর্ম্মার্থফলধারিণী সত্তা নাম্নী লতা অজ্ঞানের অন্যতমা বিভূতি। এই যে জগত্রয়রূপ গৃহ, এ গৃহের বৃহৎ স্থূণ (খুঁটী বা স্তম্ভ) সুমেরু, চন্দ্র ও সূর্য্য গবাক্ষ, গগন ইহার ছাদ, এ গৃহও সেই অজ্ঞানের নির্ম্মিত[২২।২৪]। এই সংসার একটী বিস্তীর্ণ সরোবর, এ সরোবরে প্রাণ নামক ষট্পদ (ভ্রমর) বিচরণ করে। নানাপ্রকার শরীর এ সরোবরের পদ্ম, চিৎ বা চেতনা সে সকলের মধু। এই যে ভুবন নামক কুট্টিম (নানা রত্ন শোভিত কৃত্রিম ভূভাগ), ইহার একমাত্র দীপ আদিত্য। এই যে জগদন্তর্গত জীবরাশি, ইহারা জরৎপক্ষীর (বহুকালের পুরাতন বা জীর্ণ পক্ষীর) অনুরূপ। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ আশা তন্তুতে নিবদ্ধ, ইহারা নিরন্তর ইন্দ্রিয়পিঞ্জরের অধীনে অবস্থান করে[২৫।২৭]। এই সংসার একটী লতিকা, এ লতিকার পত্র প্রাণিনিবহ। এ লতিকা প্রাণ-বায়ুর আন্দো-লনে নিরন্তর পতিত হইতেছে। বিধাতা পাতাল প্রদেশে নরক স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, প্রাণিগণ তৎপতনশঙ্কাবর্জ্জিত। অথবা বিধাতা মলমূত্রাদিপূর্ণ দেহ নামক নরক সৃজন করিয়াছেন পরন্তু প্রাণিগণ তাহাতেই অহং-অধ্যাসে হৃষ্ট ও মহামাহাত্ম্যাভিমানী। এ সকল ব্যাপারও অত্যধিক অজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য। স্বর্গ একটী সরোবর। দেবতারা তাহার সারস। এবং মেঘ তাহার শৈবাল। এই সরোবরের পদ্ম মোদ (হর্ষ), এ পদ্ম পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা বিকসিত হয়[২৮।৩১]। রাম! এই যে সৃষ্টি ইহা একটী দুর্ব্বলা শফরী। ইহার স্ফূর্ত্তিস্থান ভব-পল্বল। কৃতান্তরূপ গৃধ্র ইহাদের ভক্ষক[৩২]। ইন্দুরেখা যেমন দিন দিন উদয় ও উৎক্রম ব্যুৎক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সৃষ্টিও উদয় ও ক্ষয় প্রাপ্ত

হইয়া থাকে৩৩। কুলালধর্ম্মী কাল যে চক্র আবর্ত্তন দ্বারা কত ক্ষণভঙ্গুর প্রাণিরূপ শরাব নির্ম্মাণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই৩৪। সেই অচল ব্রহ্মপদে অসংখ্য কল্প ও জগজ্জাল জন্মিয়াছে ও যুগাগ্নির দ্বারা পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়াছে। এই যে জগৎ, ইহার স্থিতি ও গতি একরূপ নহে। কখন ভাব, কখন অভাব, কখন সুখ, কখন দুঃখ। বাসনা শৃঙ্খলে বিজড়িত অজ্ঞ দিগের মূর্খতা এত দৃঢ় যে তাহা শত শত যুগ পরিবর্ত্তনরূপ বজ্রের আঘাতেও বিশীর্ণ হয় না৩৫।৩৭। মূর্খ দিগের বাসনারূপ এই শরীর কিছুতেই বিক্রত হয় না। নিয়তিঝটিকার দ্বারা জীব সৃষ্টিরূপ পাংশু নিরন্তর কালরূপ সর্পের উদরগত হইতেছে। অভাব অর্থাৎ ধ্বংস এক প্রকার বাড়বানল, তন্মুখে এ সমস্তই ভস্মীভূত হইতেছে ও হইবে৩৮।৪০। অকস্মাৎ কত শত আশ্চর্য্য দ্রব্যশক্তি উদ্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার লোপ প্রাপ্ত হইতেছে৪১। ভূত ও ভৌতিক পদার্থে পরিপূর্ণ এই জগৎ একটী বৃহৎ হস্তী। পরন্তু কৃতান্ত ইহাতে দৃপ্ত (অতিবলবান্) সিংহ৪২। জীবরূপ পক্ষিগণ অত্র জগতের উত্তর দক্ষিণ এই দুই পথে নিরন্তর গত্যাগতি করিতেছে৪৩। এই সংসাররূপ চিত্রের আধার চিৎ শক্তি। চিৎ শক্তি ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা বিস্পষ্ট ও শুভ্র। পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার পাঁচ প্রকার রং অর্থাৎ বর্ণ, এবং বিধাতা ইহার চিত্রকর৪৪।৪৫। ইহাতে এই যে স্থাবর জাতি দৃষ্ট হইতেছে এ সকল নিতান্ত নশ্বর। অর্থাৎ এ সকল নিরন্তর জন্মমরণ ও পরিবর্ত্তন শীল৪৬। তদ্ভিন্ন, এই যে জঙ্গম জাতি, এ জাতিও রাগ দ্বেষ সমুত্থিত ভাবাভাবময় ও জরামরণযুক্ত রোগে জীর্ণ৪৭। কৃমি কীটাদি জীব আরও অধিক দুঃখী। তাহাদের নিয়তিই তাহাদিগকে নিরন্তর পীড়া প্রদান করিতেছে৪৮। কালরূপ সর্প যে কোন্ অতর্কিত গর্ত্তে বাস করে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে। সেই কালরূপ সর্প ঐ সকল জীবকে গ্রাস করিতেছে আবার অদৃশ্য হইতেছে। সেই কাল আবার স্থাবর জাতিতে ঋতুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগের ফল পুষ্প উৎপাদন ও নিবারণ করিতেছে এবং তাহাদিগকে সমধিক শীত বাত আতপ সহিষ্ণু করিতেছে৪৯।৫০। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন্‌টী লোক যেন তিন্‌টী পথ। এই তিন্‌টী পথই জলোপরি অবস্থিত। * ঐ সকল পথের মধ্যে

* যদিও পৃথিবী জলোপরি অবস্থিত ভাসমান প্রায়, ইহা পুরাণকার দিগের

অসংখ্য ভূত (প্রাণী) রূপ ভ্রমর সর্ব্বক্ষণ কলরব করিতেছে। এই ত্রিলোক নামক ব্রহ্মাণ্ড কালীদেবীর অর্থাৎ কালপত্নীর ভিক্ষাপাত্র। এই কালপত্নী কালী পূর্ব্ব গৃহীত ভিক্ষা (জীবজাতি গ্রহণ) আপন ভর্ত্তা কালকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার অন্য প্রাণী ভিক্ষা করিবার চেষ্টায় ব্যগ্রা রহিয়াছে[৫১,৫২]। তিমির (অন্ধকার) পটল যাহার কবরী, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্ষু, ব্রহ্মাদি দেবতা যাহার অন্তশ্চেতনা, সুমেরু প্রভৃতি স্থাবর যাহার জড়ভাব অর্থাৎ দেহ, ব্রহ্মতত্ত্ব যাহার পয়োধর, চিদাভাস যাহার ধাত্রী (পোষণকর্ত্রী), তারকাগণ যাহার দন্তপংক্তি, যে ইন্দ্র অপেক্ষা পুরাতন, সমুদ্র সপ্তক যাহার মুক্তামালা, নীল মেঘ যাহার আবরণ বস্ত্র, জম্বুদ্বীপ যাহার নাভি, চতুর্দ্দশ ভুবন যাহার রোম, সেই লোকত্রয়রূপিণী বৃদ্ধা রমণী পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কালদশনে চর্ব্বিত ও নিগীরিত হইতেছে[৫৩,৫৭]। কালরূপ মহাসমুদ্র অতি ভীষণ। ইহাতে যে কত বার বিভ্রমকারিণী ত্রিলোকী রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়া মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়াছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না[৫৮]। ব্রহ্মাণ্ড উক্ত কালসমুদ্রের বুদ্বুদ ও কারণকুট উহার সারস পক্ষী[৫৯,৬০]। এই কাল মেঘরূপে বর্ণিত হইতেও পারে। কালরূপ মেঘে চৈতন্যরূপ বিদ্যুতের উদয় হইতেছে। উক্ত মেঘের অভিমুখে অসংখ্য ভূতরূপ বিহঙ্গ উড্ডীন হয়। এই কালকে তালবৃক্ষ রূপকেও বর্ণন করা যায়। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ইহার ফল, এবং সেই সকল ফল অনবরত উৎপন্ন ও নিপতিত হইতেছে। কোন কোন ভূত (প্রাণী) নিমেষমাত্র জীবী। যাঁহারা দেবতাদিগের অধিপতি, সেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উক্ত কাল তালের ফল। অপিচ, তাঁহারাও পক্ক ও পতনশীল। চিদ্রূপ পরম পদে রুদ্রাদি দেবপালকগণ নিমেষ মধ্যে উৎপন্ন হন, আবার নিমেষান্তরে বিলীন হন। ব্রহ্মপদে যে অভিহিত (বর্ণিত) রুদ্রান্ত ক্রিয়ার (হওয়া যাওয়া প্রভৃতি বিকারের) অবস্থান দৃষ্ট হয় সে সমস্তই কর্ম্মের ও উপাসনার ফল[৬১,৬৮]। বলিতে কি, অজ্ঞানের বিভূতি সহস্র সহস্র আশ্চর্য্যের জনক। বলা বাহুল্য যে, জগৎ সংক্রান্ত যে কিছু, সে সমস্তই অজ্ঞানের বিজৃম্ভণ[৬৬,৬৭]।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অভিমত, তথাপি পঞ্চ ভূতের ক্যার্য বলিয়া সমস্তই জলোপরি, এ কথা বলা অসঙ্গত নহে।

অষ্টম সর্গ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিৎ পর্ব্বতের তটে যে সংসার নামক বন ও তন্মধ্যে যে সৃষ্টি ও অবিদ্যা লতা বিরাজ করিতেছে, এই লতা যেরূপ ও যে সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত, তাহা বলি শ্রবণ কর[১]। সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ পর্ব্বত সকল এই লতিকার পর্ব্ব (পাব), ব্রহ্মাণ্ডাবরণ বা ব্রহ্ম কটাহ ত্বক্ এবং লোকত্রয় ইহার সংস্থান (গঠনভঙ্গী)। সুখ দুঃখ জন্ম স্থিতি ও জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি এই লতিকার বৃদ্ধিশীল ফল মূল পত্র ও পুষ্প প্রভৃতি[২।৩]। একবার সুখানুভব হইলে পুনর্ব্বার তজ্জাতীয় সুখের স্পৃহা জন্মে; সুতরাং সুখই অনুরাগ নামক অবিদ্যার মূল। যে হেতু উক্ত সুখ হইতেই পুনঃ সুখাভিলাষ উৎপন্ন হয় এবং চেষ্টার দ্বারা পুনর্ব্বার তৎসজাতীয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই হেতু উক্ত সুখকে ফল বলিয়াও গণ্য করা যায়। অর্থাৎ সুখেরও শেষ ফল বা শেষ পরিণাম সুখ। এইরূপ, দুঃখও ধনতৃষ্ণাদিরূপ অবিদ্যার মূল এবং তাহারও ফল দুঃখ। ভাবিয়া দেখ, দরিদ্রতা প্রভৃতি দুঃখ হইতে ধন তৃষ্ণারূপ অবিদ্যা উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে পাপ বাসনা জন্মে, পাপ বাসনা জন্মিলে চৌর্য্যাদি প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং তাহা পরিণামে দুঃখ ফলই প্রসব করে[৪]। জন্ম ও স্থিতি এ দুটীকেও উক্ত প্রকারে জন্মান্তরের ও মৃত্যান্তরের মূল ও ফল বলিয়া বিদিত হইবে[৫]। অজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানেরই এবং জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানেরই বৃদ্ধি সংঘটন হইয়া থাকে[৬]। এই লতার বিলাস বহুবিধ, ও তাহার সৌগন্ধ বাসনা[৭]। দিবস সকল উক্ত লতার কুসুম, রাত্রি সকল সে কুসুমের ভ্রমর, এবং পতনশীল প্রাণি সকল তাহার পল্লব[৮]। কদাচিৎ কখন বিবেকরূপিণী করিণী আসিয়া দৈবাৎ কোন কোন পল্লবের রজোমার্জ্জন (রজঃ ধূলা, পক্ষান্তরে কর্ম্মজ বাসনা) করে এবং তৎকর চ্যুত (কর=শুণ্ড, রজঃ=দুর্ব্বাসনা) কোন কোন পল্লব পুনর্ব্বার রজোযুক্ত হয়[৯]। এই লতা জায়মান পুত্র মিত্র ও পশু প্রভৃতিরূপ নব পল্লব দ্বারা সুশোভিত এবং উৎপন্ন পুত্র ও

পৌত্রাদি রূপ অঙ্কুরের দ্বারা দন্তুর অর্থাৎ দন্তবিকাশক আনন্দিতমুখ। এই লতা সকল ঋতুরূপ পুষ্প ধারণ করে এবং সর্ব্ব প্রকার রস বহন করে[১০]। জন্ম এই লতার পর্ব্ব, তাহা দুঃখরূপ সর্পে পরিব্যাপ্ত, বিনাশ বা ধ্বংস তাহার ছিদ্র, বিষয়ানুভব তাহার রস, এবং বিচার তাহার নাশক ঘুণ (কীট বিশেষ)[১১]। উক্ত লতায় প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জোতিষ্কগণ বিকসিত হইতেছে[১২।১৩]। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতির আলোক উক্ত কুসুমের পরাগ। তদ্দ্বারা এই লতিকা অতীব সুন্দরী[১৪]। মনোরূপ হস্তী ইহাকে কম্পিত করে এবং সঙ্কল্প নামক কোকিল ইহাতে কলরব করে। এই লতা ইন্দ্রিয়রূপ সর্পে সম্বাধ অর্থাৎ বিজড়িত এবং তৃষ্ণারূপ ত্বকে উপরঞ্জিত[১৫]। এই লতা নীলবর্ণ আকাশরূপ তমালের আশ্রয়ে উন্নতি প্রাপ্ত[১৬]। অধোভুবন অর্থাৎ পাতাল তল উহার আলবাল এবং সমুদ্রজল তাহাতে জলসেক[১৭]। ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয় উক্ত লতার ভ্রমর ও রমণীমণ্ডল উহার পুষ্পপুঞ্জ। এই লতা চিৎস্পন্দরূপ বায়ুর দ্বারা বিচলিত হয় এবং ইহাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপ সূক্ষ্ম কীট বাস করে[১৮]। বর্ণিত লতা কুকর্ম্মরূপ অজগরে ব্যাপ্তা, স্বর্গশোভা তাহার পুষ্প, এবং তাহা বহুবিধ জীবের জীবিকায় ও আমোদে পরিপূর্ণা[১৯]। এই লতা বিবেকীর নিকট নানা উপশমযুক্তা, অবিবেকীর নিকট নানা ফল পুষ্পে সুশোভিতা[২০।২১]। এ লতার আলবাল অতীব বিচিত্র। ইহাতে বহুবিধ জীব বিহঙ্গ বাস করে, এবং ইহার পরাগও বিচিত্রতম[২২]। নানাপ্রকার লীলা অর্থাৎ শিল্পাদি ইহার কুট্মল, এবং ইহা নানা প্রকার পর্ব্বতের তটে অবরূঢ়। ইহার ফল নিতান্ত নিবিড়। এ লতা অনেক বার জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিয়া বিনষ্ট হইতেছে। কখন বা এ লতা অর্দ্ধছিন্না হয় এবং কখন বা ছিন্ন হয় না। ইহার এককালীন উচ্ছেদ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না[২৩]। সত্য না হইলেও এ লতা সদা সত্যের ন্যায় ভাসমানা। ইহার তরুণত্বও নিত্য এবং শোষও (শোষ=শুষ্ক হওয়া) নিত্য[২৪]। এ একটী বিশেষ বিষলতা। ইহার আলিঙ্গনে সংসারনামক মূর্চ্ছা ও ভ্রান্তি এবং বিচারে ইহার বিনাশ হয়[২৫]। যে ইহার বিচার করে, সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে, উক্ত লতা তাহার অন্তর হইতে বিগলিত হইয়া যায়। অর্থাৎ সে ইহাকে অসত্য বলিয়া জানে। যে

বিচার করে না, সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে না, উক্ত লতা সেই অজ্ঞ নরের অন্তরে সত্যরূপে অবস্থিতি করে। তাহাদেরই দৃষ্টিতে কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নাগ, কোথাও দেবতা এবং কোথাও বা পৃথিবী প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। বলিতে কি, সূর্য্য চন্দ্র তারকা তমঃ তেজ আকাশ শস্যসম্পন্না ভুমি শাস্ত্র শস্ত্র বেদ এই লতার পক্ষী ও এ পক্ষীর উড্ডয়ন দেবতা স্থাণু বায়ুপ্রবাহ নরক স্বর্গ দেবত্বাদিপদ কৃমি কীট বিষ্ণু ব্রহ্মা রুদ্র সূর্য্য অগ্নি ও যম। এ সমস্তই আবার দৃষ্ট শ্রুত ও অনুভূত হয়[২৬।৩১]। যে কোন মহিমান্বিত পদার্থ ও যে কোন তৃণাদি তুচ্ছ পদার্থ ভুবন মধ্যে লক্ষিত হইবে, হে রামচন্দ্র! সে সমুদায়কেই তুমি অবিদ্যা বলিয়া বিদিত হইবে[৩২]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনার মুখে হরি হর ব্রহ্মাদি আকারেরও অবিদ্যাময়ত্ব শ্রবণ করিয়া আমার ভ্রম বা সংশয় জন্মিতেছে। ঈশ্বর মূর্ত্তির অবিদ্যাময়তা কি রূপে সুসম্ভব হইতে পারে[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান বিস্পষ্ট জগৎ ছিল না, পরন্তু ইহা সংস্কারের আকারে ছিল। সেই সংস্কার ভাবটী এক বা একটী অখণ্ডিত ভাব; তাহাকেই আমরা সর্ব্বাত্মক বলি এবং তাহা সম্বিদাভাস যুক্ত[২]। পরে সৃষ্ট্যারম্ভ কালে সেই সংস্কারীভূত জগতের উদ্বোধে বা উদ্রেকে তত্রস্থ চিদাভাসও উদ্বুদ্ধ ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তরঙ্গ উঠিবার পূর্ব্বে জলে যেমন প্রথমতঃ একটী সূক্ষ্ম আবর্ত্ত-রেখা উৎপন্ন হয়, পরে সেই রেখা বৃহৎ তরঙ্গাকার ধারণ করে, সেইরূপ, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে প্রথমতঃ মায়ানামক জগৎসংস্কারের উদ্বোধ অর্থাৎ জন্মে। পরে তাহা হইতেই সূক্ষ্ম রেখার আকার ভাবি জগতের

জন্ম হয়। অর্থাৎ সেই সূক্ষ্ম জগৎ ক্রমে স্থূল সুতরাং বিস্পষ্ট হয়[৩]। প্রখর আতপ, মন্দাতপ ও ছায়া যেমন এক সূর্য্য হইতেই প্রকটিত হয়, এবং উক্ত তিন্ অবস্থায় যেমন সৌর তেজের আধিক্য ও অল্পীভাব থাকে, সেই রূপ, সেই সর্ব্বাত্মক এক মূল তত্ত্ব হইতে আগে সূক্ষ্ম, পরে মধ্য, তৎপরে এই স্থূল জগৎ প্রকটিত হয়, সেই জন্য আমরা তাহাকে সূক্ষ্মঃ মধ্য স্থূল এই ত্রিবিভাগে কল্পনা করিয়া থাকি। প্রথমোক্ত সূক্ষ্ম বিভাগটী তদ্ব্যাপ্ত চিদাভাসের শরীর স্থানীয় এবং তাহারই অন্য নাম সমষ্টি মন অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ[৪]। যে এক সর্ব্বাত্মক পদার্থকে ত্রিবিভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা বলা হইল, সৃষ্টিমূল সেই এক সর্ব্বাত্মক পদার্থের আর এক নাম অব্যাকৃত ও অপর নাম প্রকৃতি, এবং তাহারই অন্য নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা অব্যাকৃত বা প্রকৃতি ত্রিগুণধর্ম্মিণী অর্থাৎ সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন্ গুণের সমাহার (সম সমাবেশ) বিশেষ। উক্ত তিন্ গুণই জীবের সংসার এবং উহারই পারে পরম পদ[৫,৬]। যে তিন্টী গুণের উল্লেখ করিলাম, সেই তিন্টী গুণ আবার প্রত্যেকে ত্রিবিধ। অর্থাৎ সূক্ষ্ম মধ্য ও স্থূল। স্থূল কি-না বিস্পষ্ট[৭]। যে কোন দৃশ্যের উল্লেখ করিবে সে সমস্তই উক্ত তিন্ গুণের আশ্রিত[৮]। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে প্রথম সাত্বিক বিভাগের কথা বলি, শ্রবণ কর। ঋষি, মুনি, সিদ্ধ (দেবযোনি বিশেষ), নাগ, বিদ্যাধর, সুর অর্থাৎ দেবতা, এ সকলকে তুমি সাত্বিক বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে[৯]। সাত্বিক বিভাগের মধ্যে বিদ্যাধর ও নাগ এই দুই জাতির দেহ আধিক্যনিয়মে কিছু অধিক তমোগুণান্বিত, মুনি ও সিদ্ধ গণের দেহ রজোময় এবং হরি হর ব্রহ্মাদির দেহ সত্বময়। অর্থাৎ হরি হরাদির দেহ বিশুদ্ধসত্বসম্পন্ন আর অন্যের দেহে রজস্তমো মিশ্রিত সত্ব। হরি হরাদির দেহ শুদ্ধ সত্বময় বলিয়া সর্ব্বদা নির্ম্মল। অর্থাৎ তাঁহারা অবিদ্যার আবরণ বর্জ্জিত[১০,১১]। হে রামচন্দ্র! যাহারা তজ্জ্ঞ অর্থাৎ হরি হরাদির উপাসক, তাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ও জ্ঞান প্রাপ্তির পর মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সেই কারণেই রুদ্রাদি দেহ নামক সত্বভাগ জগৎস্থিতি পর্য্যন্ত অবস্থান করে[১২,১৩]। যাঁহারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহারাও যাবৎ প্রারব্ধ তাবৎ সদেহ থাকেন, পরে বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন[১৪]। তাই বলিতেছি, যেমন বীজ ফলরূপ ধারণ করে আবার ফল বীজ

রূপে পরিণত হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যান্তরের রূপ প্রাপ্ত হয়[১৫]। যেমন সলিল হইতে ফেন বুদ্বুদাদির উদয় হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যার পুর্ব্বাবস্থা হইতে প্রকটিত হয়। ফেন বুদ্বুদাদি যেমন সলিলে লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যায় বিলীন হয়[১৬]। জল ও তরঙ্গ এই দুই ভেদ কেবল ভাবমাত্রমূলক, বস্তুমূলক নহে। অর্থাৎ বস্তুদৃষ্টিতে জলই তরঙ্গ। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বিদ্যা অবিদ্যা এ দুই ভেদও ভাবনামুলক, বস্তুমুলক নহে। জল ও তরঙ্গ পরমার্থতঃ এক। সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা এ দুইও পরমার্থতঃ এক[১৭,১৮]। অতএব হে রাঘব! বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই বিভাগ ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে তাহাই আছে। অর্থাৎ তাহাই পরম সৎ। সেই একাদ্বয় পরম সৎ ব্যতীত বিভাগীভূত বিদ্যা ও অবিদ্যা নাই। যখন তাহা বস্তুতঃ নাই তখন আর তদ্দ্বয়ের বৃথা কল্পনা কেন[১৯,২০]। যাহা কোন নামরূপাদির গোচর নহে তাহাই আছে। যাহা আছে তাহারই অজ্ঞাত ভাব আমাদের মতে অবিদ্যা[২১]। অপিচ, তাহা যদি বিদিত হয় তবে তাহাকে আমরা বিদ্যা বলি এবং বিদ্যা ভাবের উদয়ে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অবিদ্যা নাস্তি হইয়া যায়[২২]। ঐরূপে অবিদ্যার অনস্তিতা সম্পন্ন হইলে তখন বিদ্যা অবিদ্যা এ কল্পনাও থাকে না[২৩]।

হে রঘুনাথ! যখন তাহা বিদ্যা ইহা অবিদ্যা এ কল্পনা থাকে না, তখন সেই বিদ্যাপ্রাপ্য পূর্ণানন্দ অবশেষিত হয় অর্থাৎ কেবল তাহাই থাকে, অন্য কিছু থাকে না। ভাবার্থ এই যে, অবিদ্যা পক্ষ না থাকিলে বিদ্যা পক্ষও থাকে না, কাযেই তখন একাদ্বয় পরম পদ অবশেষিত হয়। উক্ত উভয় কল্পনার অভাবে যাহা থাকে, তাহা "যৎ-কিঞ্চিৎ" এতাবৎ মাত্র বলা যায় অন্য কিছু বলা যায় না। সেই যে যৎকিঞ্চিৎ, তাহা পরমার্থ সৎ ও পরম পদ প্রভৃতি কথায় উক্ত হইয়া থাকে[২৪,২৫]। যেমন বটবীজে বট থাকে, তাহার ফল পুষ্প শাখা কাণ্ড, সমস্তই অব্যাকৃতরূপে তাহাতেই বিরাজিত থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞানাবৃত দশায় তাদৃশ অজ্ঞানে এ সমস্তই অব্যাকৃতরূপে অবস্থিত থাকে, সেই জন্য তাহা কিঞ্চিৎ শব্দের দ্বারা উল্লেখ্য হয়। অতএব, সেই অজ্ঞান ভাবটী সর্ব্বশক্তির পেটরা স্বরূপ[২৬]। পরম সত্য চিৎপদার্থ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অথচ শূন্য নহে (শূন্য=অভাব)। যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে

বহ্নির অবস্থান, যেমন দুগ্ধে ঘৃতের স্থিতি, তেমনি উক্ত চিৎ পদার্থে এ সমুদায়ের অবস্থান ছিল পরে তাহা হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ন্যায়ে অথবা আভাস ন্যায়ে * এ সকল আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব, তরঙ্গের সহিত সমুদ্রের, কিরণের সহিত মণির, যেরূপ সম্বন্ধ, এ সকলের সহিত চিৎ পদার্থের সেইরূপ সম্বন্ধ[২৭।২৯]। অতএব হে রাঘব! উক্ত চিৎ পদার্থই এই দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ রাশির কোষস্বরূপ। কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে, তাহারই অবস্থান দৃষ্ট হয়। যেমন কুম্ভেরই বিনাশ হয়, কুম্ভাকাশের বিনাশ হয় না, তাহা সর্ব্বদা অবিনাশী, সেইরূপ, দৃশ্যভাগই বিনষ্ট হয়, তদাধার চিৎ অবিনাশিনী থাকে। লৌহস্পন্দে অয়স্কান্ত মণির কর্ত্তৃত্ব যেরূপ, জড় দেহের পরিস্পন্দে চিদাত্মার কর্ত্তৃত্বও সেইরূপ। যেমন সন্নিহিত থাকাই অয়স্কান্তের কর্ত্তৃতা, সেইরূপ, সদাত্মার অস্তিতা মাত্র দেহচেতনার প্রতি কর্ত্তৃতা[৩০।৩২]। অতএব, হে রঘুনাথ! এই সমুদায় জগৎ সেই চিদাত্মাতেই অবস্থিত, সেই চিদাত্মাই বিশ্বের এক মাত্র বীজ, সেই চিৎ-নাম্নী সম্বিদে এ সকল কল্পিত বলিয়া জানিবে[৩৩]।

নবমঃ সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যে হেতু স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত, সেই হেতু এ সকল ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তখন এ সকল তুচ্ছ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া যায়[১]। যাহাতে ভাব ও অভাব কোনও প্রকার গণনা নাই সেই ব্রহ্ম পদার্থেই

---

* আভাস ন্যায় কথার অর্থ—ঔপাধিকী ভ্রান্তি অথবা অজ্ঞান বশতঃ কল্পনা বিশেষ। যেমন নিকটে জবা পুষ্প থাকিলে তৎপ্রতিবিম্বপাতে স্ফটিকে রক্তবর্ণ পদ্মরাগ মণির ভ্রান্তি হয়। অথবা যেমন রজ্জুর রজ্জুত্ব অজ্ঞানগ্রস্ত হইয়া সর্পের কল্পনা জন্মায়।

এ সকলের পরিশেষ। হে রামচন্দ্র! তাই আমি বলিতেছি, কেন তুমি বৃথা ইচ্ছা করিবে। এই সকল জীব ও এই সকল দৃশ্য বা এই জগৎ এ সমস্তই মিথ্যা, এবং ব্রহ্মই ইহার সত্য বা সার[২]। দেহের সহিত ও বাহ্যভোগাদির সহিত যে অহং মম সম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ভ্রম বিনাশ হইলে তখন আর সে সম্বন্ধ দৃষ্ট বা অনুভূত হইবে না। সর্পভ্রম বিনষ্ট হইলে তখন কি আর রজ্জুতে সর্পদর্শন হয়? তাহা হয় না। আত্মাই অপরিজ্ঞাত অবস্থায় ভ্রান্ত অর্থাৎ জগদ্দ্রষ্টা এবং জ্ঞাত অবস্থায় ব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাস্তিতার বোদ্ধা[৩,৪]। ব্রহ্মাভিধেয় চিৎ পদার্থ চেত্যমলের আশ্রিত হইলেই লোকে তাহাকে অবিদ্যা বলে এবং চেত্যের অতীত হইলে তাহাকেই লোকে আত্মা ও ব্রহ্মাদি নাম প্রদান করে[৫]। (চিতের বিষয় চেত্য। ফলিতার্থ—স্বাতিরিক্ত রূপের আরোপ)। জীব কি? না চিত্ত। চিত্তই পুরুষ বা জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত। যেমন ঘট থাকিলে ঘটাকাশ থাকে সেইরূপ চিত্ত সদ্ভাবেই জীবের সদ্ভাব কল্পিত হয়। ফলতঃ চিত্তই গমনাগমন করে, তদনুসারে তন্ময়তা প্রাপ্ত চিৎও গমনাগমন করে বলিয়া অভিহিত হয়। হে রঘুনাথ! চিত্তই ভ্রমের প্রভাবে আকুল হইয়া মিথ্যা জগদ্দর্শন করিতেছে[৬,৭]। যেমন কোষকার কীট আপনার লালায় আপনাকে বেষ্টন করে সেই-রূপ চিত্তও আপনাকে নানা প্রকার বাসনা জালে জড়িত করিতেছে[৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! বুঝিলাম, জীবচৈতন্য যার পর নাই প্রগাঢ় মূর্খতা অবলম্বন করিয়াছে। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য—স্থাবরাদি শরীরের জীবচৈতন্য কিরূপ[৯]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন সুষুপ্তি কালে মনের বিলয় হয়, তখন যেমন মনের সুখদুঃখানুভবের ক্ষমতা থাকে না, জীবচৈতন্য স্থাবর শরীরে সেইরূপ মনস্তা হইতে বিচ্যুত থাকায় সুতরাং একপ্রকার মুগ্ধভাব (মোহপ্রাপ্ত ভাব) মাত্রে অবস্থান করে। (মনস্তা=মনন শক্তি)[১০]। হে বেদ্যবিৎশ্রেষ্ঠ! মুক্তি স্থাবর শরীরের বহু দূরে অবস্থান করে। চিৎ অর্থাৎ জীবচৈতন্য তাহাতে থাকে মাত্র, পরন্তু তাহাতে স্বাত্মোদ্ধারের ক্ষমতা থাকে না। উহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয় থাকে না, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল লুপ্ত হইয়া যায় এবং মনেরও প্রচার থাকে না। সুতরাং ঐ অবস্থা বহু দুঃখপ্রদ ও মুক্তির বহু দূরে অবস্থিত[১১]।

রাম বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিতেছেন, জীবাত্মা স্থাবর দেহে

জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার রহিত হওয়ায় সুতরাং অস্তিতা মাত্রে পরিশেষিত হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে সে অবস্থাকে মুক্তির দূরস্থিত বলিলেন কেন? আমার মনে হয়, উক্ত অবস্থার দ্বারা শীঘ্র মনোলয় পূর্ব্বক মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে। কেননা দেখা যায়, যোগীরা জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার পরিত্যাগ করতঃ শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন[১২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বাসনা বিনাশের সহিত মনোবিনাশ ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। পরন্তু তাহা বিহিতানুষ্ঠান ব্যতীত সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানপূর্ব্বক বিচারণার পর যে তত্ত্ববোধ উদ্ভূত হয়, সেই তত্ত্ববোধ সত্তাসামান্যাবস্থার অপর একটী নাম। মোক্ষ তাহারই সংজ্ঞাবিশেষ এবং তাহাই অক্ষয় অব্যয় ও অবিনাশী ব্রহ্ম[১৩]। আগে জ্ঞান, পরে বাসনা পরিত্যাগ জনিত সত্তাসামান্য লাভ, তৎপরে তাহা কৈবল্য পদের অভিধেয়[১৪]। গুরূপদেশ প্রাপ্তি, বিচার ও শাস্ত্রাভ্যাস পূর্ব্বক যে সত্তাসামান্যের উদয় হয় সেই সত্তাসামান্যকেই আমরা ব্রহ্ম পদ বলি[১৫]। অতএব, যাহাতে বীজে অঙ্কুর শক্তি থাকার ন্যায় বাসনা শক্তি বিদ্যমানা থাকে সে অবস্থাকে তুমি সুষুপ্ত অবস্থার ন্যায় বিদিত হইবে। যেমন সুষুপ্তাবস্থার পর পুনরুত্থান অবস্থা আইসে সেইরূপ স্থাবরস্থ জীবচৈতন্যেরও পুনর্ব্বার দেহান্তরে জন্ম হইয়া থাকে। সেই জন্যই বলিয়াছি, মুক্তি স্থাবর দেহের অতীব দূরে অবস্থিত[১৬]। জড় দেহে মননধর্ম্ম প্রলীন হইয়া থাকে, বাসনাও (পূর্ব্ব কর্ম্মের সংস্কারও) প্রসুপ্ত থাকে, সেইজন্য সে অবস্থা মুক্তির উপযোগী নহে, অধিকন্তু তাহা শত শত জন্মমরণ দুঃখের কারণ[১৭]। অতএব, হে রাঘব! এই সকল স্থাবর জীব জড়ধর্ম্মা, বর্ত্তমানে ইহারা প্রসুপ্তের ন্যায় থাকিলেও ভবিষ্যতে ইহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে[১৮]। যেমন বীজে পুষ্পাদির অবস্থান দুর্লক্ষ্য, মৃত্তিকাস্তূপে ঘটাদির স্থিতি অলক্ষ্য, তেমনি, স্থাবরে বাসনার অবস্থানও দুর্লক্ষ্য[১৯]। যে প্রসুপ্তভাবে বাসনাবীজ লুকায়িত থাকে, সে প্রসুপ্তভাব মুক্তির কারণ নহে। বাসনাবীজ নাই, বিনষ্ট হইয়াছে, যেমন যোগী দিগের প্রসুপ্ত ভাব, সেইরূপ প্রসুপ্ত ভাবই মুক্তি পদ প্রদান করে[২০]। যেমন বহ্নির শেষ, ঋণের শেষ, ব্যাধির শেষ, শত্রুতার শেষ, ও বিষের শেষ ভবিষ্যৎ কষ্টের কারণ, সেইরূপ, বাসনার শেষও পশ্চাদ্দুঃখের কারণ[২১]। বাসনা বীজ যদি জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ

হয়, তাহা হইলে তৎকালের সেই সত্তাসামান্ত অর্থাৎ অস্তিতাবশেষ নামক অবস্থা আত্যন্তিক দুঃখ নাশক বলিয়া গণ্য[২২]।

হে রঘুনাথ! চিচ্ছক্তিই বীজে অঙ্কুরশক্তি রূপে, স্থাবর পদার্থে রস-শক্তি রূপে, জড়ে জাড্যরূপে, দ্রব্যে দ্রব্যভাবে অর্থাৎ ধন রত্নাদি দ্রব্যে স্পৃহনীয় রূপে, কজ্জলে কালিমারূপে, অস্ত্রে তীক্ষ্ণতারূপে, অবস্থিতি করিতেছে[২৩।২৫]। বলা বাহুল্য যে, আত্মা নামক চেতনাই ঘট পটাদি পদার্থে সত্তাসামান্ত আধান করতঃ স্থিত রহিয়াছে[২৬]। যেরূপ বলা হইল, বর্ণনা করা হইল, আত্মা সেই সেই প্রকারে সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে অর্থাৎ সমুদায় দৃশ্য পদার্থে পূর্ণ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। মেঘ যেমন আচ্ছাদক, সেইরূপ আত্মাও সর্ব্বাচ্ছাদক। রঘুনাথ! যাহা যাহা বলিলাম এবং যাহা বলিতে বিরত রহিলাম, সে সমস্তই অজ্ঞানাবৃত চিচ্ছক্তির স্বরূপ। অর্থাৎ তৎস্বরূপান্তর্গত মায়ার বিকার। মায়া সর্ব্বপদার্থ-ব্যাপিনী অথচ অকিঞ্চিৎ[২৭।২৮]। সংসার আত্মদৃষ্টির অভাবমূলক এবং মোক্ষ আত্মদৃষ্টিমূলক। অর্থাৎ আত্মাই অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকায় সংসারের কারণ এবং তদাবরণের বিনাশে সমগ্র দুঃখের বিনাশ কারণ[২৯]। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যাহা আত্মদৃষ্টির অভাব তাহাই অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির প্রবৃত্তি[৩০]। অবিদ্যা বস্তুতঃ রূপরহিত ও নিঃস্বরূপ অর্থাৎ অবিদ্যার বাস্তব কোন রূপ নাই। যেমন হিমপিণ্ড আতপতাপে বিগলিত হয়, সেইরূপ, "অবিদ্যা কি? বিচার করিয়া দেখি" এবম্প্রকারে দেখিতে গেলে অবিদ্যাও থাকে না, বিগলিত হইয়া যায়[৩১]। যেমন কোন মনুষ্য নিদ্রা কি? বিচার করিয়া দেখি, এবম্প্রকার চিন্তাপরায়ণ হইলে নিদ্রা তৎ সকাশ হইতে পলায়ন করে, সেইরূপ, অবিদ্যাও বিচারপরায়ণ মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে[৩২]। অবিদ্যা কি? অবিদ্যা কিংস্বরূপা, বস্তু কি অবস্তু, এরূপ বিচারে অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্তই হইয়া থাকে[৩৩]। অন্ধকারের রূপ কি? অথবা অন্ধকার কি প্রকার? দেখিব, ইহা ভাবিয়া যদি কেহ দীপ প্রজ্বালিত করে তাহা হইলে সে অন্ধকার দেখিতে পায় না। কেননা, দীপের প্রভাবে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, কাযেই অন্ধকার কিরূপ তাহা দেখিতে পায় না। অতএব, যেমন দীপের দ্বারা অন্ধকারের ধ্বংসই সাধিত হয়, তাহার রূপ নির্ণীত হয় না,

তেমনি, বিচারের দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংসই সাধিত হয়, তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয় না[৩৪,৩৫]। বিচার পূর্ব্বক অবিদ্যা দেখিতে গেলে অবিদ্যা কোথায় পলায়ন করে। সেইজন্ত তাহা অবস্ত। আলোকের অভাবে অন্ধকার দর্শনের স্থায় বিচারের অভাবে অবিদ্যার স্থিতি লক্ষিত হয় এবং অনুসন্ধানে তাহার অবস্ততাই সিদ্ধ হয়, বস্তুতা সিদ্ধ হয় না[৩৬।৩৮]। এই যে রক্তমাংসাদিময় দেহযন্ত্র, ইহার মধ্যে আমি কে, বিচার করিতে গেলে "আমি" নামের নামী পাওয়া যায় না[৩৯]। যেমন দেহের মধ্যে, সেইরূপ অন্যান্য দৃশ্বের মধ্যে। অতএব, বিচার বুদ্ধি অবলম্বনে প্রত্যেক দৃশ্বের মিথ্যাত্ব দৃষ্ট হইলে যে দ্রষ্টৃভাগের সত্যত্ব অবশেষিত হয় সেই সত্যতাবধারণকেই পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বিনাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন[৪০]। তাহাকে কোন কিছু বলাও যায়, না বলাও যায়। পণ্ডিতগণ তাহাকে সৎ, ব্রহ্ম, শাশ্বত, বস্ত, উপাদেয় ও অখণ্ড নামে বর্ণনা করেন[৪১]। উক্ত সৎ প্রভৃতি নাম আপনারই (আত্মারই) নাম[৪২]। অবিদ্যা অন্ত কুত্রাপি নাই। যে কোন পদার্থের নামোল্লেখ করিবে সে সমস্তই ব্রহ্ম[৪৩]। অধিক কি বলিব, ইহা ব্রহ্ম নহে, এইরূপ বোধেরই নাম অবিদ্যা এবং তাহারই বিপর্য্যয়ে এ সমুদায় ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণীত হয়[৪৪]। ইহা ঘট, তাহা পট, উহা শকট, ইত্যাদি রূপে অবভাসমান এই যে জগজ্জাল, এ সকল অবিভু অর্থাৎ বিভু নহে। এবম্প্রকারা বুদ্ধির নাম অবিদ্যা এবং এ সমস্তই বিভু এবম্বিধা বুদ্ধির নাম বিদ্যা[৪৫]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমাকে তোমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, বিনা অভ্যাসে আত্মভাবনার উদয় হয় না, হইলেও তাহা স্থিরা হয় না[১]। যাহার অন্ত নাম অবিদ্যা, সেই অজ্ঞান

নিতান্ত বলবান্ সুতরাং দুশ্ছেদ্য। উহা অসংখ্য জন্মপরম্পরার দ্বারা দৃঢ়মূল ও চক্ষুরাদি প্রবল প্রমাণের দ্বারা অনুভূয়মান; সেই কারণে উহা অত্যন্ত প্রবল[২।৩]। আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সেজন্য তাহার অস্তিতায় বহু লোক সন্দিগ্ধ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও সে সকলের অধিষ্ঠাতা মন যখন নির্বৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার সত্তা অর্থাৎ অস্তিতা প্রকটিত হয়। যাহা প্রত্যক্ষের অতীত, ইন্দ্রিয় বৃত্তির অগোচর, তাহার আবার প্রত্যক্ষ কি? কিরূপে বা কিসের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইবে[৪।৫]। হে রঘুনাথ! তাই তোমাকে বলিতেছি, হৃদ্‌বৃক্ষে আরূঢ় উক্ত অবিদ্যা লতাকে তুমি জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছেদন কর[৬]। জনক রাজা যেমন আত্মজ্ঞানতৎপর হইয়া সংসারে বিহরণ করিতেছেন, সেইরূপ তুমিও জ্ঞানাভ্যাসতৎপর হইয়া বিহরণ কর[৭]। হে রঘুনাথ! তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহার ও আন্তরিক সমাধি আত্মানুভবানুসারী হইয়াছিল। বাহিরে কার্য্যবান্ ও অন্তরে সমাহিত এরূপ হওয়াই আত্মাভ্যাসের ফল এবং তাহাই প্রকৃত জ্ঞানপদাভিধেয়। তাদৃশ জ্ঞানই সত্য, আপাত জ্ঞান সত্য নহে[৮]। তাদৃশ নিশ্চয় অর্থাৎ তাদৃশ দৃঢ় জ্ঞান থাকায় ভগবান্ হরি বিবিধ যোনিজন্মে অবতরিত হন অথচ তৎপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকেন[৯]। হে রঘুনাথ! প্রভু ত্রিলোচনের যে জ্ঞান, এবং রাগরহিত চতুরাননের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তোমারও হউক[১০]। সুরগুরু বৃহস্পতির যে জ্ঞান, অসুরগুরু শুক্রের যে জ্ঞান, দিবসপতি সূর্য্যের যে জ্ঞান, নিশানাথ চন্দ্রের যে জ্ঞান, অনিল ও অনল দেবের যে জ্ঞান, নারদ পুলস্ত্য প্রচেতা ভৃগু ক্রতু অত্রি শুকদেব ও আমার যে জ্ঞান এবং অন্যান্য বিপ্রশ্রেষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত রাজাধিরাজ দিগের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান তোমার হউক[১১।১৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! ঐ সকল মহাবুদ্ধিধর যে জ্ঞানের মহিমায় শোকোত্তীর্ণ হইয়াছেন সেই জ্ঞানের বিবরণ আমাকে পুনর্ব্বার বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! হে মহাবাহো! হে বিদিতবেদ্য! তুমি যে জ্ঞানের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই জ্ঞানের বিবরণ স্পষ্ট করিয়া বলি; শ্রবণ কর[১৪।১৫]।

হে মহাবাহো! এই যে জগজ্জাল দেখিতেছ, এ সমস্ত প্রকৃত পক্ষে জগজ্জাল নহে; পরন্তু সমস্তই অমল ব্রহ্ম[১৬]। চিৎ বা চেতনা,

ভুবন, ভূতগণ, আমি, শত্রু, মিত্র, বান্ধব, এ সমস্তই ব্রহ্ম। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই তিন্ কাল ব্রহ্মে অবস্থিত। যেমন তরঙ্গ সমূহের দ্বারা সমুদ্রের বৃদ্ধি অনুভূত হয়, তেমনি, ঐ সকলের দ্বারা ব্রহ্মেরও বৃদ্ধি (অর্থাৎ ভ্রান্তিময়ী বিকৃতি) বোধ গম্য হয়[১৭।১৮]। ব্রহ্মই ভোগ্য, ব্রহ্মই ভোগ, ব্রহ্মই ভোক্তা, ব্রহ্মেই ব্রহ্মের বৃদ্ধি বা প্রকাশ, এবং বৃদ্ধিও ব্রহ্মের শক্তি। অতএব, ব্রহ্ম যদি আপনি আপনার শত্রু ও অপ্রিয়কারী হন তাহা হইলে অবশ্যই রাগ দ্বেষাদির অস্তিতা কল্পিত খ বৃক্ষের অনুরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইবে[১৯।২১]। অর্থাৎ সঙ্কল্প ত্যাগ দ্বারা যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে ব্রহ্মে তাহাদের আর প্রসক্তি কি? যে কিছু স্ফুরণ, সমস্তই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের স্ফুরণ। সুতরাং সুখিত্ব দুঃখিত্ব উভয়ের কোনও কিছু নাই। ব্রহ্মেই ব্রহ্মের তৃপ্তি ও ব্রহ্মেই ব্রহ্মের স্থিতি। সুতরাং ব্রহ্ম ব্রহ্মেই স্ফুর্ত্তি পাইতেছেন। আমিও ব্রহ্মাতিরিক্ত নহি। ঘটপটাদি বহির্দৃশ্য ও অহমাদি আন্তর পদার্থ সমস্তই ব্রহ্ম। রাগ বিরাগ প্রভৃতির কল্পনা, কল্পনা মাত্র অর্থাৎ মিথ্যা। যখন জন্ম মরণ দেহাদি সমস্তই ব্রহ্ম, তখন আর মরণে দুঃখ কি? আমি মরিলাম বলিয়া যে দুঃখ হয় সে দুঃখ রজ্জুসর্পের ন্যায় কল্পনা ব্যতীত বস্তু অর্থাৎ সত্য নহে। এইরূপ, যখন দেহও ব্রহ্ম, তখন অবশ্যই সম্ভোগ সুখও ব্রহ্ম। যেমন জল ও তদাশ্রিত তরঙ্গ ভিন্ন নহে, সেইরূপ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিবর্ত্ত বিশ্ব ভিন্ন নহে। ব্রহ্মে তুমিত্বও নাই, আমিত্বও নাই। মরণরূপী ব্রহ্মও ব্রহ্ম, দেহরূপী ব্রহ্মও ব্রহ্ম। যেমন স্পন্দমান জলের স্পন্দন জলেরই রূপান্তর বা অবস্থান্তর, সেইরূপ, জন্ম মরণাদিও ব্রহ্মের রূপান্তর বা বিবর্ত্তান্তর। তাহাতেও তুমিত্বও নাই, আমিত্বও নাই। যাহা পরমাত্মা, তাহাতে জড়াজড় বিভাগ নাই। যেমন হেমের বলয়ভাব, জলের আবর্ত্তভাব, সেইরূপ, আত্মারও প্রকৃতিভাব ইহা বিদিত হইবে। ইহা জড়, তাহা অজড়, এবম্বিধ দ্বৈরূপ্য একাদ্বয় ব্রহ্মে অবশেষিত। আমি জীব, তুমি জীব, তাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা, এ সকল অজ্ঞানগ্রস্ত আত্মার মোহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। জ্ঞান প্রাপ্ত আত্মায় ঐ সকল নাই। অজ্ঞানী আত্মার নিকট এ সকল দুঃখপ্রদ এবং জ্ঞানী আত্মার নিকট এ সকল আনন্দ ব্রহ্ম[২২।৩২]। অন্ধের নিকট ভুবন অন্ধকার কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকট ভুবন প্রকাশময়। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ আত্মা, পরন্তু অজ্ঞানীর

দৃষ্টিতে অপ্রকৃত দুঃখদাতা৩৩। যেমন শিশুর নিকট যক্ষের স্ফূর্ত্তি, সেইরূপ, অজ্ঞের নিকট জগতের স্ফূর্ত্তি। যে হেতু এই ঘট অর্থাৎ এই দেহ ব্রহ্মামৃতে পরিপূর্ণ, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, সত্য সত্যই কেহ মরে না, সত্য সত্যই কেহ জীবিত থাকে না৩৪,৩৫। মহাসমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মে ভূতবৃন্দ কখন উল্লসিত ও কখন বা বিলসিত হইতেছে। ইহা নাই, তাহা নাই, ইহা আছে তাহা আছে, এ সকল ভ্রান্তিরই মহিমা ও তাহা আত্মারই আশ্রিত৩৬। ব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ জগচ্ছক্তির দ্বারা আপনাতেই সংস্থিত। যেমন জল স্বীয় অভিন্ন তরঙ্গ ও কণা প্রভৃতির আকারে অবস্থিত, সেইরূপ, ব্রহ্মও বিশ্ব অভিন্ন বিশ্বের আকারে অবস্থিত। শরীরের নাশে মরণ বুদ্ধি অতীব ভ্রান্তির স্থল। যেমন মহার্ণব জল ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সেইরূপ, শরীরাদিও ব্রহ্ম ব্যতীত নহে৩৭,৩৯। যেমন কণা, কণিকা, ক্ষুদ্র লহরী, তরঙ্গ বা ঢেউ, স্রোতঃ, ফেণ ও লহরী প্রভৃতি, সেইরূপ, দেহ, দৃশ্যসমূহ ও সে সকলের উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত বিভাগ যেমন জলের অনতিরিক্ত, সেইরূপ পশ্চাদুক্ত বিভাগও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত৪০,৪১। সুবর্ণে নানা আকার রচনার ন্যায় ব্রহ্মে নানা ভাবের কল্পনা মূঢ় দিগেরই হইয়া থাকে৪২।

হে রঘুকুলতিলক ! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়, এ সমস্তই ব্রহ্ম। সুতরাং সুখ ও দুঃখ দুয়ের কিছুই নাই। এই আমি, এইরূপ আমার চিত্ত, এ সকল শব্দ প্রতিধ্বনির অনুরূপ জানিবে অর্থাৎ যেমন একই শব্দ পর্ব্বত গুহাদি প্রদেশে দুই আকারে প্রকাশ পায় তেমনি একই ব্রহ্ম নানা বাহ্যাভ্যন্তর পদার্থের আকারে প্রকাশ পাইতেছে৪৩,৪৪। অজ্ঞাত ব্রহ্মই অজ্ঞের ন্যায় স্থিতি করিতেছে। ব্রহ্মভাবে অভাবিত বিধায় ব্রহ্ম অজ্ঞের ন্যায় এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত বিধায় ভাবিত কালে ব্রহ্ম এক অখণ্ড ও জ্ঞানস্বরূপ। সুবর্ণকে সুবর্ণ বলিয়া না জানিলেই তাহা মৃত্তিকা ও পিত্তলাদি বলিয়া প্রকটিত হয় ৪৫,৪৬। ব্রহ্মজ্ঞগণই ব্রহ্মকে মহান্ আত্মা বলিয়া জানেন। অজ্ঞগণ তাহা জানে না। যেমন সুবর্ণ বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া সুবর্ণের সুবর্ণত্ব প্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ, ব্রহ্ম বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়াই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির কারণ। উক্ত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত, যখন যে শক্তির উদ্রেক হয় তখন তিনি সেই আকারে প্রথিত হন৪৭,৪৯।

ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মকে কর্ম্ম কর্ত্তা করণ ও কারণের অতীত বলিয়া জানেন। তিনি মহান্ আত্মা, প্রভু ও স্বয়ং অর্থাৎ অন্যের অনধীন। অজ্ঞগণ জানে না বলিয়াই তাঁহাকে অজ্ঞান ও জ্ঞানিগণ জানেন বলিয়াই তাঁহাকে অজ্ঞান নাশক জ্ঞান সংজ্ঞা দেন[৫০,৫১]। জানা না থাকিলে বন্ধু অবন্ধু মধ্যে গণনীয় হয় এবং জানা থাকিলে লোক সকল বন্ধু ভাবে পরিতুষ্ট থাকে[৫২]। পুরুষ যখন জানে, জীব জগতের বস্তুতা অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসহ নহে, তখন তাহাদের উক্ত বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। দ্বৈত মিথ্যা, এ তথ্য বিজ্ঞাত হইলেও জীব দ্বৈতের প্রতি বিরক্ত হয়[৫৩,৫৪]। আমরা যে আমি আমি করি, তাহাও মিথ্যা, এরূপ নিশ্চয় হইলেও আমাদের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। বৈরাগ্য জন্মিলেই ক্রমে জীব জগতের ব্রহ্মমাত্রতা উপলব্ধ করিতে থাকে। আমি ব্রহ্মই, এই সত্যভাবনা প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সত্যরূপে এ সকলের লয় হয়। অর্থাৎ জগৎ থাকিলেও সে তখন জগৎকে জগৎ বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিয়াই জানে[৫৫,৫৭]। তখন সে জানে, এক অপরিচ্ছিন্ন আত্মায় এ সকল কল্পিত, যাহা কল্পিত তাহা মিথ্যা, সুতরাং তুমি আমি তিনি প্রভৃতিও কল্পনা কারণে মিথ্যা। অতএব, যখন তুমি আমি প্রভৃতি কল্পনা থাকে না, তখন সে জানে, এ সমস্তই ব্রহ্ম; সুতরাং আমিও ব্রহ্ম। যখন স্বাত্মব্রহ্মবোধ প্রকট প্রাপ্ত হয়, তখন সে জানে—আমি নির্দ্দুঃখ, নিষ্ক্রিয়, ব্যামোহরহিত, নিরীচ্ছ, সম, স্বচ্ছ, বিশোক, নিষ্কলঙ্ক, নির্লেপ ও নিরাময়[৫৮,৫৯]। আমি গ্রহণ ও বর্জ্জন করি না, কোন কিছু ইচ্ছাও করি না। আমি পূর্ণ বস্তু, ইহাই আমার সত্যরূপ। যে হেতু আমি ব্রহ্ম সেই হেতু রক্ত, মাংস, অস্থি, তন্নির্ম্মিত শরীর, চিৎ বা চেতনা; এ সমস্তই আমি। চিৎও আমি, আকাশও আমি, সূর্য্যাদি গ্রহও আমি, দিগ্‌ও আমি, বিদিক্ ও পৃথিবীও আমি[৬০,৬১]। আমিই ঘট পটাদি আকারে অবস্থিত, ইহা সত্য। তৃণ, উর্ব্বী, গুল্ম, কানন, শৈল, সাগর, দান, আদান, সঙ্কোচ, বিকাশ, এ সমস্তই চিদাত্মা ও অতিবিস্তৃত রূপ ধারী ব্রহ্ম আমি, এবং প্রাণীর প্রাণন ধর্ম্ম ও লতাগুল্মাদির উৎপত্ত্যাদি ধর্ম্ম, সমস্তই আমি[৬২,৬৩]। যাহাতে ও যাহা হইতে বিশ্ব এবং যাহা এ সমুদায়ের মূলতত্ত্ব, যাহা একাত্মা, পরব্রহ্ম, চিদাত্মা, ব্রহ্ম, সৎ, সত্য, অমৃত, জ্ঞ, ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ, যাহাকে সর্ব্বগত চিন্মাত্র ও চেত্য

বর্জ্জিত বলা যায়, যাহা আভাস মাত্র, নির্ম্মল, সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা, যাহা সর্ব্বত্র বিরাজিত, শান্ত ও বিশুদ্ধ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা আমা ছাড়া নহে অর্থাৎ আত্মার অনতিরিক্ত। মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণও আমার অনধিক[৬৭।৬৮]। ভেদধর্ম্ম পরিত্যাগ হইলে যে স্বরূপ স্বপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় সেই প্রতিষ্ঠিত স্বপ্রকাশ অনাময় ব্রহ্ম আমি। শব্দাদি ও শব্দাদির আধার আকাশাদির কারণ আমি এবং জগৎস্থিতির কারণও আমি[৬৯]। যাহা সকল পদার্থে সত্তা অর্থাৎ অস্তিতা অর্পণ করতঃ স্থিত রহিয়াছে, সেই চিদ্ব্রহ্ম আমি। আমি ক্ষয়োদয় রহিত চিৎ-ধারা[৭০]। সূর্য্য ও আলোকও আমি, পুষ্প ও সৌগন্ধও আমি, অথবা যোগিগণের অনুভাব্য পরমামৃতও আমি, এবং বৈদান্তিকদিগের কথ্যমান পরমানন্দও আমি। অহঙ্কার প্রভৃতি ভোক্তৃচক্র অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি সকল আমার অতিরিক্ত নহে। আমি সুষুপ্তসদৃশ শান্তস্বভাব ও আলোকের ন্যায় নির্ম্মল[৭১।৭২]। আমি যার পর নাই উত্তম সম্ভোগ স্বরূপ, সর্ব্বত্র প্রকাশমান, স্বাদু দ্রব্যের স্বাদু, অর্থাৎ আমিই স্বল্প মাত্রায় সমুদায় স্বাদুদ্রব্যে বিরাজ করিতেছি[৭৩]। যে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রসত্তা অর্পণ করে সে চৈতন্যও আমি। ভূমিষ্ঠ নরেরা যে আকাশে চন্দ্রাদির উদয় দর্শন করে তাহাও আমি এবং যাহা সুখ দুঃখাদির আন্তরালিকী অবস্থা তাহাও আমি। অপিচ, সত্যানুভবরূপী চিদ্ব্রহ্ম আমি[৭৪।৭৭]। বলা বাহুল্য যে, বিষয়সংস্পর্শশূন্য কদাচিৎ প্রতীয়মান যে নিরুপাধিক সুখাদি তাহাও আমি। ক্ষিতি জল ও পবন সংসর্গে যে বীজাদি অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হয় সে অঙ্কুরশক্তিও চিদ্ব্রহ্ম আমি। খর্জ্জুর ও নিম্ব প্রভৃতি যে বিশেষ বিশেষ স্বাদ বহন করে, সে স্বাদ ও সে বহন সমস্তই আমি। যে চেতনা লাভ ও অলাভ বিধানে তুল্যরূপে প্রতি-ষ্ঠিত থাকে সেই চেতনা চিদ্ব্রহ্ম ও তাহা মৎস্বরূপের অন্তর্গত। সূর্য্য উদিত হইলে ভূমিষ্ঠ নরের চক্ষু হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যে একটী দৃষ্টিসূত্র বিস্তৃত হয় সেই দৃষ্টিসূত্রের মধ্যগত যে কোন সত্তা সে সমস্তই চিদ্ব্রহ্ম আমি। আমিই সেই দৃষ্টিসূত্ররূপে বিস্তৃত হই[৭৮।৮৩]। চিদ্ব্রহ্ম আমি সকল শরীরে সমান, অর্থাৎ একরূপ। সেজন্য তাহাকে বা আমাকে সর্ব্বগামী বলা যায়[৮৪]। চিৎ-ই প্রকাশকারিণী ও কমনীয়স্বভাবা। ভোগ সকল অথবা স্বাদ সকল তদীয় শক্তিবিশেষ। যাহা কেবল স্বানুভূতি-

স্বরূপ, সেই চিদ্ব্রহ্ম আমি। এই চিৎ পদ্মনালে তন্তুর ন্যায় সর্ব্বদেহে বিস্তৃতা রহিয়াছে। দেহাদি ছিন্ন ভিন্ন হয় কিন্তু চিতের কিছুই হয় না। তাদৃশ অনাময় চিৎ আমি। মেঘ যেমন ভুবনাক্রমী, তেমনি; এই চিৎও ভুবনব্যাপিনী। এই চিৎ নিতান্ত দুর্লক্ষ্যা। ইহার আকার এত দুর্লক্ষ্য যে কোনও ইন্দ্রিয়ে ইহার গ্রহণ হয় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ চিতের প্রকাশ্য, কিন্তু চিৎ তাহাদের প্রকাশ্য নহে। তাদৃশ চিৎ আমিই। এই স্বানুভূতিময় চিৎ দেহে দেহে স্নেহমাত্র উপলক্ষে লক্ষিত হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। যেমন ক্ষীরে ঘৃতের সত্তা, সেইরূপ, সর্ব্ব দেহে চিদ্ব্রহ্মের সত্তা অহংরূপে প্রকটিত হয়। সুবর্ণে কেয়ূরাদি রচনার ন্যায় অহং ব্রহ্মে বিশ্ব পদার্থের রচনা[৮৯।৯০]। যে চিৎ সত্তাসামান্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ঘট সত্তা পট সত্তা প্রভৃতির ভেদক বিশেষণ পরিত্যাগে কেবল সত্তা রূপে বিরাজিত, সেই সত্তাসামান্য আমি। আমি নির্লেপস্বভাব ও সর্ব্ব পদার্থের অকৃত্রিম আদর্শ[৯১]। বলা বাহুল্য যে আমি মহতী চিৎ, সর্ব্বসঙ্কল্পের ফলদাতা ও সর্ব্ব তেজের তেজ অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুর প্রকাশক[৯২]। যে কিছু উপাদেয় ও যে কোন উপাদান, সে সমুদায়ের সীমা চিদাত্মা। যে চিদাত্মা ঘটপটাদি পদার্থে অস্তি এতদ্রূপে এবং চতুর্ব্বিধ প্রাণিশরীরে স্ফূর্ত্তিরূপে বা চেষ্টা এতদ্রূপে রহিয়াছে সেই চিদাত্মাকে আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ স্বাত্ম-অভেদে জানি[৯৩।৯৪]। যে চিদাত্মা জাগ্রৎকালেও সুষুপ্তের ন্যায় অর্থাৎ সদা নির্ব্বিশেষ, যে চিদাত্মা অগ্নিতে উষ্ণ, হিমে শীত, অন্নে মৃষ্টতা (সুখসেব্যতা), ক্ষুরে তীক্ষ্ণতা, অন্ধকারে কৃষ্ণতা ও চন্দ্রে শুভ্রতা রূপে স্থিত আছে সেই চিদাত্মাকে আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ স্বাত্ম অভেদে ধ্যান করি। যিনি বাহিরের ও অন্তরের আলোক, নিকটে থাকিলেও দূর (অজ্ঞদিগের দূর ও জ্ঞানিদিগের নিকট অর্থাৎ হৃদয়স্থ) সেই চিদাত্মাকে আমরা উপাসনা করি। তিনিই মধুর রসের মাধুর্য্য, তীক্ষ্ণ পদার্থের তীক্ষ্ণতা, সেজন্য আমরা তাঁহারই উপাসনা করি। তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চতুর্ব্বিধ অবস্থায় সমরূপ, সে ভাবেও আমরা তাঁহার উপাসনা করি। যাহাতে সর্ব্ব সঙ্কল্পের বিরাম, সর্ব্ব কৌতুকের অবসান ও সর্ব্ব সংরম্ভের (আড়ম্বরের) বিশ্রাম, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাস্য। নিষ্কৌতুক, নিরীহ, নিরারম্ভ, নিরংশ, নিরহঙ্কার চিদাত্মা আমাদের উপাস্য

৯৫।১০১। চিদাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বরূপী অথচ একরূপী। চিদাত্মার চেতনা অসীম, তাহা দেহরূপ মুক্তার সূত্র, জাগ্রদাদি অবস্থার আশ্রয় ও জগৎ পক্ষীর নীড়১০২।১০৩। চিদাত্মাই জীবপক্ষীর বৃহৎ জাল। এই চিদাত্মায় যাহা নাই তাহা অন্য কুত্রাপি নাই১০৪। চিদাত্মা সর্ব্বসত্তা নির্ব্বাহক বিধায় সৎ এবং মহাপ্রলয়ে তদ্বিপরীত বলিয়া অসৎ। চিদাত্মাই বিশ্বাসের চূড়া ও সর্ব্বসম্পত্তির আস্পদ। চিদাত্মাই সমুদায় আকারে বিহরণশীল, স্নেহের আস্পদ, শান্তস্বভাব হইলেও দেহরূপ বায়ুর তাড়নায় অশান্তপ্রায়। চিদাত্মা তত্ত্বদৃষ্টিতে মুক্ত ও অতত্ত্ব দৃষ্টিতে বদ্ধ। ইনি বুদ্ধিসরোবরের পদ্মিনী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুদৃশ্য ১০৫।১০৭। চিদাত্মাই জীবের জীবনোপায় ও স্বতঃসিদ্ধ অমৃত ও অসমুদ্রপ্রভব চন্দ্র১০৮। জীবাত্মা অনাহার্য্য অমৃত ও স্বতঃপ্রমাণ ও সত্য। চিদাত্মাই শব্দ স্পর্শাদির অভিব্যঞ্জক ও ঐ সকলের দ্বারা আভাসিত। চিদাত্মা আকাশ অপেক্ষা বিশদ ও সকল লোকের রঞ্জন১০৯।১১০। বস্তুতঃ ইনি রঞ্জনও নহেন, রঞ্জনাও নহেন, আকাশও নহেন। ইনি মহামহিম অথচ সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অতীত। ইনি কোন কিছুর কর্ত্তা নহেন।

অধ্যাস দৃষ্টিতে এ সমস্তই আমি ও সম্বন্ধাধ্যাসের দ্বারা এ সমস্তই আমার। অপবাদ দর্শনে অহং আমি নহি এবং অধ্যারোপ দৃষ্টিতে অহং আরোপের স্থান। উক্তবিধ অধ্যারোপ ও অপবাদ বিধির দ্বারা আমি আমার তত্ত্ব বিদিত হইয়াছি ও হইতেছি। এখন এই জগৎ আমার নিকট মায়াবিরচিত হউক, আর স্থির স্বভাব বা অন্য প্রকার হউক, উভয় প্রকারেই আমি অশোক ও অজর১১১,১১২।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

—০()•()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জনকাদি রাজা ও নানা মুনি ঋষি ঐরূপ নিশ্চয়ে জীবন্মুক্তি লাভ করতঃ অন্তরে সত্য পদে ও বাহিরে লোকাচার অনুষ্ঠানে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপ ও সমসুখে অবস্থিত ছিলেন[১]। তাঁহারা জীবন মরণের পুরস্কার তিরস্কার করিতেন না। তাঁহারা মেরুর ন্যায় স্থির ও নারায়ণ বাহুর ন্যায় দুর্লক্ষ্য বেধে সমর্থ (ব্রহ্মপদ অতি দুর্লক্ষ্য, সে পদও তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল।) তাঁহারা যার পর নাই সরল ও নম্রস্বভাব[২,৩]। এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ বনখণ্ডে, দ্বীপে, নগরে, উপবনে, দেবোদ্যানে, ও বনশ্রেণীতে অমর গণের ন্যায় ক্রীড়া বিহারাদি করিতেন[৪]। কুসুম শোভিত দোলার আন্দোলনে ও সুমেরুর অগ্রশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতেন[৫]। তাঁহাদের কেহ কেহ শত্রুবিজয় পূর্ব্বক ছত্রচামরাদিলাঞ্ছিত রাজত্বও করিতেন[৬]। লোক সকল ইহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অনুষ্ঠান সকল নির্ব্বাহ করিত[৭]। ইঁহারা সকলেই দৃষ্টাদৃষ্ট সাধন সম্পন্ন হইয়া বিবিধ ভোগ কলাপে বিভূষিত ছিলেন অথচ সে সমুদায়ে নির্লিপ্ত ছিলেন[৮]। ইঁহারা ইন্দ্রের নন্দন কাননেও প্রবেশ করিতেন এবং গার্হস্থ্য অবলম্বনে যজ্ঞ ক্রিয়াদিও করিতেন[৯,১০]। আবার সময় বিশেষে ঘোরতর সংগ্রাম করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। বিপদ উপস্থিত হইলেও চলচ্চিত্ত হইতেন না এবং ক্রোধাদির বশীভূত হইতেন না[১১,১২]। তাঁহাদের মনে রাগ দ্বেষ ও ভ্রান্তি ছিল না। কোনও কিছুতে ব্যাসক্ত হইতেন না ও আশার সীমান্ত সত্বনামক মহাপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৩]। কি মহা বিপদ কি মহান্ ঐশ্বর্য্য, কুত্রাপি তাঁহারা অধীর হইতেন না, হিমাচলের ন্যায় ধৈর্য্যে অবস্থিতি করিতেন[১৪]। পরম কমনীয় স্ত্রীসৌষ্ঠবে ও বিলাসে উল্লসিত হইতেন না। হে রঘুনাথ! দুঃখ শোকাদি তাঁহাদিগকে ম্লান করিতে পারিত না ও ভোগ সমূহ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট তুষ্ট করিতে পারিত না[১৫,১৬]। তাঁহারা ভোগ্য ভোগ করিতেন, তদুপযোগী

কার্য্যও করিতেন, অথচ সে সকলে তাঁহারা অব্যগ্র থাকিতেন অর্থাৎ সে সকলে তাঁহারা "আমি কর্ত্তা, আমি করিতেছি" এরূপ অভিনিবেশ রাখিতেন না। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা কর্ম্মতৎপর থাকিলেও সে সকলের ইষ্টানিষ্ট ফল লক্ষ্য করিতেন না[১৭]। কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে আপনার উৎকর্ষানুভব করিতেন না, শত্রুসমাক্রান্ত হইলে অপকর্ষানুভব করিতেন না, সুখ লাভে সন্তুষ্ট ও সঙ্কটে বিম্লান হইতেন না[১৮], বিমোহন বিষয়ে মুগ্ধ ও বিপদে নিমগ্ন হইতেন না, শুভ লাভে হৃষ্ট ও শোক প্রাপ্তে রোদমান হইতেন না[১৯]। স্বাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেন অথচ সংরম্ভী (কর্ত্তৃতাভিমানী) ছিলেন না[২০]। হে রঘুনাথ! তুমি তাদৃশী পাপতাপনাশিনী দৃষ্টি (জ্ঞান) অবলম্বন করিবে ও অহং পরিত্যাগী হইয়া আহার বিহারাদি করিবে[২১]। সৃষ্টিপরম্পরা যেমন যেমন দৃষ্ট হইবে, ভ্রমবর্জ্জিত হইয়া সে সকল বিষয়ে সুমেরুর ন্যায় স্থির ও সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইয়া সর্ব্বত্র সাম্য অনুভব করিবে[২২]। এ সমস্ত চিন্ময়, চিৎ ছাড়া অন্য কিছু নাই, এ নিশ্চয় স্থির রাখিয়া, মহত্তা অবলম্বন করতঃ কুত্রাপি ব্যাসক্ত না হইয়া, সম ব্রহ্মে অবস্থান করিবে[২৩,২৪]। মূঢ় দিগের ন্যায় ধনের উদ্বেগে রোদন ও তাহার নিমিত্ত অনুশোচনা করিও না এবং আবর্ত্তে তৃণের ন্যায় উদ্ভ্রান্তচিত্তে ভ্রাম্যমান হইও না[২৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! ভগবৎপ্রসাদে আজ্ আমি অনাচ্ছন্ন সূর্য্য সম্পর্কে অম্বুজের ন্যায় বিকসিত অর্থাৎ প্রবুদ্ধ হইয়াছি। আমার ভ্রম অস্তগত হইয়াছে, সন্দেহও বিদূরিত হইয়াছে[২৬,২৭]। হে সাধো! আমার মদ, মোহ, মান, মাৎসর্য্য, এ সকল বিনষ্ট হইয়াছে, শোক উপশান্ত হইয়াছে, এখন আমি চিরকালের নিমিত্ত প্রমুদিত হইয়াছি। এখন আমি শঙ্কাশূন্য হইয়া আপনার রাজ্যপালনাদিবিষয়ক আদেশ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইব[২৮]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

—০*()*০—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাসনা ক্ষয় হওয়ায় আমি জীবন্মুক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি সত্য; পরন্তু প্রাণ নিরোধ দ্বারা বাসনা বিনাশ ও তাহা হইতে জীবন্মুক্তি পদলাভ যে প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হয় সেই প্রক্রিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন[১।২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সংসার উত্তরণের যে যুক্তি (শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া); তাহাকে আমরা যোগ শব্দে উল্লেখ করি। সেই যোগ দুই প্রকার। উভয় প্রকারেরই ধর্ম্ম চিত্তের উপশম অর্থাৎ চিত্তের বিলয়[৩]। তাহার অন্যতর প্রকার আত্মজ্ঞান, পৃথিবীতে তাহা সর্ব্ববিদিত। দ্বিতীয় প্রকারের নাম প্রাণ নিরোধ, এক্ষণে তাহার বিবরণ বলি; শ্রবণ কর[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন; উক্ত দুই প্রকারের যে প্রকার সুলভ, শুভ ও অল্প কষ্টকর; তাহা আমাকে বলুন। তাহা বিদিত হইলে আমার আর চিত্তবিক্ষেপের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যদিও তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাণনিরোধ, এই উভয় প্রকারই যোগশব্দের বাচ্য; তথাপি, প্রাণনিরোধ বিষয়েই যোগশব্দের প্রসিদ্ধি অতিশয় বিস্তৃত হইতে দেখা যায়[৬]। সংসার উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রম দ্বিবিধ। এক যোগ ও অপর জ্ঞান। মনীষিগণ বলেন যে, ঐ দুই উপায়ের ফল একই প্রকার। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাও সংসার জয় হয় এবং যোগের দ্বারাও সংসার জয় হয়। তন্মধ্যে অধিকারী ভেদে উক্ত উভয়ের সাধ্যাসাধ্য বিভাগ স্থিরীকৃত আছে। অর্থাৎ কাহার কাহার পক্ষে যোগ অসাধ্য এবং কাহার কাহার পক্ষে জ্ঞানই অসাধ্য। পরন্তু আমি মনে করি, জ্ঞানই সুসাধ্য[৭।৮]। তৎপ্রতি কারণ এই যে, জ্ঞান সকল অবস্থায় সদা স্বপ্রকাশ। আর অজ্ঞান পরপ্রকাশ্য অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যের প্রকাশ্য। পরাধীন বিষয়ে অজ্ঞান ও তদ্ঘটিত কৌশলের কার্য্য দুষ্কর এবং স্বপ্রকাশ বিষয়ে জ্ঞানরূপ উপায় অদুঃখপ্রদ[৯]। যোগে ধারণা, আসন ও উপযুক্ত স্থানাদি আবশ্যক হয়, সেজন্য তাহা দুঃসাধ্য হয়

না। কিম্বা চিত্ত স্থির করিয়া ধ্যানাদি করা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অতি দুষ্কর হইয়া থাকে[১০]। হে রঘুনাথ! শাস্ত্রে যে জ্ঞান ও যোগ এই দ্বিবিধ উপায়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার একতর জ্ঞান। এই জ্ঞান অত্যন্ত নির্ম্মল অর্থাৎ ছেত্র দ্বারা অবিদ্ধ। এক্ষণে যোগের কথা বলি, শ্রবণ কর। এই যোগ প্রাণ ও অপান নামক দ্বিবিধ অধ্যাত্মবায়ুর সমতা বা নিরোধ এতন্নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সিদ্ধি কামুকের সিদ্ধি দাতা এবং জ্ঞানকামীর মোক্ষ দাতা (যাহারা অনিমাদি সিদ্ধি ইচ্ছা করে তাহাদের অনিমাদি সিদ্ধি হয় এবং যাহারা তত্ত্বজ্ঞান কামনা করে তাহা· দের তত্ত্ব জ্ঞান হয়)। হে রাজকুমার রাম! তুমি যদি প্রাণ সঞ্চরণ রোধ করতঃ সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পার তাহা হইলেও তুমি সেই বাক্য মনের অবর্ণনীয় পরমানন্দ অনুভবের লাভ করিতে পারিবে[১১,১৩]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—○()•()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মরুস্থলে মৃগতৃষ্ণিকা দর্শনের ন্যায়, পূর্ব্বপ্রোক্ত পরম পদের অবিদ্যাবৃত প্রদেশে, এই ব্রহ্মাণ্ড নামক প্রস্পন্দ জন্মিয়াছে। (প্রস্পন্দ অর্থাৎ বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি)[১]। এতদ্বিধ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা কমল· যোনি ব্রহ্মা। আমি তাঁহার মানস পুত্র, আমার নাম বশিষ্ঠ, এবং আমি যুগে যুগে সপ্তর্ষি লোকে অবস্থান করি[২,৩]। একদা আমি ইন্দ্র সভায় নারদাদি ঋষিগণের নিকট চীরজীবী দিগের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম[৪]। সেই প্রসঙ্গে শাতাতপ নামক মুনি বলিলেন, সুমেরুর ঈশান কোণস্থ পদ্মরাগময় শৃঙ্গে চূত নামে প্রসিদ্ধ এক কল্পবৃক্ষ আছে[৫,৬]। তাহার মূর্দ্ধপ্রদেশস্থ স্কন্ধ বিশেষের কোটরে এক বিহঙ্গালয় রহিয়াছে, তাহা হেমরূপ্যময়ী লতিকায় সমাচ্ছন্ন[৭]। উক্ত কোটরে ভুশুণ্ড নামে এক বায়স বাস করে। এই ভুশুণ্ড রাগাদিদোষপরিশূন্য সুতরাং শান্ত স্বভাব। এই বায়স যদ্রূপ চীরজীবী তদ্রূপ চীরজীবী দেবতাদের মধ্যেও নাই[৮,৯]। এই দীর্ঘায়ু বায়স নীরাগ, মহাবুদ্ধিধর, বিশ্রান্তমতি অর্থাৎ

জীবন্মুক্ত বা তত্ত্বজ্ঞানী ও কালজ্ঞ[১০]। এই পক্ষী যেরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে, যদি কেহ তাহার ন্যায় হইতে পারে, তাহা হইলে সেও দীর্ঘ জীবনের তদ্বৎ সাফল্যপ্রাপ্ত হইতে পারে[১১]। আমি পুনঃ পুনঃ তাহার কথা জিজ্ঞাসা করায় মুনিপ্রবর শাতাতপ পুনঃ পুনঃ তাহার দীর্ঘজীবিতার বিষয় সত্য বলিয়া বর্ণন করিলেন[১২]। কথা শেষ ও সভা ভঙ্গ হইলে আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া উক্ত ভুশুণ্ডকে দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। সুমেরুর যে শৃঙ্গে ভুশুণ্ড বাস করে, ক্ষণমধ্যে আমি সেই পদ্মরাগময় শৃঙ্গে গমন করিলাম[১৩,১৪]। দেখিলাম, শৃঙ্গটী রত্নময় গৈরিক ধাতুতে রক্তায়মান ও দেখিতে অতি সুন্দর। বহ্নির ন্যায় তেজস্বী ও রক্তবর্ণ হওয়ায় ইহাকে মদোন্মত্ত যুবার অনুরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে[১৫]। ইহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কল্পাগ্নিনিচয় পিণ্ডীভূত (জমাট্) ও কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহার মস্তকে যে ইন্দ্রনীল মণির স্তূপ রহিয়াছে, সে সকলের প্রসৃত প্রভা ধূমের সহিত তুলিত হইতে পারে[১৬]। যেন সমুদায় রাগের (রক্ত বর্ণের) রাশি, যেন সকল সন্ধ্যা মেঘের ঘনীভাব (জমাট), যেন ইহা মেরুর উৎক্রান্তি নাড়ী, যেন সুমেরুর জঠরানল তন্নাড়ীপথে মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া উঠিতেছে, যেন বন-দেবীরা ইহাকে অলক্তক রসে রঞ্জিত করিয়াছে, যেন তাহারা আকা-শস্থ চন্দ্রকে কৌতুকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় অলক্তকরঞ্জিত হস্ত প্রসা-রিত করিতেছে[১৭,১৯], যেন কোন বাড়বাগ্নি বা বজ্রাগ্নি, যেন এই মেরু নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিবার জন্য অঙ্গুলী বিস্তার করিতেছে[২০,২১]। অহো! ইহা যেন মেঘরূপ মৃদঙ্গের ধ্বনিযুক্ত, ইহা যেন কোন এক মহারাজার ক্রীড়ামন্দির, যেন ইহা হাস্যময় কুসুমের গুচ্ছ, যেন ইহা ধ্বনিকারী ষট্পদের পেটরা, যেন ইহা অপ্সরাবৃন্দের ক্রীড়া স্থান[২২,২৩]। দেবগণ ইহার শিলা খণ্ডে বিশ্রাম করে ও কন্দরে বিবুধমিথুন (দেব দেবী) বাস করে। এই শৃঙ্গ যেন একটী তাপস। মেঘ ইহার পরিধেয় অজিন, গঙ্গা ইহার যজ্ঞোপবীত, অত্রস্থ বেণু সকল ইহার দণ্ড, গঙ্গা নির্ঝর ইহার কমণ্ডলু। ইহা গন্ধর্ব্বদিগের গানে সুভগ, সুগন্ধে আমোদিত, সুখসেব্য অনিলে মধুর, স্বর্ণপদ্মের বিকাশে বিভূষিত, এবং ইহা যেন ব্যোমবীথির পর পারে অবস্থিত[২৪,২৭]। ইহা যেন শ্বেত, পীত, হরিত, ও পাটল বর্ণের বনকুসুমে রঞ্জিত সুরযুবতিদিগের লীলাপদ্ম[২৮]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি গিয়া দেখিলাম, বর্ণিত মেরুশৃঙ্গের শিরঃপ্রদেশে সমবিস্তৃত ও লম্বায়মান শাখা সমূহে পরিবৃত চূত তরু যথাবর্ণিত প্রকারে রহিয়াছে। ইহার সমস্ত অঙ্গই প্রাণিগণের অভিলাষ পূর্ণ করে, সেজন্য ইহার নাম কল্পাঙ্গ। আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষ পুষ্পরেণুরূপ শ্বেত মেঘে পরিবৃত, রত্নস্তবকরূপ দন্তে দন্তুর ও উচ্চতায় আকাশজয়ী[১।২]। আকাশে যে পরিমাণ তারা, এই বৃক্ষে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ পুষ্প। যে পরিমাণ মেঘ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ শ্যামল পল্লব। যেপরিমাণ সৌরকিরণ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ পুষ্পরেণু। মেঘে যে পরিমাণ তড়িৎ, এই বৃক্ষে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ মঞ্জরী[৩]। ইহার স্কন্ধদেশে ভ্রমরের গীত, পল্লবে দোলালোল অপ্সরোগণের অনুকার অর্থাৎ সাদৃশ্য[৪]। এখানে যে পরিমাণ সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিহঙ্গ। আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষ রত্নকান্তিতুল্য নির্ম্মল নীহারের দ্বিগুণিত ত্বক্ রূপ বস্ত্রে পরিবৃত[৫]। ইহার ফল ঔন্নত্যে, বৃহত্ত্বে ও রসপূর্ণতায় চন্দ্র অপেক্ষা দ্বিগুণ। ইহার পর্ব্ব অর্থাৎ স্কন্ধস্থান কল্পান্তমেঘ অপেক্ষাও অধিক বৃহৎ ও নিবিড়িত[৬]। ইহার পত্র কিন্নর গণের বিশ্রামযোগ্য, লতা বিতান ভাগ দেবতাদের শয্যাযোগ্য[৭]। যৎকালে অপ্সরাগণ ইহার পুষ্প গ্রহণ করে তৎকালে ভৃঙ্গকুল চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হয় ও পুষ্প সৌরভ দিক্ সকলকে আমোদিত করে[৮]। সুর, কিন্নর গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ এই স্থানে বিহার করে এবং এই স্থান যেন অভিনব আনন্দ জগৎ[৯]। ইহার কলিকা, পল্লব, পুষ্প, মঞ্জরী, গুচ্ছ সমস্তই ঘন। ইহা দৃশ্যতায় দিব্যচন্দ্র ও রত্নালঙ্কার দ্বারা পরিবৃতের ন্যায়[১০।১১]। ইহার সর্ব্বত্র কুসুম, সর্ব্বত্র ফল ও সর্ব্বত্র পল্লব, সর্ব্বত্র সুগন্ধময় কুসুমরজঃ বিদ্যমান। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, এই স্থান যার পর নাই অদ্ভুত[১২]। ইহার কক্ষপ্রদেশস্থ কুঞ্জে, লতায়, পত্রে, পর্ণে ও পুষ্পে, বিহগ গণের আলয় (নীড়) দেখিলাম[১৩]। ব্রহ্মবাহন হংস ও তাহাদের শাবক, অগ্নিবাহন শুকপক্ষী ও তাহাদের শাবকদিগকেও

দেখিলাম। ষড়াননবাহন ময়ূর ও তাহাদের পোতক গণকেও দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য ব্যোমচর পক্ষীও আমার নয়নগোচর হইল[১৯,২০]। দেখিলাম, হেমচূড়, কলবিঙ্ক, গৃধ্র, কোকিল, ক্রৌঞ্চ, কুক্কুট, ভাস, চাষ ও বলাকা প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী নীড় রচনা করিয়া বাস করিতেছে[২১,২২]। আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষের দক্ষিণস্কন্ধশাখায় কৃষ্ণবর্ণ কাক সমূহ বাস করিতেছে। এই শাখার পত্রপুঞ্জ অতিপুষ্ট ও অত্যন্ত নিবিড়িত এবং তত্রস্থ কাকবৃন্দও কল্লান্তমেঘবৃন্দের অনুরূপ[২৩,২৪]। এই কাকাবাস শাখার একদেশে একটী কোটর দেখিলাম, তাহা বিবিধ পুষ্পাস্তরণে সুসজ্জিত ও নানা প্রকার সদ্গন্ধে আমোদিত। দেখিলাম, এই কোটরে শান্তস্বভাব ও অক্ষুভিতাকার বায়স দিগের এক সভা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীমান্ অতি উন্নতাকৃতি ভুশুণ্ড স্থিত রহিয়াছেন[২৫,২৭]। কাচ খণ্ডের মধ্যগত বৃহৎ ইন্দ্রনীল মণি দেখিতে যদ্রূপ, সেই বায়সসভায় ভুশুণ্ডের অবস্থানও দেখিতে সেইরূপ। অনুমান হইল, ভুশুণ্ডের মনে কোনরূপ পাপ তাপ নাই, কোনরূপ দুশ্চিন্তাদি নাই, তজ্জন্য সে অত্যন্ত মাননীয়[২৮]। ইনি ধ্যানী জ্ঞানী মৌনী সমাধি সুখী ও দীর্ঘজীবী বলিয়া বিখ্যাত[২৯]। ইঁহার দীর্ঘজীবিতা জগদ্বিখ্যাত, ইঁহার নাম ভুশুণ্ড, ইনি অনেক যুগ যুগান্তরের আগম ও অপায় দেখিয়াছেন[৩০]। ইনি বহুতর কল্পের আরম্ভ, সমাপ্তি ও তন্মধ্যগত জীবচক্রের বিবিধ দশা, লোকপাল দিগের জন্ম অবগত আছেন[৩১]। অতি পুরাতন অর্থাৎ অতিসুদীর্ঘ কালের পূর্ব্ববর্ত্তী সুর অসুর ও রাজা দিগের বৃত্তান্ত ইঁহার স্মরণ পথে রহিয়াছে। ইনি দেখিতে সুন্দর, ইঁহার মন সতত প্রসন্ন ও গম্ভীর, এবং ইঁহার বাক্যও সুশ্রবণীয় ও পণ্ডিতোচিত। যাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য, তাদৃশ বিষয় ইনি বিশদ করিয়া বলিতে পারেন। ইনি মমত্বদোষবর্জ্জিত ও নিরহঙ্কার। ইনি সকলের নিকট পুত্রের ন্যায় প্রিয়, সকলের সুহৃদ ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই সংসারের যাবন্ত প্রাণী ও তাহাদের যাবন্ত অবস্থা, সে সমস্তই ইনি বিদিত আছেন। ইনি বিজ্ঞদিগের গণনায় বিজ্ঞতম বলিয়া গণ্য[৩২,৩৩]।

অধিক কি বর্ণন করিব, এই ভুশুণ্ড অতীব সৌম্যমূর্ত্তি, প্রসন্ন স্বভাব, মধুরভাষী, মহাত্মা, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদ্য, সরোবরের ন্যায় অন্তঃশীতল, হৃদ্পদ্মাকাশের অনুরূপ স্বচ্ছস্বভাব, ব্যবহারবেত্তা, গম্ভীর ও নির্ম্মলাশয়[৩৪]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর আমি নভোমণ্ডল হইতে বর্ণিত প্রকার ভুশুণ্ডের সমীপে অবতরণ করিলাম। আমার গমনে সেই বায়স সভা কিঞ্চিৎ সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল। নীলোৎপল পূর্ণ সরোবরের বিচলনে যদ্রূপ শোভা উদ্ভূত হয়, বায়স-সভার বিচলনেও তথায় তদ্রূপ শোভা উৎপন্ন হইল[১।২]। পরে ভুশুণ্ড আমাকে দেখিবা মাত্র বুঝিলেন, ইনি বশিষ্ঠ, মৎসকাশে আগমন করিয়াছেন[৩]। অনন্তর পর্ব্বতে মেঘশিশুর ন্যায় সেই বায়সরাজ পত্রপুঞ্জ হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিনয় সহকারে বলিলেন, হে মুনিবর! আপনি ত এস্থানে আসিতে ক্লেশ প্রাপ্ত হন নাই[৪]? পরে তিনি সঙ্কল্পজাত হস্তদ্বয় দ্বারা আমার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। এবং হে ভগবন্! এই পত্রাসনে উপবেশন করুন, এই বলিয়া স্বয়ং নবপল্লব সকল প্রদান ও বিস্তৃত করিয়া দিলেন[৫।৬]। তৎসভাস্থ অন্যান্য বায়সগণও তদনুরূপ আচরণ করিলে আমি সেই পত্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলাম। পরে সেই বায়সপতি ভুশুণ্ড ও তৎসভাস্থ বায়স সকল আমার উদ্দেশে অর্ঘ পাদ্যাদি আহরণ করিলেন ও করিল। তৎপরে তিনি হৃষ্টচিত্তে আমাকে বলিতে লাগিলেন[৭।৯]।

ভুশুণ্ড বলিলেন, অহো ভাগ্য! বহুকালের পর আজ্ আমি ভগবানের দর্শন লাভ করিলাম। বৃক্ষস্বরূপ আমরা আজ্ ভবদ্দর্শনামৃতে সিক্ত হইলাম[১০]। আমাদের চিরসঞ্চিত পুণ্য ভারের প্রেরণাতেই অদ্য ভগবানের অত্র স্থানে আগমন হইয়াছে[১১]। আপনি এই মোহরচিত সংসারে চিরকাল বিচরণ করিতেছেন, তাহাতে ত আপনার সাম্যস্থিতি বিচ্ছিন্ন হয় নাই? আপনি ত পবিত্রচিত্তে অবস্থিত আছেন[১২]? কি জন্য আপনি মৎসকাশাগমনের ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে লজ্জিত করিলেন? তাহা শুনিবার জন্য আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি[১৩]। হে মুনে! যদিও আমি আপনার পাদপদ্ম দর্শনে সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছি, তথাপি, আপনার মুখে তাহা শুনিবার ইচ্ছা করি। ইন্দ্র সভার

চিরজীবী জীবের কথা প্রসঙ্গে আমরা আপনার স্মৃত্যারূঢ় হইয়াছিলাম, সেই কারণে আজ্ এই আশ্রম আপনার পদরজে পবিত্রিত হইয়াছে [১৪,১৫]। হে মুনিবর! যে জন্য আপনার আগমন তাহা আমি বিদিত হইলেও আমি আপনার বাক্যামৃত পানের বাঞ্ছায় অতীব উৎসাহান্বিত হইয়াছি[১৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই চিরজীবী ত্রিকালদর্শী পক্ষী ভুশুণ্ড আমাকে উক্তরূপ বলিলে আমি বক্ষ্যমাণ প্রকার বাক্য সকল বলিলাম। বলিলাম, হে বিহঙ্গরাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। চিরজীবী দিগের কথা প্রসঙ্গে আপনার কথা উঠিয়াছিল, তৎপরে আমি আপনাকে দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। ভাগ্যবলে আপনি কুশলী ও শীতল চিত্তে অবস্থান করিতেছেন এবং ভাগ্যবলে আপনি অতিভীষণ সংসার পাশে অবদ্ধ আছেন[১৭,১৯]। সম্প্রতি আমার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহার ছেদন কর্ত্তা। অর্থাৎ আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কোন্ কুলে জন্মিয়াছিলেন? কি প্রকারে আপনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন? আপনার আয়ুঃ কত? এবং কি কি পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনার স্মৃতি পথে বিরাজিত রহিয়াছে? এবং আপনার এতদ্রূপ বাসস্থানের বিধান কে করিয়াছে[২০,২১]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে মুনে! আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় আমি অবশ্যই আদ্যোপান্ত বর্ণন করিব। আপনি উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া সে সকল কথা শ্রবণ করুন[২২]। আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে বৃত্তান্ত অবশ্যই অন্য শ্রোতারও পাপ তাপ নাশক ও অশুভ নিবারক। যেমন মেঘোদয়ে সূর্য্যের তাপ বিনষ্ট হয় তেমনি মহাপুরুষশ্রাব্য কথাতেও শ্রোতার পাপ তাপ বিনষ্ট হয়[২৩]।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই ভুশুণ্ড বুদ্ধিমান্, সরল স্বভাব, ইষ্ট লাভে হৃষ্ট নহে, অনিষ্ট প্রাপ্তে কাতর নহে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, বর্ষামেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধভাষী, সহাস্য আস্য, জগত্রয়ের তত্ত্ব বিদিত, সর্ব্বদর্শী বা ভোগবৃন্দে নিস্পৃহ, সংসারের রহস্য বেত্তা, পরাবর ব্রহ্মের বিজ্ঞাতা[১।৩], অতি ধীর, অতি স্থির, নিষ্কাম, দেখিতে পরিশ্রান্ত কিন্তু অন্তরে বিশ্রান্ত ও আবির্ভাব তিরোভাবের তত্ত্বজ্ঞ[৪।৫]। ইহার বাক্য বীণাবাদ্য অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী এবং যেন ইনি মূর্ত্তিধারী পরব্রহ্ম। আমি দেখিলাম, ইনি যেন মদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিবার উদ্যোগী হইয়াছেন[৬]। তৎপরে দেখিলাম, মেঘ যেমন মধুপানরসিক ভ্রমরের প্রতি তাহাদের ধ্বনির অনুকার করে, তাহার ন্যায় এই ভুশুণ্ড মদভিমুখী হইয়া বক্ষ্যমাণ বচনাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন[৭]।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

—○()*()○—

ভুশুণ্ড বলিলেন, মুনে! এই জগতে, হর নামে এক দেবাধিদেব আছেন। ইনি সমুদায় স্বর্গবাসী দিগের শ্রেষ্ঠ সুতরাং সর্ব্বদেবতার নমস্য পূজ্য ও উপাস্য[১]। ইঁহার নয়নাবলি ভ্রমরাবলির শোভা বিলোপ করে এবং ইঁহার দেহার্দ্ধে তদীয় বিলাসিনী অবস্থিতা থাকেন[২]। যাহার লহরী দেখিতে তুষারের ন্যায় শুভ্র বর্ণ, ও হারের ন্যায় সুন্দর, সেই গঙ্গা তাঁহার জটাজূটের কুসুম বা কুসুম মালিকার ন্যায় আবেষ্টনকারী

এবং শ্রীমান্ চন্দ্র ইঁহার শিরোভূষণ মণি[৩।৪]। অবিশ্রান্ত বিগলিত চন্দ্রামৃতের দ্বারা যে বিষের মারকশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে সেই কালকূট বিষ ইঁহার কণ্ঠভূষণ[৫]। মহাপ্রলয়ে ত্রিজগৎ ধ্বংসে যে কেবল পরমাণুময় ভস্ম বিরাজ করে, সেই পরমাণুময় ভস্ম ইঁহার গাত্রভূষণ[৬]। চন্দ্র অপেক্ষা নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ ও মালার স্থায় নির্ম্মিত অস্থিনিচয় ইঁহার রত্ন। চন্দ্রকিরণে ধৌত, নীল মেঘে পল্লবিত অর্থাৎ মেঘ যাহার পাইড় ও নক্ষত্র নিচয় যাহার বিন্দু, এরূপ দিগ্বস্ত্র ইঁহার পরিধেয়[৭।৮]। দগ্ধ নরমাংস লোলুপ শিবা (শৃগাল) সমূহে ব্যাপ্ত শ্মশান ইঁহার বহির্গৃহ[৯]। যাঁহাদের আভরণ নরকপাল, যাহারা রক্ত ও বসা পান করে, যাহারা নরান্ত্রের মালা ধারণ করে, সেই সকল মাতৃগণ ইঁহার ক্রীড়া সখী[১০]। যাহাদের শিরঃপ্রদেশে মণি, অঙ্গ সকল মসৃণ ও বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, সেই সকল ভুজঙ্গ ইঁহার বলয়[১১]। ইঁহার দৃক্‌পাতে শৈলরাজও দগ্ধ হয়, ইচ্ছা মাত্রে ত্রিজগৎ ইঁহার কবলগত হয়, অসুরগণ ইঁহার লীলায় ত্রস্ত হয়, এবং আচার অতিভীষণ। ইঁহারই কল্যাণময় সঙ্কল্পে ত্রিজগৎ স্বস্থ থাকে, ইঁহার অন্তর সদা স্বস্থ অর্থাৎ সমাধিমগ্ন এবং ইঁহার হস্তস্পন্দে অসুরপুর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়[১২।১৩]। ধ্যান কালে ইঁহার মূর্ত্তি ক্ষুধাতৃষ্ণাদি রহিত হিমাচলাদি স্থির পদার্থের সহিত তুলিত হয়[১৪]। যাহাদের মস্তক ক্ষুর (তীক্ষ্ণধার) শক্তিবিশিষ্ট এবং ক্ষুর (পায়ের নাম) হস্তশক্তিবিশিষ্ট, যাহারা হস্তে দন্তের, মুখের ও উদরের কার্য্য (ভোজনের কার্য্য) করে, যাহাদের আকৃতি কাহার ভল্লুকের, কাহার উষ্ট্রের, ও কাহার বা ছাগের ও মেষের সদৃশ, তাদৃশ প্রমথগণ ইঁহার লালক অর্থাৎ ক্রীড়ার সহায়[১৫]। সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বশক্তিযুক্ত প্রমথগণের অনুরূপ মাতৃগণ ইঁহার পরিবার[১৬]। চতুর্দ্দশ ভুবন ও ভুবনস্থ অসংখ্য ভূত (প্রাণী) যাহাদের ভক্ষ্য, তাদৃশ মাতৃগণ ইঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকে[১৭]। তাঁহাদের মধ্যে কেহ গর্দ্দভবদনা, কেহ উষ্ট্রমুখী, এবং কেহ বা ছাগাদিমুখী। ইঁহারা সকলেই রক্ত মেদ ও বসা আসবের স্থায় পান করেন। ইঁহাদের কেহ শব-করের মালা ও কেহ বা শব-মুণ্ডাদির মালা ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কেহ দিগন্তরে, কেহ গিরিকূটে, কেহ ব্যোমতলে, কেহ লোকান্তরে, কেহ গর্ত্তে এবং কেহ বা জীবগণের শরীরে বসতি করেন[১৮।১৯]। তাদৃশ মাতৃগণের মধ্যে প্রধানা মাতৃ আটটী। তাহাদের নাম জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা,

রক্তা, অলম্বুসা ও উৎপলা। এই আট্ মাতৃদেবী সমুদায় মাতৃগণের নায়িকা [২০।২১]। হে মুনে! উক্ত মাতৃগণের মধ্যে যিনি অলম্বুসা নামে বিখ্যাতা, চণ্ড নামক কাক তাঁহার বাহন। এই কাকের অস্থি তুণ্ড ও নখ বজ্র সদৃশ। আকৃতি ইন্দ্রনীল পর্ব্বতের অনুরূপ[২২।২৩]। অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্তা ঐ সকল মাতৃগণ একদা গগন পথে মিলিত হইয়া পরমার্থ প্রকাশক পানোৎসবে * প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল পানোৎসবপ্রবৃত্তা হইয়াছিলেন এমন নহে, তুম্বুরুনামক রুদ্রমূর্ত্তির আশ্রিতা ও বামমার্গ-গামিনীও হইয়াছিলেন। † তাঁহারা জগৎপূজ্য তুম্বুরুনামক ভৈরবের পূজা করিয়া ও মদিরাদি পান দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ সদালাপ করিতেছিলেন[২৪।২৬]। ইত্যবসরে তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ এক প্রস্তাব উপস্থিত হইল যে, দেব উমাপতি আমাদিগকে অবহেলা করেন কেন? আমরা আজ্ এরূপ প্রভাব প্রদর্শন করিব, যাহা দেখিয়া তিনি অতঃপর আমাদের প্রতি অবহেলা করিতে বিরত থাকিবেন। মাতৃদেবীরা ঐরূপ মন্ত্রণা করিয়া রুদ্রশক্তি উমাদেবীকে আপনাদের বশে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করতঃ যজ্ঞে যেমন পশু প্রোক্ষণ করে, সেইরূপ প্রোক্ষণ করিলেন। এই মাতৃগণও উমাদেবীর মূর্ত্তিভেদ, সেই কারণে ইহারা উমাদেবীকে স্ববশে আনয়ন করিতে ক্ষমবতী হইয়া-ছিলেন। প্রোক্ত উমাদেবী মাতৃগণের মায়ায় শিববামাঙ্গ হইতে অপ-হৃতা ও উক্ত মাতৃগণের সভায় আগতা হইলে মাতৃগণ তাঁহাকে ভক্ষ-ণীয় হওয়ার জন্য অভিশপ্ত করেন অর্থাৎ ছাগভাবাপন্ন করেন। যে দিন তাদৃশ প্রকারে পার্ব্বতীপ্রোক্ষণ হয় (পার্ব্বতীকে পশুভাবাপন্ন করা হয়,) সেই দিন মাতৃগণের মধ্যে নৃত্য গীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ

---

* আসব পানের দ্বারা কৌশলে চিত্ত স্থির করণ পূর্ব্বক সমাধিস্থ হওয়ার নাম পানোৎসব। এই সমাধির উদ্দেশ্য—স্বাত্মতত্ত্বের অনুভব। ইহা সহজ সাধ্য নহে। সহজ সাধ্য নহে বলিয়া সাধারণ লোক আসব পান ঘটিত বিধির বশ্য হইয়া ভ্রষ্ট হয়।

† বামমার্গ কথার অর্থ—তন্ত্রোক্ত বামাচার। বামাচারের বিধান অনুসারে ইঁহারা রুদ্রের অপর মূর্ত্তি তুম্বুরুর বামপার্শ্বগামিনী হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তুম্বুরু নামক রুদ্রই আমাদের উপাস্য বা আরাধ্য, এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ তদীয় স্ত্রী হইয়া তদীয় বামপার্শ্বে উপবেশনাদি, তদীয় মুখে মদিরা অর্পণাদি ও অন্যান্য প্রকারের সেবা করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন।

আমোদ প্রকটিত হইয়াছিল[২৭।৩১]। অতিশয় আনন্দ, তজ্জনিত উদ্দাম রব, সুদীর্ঘ হস্তপদাদির বিক্ষেপ বা পরিচালনা, জঘন ও উদর প্রভৃতির বিকৃতি, উচ্চ হাস্য, গভীর করতালী, সিংহনাদ, মেঘের ন্যায় তর্জ্জন, সিংহের ন্যায় গর্জ্জন ও অন্যান্য অঙ্গ বিকার প্রদর্শিত হইয়াছিল[৩২।৩৩]। কেহ শৈল বিদারক কঠোর রবে গান করিতে লাগিলেন, কেহ চন্দ্রোদয়ে স্ফীত সমুদ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কেহ মদিরা পান করিয়া, কেহ সর্ব্বাঙ্গে রুধিরাদি লিপ্ত করিয়া বিকৃত রব করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, মাতৃগণের সেই উন্মাদ বৃত্ত অতি ভয়ঙ্কর ও অবর্ণনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদের পান, উচ্চৈঃস্বরে গান, দ্রুতবেগে গমন, কর্কশ রবের আলাপ, পতন, উৎপতন, পরস্পরের মুখাগ্নিতে পরস্পরের প্রক্ষেপ নিক্ষেপ, নৃত্য ও মাংসাদি চর্ব্বণ ও ভক্ষণ এই সকল ব্যাপার নিতান্ত ভীষণ। বলিতে কি, এই মাতৃগণ পানোৎসবে উন্মত্তা হইয়া যেন ত্রিভুবন অপবিত্রিত করিয়া তুলিলেন[৩৪।৩৬]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, মাতৃগণ ঐ প্রকার উৎসবে প্রবৃত্তা হইলে তাঁহাদের বাহনেরাও তাদৃশ উৎসবে মত্ত হইল। তাহারাও মত্ত হইয়া হাস্য রোদন গান ও তাদৃক্ প্রকারে পানাদি করিতে লাগিল। বাহনগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া যুগল নৃত্য আরম্ভ করিল তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মীর বাহন হংসীর সহিত অলম্বুসার বাহন চণ্ড নামক কাক যুগলিত হইয়া নৃত্যারম্ভ করিল[১।২]। তাহারা নাচিতে নাচিতে ও আসব পান করিতে করিতে সমুদ্র তটের সমতল প্রদেশে গমন করিয়া রতি কামনায় অভিভূত হইল। ক্রমে সমুদায় হংসীই উক্ত কাকের সহিত রমমাণা হইল, এবং তৎক্রমে তাহারা গর্ব্ভধারিণীও হইল[৩।৪]। পরে মাতৃগণ নৃত্য সমাপ্তি করিয়া প্রশান্তচিত্ত রুদ্রের নিকট গমন করিল এবং ভক্ষ্যভাব প্রাপ্ত উমাদেবীকে তদীয় ভোজনার্থ অর্পণ করিল[৫।৭]।

ভগবান্ শশিশেখর যখন বুঝিলেন, আমার প্রিয়তমাকে আমার আহারীয় করিয়া অর্পণ করিয়াছে, তখন তিনি মাতৃগণের প্রতি রুষ্ট হইলেন। মাতৃগণ তখন রুদ্রের কোপে ভীতা হইয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব অঙ্গের দ্বারা এক অভিনব উমা প্রস্তুত করতঃ বিবাহ বিধানে উমাকে অর্পণ করিলে রুদ্রের কোপ উপশান্ত হইল। পরে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব অভিমত স্থানে গমন করিলেন[৮।১০]। হে মুনীশ্বর! ব্রাহ্মীবাহন সেই সকল হংসীরা অতঃপর গর্ভবতী হইল এবং সে বৃত্তান্ত তাহারা ব্রাহ্মীদেবীকে বিদিত করিল।

ব্রাহ্মী বলিলেন, বাছা সকল! তোমরা এখন গর্ভিণী। সেজন্য তোমরা এখন মদীয় রথ কার্য্য করণে অক্ষমা। এখন তোমরা যথেচ্ছ বিচরণ কর[১১।১২]। দেবী ব্রাহ্মী দয়াবতী হইয়া ঐ কথা বলিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এ দিকে সেই সকল হংসীরা ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিকমলের কিশলয় প্রদেশে গিয়া যথাসুখে বিচরণ করিতে লাগিল এবং বিপক্কগর্ভা হইয়া যথাকালে অণ্ড সকল প্রসব করিল। সেই সকল অণ্ড উপযুক্ত কালে দ্বিধা বিভক্ত হইল। হে মুনিশ্বর! হে বশিষ্ঠ! এবম্প্রকারে আমরা একবিংশতি হংসীর একবিংশতি অণ্ড হইতে একবিংশতি ভ্রাতা প্রসূত হইয়াছিলাম। আমরা সকলেই সেই চণ্ড বায়সের সন্তান[১৩।১৭]। ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি কমলে আমরা উক্ত প্রকারে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ক্রমে জাতপক্ষ ও উড্ডয়নে সক্ষম হইলে আমরা স্ব স্ব জননী গণের সহিত ভগবতী ব্রাহ্মী দেবীর দীর্ঘকালব্যাপিনী আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরে আমাদের আরাধনায় দেবী পরিতুষ্টা হইয়া সমাধি ত্যাগ করিলেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারকারক জ্ঞান প্রদান করিলেন[১৮।২০]। তখন আমরা মনে করিলাম, অদ্য প্রভৃতি আমরা সকলেই শান্তচিত্তে ধ্যানাবলম্বী হইয়া কোন এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া কাল কর্ত্তন করিব। ঐরূপ চিন্তা করিয়া আমরা পিতার নিকট গমন করিলাম, পিতা আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আমরা দেবী অলম্বুসার পূজা করিলাম, তাহাতে তিনিও আমাদের প্রতি প্রসন্না হইলেন[২১।২২]। আমরা তাঁহার সম্মুখে বিনীত ভাবে স্থিতি করিতে লাগিলাম। পরে আমাদের পিতা চণ্ড আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন।

চণ্ড বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা ত অনন্ত বাসনাসূত্রে গুম্ফিত সংসার জাল হইতে নির্গত হইয়াছ? যদি তাহা না হইয়া থাক, তবে বল, আমরা সকলে একযোগ হইয়া এই ভৃত্যবৎসলা দেবীর নিকট প্রার্থনা করি, তাহাতে তোমরা জ্ঞানপারগ হইবে[২৩,২৪]।

কাক সকল বলিল, পিতঃ! ব্রাহ্মী দেবীর প্রসাদে আমরা যাহা নির্ম্মল জ্ঞেয় তাহা জানিতে পারিয়াছি। এখন আমরা কোন এক উত্তম ও নির্জ্জন স্থানে বাস করিবার বাঞ্ছা করি[২৫]।

চণ্ড বলিলেন, সমস্ত রত্নের আকর, সমুদায় দেবতার আশ্রয় ও সর্ব্ব মহীধর অপেক্ষা উচ্চ মেরুনামে এক মহীধর আছে। চন্দ্র ও সূর্য্য এই মহীধরের দীপ ও ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডপের মধ্য স্তম্ভ[২৬,২৭]। ইহা-রই মূলে কিম্পুরুষাদি বর্ষ বিরাজিত। (ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষ নামে বর্ষ আছে) ইহার শৃঙ্গ সকল যেন ইহার রত্নভূষিত অঙ্গুলী। দেখিলে বোধ হয়, অব্ধিবলয় দ্বীপবতী পৃথিবী দেবী যেন উর্দ্ধভুজে অবস্থিত রহিয়াছে[২৮]। হে বৎসগণ! এই মহীধর অন্যান্য মহীধরের রাজা। কুল পর্ব্বত সকল ইহার সামন্ত, জম্বুদ্বীপ ইহার সিংহাসন; চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার নেত্র, তারা বৃন্দ ইহার মালিকা, দিক্ সকল যাহার দশা তাদৃশ আকাশ ইহার উত্তম বস্ত্র। নাগজাতীয় প্রাণীর আধার বা আশ্রয় এবং নাকনায়ক ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার আভরণ[২৯,৩০]। দিগঙ্গনারা ইহার চতুর্দ্দিকে মেঘরূপ চামর সঞ্চালন করে[৩১]। ক্ষিতি তলে ইহার পাদ দেশ ষোড়শ সহস্র যোজন, নাগ অসুর ও মহোরগ গণ ইহার পাদ সেবক[৩১,৩২]। ইহার দেহ অশীতিসহস্র যোজন; লোচন চন্দ্র ও সূর্য্য, সুর গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ ইহার পরিচারক[৩৩]। এই পর্ব্বতরাজ দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নর; অপ্সরা, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, প্রমথ, গুহ্যক, নাগ, এই চতু-র্দ্দশ বিধ প্রাণীর উপজীব্য[৩৪]। ইহার ঈশান ভাগে এক বৃহৎ শৃঙ্গ আছে। তাহা পদ্মরাগমণিময় ও দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল[৩৫]। এই শৃঙ্গের শিরোদেশে এক বৃহৎ কল্পপাদপ আছে, তাহাও নানা প্রকার জীব জাতির বাসস্থান[৩৬]। এই পাদপের দক্ষিণ স্কন্ধে যে শাখানিচয় আছে, সে সকলের পল্লব কনকময়, স্তবক রত্নময় ও ফল চন্দ্রসদৃশ[৩৭]। হে পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমি উক্ত শাখায় মণিময় নীড় প্রস্তুত করিয়া ধ্যানে

নিষণ্ণা দেবীর আরাধনা করিতাম[৩৮]। উক্ত নীড়ের একটী অলিন্দ (বারাণ্ডা) আছে, তাহাও রত্নময় পুষ্প পত্রে সুশোভিত, অমৃতাস্বাদ ফলে পরিব্যাপ্ত ও তাহার কোষ্ঠরচনা চিন্তামণির দ্বারা সমাপ্ত (চিন্তা-মণি এক প্রকার শ্রেষ্ঠ রত্ন)[৩৯]। তাহার অভ্যন্তর অতি মনোহর কুসুম সমূহে সমাকীর্ণ ও তথায় বিচারশীল কাকপুত্রেরা বাস করে[৪০]। হে সুতগণ! দেবগণেরও দুর্গম্য সেই নীড়ে তোমরা গমন কর। তথায় তোমরা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে[৪১]। আমার পিতা চণ্ড আমাদিগকে ঐ কথা বলিয়া চঞ্চুর দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ও দেবী কর্ত্তৃক আহৃত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি আমাদিগকে অর্পণ করি-লেন[৪২]। আমরা সেই পিতৃদত্ত দেবীপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া দেবীচরণে ও পিতৃচরণে কৃতনমস্কার হইয়া সেই বিন্ধ্যকচ্ছস্থ অলম্বুসা স্থান হইতে আকাশে উড্ডয়ন আরম্ভ করিলাম[৪৩]। ক্রমে মেঘলোক ভেদ ও বায়ু-লোক উৎক্রমণ করিলাম[৪৪]। পরে সূর্য্য লোক ও স্বর্গ অতিক্রম করতঃ ব্রহ্ম লোক গমন করিলাম। হে মুনিবর! আমরা পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া তত্রস্থা ভগবতী ব্রাহ্মী দেবীর চরণ বন্দনা করিলাম ও আমাদের মেরুশৃঙ্গে গমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলাম। পরে দেবদেব ব্রহ্মা ও দেবী ব্রাহ্মী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া তদীয় সেই সত্য লোক হইতে নির্গত হইলাম[৪৫,৪৭]। লোক সকলের পরিত্যাগ অন্তে আমরা এই কল্প বৃক্ষকে প্রাপ্ত হইলাম এবং তদবধি আমরা এই নীড়ে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছি[৪৮,৪৯]।

হে মহানুভাব! আমরা যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যে প্রকারে এই স্থানে স্থিতি করিতেছি, এবং আমরা পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সমস্তই যথাবৎ বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি কি করিতে হইবে, আদেশ করুন[৫০]।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ যে কল্পে আমার জন্ম সেই কল্পে যে আকারের জগৎ ছিল, এতৎ কল্পে ঠিক্ সেই আকারের জগৎ জন্ম লাভ করিয়াছে। সেই সাম্যতা প্রযুক্তই আমি "এই কল্পতরু" ইত্যাদি কথা বলিয়াছি। সে জগৎ না থাকিলেও এতৎ কল্পের জগ-তের সহিত সে জগতের সাম্য থাকায় একতা আরোপ পূর্ব্বক বর্ত্ত-মানের ন্যায় বর্ণনা করিতেছি। হে মুনে! আমি কেবল আপনাকে সহজে বুঝাইবার জন্যই অতীত কল্পের বৃত্তান্তকে বর্ত্তমান কল্পীয় বলিয়া বর্ণনা করিতেছি[১।২]। হে মুনিনাথ! আপনার দর্শন লাভে অতি সুদীর্ঘ কালের সঞ্চিত মদীয় পুণ্যরাশি অদ্য সফল হইল, এক্ষণে আপনি আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করুন। আপনার দর্শনে আজ্ আমার এই নীড় ও এই শাখা ও এই মহাবৃক্ষ পবিত্রতা লাভ করিল[৩।৪]। হে প্রভো! আপনি অগ্রে এই বিহগের অর্পিত পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, করিয়া এই অধম জীবকে পবিত্র করুন, পশ্চাৎ আদেশ করুন, অতঃপর এই বিহগাধমকে কি বলিতে হইবে[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! ভুশুণ্ড পক্ষী "এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য, ও এই আসন গ্রহণ করুন" এই বলিয়া স্বয়ং ঐ সকল প্রদান করিলে পর আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে বিহঙ্গেশ! তোমাকে একক দেখিতেছি কেন? তোমার সেই সকল মহাবুদ্ধিধর ও মহাসত্ত্ব ভ্রাতাদিগকে দেখিতেছি না কেন[৬।৭]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, মুনিবর! আমরা এই স্থানে থাকিতে থাকিতে ক্রমে এক মহান্ কাল অতিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহাতে মনুষ্যদিগের শত শত যুগ আমাদের দৃষ্টিতে দিবসের ন্যায় গত হইল[৮]। পরে আমার সেই ভ্রাতারা ক্রমে সকলেই শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিব পদে প্রবেশ করিয়াছে[৯]। যিনি যতই দীর্ঘায়ু হউন, মহান্ হউন, সাধু হউন ও বলশালী হউন, কাল সকলকেই অলক্ষ্যে গ্রাস করিয়া থাকে[১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে সময়ে প্রলয় বায়ু অতিবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, সে সময়েও তুমি কি কষ্ট পাও নাই? যে সময়ে সমুদিত দ্বাদশ সূর্য্যের করে বিশ্ব মণ্ডল দগ্ধ হইয়াছিল, সে সময়েও তুমি কি খেদ প্রাপ্ত হও নাই[১১।১২]? যে সময়ে শীতরশ্মির প্রবল প্রভাবে জল সমুদায় করকায় পরিণত হইয়াছিল, সে সময়েও কি তোমার ক্লেশ হয় নাই[১৩]? যে সময়ে কল্পান্তমেঘ উদিত হইয়া মেরু শিখরকেও ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল সে সময়েও কি তুমি অক্ষত ছিলে[১৪]? এই উন্নত কল্প বৃক্ষও কি সেরূপ জগৎসংক্ষোভ কালেও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল[১৫]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধম পক্ষিজাতির কথা দূরে থাকুক, যাহারা অতিশয় মহান্ তাঁহারাও সে সময়ে কষ্টের অবস্থায় পড়েন, পরন্তু প্রভেদ এই যে, মহাত্মারা বিবেক প্রভাবে তজ্জনিত ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। ইহ জগতে যত প্রকার জীবযোনি আছে, তন্মধ্যে পক্ষি যোনি অধিক নিকৃষ্ট। নিরবলম্বন আকাশ ইহাদের অবলম্বন ও ইহারা সর্ব্ব জীবের নিকট হেয় ও তুচ্ছ[১৬]। বিধাতা এ জাতির জীবিকা অর্থাৎ জীবনোপায় শূন্য পথে স্থাপন করিয়াছেন। এ জাতিতে যাহাদের জন্ম, হে প্রভো! সে জাতির আবার সুখ কি? আশাপাশে বদ্ধ এতাদৃশ বিহগ জাতির নির্দ্দুঃখতা অসম্ভব[১৭।১৮]। হে ভগবন্! বিধাতার ইচ্ছায় বিহগজাতি দুঃখনির্ম্মুক্ত না হইলেও আমরা আত্মসন্তোষ অবলম্বনে মোহনির্ম্মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা কেবল আত্মস্বভাবে সন্তুষ্ট ও পরপীড়াদি চেষ্টায় বিমুখ থাকিয়া এই বিহগালয়ে কালক্ষেপ করিতেছি[১৯।২০]। আমরা জীবন মরণ ও ভোগার্থ ক্রিয়া কারণ কিছুই বাঞ্ছা করি না। এখন যেমন নিরীহ বা পূর্ণ কাম হইয়া আছি, জীবনের অবশেষ এইরূপে অতিবাহিত করিব[২১]। আমি লোক সমূহের অনেক জীবন মরণাদি দশা দেখিয়াছি, সংসারের মিথ্যাত্ব নির্ণায়ক বিবিধ দৃষ্টান্তও বিদিত হইয়াছি, এবং এই বিদ্যুতের ন্যায় অস্থায়ী শরীরের আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছি[২২]। এই কল্প বৃক্ষের অনুগ্রহে আমাদের কোনরূপ পাপ তাপ নাই। আমি স্বাত্মপ্রকাশের আলোকে কালব্রহ্মের গতি জ্ঞাত হইয়াছি[২৩]। হে ব্রহ্মন্! আমি প্রাণ ও অপান এই দুই শারীর বায়ুর সূক্ষ্ম গতিবিজ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ কল্পকালের বৃত্তান্ত জানিতেছি। (প্রাণ অপান এই দুই শারীর

বায়ুর গতি বিজ্ঞাত হওয়ার দ্বারা কল্পান্তকালের বৃত্তান্ত জানা যায়, তাহা স্বরোদয় শাস্ত্রে লিখিত আছে।) দেখুন, এই বিহগালয় কত উচ্চে অবস্থিত। এই স্থান সর্ব্বদাই রত্নগুচ্ছের আলোকে প্রকাশময়, তন্নিবন্ধন এখানে দিবা রাত্র বিভাগ নাই, তথাপি আমি কালের সূক্ষ্মা গতি নিজ অনাবৃত জ্ঞানে জানিতেছি[২৪।২৫]। মুনিবর! স্থিরতার প্রভাবে আমার মন চাঞ্চল্যরহিত ও শান্ত হইয়াছে, সার কি অসার কি তাহা জানিতেছি। সামান্ত ভূ-কাকের ন্যায় আমি আশাপাশে বদ্ধ ও তাহার বশ্য নহি। সে কারণেও তাদৃশ মহাপ্রলয়ে আমার খেদ জন্মে না [২৬।২৭]। জগতের মায়িকত্ব দর্শনে আমার চিত্ত ধীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ঘোরতর বিপদ্দশাতেও আমার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, সুতরাং কোনরূপ খেদও অনুভবগম্য হয় না[২৮।২৯]। আমি বার বার অনুসন্ধানে বিদিত হইয়াছি, জগতের স্থিতি আপাতরম্য মাত্র, ইহার পরিণাম অতি তুচ্ছ। ইহার মিথ্যাত্ব জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ নামক বিকার সমূহের পরিবর্ত্তন মাত্র। সুতরাং দুর্যোগ সমূহ আমাকে ভয় প্রদর্শন বা পীড়ন করিতে পারে না[৩০]। হে ভগবন্! ভূতবৃন্দ হইতেছে যাইতেছে, ইহাও ব্যবহারিকী দৃষ্টি ব্যতীত পরমার্থ দৃষ্টিতে নহে। যদি তাহাই হইল, তবে আর ভয় প্রাপ্তির প্রসক্তি কোথায়? এই ভূতবৃন্দরূপা নদী নিরন্তর কাল সাগরে প্রবেশ করিতেছে, আমরা তাহার তটে অবস্থান মাত্র করিতেছি[৩১।৩২]। আমরা কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করি না, এই একই স্থানে মুনিবৃত্তিতে (মুনিবৃত্তি=মননশীল দিগের ধর্ম্ম) স্থিত রহিয়াছি। লোক যেমন কণ্টকাচিত ভূমে অতি সাবধানে পদসঞ্চালন করে, সেইরূপ, আমরাও এই কল্পদ্রুমে সাবধানতার দ্বারা মাত্র ব্যবহার নির্ব্বাহক অনুষ্ঠানে কাল কর্ত্তন করিতেছি। যাঁহারা আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ, যাঁহাদের শোক ভয় আয়াস কিছুই নাই, যাঁহারা নিরাময় ও সন্তুষ্টস্বভাব, তাঁহাদের অনুগ্রহও আমার নির্ভয়তার অন্য এক কারণ[৩৩।৩৪]। হে ভগবন্! আমাদের মন ইহা তাহা করিয়া লুণ্ঠিত হয় না ও বিশ্বের রহস্য বা তত্ত্ব (মায়াময়ত্ব) বিস্মৃতও হয় না। মহাসমুদ্র যেমন পর্ব্বকালে অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ের পূর্ণতা কালে পরিপূর্ণ থাকে, আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চন্দ্রের পূর্ণতায় পূর্ণ রহিয়াছি (অক্ষয় অব্যয় রহিয়াছি)[৩৫-৩৬]। হে ব্রহ্মন্! আপনার আগমনে আমার আশয় (চিত্ত) অত্যন্ত

প্রসন্ন হইয়াছে। সাধু সজ্জনগণ যে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, ইহা অপেক্ষা আমাদের আর অধিক কুশল কি হইবে?[৩৭।৩৮]। ভোগ আপাতরম্য, তাহার দ্বারা কি পাওয়া যায়? কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু সৎসঙ্গরূপ চিন্তামণির দ্বারা যাহা সর্ব্বসার তাহাই পাওয়া যায়[৩৯]। এই ত্রৈলোক্য একটী পদ্ম, একমাত্র আপনিই ইহার ভ্রমর। আপনার বাক্য স্নিগ্ধ, গম্ভীর, জ্যোতিষ্মান্, উদার, ধীর ও মধুর[৪০]।

হে সাধো! আমার মনে হইতেছে, আপনার দর্শনে আমার দুষ্কৃত পুঞ্জ বিনষ্ট হইয়াছে, এবং আমার পক্ষিজন্মও উত্তম ফলযুক্ত হইয়াছে। কেননা, সাধু সজ্জনের সঙ্গ সমুদায় ভয়ের বিনাশক[৪১]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, সাধো! সেই অতি বিষম যুগান্ত কালেও এই বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। ইহা সমগ্র ভূতের অগম্য; সেই কারণে আমি এই স্থানে নিরুদ্বেগে অবস্থান করি[১।২]। যে সময়ে হিরণ্যাক্ষ সপ্তদ্বীপা বসুমতী বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিল, সে সময়েও এই কল্পপাদপ বিচলিত হয় নাই[৩]। ভগবান্ নারায়ণ যে সময়ে বরাহবিগ্রহ ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে সময়েও এই বৃক্ষ সুস্থির ছিল[৪]। ভগবান্ বিষ্ণু যখন সমুদ্রমন্থনার্থ মন্দরাচল আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তখনও এই কল্পতরু সুস্থির ছিল[৫]। দেবাসুরের যুদ্ধকালে অতি বিষম উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়ে সূর্য্য চন্দ্রাদি বিকম্পিত হইয়াছিল, অথচ এই বৃক্ষ বিকম্পিত হয় নাই[৬]। উৎপাত বায়ু বহমান হইলে সুমেরুস্থ শিলা ও সমুদায় বৃক্ষ বিচলিত হইয়াছিল, তথাপি এই বৃক্ষ বিচলিত হয় নাই[৭]। সমুদ্রমন্থন কালে মন্দরাচলের আন্দোলনে কল্পান্ত মেঘ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়াছিল, তথাপি এই বৃক্ষ

বিকম্পিত হয় নাই[৮]। এক সময়ে কালনেমি এই পর্ব্বতকে ভুজদ্বারা উত্তোলিতপ্রায় করিয়াছিল, সে সময়েও এই কল্পতরু বিকম্পিত হয় নাই[৯]। অমৃতাহরণ কালে পক্ষীন্দ্র গরুড়ের পক্ষবাতে সিদ্ধ বিদ্যাধর্য্যাদি গণও বায়ুবাহিত হইয়াছিল, সে সময়েও এই তরু বিচলিত হয় নাই[১০]। পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্ম হইলে সপ্তদ্বীপা বসুমতী অন্যান্য লোক সহ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তদ্দৃষ্টে সঙ্কর্ষণ রুদ্র শেষ নাগের আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সে উৎপাতেও এই বৃক্ষ বিকম্পিত হয় নাই[১১]। যে সময়ে শেষ অহির মুখনির্গত কল্পানল লোক সকল দগ্ধ করিয়াছিল, সপ্ত সমুদ্র শুষ্ক করিয়াছিল, পর্ব্বত সকল ভস্মসাৎ করিয়াছিল, সে সময়েও এই দ্রুম অক্ষত ছিল। হে মুনিশার্দ্দুল! যাহারা এতদ্বিধ শ্রেষ্ঠ দ্রুমে থাকে তাহাদের আবার আপদ্ কোথায়[১২।১৩]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, কল্পান্ত পবনের তাড়নায় সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র পর্য্যন্ত নিপাতিত হয়, তখন তুমি কি প্রকারে বিজ্বর থাক?

ভুশুণ্ড বলিলেন, যেমন কৃতঘ্ন নর চিরমিত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় আমি তখন এই নীড় পরিত্যাগ করিয়া থাকি[১৪]। সে সময়ে নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, সঙ্কল্পবর্জ্জিত ও বাসনাশূন্য হইয়া শূন্যে অবস্থান করি[১৫]। দ্বাদশ আদিত্যের উদয় যত কাল থাকে, তত কাল বারুণী ধারণা * অবলম্বনে কাল কর্ত্তন করি। যে সময়ে প্রলয় বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত পর্ব্বত সকলকে খণ্ড খণ্ড করে, সে সময়ে আমি পার্ব্বতী ধারণা অবলম্বনে শূন্যোপরি অবস্থান করি[১৬।১৮]। জগৎ যখন গলিয়া একার্ণব হয়, আমি তখন বায়বী ধারণায় স্থিত থাকি[১৯।২০]। ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসের পর অব্যাকৃত পদ (অব্যাকৃত=মূলপ্রকৃতি), সেই অব্যাকৃত পদে সমাধি স্থাপন করতঃ সুষুপ্তের ন্যায় দীর্ঘকাল অতিবাহন করি, পরে যখন পুনঃ সৃষ্ট্যারম্ভ হয় তখন পুনর্ব্বার এই বিহগালয়ে প্রবেশ করতঃ স্থিত হই। (পূর্ব্বসদৃশ সুমেরু ও তদুপরি পূর্ব্বসদৃশ কল্পবৃক্ষ ও তৎশাখায় নীড় সৃষ্টি হয়, আমিও পুনর্ব্বার এতন্মধ্যে পূর্ব্ববৎ প্রবিষ্ট ও স্থিত হই)[২১]।

---

* বারুণী ধারণা=উৎকট জলময় সমাধি। পার্ব্বতী ধারণা=পর্ব্বতময় সমাধি। এইরূপ বায়বী ধারণাও সমাধিবিশেষ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! প্রলয় কালে তুমি যেমন ধারণার দ্বারা অখণ্ডিত থাক (তোমার দেহের বিনাশ হয় না), অন্য যোগীরা সেরূপ অখণ্ডিত থাকেন না কেন? (তাঁহাদের দেহ বিনষ্ট হয় কেন?)

ভুশুণ্ড বলিলেন, ব্রহ্মন্! কোনও ব্যক্তির নিয়তিনাম্নী ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। নিয়তির নিয়ম বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ যাহার যেরূপ প্রারব্ধ বা নিয়তি সে তদনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। কল্পান্ত কালে দেহ থাকার প্রারব্ধ আমার ব্যতীত অন্য যোগীর নাই[২২।২৪]। সত্যসঙ্কল্পরূপ মদীয় নিয়তির বলে প্রত্যেক কল্পে এই শৃঙ্গ, এই বৃক্ষ ও এই নীড় সৃষ্ট হইয়া থাকে[২৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে কল্যাণ! তুমি যার পর নাই অত্যধিক দীর্ঘায়ু, জ্ঞান বিজ্ঞানে তৎপর, ধীরস্বভাব, যোগযোগ্য ও বুদ্ধিমান্। অনেক বার ও অনেক প্রকার সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখিয়াছ ও তাহা বলিতেও পারগ আছ। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি জগৎ ক্রমের কি কি আশ্চর্য্য স্মরণ করিয়া বলিতে পারগ আছ[২৬।২৭]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, এই সুমেরুর অধোভাগে পৃথিবীর জন্মপ্রকার আমার স্মরণ হয়। পৃথিবীতে যখন শৈল বন বৃক্ষ এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় নাই, পৃথিবীর সে অবস্থাও আমার মনে পড়ে[২৮]। পৃথিবী এগার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভস্মপূর্ণা অবস্থায় নিপতিতা ছিল, সে অবস্থাও আমার স্মরণে আবদ্ধ রহিয়াছে[২৯]। সূর্য্য উৎপন্ন হয় নাই, চন্দ্রের জন্ম হয় নাই, সুতরাং দিন রাত্র বিভাগ ছিল না, তৎকালের সে অবস্থাও আমার স্মরণ হয়[৩০]। পর পর যে ক্রমে ভুবন সৃষ্ট হইয়াছে, সুমেরু ও এই কোটর উৎপন্ন হইয়াছে, সে ক্রমও আমি দৃষ্ট করিয়াছি[৩১]। দেবাসুরের যুদ্ধ মনে পড়িতেছে ও এই মেরু ব্যতীত অন্য সমুদায়ের ধ্বংস স্মরণ হইতেছে। যে সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ব্যতীত আর সমুদায় বিনষ্ট হয় সে সময়ও আমার স্মরণে রহিয়াছে[৩২]। ধরামণ্ডল মণ্ডকাদি (মস্তক বা মণ্ডক) অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল দৈত্যাদিগের অন্তঃপুর হইয়া রহিয়াছিল, তাহাও আমার স্মরণ হয়। পৃথিবীকে চার যুগের অধিক কাল কেবল পর্ব্বতাচিত (পর্ব্বতব্যাপ্ত) থাকিতে দেখিয়াছি। দশ সহস্র বৎসর স্তূপাকার মৃত দৈত্যের অস্থিতে পরিপূর্ণ থাকিতে দেখিয়াছি। এই পৃথিবী বহুকাল নির্ব্বৃক্ষ ও আকাশ-

নক্ষত্র বর্জ্জিত ছিল, তাহাও আমার স্মরণ হয়[৩৩।৩৮]। যে সময়ে বিন্ধ্য পর্ব্বত সুমেরু স্পর্দ্ধায় বিবৃদ্ধ হইতে ছিল, অগস্ত্য তাহার স্পর্দ্ধা খর্ব্বীকৃত করেন, এক সময়ে মলয়, দর্দ্দুর ও সহ্য প্রভৃতি বিভাগ ছিল না, কেবল একপর্ব্বত বিন্ধ্যমাত্রই ছিল, সে সমুদায়ও আমার স্মরণ হয়[৩৯]। এইরূপ এইরূপ বহু বৃত্তান্ত আমার স্মরণ হয়, পরন্তু সে সকল বহু বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। তন্মধ্যে যাহা সার বা প্রধান, তাহাই বর্ণন করি, শ্রবণ করুন[৪০]। শত শত মনুর পরিবর্ত্তন, বহুযুগব্যাপী জীব লোকের ঐশ্বর্য্যের ও প্রভাবের স্থিতি ও আধিক্য, ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ, বেদনিন্দুক শূদ্র, বহুপতিকা নারী যে কালে প্রাদুর্ভূত হয় সে কালের সে সমুদায় আমার স্মরণ হয়[৪১।৪৩]। পৃথিবীকে কেবলমাত্র বৃক্ষে পরিপূর্ণা, লবণাদিসমুদ্রসপ্তক না থাকা; স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-ব্যতীত মনুষ্যোৎপত্তি হওয়া, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়[৪৪]। পর্ব্বত ছিল না, তুমি ছিলে না, সূর্য্যচন্দ্রাদি ছিল না, এ অবস্থাও আমার স্মরণ হয়। ইন্দ্র ছিল না, রাজা ছিল না, উত্তমাধমবিভাগ ছিল না, এরূপ অবস্থাও আমার স্মরণ হয়[৪৫।৪৬]। সৃষ্টির আরম্ভ, তাহার বৃদ্ধি ও তাহার বিভাগ আমার মনে হয় এবং কুল পর্ব্বতের উৎপত্তি ও জম্বুদ্বীপের বিভাগারম্ভ আমার স্মরণ হইতেছে। বর্ণধর্ম্মের সৃষ্টি, মর্ত্ত্যমণ্ডলের বিভাগ ও রচনারম্ভ, নক্ষত্রচক্রের সংস্থান, ধ্রুবনির্ম্মাণ, চন্দ্রসূর্য্যাদির জন্ম, ইন্দ্রোপেন্দ্রাদির স্থিতি, হিরণ্যাক্ষের দৌরাত্ম্য ও বরাহ অবতার, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়। রাজার ও রাজধর্ম্মের উৎপত্তি, বেদোদ্ধার ও সমুদ্রমন্থন আমার স্মরণ হইতেছে[৪৭।৫০]। পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্ম, সগর রাজার কীর্ত্তিকলাপ, এ সকল যাহারা বালক তাহারাও স্মরণ করিতে পারে। অর্থাৎ ঐ সকল যেন অল্প দিনের ঘটনা, তাই বলিতেছি, এতৎকল্পীয় লোকেরাও ঐ সকল স্মরণ করিতে পারে[৫১]।

অধিক কি বলিব, গরুড়বাহনকে হংসবাহন, হংসবাহনকে গরুড়বাহন, তাঁহাকে পুনঃ বৃষভবাহন হইতে দেখিয়াছি (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের বিষ্ণু অন্য এক কল্পের ব্রহ্মা এবং সে কল্পের ব্রহ্মাকে অন্য কল্পে শিব হইতে দেখিয়াছি)। এবং তৎতৎ কল্পীয় বৃত্তান্তনিচয় আমার স্মৃতিপথারূঢ় রহিয়াছে[৫২]।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

৬২

দ্বাবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে ভগবন্! তৎপরবর্ত্তী জগতে যুষ্মদাদির জন্ম, ভরদ্বাজ পুলস্ত্য অত্রি মরীচি, পুলহ ও উদ্দালক প্রভৃতির জন্ম ও স্থিতি; ক্রতু ভৃগু অঙ্গিরা সনৎকুমার ভৃঙ্গীশ কার্ত্তিকেয় গজবদন গণেশ গৌরী সরস্বতী লক্ষ্মী ও গায়ত্র্যাদির উৎপত্তি এবং মেরু মন্দর কৈলাস হিমবান্ প্রভৃতি গিরির উৎপত্তি, হয়গ্রীব হিরণ্যাক্ষ কালনেমি হিরণ্যকশিপু বলি প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্য দানবের জন্ম, শিবি নাভাগ নল মান্ধাতা দিলীপ নহুষ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় গণের জন্ম, আত্রেয় ব্যাস বাল্মীকি শুক বাৎস্যায়ন উপমন্যু মণ্ডুকী প্রভৃতি মুনি ঋষি গণের জন্ম বৃত্তান্ত, এ সকল যেন অতি যৎসামান্য অতীত কালের কথা[১।৭]। হে মুনে! আপনি এতজ্জন্মে ব্রহ্মার পুত্র, ইহার পূর্ব্বের অপর সাত জন্ম আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। এই অষ্টম জন্মে আপনি আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন[৮]। আপনি অন্য জন্মে ব্রহ্মপুত্র হন নাই, এই অষ্টম জন্মেই ব্রহ্মপুত্র হইয়াছেন। পূর্ব্বের সাত জন্মের মধ্যে কোন কোন জন্মে আপনি ব্যোমজাত, কোন কোন জন্মে জলজাত, কোন কোন জন্মে বায়ুজ ও কোন কোন জন্মে অনলজ হইয়াছিলেন[৯]। প্রত্যেক কল্প পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সদৃশ রূপে নির্ম্মিত হয় সত্য; পরন্তু কখন কোন কোন বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটনাও হইয়া থাকে। আমার স্মরণ হইতেছে, পর পর তিন্ বার ঠিক্ সমানাকারের সৃষ্টি হইয়াছে। আচার ব্যবহারও দশ বার সৃষ্টিতে ঠিক্ সমান হইয়াছিল, এবং জীবগণের আয়ুষ্কালও দশ সৃষ্টিতে সমান চলিয়া ছিল। আমার বেশ স্মরণ হয়, পৃথিবী পাঁচ বার জলমগ্না হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বার পৃথিবী বরাহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতা হইয়াছিলেন। সেইরূপ পাঁচ বার সমুদ্রমন্থন, পাঁচ বার কুর্ম্মাবতার, দশ বার ও তৎপরে পুনর্দ্বাদশ বার সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল[১০।১৩]। তিন বার হিরণ্যবধ, (হিরণ্য = অসুর) ছয় বার পরশুরাম, শতবার বুদ্ধাবতার, ত্রিশ বার ত্রিপুরবধ, দুই বার দক্ষযজ্ঞধ্বংস, (শিব কর্ত্তৃক) শত

বার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বিনাশ, অষ্ট বার বাণযুদ্ধ, তথা শতবার হরি হরের দ্বন্দ্ব, যুগভেদে মনুষ্য দিগের বুদ্ধিভেদ, এই সমস্ত আমার স্মরণ গম্য আছে[১৪।১৯]। যুগে যুগে মহাভারত রামায়ণাদি গ্রন্থের আবির্ভাব ও বেদাদি গ্রন্থের উদয় হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা (রামায়ণের দ্বারা) রামের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, রাবণের ন্যায় বিলাসী হওয়া উচিত নহে, এইরূপ জ্ঞান লব্ধ হয়। বাল্মীকিনামা জীব দ্বাদশ বার হইয়া গিয়াছে ও দ্বাদশ বার লক্ষশ্লোক রামায়ণ প্রকটিত হইয়াছে। পূর্ব্বযুগীয় ব্যাস ও তৎকৃত মহাভারতের ন্যায় এতৎযুগীয় ব্যাস ও তৎকৃত মহাভারত আমার স্মৃতিগম্য আছে। এ পর্য্যন্ত সাত বার ব্যাসনামধেয় জীব জন্মিয়াছে ও সাত বার মহাভারত প্রচারিত হইয়াছে[২০।২৭]। হে মুনীশ্বর! আখ্যান-শাস্ত্রও (ইতিহাস শাস্ত্র) যুগে যুগে বিনষ্ট হয় ও পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়[২৮]। হে সাধো! প্রত্যেক যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎযুগীয় পদার্থ সমূহের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট করিয়াছি ও সে সমুদায় স্মরণ করিতেছি। ভগবান্ বিষ্ণু রাক্ষস বধার্থ দশ বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বার তাঁহার রাম আখ্যা হইয়াছে। এবার তাঁহার একাদশ জন্ম, এ বারও তিনি রাম আখ্যায় প্রসিদ্ধ[২৯।৩০]। হরি তিন্ বার নরসিংহ-শরীরী হইয়া তিন্ হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছেন। ভূভার নিবারণার্থ হরির পঞ্চদশ বার বসুদেব গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি, এবার তাঁহার ষোড়শ জন্ম।

হে মুনিশ্বর! আমি আপনার নিকট যে সকল সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিলাম, এ সমস্ত সৃষ্টিই ভ্রান্তিনির্ম্মিত, বস্তুভূত নহে। যেমন জলে বুদ্বুদের ক্ষণিক উৎপত্তি ও ক্ষণিক স্থিতি, সেইরূপ স্বাত্ম-অজ্ঞানে এই সৃষ্টির ক্ষণিক উৎপত্তি ও ক্ষণিক অবস্থিতি জানিবে। উক্তরূপ দৃশ্যভ্রান্তি নিতান্ত অনিত্য; কেননা ঐ সকল জলে লহরীর ন্যায় উত্থিত হইতেছে ও লয় হইতেছে[৩১।৩৪]। কখন পূর্ব্বসৃষ্টির সমান সৃষ্টি, কখন বা সম্পূর্ণ বিপরীত সৃষ্টি কখন বা অর্দ্ধসমান সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছি[৩৫]। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে সকল প্রাণীর যেরূপ আচার ব্যবহার স্বভাবাদি দৃষ্ট করিয়াছিলাম, পর সৃষ্টিতে সেই সকল প্রাণীর ঠিক্ তদনুরূপ আচার ব্যবহার ও স্বভাবাদির জন্ম হইতে দেখিয়াছি, কদাচিৎ বিপরীত হইতেও দেখিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! মন্বন্তর ভেদে কখন কখন জগৎক্রমের ভেদও

হইয়া থাকে। প্রায়ই অভেদ, ভেদ কদাচিৎ। বন্ধু মিত্র ভৃত্য বাসস্থান, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমিও কখন বিন্ধ্য পর্ব্বতে, কখন বা সহ্য গিরিতে, কখন বা দর্দ্দুর শিখরে, কখন বা মলয়াচলে বাস করিয়াছি। এই যে ভূধর, এই যে শিখর, এই যে চূতবৃক্ষ, এই যে শাখা, এই যে নীড়, এ সমস্তই এতৎকল্পীয়; পূর্ব্ব কল্পেও এ সকল ঠিক্ এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন সর্ব্বধ্বংস মহাপ্রলয় হয় তখন এ সকল থাকে না, পুনর্ব্বার এ সকল প্রাক্তন সন্নিবেশের তুল্যসন্নিবেশে এ সকল উৎপন্ন হয়, আমিও এতন্নীড়ে পুনঃ অবস্থান করি[৩৩।৪৪]। মদীয় পিতার জীবদ্দশায় যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে বটে; পরন্তু এ সকল পূর্ব্বতন নহে; কিন্তু অভিনব[৪৫]। সর্ব্ববিধ্বংস কালে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ থাকি, পুনঃ সৃষ্টি হইলে সমাধি পরিত্যাগ করিয়া দেখি, সেই মেরু ও পাদপ পুনরুৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে আকারের সৃষ্টি ছিল, এই বৃক্ষাদির যেরূপ সংস্থান (অবয়ববিন্যাস) ছিল, পরে তাহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও দেখিতে পাই। তাহাতেই আমার অবিনাশ ও সৃষ্টির বিনাশ অবধারিত হয়। অতএব, জগতের রহস্য সৎ অসৎ দুএর বহির্ভূত অর্থাৎ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য। যাহাই হউক, বুদ্ধির বিপর্য্যাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৬।৪৭]। আত্মাশ্রিত মায়ার বিক্ষেপ শক্তির অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির বিলাস যার পর নাই চমৎকার জনক। কখন পুত্র পিতা হইতেছেন, কখন বা পিতা পুত্র হইতেছে। ঐরূপ মিত্র অমিত্র, অমিত্র মিত্র, পুরুষ স্ত্রী ও স্ত্রী পুরুষ হইয়া জন্মিতেছে। আমি কলি যুগে সত্যের আচার ও সত্যে কলির ব্যবহার দৃষ্ট করিয়াছি। হে মুনিবর! ত্রেতায় ও দ্বাপরে কলিযুগ ও কলিযুগে ত্রেতার ও দ্বাপরের কার্য্য হইতে দেখিয়াছি। সে সমস্তই আমার স্মরণে রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! চার সহস্র যুগের শেষ হইলে যে সর্ব্ববিধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় জন্মে, সে মহাপ্রলয় আমার স্মরণে রহিয়াছে। আমি দশসংখ্যক বার পার্থিবরূপ বর্জ্জিত প্রাণীর অর্থাৎ বায়বীয় মূর্ত্তিধারী জীবের সৃষ্টি সন্দর্শন করিয়াছি।

হে মুনিবর! ব্রহ্মার এক এক দিনে এক এক কল্প হয় সেই সকল কল্পের নানা আকারের সৃষ্টি মদীয় স্মৃতিতে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে[৪৮।৫৩]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! আমি পুনর্ব্বার সেই বায়সরাজ ভুশুণ্ডকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বায়সরাজ! যাহারা এই জগতে বিচরণ করে ও ব্যবহারে রত থাকে, কি করিলে মৃত্যু তাহাদের দেহ বিনষ্ট করিতে পারে না[১।২]।

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সমস্তই জানেন, তথাপি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রভুরা ভৃত্যদিগকে মুখরিত করিবার জন্যই বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রশ্ন করেন, ইহা আমি বিদিত আছি। যাহাই হউক, যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অবশ্যই তাহা বলিব। কেননা, সাধু দিগের আজ্ঞা পালন করাই আমাদিগের মুখ্য আরাধনা[৩।৪]। মৃত্যু তরণের প্রধান উপায় বাসনাবিনাশ। যাহার হৃদয়ে বাসনাতন্তুগ্রথিত দোষরূপ মুক্তাফল বিধৃত নাই, মৃত্যু তাহাকে কদাচ মারিবার ইচ্ছা করে না[৫]। আধিরূপ কাষ্ঠকীট যাহার দেহ ভেদ না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[৬]। শরীররূপ বৃক্ষের কোটরে স্থিত ও চিন্তারূপ ফণাধারী আশারূপ সর্প যাহাকে বিষজর্জ্জরিত না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[৭]। মনোরূপ গর্ত্তে অবস্থিত ও রাগদ্বেষরূপ বিষে পরিপূর্ণ লোভরূপ সর্প যাহাকে দংশন না করে, মৃত্যু তাহাকে বিনাশ করে না। শরীররূপ সমুদ্রের বাড়বানল স্বরূপ ক্রোধ যাহার বিবেক স্বরূপ জল পান না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না। তিলনিষ্পেষণ যন্ত্রের অনুরূপ কঠিন অনঙ্গ যাহাকে নিষ্পীড়ন না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[৮।১০]। যাহার চিত্ত পরম পাবন একাদ্বয় পদে বিশ্রান্ত হইয়াছে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[১১]। যাহার চিত্ত উদয়াস্তবর্জ্জিত ও নিত্য সমাহিত, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[১২]। হে ব্রহ্মন্! ঐ সকল মহাদোষ সংসার ব্যাধির মুখ্য নিদান, পরন্তু যাহার চিত্ত সদা সমাহিত, ঐ সকল দোষ তাহাকে লুপ্ত করিতে পারে না। যাহার চিত্ত নিত্যসমাহিত, আধিব্যাধিজনিত দুঃখ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। যাহার

৯

চিত্ত সমাহিত, তাহার উদয়াস্ত ও স্মরণ বিস্মরণ ও জাগ্রৎ বা স্বপ্ন কিছুই থাকে না[১৩।১৫]। হৃদয়াকাশকে অন্ধকারময় করে, এরূপ কামের ও ক্রোধের বিকারে সমুদ্ভূত চিন্তা যাহার চিত্তকে হিংসা করে না, তাহারই চিত্তকে তুমি সমাহিত বলিয়া জানিবে[১৬।১৮]। যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সে দান আদান ত্যাগ গ্রহণ ও যাচ্ঞা, এ সকলের কিছুই করে না, অথচ সে লোকদৃষ্টিতে কার্য্যবান্ বলিয়া দৃষ্ট হয়। যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, বিপুল অর্থ ও মহৎ গুণ তাহার অনুগামী হয়[১৯]। যাহা পরিণামে হিত, সত্য, অভ্রান্ত ও দুশ্চেষ্টানির্ম্মুক্ত, মনকে তন্নিষ্ঠ করিবেক[২০]। অশুদ্ধ ও চিত্তকাতরকারী অনেক পিশাচ (দ্বৈত ভাবরূপ পিশাচ) যাহাকে দেখে নাই, মনকে তন্নিষ্ঠ করিবেক[২১]। চিত্তকে তন্নিষ্ঠ করিবেক—যাহার আদিতে, অন্তে ও মধ্যে চারু, মধুর ও পথ্য অর্থাৎ নির্দোষ আনন্দ[২২]। যাহা অবিনাশী, মনের হিত ও সাধুসেব্য, মনকে তত্রস্থ করিবেক[২৩]। যাহা বুদ্ধিরও আলোক অর্থাৎ প্রকাশক, যাহা দেবভোগ্য অমৃত হইতেও উত্তম অমৃত, যাহা যৎপরো ন পর (অত্যুৎকৃষ্ট) সৌভগ্য, মনকে তৎপর করিবেক। সুর অসুর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর কিন্নর ও সুরনারী ও স্বর্গ, এই সমুদায়ে যাহা আছে তাহা প্রকৃত শুভ নহে ও সুস্থিরও নহে[২৬]। নাগ অসুর অসুরাঙ্গনা ও পাতাল তলে শোভন সুস্থির কিছুই নাই। তরুরাজিতে নরাধিপত্যে পর্ব্বতে পুরসমূহে ও সমুদ্রে কিছু মাত্র শোভন ও সুস্থির নাই। হে তাত! কোনরূপ ক্রিয়াতেও শোভন ও সুস্থির বস্তু নাই। কেননা সে সকল আধিব্যাধি যুক্ত সুতরাং দুঃখজড়িত। যে হেতু দুঃখদ সেই হেতু তুচ্ছ[২৫।২৯]। বুদ্ধিবৈচিত্র্যের মধ্যেও স্থির ও শুভ নাই। কেননা সে সকল কেবলমাত্র চিত্তের তারল্য বা চিন্তাবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ক্রিয়া সকল হৃদয়রূপ ক্ষীর সমুদ্রের বিলোড়ক মন্দর পর্ব্বতের স্থানীয়। সুতরাং তাহাতেও শোভন ও সুস্থির কিছু মাত্র নাই[৩০।৩১]। অবিশ্রান্ত উৎপন্ন ও প্রধ্বংসযুক্ত চেষ্টাপুঞ্জেও শোভন ও সুস্থির কিছু নাই[৩২]। সমুদায় মহীতলের একাধিপত্যও শ্রেষ্ট নহে, দেবত্ব লাভও শ্রেষ্ঠ নহে, নাগত্বও শ্রেষ্ঠ নহে। কেননা সাধুদিগের চিত্ত ঐ সকলে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না[৩৩]। শাস্ত্রবিচারে, পরকার্য্য বিবেচনায়, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কথাগ্রন্থে, এমন কিছু নাই যাহাতে সতের মন স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়[৩৪]। চিরজীবন ভাল নহে, মরণও ভাল

নহে, নরক ত ভাল নহেই, স্বর্গও ভাল নহে। কারণ এই যে, দীর্ঘ-জীবনে আধি ব্যাধি, মরণে মূঢ়তার আধিক্য, নরক ক্লেশময় ও স্বর্গ বা সর্ব্বভুবনের আধিপত্য অবশ্যবিনাশী[৩৫]।

হে মহাত্মন্! জগতের এবমেবং ক্রম বিচার করিয়া দেখিলে কিছুই রম্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সমস্তই অরমণীয় বলিয়া স্থির হয়। যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা তাদৃশ অশাশ্বত পদার্থে কিরূপে আশ্বস্ত থাকিতে পারেন? অর্থাৎ এ সকলে তাঁহাদের আস্থা স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না[৩৬]।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

—ం•()•ం—

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে সাধো! কেবল একাদ্বয় জ্ঞান অপার, অগাধ ও সত্য। যত প্রকার চিন্তা আছে, একমাত্র আত্মচিন্তাই সে সমস্তের নাশক। আত্মচিন্তা যে কেবল অন্যান্য চিন্তার নাশিনী তাহা নহে; চিরসঞ্চিত দুঃস্বপ্নতুল্য সংসারভ্রমেরও অপহারিণী[১।২]। উহা মনোগতির নিষ্কলঙ্ক পথ, তদীয় ভ্রমণের বিশাল চত্বর, সমুদায় দুঃখের ও সমুদায় অনর্থচিন্তার অবসান[৩]। উহা অন্ধকারের জ্যোৎস্না। তমোনাশক এই জ্যোৎস্না স্বকীয় অন্তরেই সমুদিত হয়। হে ভগবন্! সর্ব্বসঙ্কল্প-বর্জ্জিত ঐ আত্মচিন্তা আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিতে সুপ্রাপ্য হইলেও আমাদের ন্যায় ব্যক্তিতে দুর্লভ্য। প্রাকৃত জীবের মধ্যে যাহারা সামান্যজ্ঞানী, কিরূপে তাহারা সমস্ত কল্পনার অতীত পদ প্রাপ্ত হইবে? যদি বলেন, তবে তুমি সে পদ কিরূপে প্রাপ্ত হইলে? তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিলাসিনী আত্মচিন্তার কতক গুলি সখী আছে, আমি তাহাদের অন্যতমা অবলম্বন করিয়া উক্ত বর্ণিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার নাম প্রাণচিন্তা। তিনি বিজ্ঞান চন্দ্রের দ্বারা সুশীতলা, সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী ও দীর্ঘজীবনের অকাট্য কারণ[৪।৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভুশুণ্ড পক্ষী ঐরূপ কহিলে পর আমি পুনর্ব্বার

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম[৯]। বলিলাম, হে সংশয়নাশন্! হে চির-জীবিন্! হে সাধো! তুমি যে প্রাণচিন্তার কথা বলিলে সে প্রাণ-চিন্তা কিরূপ[১০]?

ভুশুণ্ড বলিলেন; মুনে! আপনি সর্ব্ববেদান্তবেত্তা ও সর্ব্বসংশয়নাশক হইয়াও এই বায়সকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা অবশ্যই আমার পক্ষে পরিহাস। যাহাই হউক, আমি নিজ শিক্ষার জন্য আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব, তাহাতে আমার ক্ষতি হইবে না[১১।১২]। এই বায়সের দীর্ঘজীবনের ও আত্মজ্ঞানের কারণ স্বরূপ প্রাণচিন্তা বর্ণন করি, আপনি শ্রবণ করুন[১৩]। হে ভগবন্! দেখুন, এই মনোরম দেহ-গৃহ দেখুন। এই গৃহের স্থূণা অর্থাৎ খুঁটী তিনটী (বাত পিত্ত শ্লেষ্মা) ও নয়টী দ্বার। পূর্ব্বে যে পুর্য্যষ্টকের কথা বলিয়াছি, সেই পুর্য্যষ্টক এতদ্-গৃহস্বামীর কলত্র ও স্বজন। এই গৃহের স্বামী অহঙ্কার। অহঙ্কাররূপ গৃহস্থ ইহাতে বাস করে ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে[১৪।১৫]। আপনিও সাক্ষী চেতনার দ্বারা এ সকল দেখিতেছেন। ইহাতে কর্ণশুষ্কুলী নামক দুইটী চন্দ্রশালিকা অর্থাৎ শিরোগৃহ (সর্ব্বোপরিস্থ ছোটঘর) আছে। এই গৃহের আচ্ছাদন শিরোরুহ ও ইহাতে দুইটী বিস্তীর্ণ গবাক্ষ আছে অর্থাৎ চক্ষু দুটী গবাক্ষস্থানীয়[১৬]। ইহার প্রধান দ্বার আস্য (মুখ)। ভুজ ও পার্শ্ব ইহার উপমন্দির অর্থাৎ গৃহের পক্ষ (পাশ চাল)। দন্তশ্রেণীরূপ মালিকার দ্বারা উক্ত প্রধান দ্বার সর্ব্বদা সুশোভিত[১৭]। এই গৃহে পাঁচ দ্বারপাল রহিয়াছে তাহারা সর্ব্বদাই রূপ রস প্রভৃতি বিজ্ঞাপিত করিতেছে (পাঁচ ইন্দ্রিয়)। এই গৃহের সর্ব্বত্রই আত্মারূপ আলোক দ্বারা আলোক-ময়। জাগ্রৎকালে গৃহস্বামী এতদ্গৃহে স্থিত থাকেন তথা নেত্রকনীনি-কারূপ অলিন্দে (বারাণ্ডায়) অবস্থিতি করেন। এই গৃহ রক্ত-মাংস-বসা-রূপ কর্দ্দম দ্বারা লেপিত, স্নায়ুরজ্জু-সমূহে জড়িত, এবং ইহার মূল বা দেওয়াল স্থূলাস্থিরূপ কাষ্ঠের দ্বারা প্রস্তুত (স্থূলাস্থি=বড় বড় হাড়)-[১৮।১৯]। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই গৃহের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম ও অতিকোমল ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। একটী বামভাগরূপ প্রকোষ্ঠে (বামভাগগত হৃদ্পিণ্ডে) ও অপরটী দক্ষিণপার্শ্বরূপ প্রকোষ্ঠে (হৃদ্পিণ্ডে)। এই দুই নাড়ী ছেদ ভেদ দ্বারা দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রাণসঞ্চরণ দ্বারা অনুমিত হয়[২০]। যাহার বা যে নাড়ীর নাম পুরীতৎ,

যাহা সমুদায় প্রাণশক্তির আশ্রয়, যাহা দ্বাসপ্ততিসহস্র নাড়ীর মূল বা কন্দ, (যেমন শালুক বা মৃণালের মূল), যাহা সম্পুটিত ও সমৃণাল পদ্মযুগল-ত্রয়াকার হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রত্রয় যে স্থানে বিরাজ করিতেছে, সে স্থান অস্থিমাংসাশ্রিত হইলেও অত্যধিক মৃদু। উক্ত পদ্মাকার প্রাণযন্ত্রের নাল উর্দ্ধদিকে ও বক্ত্র অধোদিকে। এই পদ্মাকারযন্ত্র কীলকে প্রোত রহিয়াছে[২১]। নাসাগ্র হইতে পাদ পর্য্যন্ত দেহাকাশে বিচরণকারী চন্দ্র নামক অপান বায়ুর অমৃতে পরিষিক্ত হইয়া উক্ত পদ্মের দল গুলি বিকসিত অর্থাৎ অল্প বিস্তৃত হইতেছে, পুনর্ব্বার প্রাণবায়ুর সঞ্চারে ঐ সকল দল অল্প সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। অতএব, উক্ত যন্ত্রের পত্রভাগ প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও অতি মৃদুভাবে চলমান হইতেছে। কথা গুলির স্থূল তাৎপর্য্য—নিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস যোগে উক্ত প্রাণযন্ত্র একবার অল্প সঙ্কুচিত, আর বার অল্প বিস্তৃত হইতেছে[২২]। তাহাতেই অর্থাৎ উক্ত পদ্মদলের প্রচলনে উক্ত বায়ু দ্বয়ের বৃদ্ধি ও হ্রাস সংঘটন হইতেছে। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এ কথার অর্থ এই যে, উক্ত অধ্যাত্মবায়ু পূর্ব্ববর্ণিত পুরীতৎ নামক নাড়ীতে ও হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রসংলগ্ন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বশিরায় প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা বিস্তৃত হই-তেছে। বাহ্য বায়ু যেমন বাহিরে অরণ্যবর্ত্তী লতা পত্রসমূহে আঘাত প্রাপ্ত বা বাধা প্রাপ্ত হইয়া নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া যায়, সেইরূপ[২৩], উক্ত প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সেই অধ্যাত্ম-বায়ু শিরায় শিরায় বিভক্ত হইয়া দেহস্থ সর্ব্বনাড়ীতে বিচরণ করে। তন্নি-বন্ধন দেহে যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, সেই সকল কার্য্যের অনু-রূপে উক্ত অধ্যাত্মবায়ুর নামপ্রভেদ হইয়া থাকে। যথা—প্রাণ অপান সমান প্রভৃতি[২৪।২৫]। যেমন চন্দ্র হইতে চন্দ্ররশ্মি সর্ব্বত্র প্রসৃত হয় তেমনি হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রত্রিতয় হইতেই সমস্ত প্রাণশক্তি শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চা-রিত হয়[২৬]। গতি, আগতি, কর্ষণ, বিকর্ষণ, হরণ, আহরণ, বিহরণ, পতন, উৎপতন, এ সমস্তই উক্ত প্রাণশক্তির দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়[২৬।-২৭]। এতদনুসারেই যোগিজন কর্ত্তৃক উক্ত হৃদ্‌পদ্মগত বায়ুকে প্রাণসংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। হে মুনিবর! উক্ত প্রাণবায়ুর এক শক্তিতে নেত্রের স্পন্দন (উন্মেষ নিমেষ) হয়, অপর এক শক্তিতে স্পর্শ গ্রহণ, ও অপর এক শক্তিতে শ্বাস উচ্ছ্বাস সম্পন্ন হয়। উহারই এক শক্তি অন্ন পরিপাক

করে, আর এক শক্তি বাক্য উচ্চারণ করে, আর এক শক্তি রস রক্তাদি শরীরের সর্ব্বত্র বহন করে[২৮।২৯]। অধিক কি বলিব, যেমন যন্ত্রপুত্তলিকার অঙ্গপরিচালনাদি যন্ত্রচালকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় তেমনি শারীরিক ক্রিয়া মাত্রেই উক্ত বায়ুর দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে[৩০]। এই শরীরে উক্ত বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধঃ দ্বিবিধ গতি অধিক বিস্পষ্ট, ও তদ্দ্বয়ের নাম প্রাণ ও অপান। আমি সেই প্রাণ অপানের অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ তদ্দ্বয়ের উপাসনা করিয়া (প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক বিভাগ বা ভেদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বব্যাপী সূত্রাত্মপ্রাণে অর্থাৎ সমষ্টি প্রাণে ধারণা বন্ধন করিয়া) স্থিত রহিয়াছি। উক্ত প্রাণ অপানের একটী শীতল ও একটী উষ্ণ। ইহারা উভয়েই বহিরম্বরের পথিক ও শরীররূপ মহাযন্ত্র পরিচালনে শ্রমহীন। অপিচ, ইহারা হৃদয়াকাশের সূর্য্য ও চন্দ্র অথবা বহ্নি ও সোম। ইহারাই শরীররূপ পুরের চালক, মনোরূপ রথের চক্র, ও অহঙ্কাররূপ নৃপের প্রিয়তম অশ্ব[৩১।৩৪]। হে ব্রহ্মন্! আমি ইহাদিগকেই সদা সমরূপ রাখিয়া সাবধানে দিন কর্ত্তন করিতেছি। মৃণালতন্তুকে সহস্রধা বিভক্ত করিলে, সে সকল যেরূপ দুর্লক্ষ্য হয়, শরীরে শারীর বায়ুর গতি তদপেক্ষা অধিক দুর্লক্ষ্য।

হে মহাত্মন্! অবিশ্রান্তগতি শারীর বায়ুর সঞ্চার বিদিত হইয়া তদনুসরণ করিতে পারিলে পাশমুক্ত হওয়া যায়, তথা জন্মের উচ্ছেদ ও মরণের মূল বিনাশ করা যায়। অপিচ, অবিচ্ছেদী প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়াও যায়[৩৫।৩৮]।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! সেই পক্ষী ঐ প্রকার কহিলে পুনর্ব্বার আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রাণবায়ুর গতি কিরূপ[১]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, মুনিবর! আপনি সব জানেন, তথাপি আমাকে

জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভাল, আপনার প্রশ্নানুসারে আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় যথাযথ বর্ণন করি, আপনি শ্রবণ করুন[২]। হে ব্রহ্মন্! স্পন্দশক্তি ও সদাগতি বায়ু এই দেহের ভিতরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছে। প্রাণ ঊর্দ্ধভাগে গমন করিতেছে এবং অপান অধোভাগে গতি করিতেছে। এই অপানও স্পন্দশক্তি ও সদা সঞ্চরণশীল। অতএব প্রাণ এই দেহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধভাবে ও অপান অবাক্ (অধঃ) ভাবে স্থিতি করিতেছে[৩,৪]। হে প্রাণতত্ত্বজ্ঞ! কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতেই উক্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত থাকায় জীবের পক্ষে অযত্নসুলভ প্রাণায়াম সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে যাহা শ্রেয়োলাভের কারণ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন[৫]। প্রাণ যে বর্ণিত হৃদ্‌পদ্মকোটর হইতে স্বস্বভাবে সুতরাং বিনা প্রযত্নে বহির্গমনোন্মুখ হইতেছে, পণ্ডিতগণ সেই বহির্গতিকে রেচক আখ্যা প্রদান করেন। তথা দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত বহির্গতির অর্দ্ধ ভাগকে (নাসাগত বা নাসার মধ্যগত অর্দ্ধ ভাগকে) পূরক সংজ্ঞা প্রদান করেন। (ভাবার্থ এই যে, প্রাণচিন্তক পুরুষ হৃদয় হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত প্রাণগতির অর্দ্ধভাগকে আন্তর রেচক ও মূর্দ্ধাদি বহির্ব্বর্ত্তী দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্তের অর্দ্ধ ভাগকে বাহ্য পূরক বলিয়া ভাবনা করিবেন)। পুনঃ উক্ত বায়ু যখন বাহ্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অন্তঃপ্রবেশ করে, তখন যে নাসাগ্রাবধি মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত, ও বহিরাগমন কালে মূর্দ্ধাবধি নাসাগ্র পর্য্যন্ত বায়ুস্পর্শ সংঘটন হয়, সেই দ্বিবিধ বায়ুস্পর্শকেও অন্তঃপূরক বলা যায়[৬,৮]। এইরূপ স্বাভাবিক অন্তঃকুম্ভককেও বিদিত হইতে হয়। অন্তঃকুম্ভকের বিবরণ এই যে, প্রাণ অপানে গিয়া যাবৎ না পুনঃ হৃদয়ে আইসে তাবৎ তাহাকে কুম্ভক বলা যায়[৯]। প্রাণ এইরূপে রেচক কুম্ভক ও পূরক এই ত্রিধা বিভাগে দেহে অবস্থান করে। এতদ্ভিন্ন বাহিরেও রেচক কুম্ভক পূরক কল্পিত হয়। নাসাগ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বহিরাকাশে বিনা যত্নে প্রাণের গতির নাম স্বাভাবিক বাহ্য রেচক ও তাহার স্থিতির নাম স্বাভাবিক বাহ্য পূরক ইত্যাদি। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যোগীরা যাহা বলেন, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন[১০,১১]। হে প্রভো! নাসাগ্রসম্মুখে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ স্থানে বায়ুর অবস্থান প্রভৃতিকে বাহ্যপূরকাদি জ্ঞান করা উচিত। তন্মধ্যে অপান বায়ু উক্ত স্থানস্থ (অর্থাৎ নাসাগ্রসম্মুখস্থ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ আকাশে) বাহ্য বায়ুর সহিত একীভাবে

ও নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিলে তাহা কুম্ভক, পরে তাহার নাসাগ্র স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন ও তৎস্থানে স্থিতি করা পূরক, তথা নাসাগ্র হইতে নির্গত হইয়া দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ গমন করাও দ্বিতীয় প্রকারের পূরক, এবং বহির্গত প্রাণবায়ুর অপানসম্বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত (প্রত্যাবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত) পূর্ণ ও সম অবস্থা প্রাপ্ত থাকাও বাহ্যকুম্ভক। অপিচ, বিনা প্রযত্নে অপানের অন্তর্ম্মুখী গতিকে বাহ্য রেচক ও দ্বাদশাঙ্গুলের শেষ সীমা হইতে ফিরিবার সময় যে বায়ুর অন্তর্ম্মুখী স্থিতি জন্মে সে স্থিতিকেও প্রকারান্তরের কুম্ভক বলা যায়। এইরূপে প্রাণ অপানের বাহ্য ও আভ্যন্তর কুম্ভক পূরক ও রেচক উত্তমরূপ বিদিত হইতে পারিলে পুনর্জ্জন্ম জয় করা যায়। হে মহাবুদ্ধিধর! কথিত আট প্রকার ভেদ দিবা রাত্র অনুশীলন করা কর্ত্তব্য[১২।২০]। দেহবায়ুর স্বভাব বর্ণিত হইল, শয়নে গমনে জাগ্রতে বিদিত ঐ সকল স্বভাব স্মরণ বা অভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য। অভ্যাসের সামর্থ্যে অবশেষে প্রাণে নিরোধ-শক্তি আবির্ভূত হইবে। যদিও প্রাণ ও অপান চঞ্চলস্বভাব তথাপি অভ্যাসের সামর্থ্যে উহারা নিশ্চল হইবে। যে পুরুষ নিজ অন্তরে ঐ সকল জ্ঞাত হইয়া অভ্যাসবান্ হয়, সে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান থাকে না। আর আর সমুদায় ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মনকে অভিহিত ব্যাপারে অব্যগ্র অর্থাৎ স্থির করিতে পারিলে মনুষ্য অল্পকালে কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রাণচিন্তায় রত পুরুষের চিত্ত, বিষয়ে বৃত্তি লাভ করে না। যেমন কোন ব্রাহ্মণ চর্ম্মপাত্রগত দুগ্ধকে অপেয় মনে করে, সেইরূপ, প্রাণচিন্তাতৎপর মনুষ্যেরাও বিষয় বৃত্তিকে পরিত্যাজ্য মনে করেন। অনেক মহাপুরুষ এই চিন্তার দ্বারা প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থিতি, গতি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সকল সময়েই এই দৃষ্টি (জ্ঞান) স্থির রাখিতে পারিলে বন্ধন দশা বিনষ্ট হয়। যাহারা বোধ প্রাপ্ত, তাহারাই প্রাণাপানের অনুসরণ করিতে পারে[২১-২৭]। তাহাদের মনোমালিন্য ও মোহ থাকে না। তাহারা সর্ব্বদা স্বস্থ, স্বচ্ছ, বোধযুক্ত ও সুখী থাকে। হে ব্রহ্মন্! প্রাণ হৃদ্পদ্মপত্র হইতে উদ্গত হইয়া বাহিরে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণের পর অস্তগত (বাহ্য বায়ুতে লয় প্রাপ্ত) হয়। তৎপরে সেই দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বাহ্যাকাশের নিম্ন প্রান্তে অপানের বৃত্ত্যুদয় হয়, হইয়া নাসা পথে হৃদ্পদ্মে আসিয়া অস্ত প্রাপ্ত হয়। প্রাণ দ্বাদশাঙ্গুলের পর যে স্থানে গিয়া বিশ্রান্ত হয়, অপান

ঠিক্ সেই স্থান হইতে হৃদ্‌পদ্মে আগমন করে। প্রাণ যেমন যেমন বহ্নি-শিখার ন্যায় বাহ্যাকাশোন্মুখে বহমান হয়, অপান তেমনি তেমনি জলের নিম্নগতির ন্যায় হৃদয়াকাশাভিমুখে বহমান হয়। অপিচ, অপান চন্দ্রস্থানীয় ও প্রাণ সূর্য্যস্থানীয়। চন্দ্রের দ্বারা দেহের আপ্যায়ন (উপচয় ও হর্ষ ভাব) ও সূর্য্যের দ্বারা দেহের পাক বা পরিণতি জন্মে। প্রতিক্ষণেই প্রাণ হৃদয়াকাশ তপ্ত করিয়া মুখাগ্রবর্ত্তী গগনকে তাপযুক্ত করিতেছে, অমনি চন্দ্রস্থানীয় অপান উদ্‌গত হইয়া মুখাগ্রবর্ত্তী গগনকে অমৃত বর্ষণে শীতল করতঃ হৃদ্‌পদ্মাকাশকে অমৃতপ্লাবিত (শীতল) করিতেছে। হে মুনে! অপান শশীর চরম ভাগ, যে ভাগ প্রাণসূর্য্যের দ্বারা গ্রস্ত হয়; সে ভাগ প্রাপ্ত হইলে আর শোক মোহ থাকে না। আর প্রাণসূর্য্যের যে অংশ অপানশশী গ্রাস করে, সে ভাগ বিদিত হইলে তদ্‌বেত্তা নরের পুনর্জ্জন্ম হয় না। হে মুনিনায়ক! যদিও আমি প্রাণ ও অপান্ এই দুই শব্দের দ্বারা এক পদার্থকে দুই বিভাগে বর্ণন করিলাম, তথাপি, অদ্বয়দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে, একই প্রাণ কার্য্যভেদে বিভিন্ন। অতএব, একাদ্বয় প্রাণই অন্তরাকাশে ও বহিরাকাশে সূর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, আবার সেই প্রাণই আপ্যায়নকারী শশিতা লাভ করিতেছে। পুনর্ব্বার সেই প্রাণ প্রোক্ত প্রক্রিয়ায় শরীরাপ্যায়ক চন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া শোষণ-কর সূর্য্য হইতেছে। প্রাণের সূর্য্যতা পরিত্যাগ ও চন্দ্রত্ব প্রাপ্তি এতদুভয় প্রক্রিয়ার যে সন্ধিস্থান, সেই সন্ধিস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য ও তদ্বিজ্ঞানের ফলও শোকাভাব। হৃদ্‌পদ্মসম্পুটমধ্যে আত্মার আধার স্বরূপ উক্ত সূর্য্য চন্দ্রের যে নিত্য উদয়াস্ত, তাহা জ্ঞানগম্য হইলে মনের জন্ম (বৃত্তি) নিবারিত হয়। যে ব্যক্তি হৃদয়াকাশস্থ উক্ত সচন্দ্র সূর্য্যকে জানে, সেই ব্যক্তির জানাই জানা অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। হৃদয়া-কাশস্থ সূর্য্যের জ্ঞানে অনবচ্ছিন্ন আত্মার জ্ঞান হয়, তাহাতে হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট হয়। যেমন বাহ্যিক আলোকে বাহ্যিক অন্ধকারের ধ্বংস হয় তেমনি আন্তর আলোকে অন্তরস্থ অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। হে মুনিবর! হার্দ্দান্ধকারের ক্ষয় হওয়াই মুক্তির কারণ[২৮,৩০]। সেই জন্যই যোগীরা উদয়াস্তযুক্ত প্রাণসূর্য্যের দর্শনে যত্নবান্ হন। অপানচন্দ্র হৃদ্‌-পদ্মকোটরের যে স্থানে অস্ত হন, সেই স্থান হইতেই বহির্ম্মুখ প্রাণ-সূর্য্যের উদয় হয়। যেমন ছায়া চলিয়া গেলে সে স্থানে আতপের

উদয় হয় তেমনি অপান লয় প্রাপ্ত হইলে পুনঃ সেই স্থানে প্রাণসূর্য্য সমুদিত হয়[৬৩,৬৪]। যেমন আতপ বিনষ্টে সর্ব্বত্র ছায়াই সম্ভাবিত হয়, সেইরূপ, প্রাণের অস্তগমনেও অপানের উদয় সম্ভাবিত হয়। হে সাধো! প্রাণজন্মের স্থানকেই তুমি অপানের বিনাশ স্থান বলিয়া জানিবে এবং অপানের জন্ম স্থানকেই তুমি প্রাণের লয় স্থান বলিয়া জানিবে। প্রাণ-লয় ও অপানজন্ম অবলম্বন করতঃ বাহ্যকুম্ভকতৎপর থাকিলে শোকাদি নিবারিত হয় এবং অপানের অস্তগমন ও প্রাণের উদয় কালে অন্তঃ-কুম্ভকতৎপর হইলেও শোকাদি বিনষ্ট হয়। অপান অপেক্ষাও দূরগামী প্রাণরেচক অবলম্বনে পূর্ব্ববর্ণিত স্বচ্ছ কুম্ভক অভ্যাস করিলে তাপ পাপ থাকে না এবং যে স্থানে প্রাণ অপান লয় প্রাপ্ত হয় সেই স্থান অবলম্বন করিলেও পাপ তাপ নিবারিত হয়। সে স্থান কি? সে স্থান শান্ত আত্মা। অপান প্রাণভক্ষণে উন্মুখ হইলে অন্তরে ও বাহিরে দেশ কালাদির চিন্তা করিবেক, এবং প্রাণ অপান ভক্ষণে উদ্যত হই-লেও দেশ কালাদির বিচার করিবেক। অর্থাৎ উক্ত সন্ধিস্থানদ্বয়ে নিষ্কল নিষ্ক্রিয় চিদাত্মার দর্শন সুসম্পন্ন হইবে সুতরাং, তদ্বলে মনোনাশ প্রভৃতি ফলও সুপ্রাপ্য হইবে[৬৫,৬৬]। উক্ত সন্ধি-অবস্থা প্রাণিমাত্রেরই আছে বটে; পরন্তু তাহা যোগী ব্যতীত অন্যে জ্ঞাত নহে। হে মুনিবর! আপনিও দেখুন, দেখিতে পাইবেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রাণ ও অপান উভয়েই অন্তরে ও বাহিরে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। তন্মধ্যে যে ক্ষণটী প্রাণের অস্ত ও অপানের উদয় বর্জ্জিত, যোগীরা সেই ক্ষণটীকে স্বাভাবিক বাহ্য কুম্ভক ও তৎপদ বলিয়া জানেন (ক্ষণটী তৎপদ নহে, ক্ষণোপলক্ষিত আত্মচৈতন্যই তৎপদ) এবং অনভ্যসিদ্ধ অন্তঃস্থ কুম্ভককেও পরম পদ বলিয়া জানেন[৬৭,৬৯]। কেননা, উক্ত সন্ধিস্থলে আত্মার আত্মা (আত্মার আত্মা অর্থাৎ জীবের সার পরমাত্মা) স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, কোনরূপ দোষের আবরণে আবৃত হন না। উক্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যাবস্থা স্থায়ী হইলে ও তাহা বিদিত হইলে শোকমোহাদি কিছুই থাকে না[৭০]। যেমন পুষ্পের অন্তরে সুগন্ধ তেমনি প্রাণের অন্তরে আত্মা। তাহা প্রাণও নহে, অপানও নহে, কিন্তু চিৎ বা চৈতন্যমাত্র এবং তাহাই যোগীর প্রাপ্য, উপাস্য ও বিজ্ঞেয়[৭১]। যেমন জলের অভ্যন্তরে স্বাদ তেমনি প্রাণাপানের অভ্যন্তরে আত্মা। তাহা প্রাণ ও

অপান উভয়ের অতিরিক্ত ও চেতনামাত্র এবং তাহাই যোগীর অবশ্য জ্ঞেয় বা উপাস্য[৬২]। প্রাণ লয়ের ও অপান ক্ষয়ের প্রান্তে যে চিদাত্মার প্রকাশ প্রতীয়মান হয় আমরা সেই চিদাত্মার উপাসনা করি[৬৩]। যে চিদাত্মা প্রাণের প্রাণ, জীবের জীবন, দেহ ধারণের ধূর্য্য, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাস্য (স্বাত্ম—অভেদে চিন্তনীয়)। যে চিদাত্মা মনের মন, বুদ্ধির বোধক, অহঙ্কারের অহঙ্কার, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাস্য[৬৪.৬৫]। এ সমুদায় যাহাতে, যাহা হইতে ও যাহা, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাসনীয়[৬৬.৬৭]। বস্তুতঃ যাহাতে অপানের উদয় ও প্রাণের ক্ষয় সম্ভাবিত হয় না, যাহা নাসাগ্রবর্ত্তী দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত আকাশে প্রাণাপানের প্রবাহ সন্ধিতে মাত্র উপলক্ষিত হয়, আমরা সেই চিত্তত্ত্বের ধ্যান করি[৬৮]। যাহাতে প্রাণের অস্ত ও অপানের উদয় বাস্তব বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের উপাস্য[৬৯]। বাহিরে ও অভ্যন্তরে প্রাণাপানের উদ্ভব স্থান বলিয়া বিবেচ্য সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের ধ্যেয়[৭০]। যাহা শক্তির শক্তি ও প্রাণাপানরূপ রথে আরূঢ়, সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের উপাস্য[৭১]। যাহা হৃদিস্থ প্রাণের কুম্ভকের, বহিঃস্থ অপানের কুম্ভকের ও পূরকের উপলক্ষিত; সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের উপাস্য[৭২]। যাহা প্রাণাপান প্রবাহের নিমিত্তকারণ ও সত্তাবোধস্বরূপ, সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের উপাস্য। যাহা প্রাণচিন্তার উদ্দেশ্য, ফল বা প্রাপ্য, আমরা সেই চিত্তত্ত্বের উপাসনা করি। যাহা প্রাণবায়ুর স্পন্দশক্তির হেতু, কারণসমূহের কারণ ও সমুদায় আনন্দের উৎস, আমরা সেই চিত্তত্ত্বের উপাসনা করি[৭৩.৭৪]।

যাহা সর্ব্বপ্রকার কল্পনাকলঙ্কের অতীত অথচ কল্পনা গণের দ্বারা লক্ষণীয় এবং সম্যক্ অনুভব যাহার বিভূতি, সেই দেবনমস্য শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের প্রতি আমরা প্রপন্ন হইয়া রহিয়াছি[৭৫]।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রাণোপাসনা করিয়া ক্রমে এই চিত্তবিশ্রান্তি ও নির্ম্মল আত্মবিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি[১]। হে মহামুনে! আমি নির্ম্মল আত্মতত্ত্বে সদা স্থিত থাকি, এক নিমেষের জন্য বিচলিত হই না। এই সুমেরু বিচলিত হয়, তথাপি আমি বিচলিত হই না[২]। আমার আত্মসমাধি স্থিতি গতি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, কোনও অবস্থায় লুপ্ত হয় না। এই নিত্যানিত্যময় ও অতিলোল (চপল) জগতে আমি আপনা আপনি আত্মকামে অবস্থান করি ও আমার মনোবৃত্তি অন্তর্ম্মুখী বৈ বহির্ম্মুখী হয় না। প্রলয় বায়ু বহমান হউক, আর প্রলয় জলে বিশ্ব বিধ্বস্ত হউক, কিছুতেই আমার স্বসমাধি বিনষ্ট হয় না[৩।৪]। হে মহাতপস্বিন্! আমি প্রাণাপানের অনুসরণ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শোক মোহের পরপারে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছি[৫]। হে ব্রহ্মন্! আমি সাক্ষিদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া ধীরতা সহকারে প্রাণিসমূহের বার বার মজ্জন উন্মজ্জন দেখিতেছি ও মহাপ্রলয় হইতে এতাবৎ কাল জীবিত রহিয়াছি[৭]। আমি অতীত ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করি না, কেবল মাত্র বর্ত্তমান দর্শনে ও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করি[৮]। যখন যেরূপ উপস্থিত হয়, ফলাফল চিন্তা না করিয়া সুষুপ্তসম বুদ্ধিতে স্থিত থাকি[৯]। আমি ভাবাভাবময়ী চিন্তা পরিত্যাগী ও কেবল আত্মনিষ্ঠ হইয়া এই অনাময় ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছি[১০]। বর্ণিত প্রাণাপানের যোগ (অবলম্বন) করতঃ আপন আত্মাতেই পরিতুষ্ট থাকি, তাহাই আমার এই নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের কারণ[১১]। আমি আজ ইহা পাইলাম, কাল আবার পাইব, ইহা সুন্দর তাহা অসুন্দর, এ সকল চিন্তা করি না। তাহা না করাতেই আমি গতোদ্বেগ হইয়াছি ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছি। আমি কোন কিছুর স্তুতি নিন্দা করি না, আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু জানি না, সেই কারণে আমার এতদ্রূপ শুভ লাভ হইয়াছে[১২।১৩]। আমি শুভসমাগমে তুষ্ট হই না, ও অশুভসমাগমে রুষ্ট না

খেদ প্রাপ্ত হই না, আমার মন সদা একরূপে স্থিত থাকে, সেই কারণে আমার এই শুভ লাভ হইয়াছে। আমি যার পর নাই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতেছি, তৎকারণে আমার এই শুভ লাভ হইয়াছে[১৪।১৫]। আমার চাপল্য নাই, শোক নাই, আমার মন সদা স্বস্থ ও সমাহিত থাকে, সেই জন্য আমি নিরাপদ ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি[১৬]। কাষ্ঠ, বিলাসিনী, শৈল, তৃণ, বহ্নি, হিম, আকাশ ও পৃথ্বী, সর্ব্বত্র আমি সাম্য দর্শন করি, তৎকারণে আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি[১৭]। আজ্ আমার কি হইল, কল্যই বা কি হইবে, এরূপ চিন্তাজ্বর আমার নাই, তাহা না থাকাতেই আমি নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি[১৮]। আমি জরা ও মরণ জনিত দুঃখে ভীত নহি, রাজ্যলাভ সুখে হৃষ্ট নহি, সেই কারণে আমি গতব্যথ ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি[১৯]। এ আমার বন্ধু, এ আমার অবন্ধু, এ আমার পর এ আমার আত্মীয়, এরূপ ভেদ বুদ্ধি আমার নাই। তাহা নাই বলিয়া আমি চিরজীবী ও নিরাময় হইয়াছি[২০]। যে হেতু আমি জানি, আমিই সব, আমিই সর্ব্ব বস্তুতে অবভাসমান এবং আমি আদ্যন্তমধ্যবর্জ্জিত অনাময় চিৎ, সেই হেতু আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী[২১]। আহার, বিহার, স্থিতি, গতি, উত্থান, উপবেশন ও শ্বাস, উচ্ছাস ও শয়ন, কোনও সময়ে আমি আমাকে সদেহ বা দেহী বলিয়া জানি না। যে হেতু আমি ঐরূপ জানি না, সেই হেতু আমি চিরজীবী[২২]। আমি সাংসারিক আড়ম্বরে সুষুপ্তের ন্যায় স্থিত নহি ও এ সকলকে অসৎ অর্থাৎ নাই বলিয়া জানি। উক্ত প্রকারে থাকি ও জানি বলিয়াই আমি দীর্ঘজীবী হইয়াছি[২৩]। প্রারব্ধ অনুসারে যখন যে ভোগ উপস্থিত হউক না কেন, সে সকলকে আমি সমভাবে স্বীকার করি এবং তাহাও আমার চিরজীবিতার কারণ[২৪]। আমি সকল ভূতে সমদর্শী ও অকুটিল বলিয়া চিরজীবী হইয়াছি। এই আপাদ মস্তক দেহের কুত্রাপি আমার মমতা নাই এবং আমার কোনও অঙ্গ অহঙ্কার পঙ্কে লিপ্ত নহে। সেই কারণে আমি অনাময় ও চিরজীবী হইয়াছি[২৫।২৬]। আমি পান ভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিলেও আমার মন সে সকলে অভিমানী হয় না। সে জন্যও আমি অনাময় দীর্ঘজীবী। হে মুনিবর! আমি যখন যাহা জানি, আমার তাহাতে ঔদ্ধত্য হয় না। তাহা না হওয়াতেও আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী[২৭।২৮]।

আমি পারকতা সত্ত্বেও আক্রম করি না, দরিদ্রতা সত্ত্বেও কিছু বাঞ্ছা করি না, সে জন্যও আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী[২৯]। এই শরীরে ও সর্ব্বভূতে আমি চিন্মাত্রদর্শী, ও পরশরীরকে আমি স্বশরীরের ন্যায় দেখি, তথা আশাপাশ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত থাকি, জগৎকে অসত্য ও আত্মাকে সত্য বলিয়া জানি, বাহ্যদৃষ্টিবিষয়ে সুপ্ত ও আত্ম-বিষয়ে সদা প্রবুদ্ধ থাকি, এই সকল কারণে আমি চিরজীবী[৩০।৩২]। জীর্ণ হউক, শ্লথ হউক, ক্ষয় প্রাপ্ত হউক, বা বিচূর্ণিত হউক, সমুদায়কে আমি তত্ত্ব দৃষ্টির দ্বারা নূতনবৎ দেখিয়া থাকি। সুখী মানব দেখিলে সুখানুভব করি, দুঃখী দেখিলে তদ্দুঃখে দুঃখী হই, তথা সকলকেই আমি প্রিয় ও মিত্র বিবেচনা করি, এই সকল কারণেও আমি নিরাময় ও দীর্ঘজীবী[৩৩।৩৪]। আমার বুদ্ধি আপদ কালেও বিচলিত হয় না, সম্পদেও উচ্ছ্বন হয় না, ভাব হউক, অভাব হউক, কোনও বিষয়ে আমার উদ্বেগ জন্মে না, ইহাতেও আমার দীর্ঘজীবন ও অনাময়তা উৎপন্ন হইয়াছে[৩৫]। আমি আমি নহি, আমারও কিছু নহে, ইত্যাকারে আমার চিত্ত সংস্কৃত হওয়ায় আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী[৩৬]। এই জগৎ, এই ব্যোম, এই দেশ, এই কাল ও দিক্ সমূহ, এ সমস্তই আমি, এই নিশ্চয়ের দ্বারা আমার জীবন দীর্ঘ ও স্থায়ী হইয়াছে[৩৭]। আমি ভাবি—ঘট, পট, শকট, দেশ ও আকাশ প্রভৃতি সমস্তই আমি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই ভুশুণ্ড কাক মৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার দীর্ঘজীবনের বিষয় এই সকল কথা বলিল, অবশেষে বলিল, হে মুনিবর! আমি ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রের ত্রিজগৎরূপ তরঙ্গ ভেদ করিয়া অধুনা সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপে স্থিতি করিতেছি[৩৮।৪০]।

ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

—০()*()০—

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে জ্ঞানপারগ হে ব্রহ্মন্! আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন বলিয়া আমি আপনাকে আমার স্থিতি প্রকার বর্ণন করিলাম, ইহাতে যদি আমার কোনরূপ ধৃষ্টতা হইয়া থাকে ত তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অহো! আপনি বৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের কারণ ও শ্রবণ তৃপ্তিকর স্ববৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলেন। ধন্য তাহারা, যাহারা ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘজীবী আপনার দর্শন লাভ করিয়াছে। আজ্ আমি আমাকে ধন্য মনে করিতেছি। কেননা, আপনি যাহা বলিলেন, আর আমি যাহা শুনিলাম, সে সমস্তই অত্যন্ত বুদ্ধিশুদ্ধিকর। আমি নানা দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণ করিয়াছি, নানা বিচিত্র বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছি, নানা মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছি, কিন্তু আপনার ন্যায় মহাত্মা এ জগতে আর দেখি নাই। এই জগতে ভবত্তুল্য মহাপুরুষের দর্শন সুলভ নহে, কদাচিৎ কচিৎ ভবত্তুল্য মহাত্মার দর্শন লব্ধ হইয়া থাকে। সকল বাঁশে মুক্তা পাওয়া যায় না, দৈবাৎ কোন কোন বাঁশে মুক্তা পাওয়া যায়। সেইরূপ, এই জগতে আপনার ন্যায় মহাপুরুষ কদাচিৎ কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যাহাই হউক, আমি যে আজ্ আপনাকে দেখিলাম, ইহাতে আমার একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি এখন আপনার নীড়ে প্রবিষ্ট হউন, আমি এখন যথাভীষ্ট স্থানে গমন করি।

ভুশুণ্ড মদীয় বাক্য শ্রবণে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া আমার সপর্য্যা নির্ব্বাহ করিলেন ও কিয়দ্দূর মদীয় গমনের অনুগমন করিলেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে উচিত সম্ভাষণের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গগন মার্গে পক্ষীন্দ্রের ন্যায় সুরপুরোদ্দেশে আগমন করিতে লাগিলাম। পরে আমি সপ্তর্ষিমণ্ডলে আগমন করিয়া মদীয় জায়া অরুন্ধতী কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইলাম। হে রামচন্দ্র! সত্য যুগের প্রথমে আমি এইরূপে ভুশুণ্ডের সহিত সংগত হইয়াছিলাম। সে যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন

ত্রেতা যুগ চলিতেছে[৭।১৮]। এই ত্রেতার মধ্যভাগে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আজ্ অষ্ট বর্ষ সমাপ্ত হইল, পুনর্ব্বার আমি সেই ভুশুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। অর্থাৎ সম্প্রতিও আমি ভুশুণ্ডকে দেখিতে গিয়া ছিলাম। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, ভুশুণ্ড সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে ঠিক্ সেই রূপেই স্থিত রহিয়াছে[১৯]। হে রামচন্দ্র! অতি আশ্চর্য্য ভুশুণ্ড-বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তুমি মদুক্ত ভুশুণ্ডবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য বিচার কর[২০]।

বাল্মিকি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই ভুশুণ্ডের সৎকথা বিচার করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভয়াবহ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে[২১]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—০•()•০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! আমি তোমার নিকট আদ্যোপান্ত ভুশুণ্ড বৃত্তান্ত বলিলাম। ভুশুণ্ড অভিহিত প্রকার প্রজ্ঞার দ্বারা অতি-দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন[১]। হে মহাবাহু রাম! তুমিও ভুশুণ্ডের ন্যায় প্রাণচিন্তা ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হও[২]। ভুশুণ্ড যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর ও যোগাভ্যাসরত হইয়া তৎপদ প্রাপ্ত হই-য়াছে তুমিও উক্তরূপে তৎপদ প্রাপ্ত হও[৩]। ভুশুণ্ডের ন্যায় অনা-সক্ত ও প্রাণাপানতত্ত্বদর্শী হইতে পারিলে অনায়াসে ভবসঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভুশুণ্ডের এই বিচিত্র বিজ্ঞানদৃষ্টি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তুমি যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিবে[৪।৫]।

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে সূর্য্যস্বরূপ হইয়া জ্ঞানরশ্মি বিস্তার করিলেন, ইহাতে আমার হৃদয়ান্ধকার সম্পূর্ণরূপে উন্মার্জ্জিত হইয়াছে[৬]। আমরা প্রবুদ্ধ, প্রহৃষ্ট ও আপন আস্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা জ্ঞাতব্য তাহা জানিয়াছি এবং ভুশুণ্ডচরিত শ্রবণে শান্ত পদে স্থিত হইয়াছি[৭]। আপনি ভুশুণ্ড চরিত বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই

মাংসাস্থিচর্ম্মবিনির্ম্মিত শরীর আমাদের গৃহ। এই বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য —এ গৃহ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই শরীররূপ গৃহ কাহার নির্ম্মিত, কেন নির্ম্মিত, এবং কে ইহাতে স্থিতি করে, তথা কি প্রকারে ইহার স্থিতি নির্ব্বাহিত হইতেছে[৮।১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অবহিত হও, তাহাও বলিতেছি। পরমার্থ বোধের উদয় ও দোষের অপাকরণ জন্য আমি তোমাকে যাহা বলি, তাহা তুমি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবে[১১]। অস্থিনির্ম্মিত খুঁটী, রক্ত মাংসে প্রলিপ্ত ও নবদ্বার বিশিষ্ট এই দেহ গৃহকে কেহ নির্ম্মাণ করে নাই[১২]। ইহা কেবল মাত্র আভাস অর্থাৎ বুদ্ধিবিভ্রম। ইহা দ্বিচন্দ্রের অনুরূপ। ইহাকে সৎও বলা যায়, অসৎও বলা যায়। যেমন চন্দ্র এক হইলেও ভ্রমের মহিমায় দুই চন্দ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, দেহী ও দেহ এই প্রতীতিকেও তুমি সেইরূপ জানিবে[১৩।১৪]। প্রতীয়মান কালেই দেহের অস্তিতা, পরন্তু অপ্রতীতি কালে ইহার অনস্তিতা। সুতরাং অর্থাৎ সেই জন্য ইহাকে সৎ ও অসৎ উভয়রূপী বলা যায়[১৫]। যেমন স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শন, অন্য কালে সে দর্শন বিলুপ্ত, সেইরূপ, দেহপ্রত্যয়কালে ইহার স্থিতি, অন্য কালে ইহার অস্থিতি অবধারিত। বুদ্বুদপ্রত্যয় কালেই বুদ্বুদ, অন্য কালে তাহা জলই, অন্য কিছু নহে। অতএব, এখন এই দেহ অবভাসিত হইলেও অন্য কালে ইহার মিথ্যাত্ব অবধারিত হয় [১৩।১৮]। অহং আমি, এই যে এক আকস্মিক জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতেই এই মাংসাস্থিময় পদার্থের বিভ্রম প্রকটিত হইয়াছে[১৯]। অতএব, হে রঘুনাথ! তুমি দেহে দেহবুদ্ধি পরিত্যাগী হও। কেননা দেহের সঙ্কল্পই দেহাকারে রচিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নে দেহের রচনা। স্বপ্নকালে যে ব্যাঘ্রাদিদেহ প্রতীত হয়, সে দেহ যেমন কেবল মাত্র সঙ্কল্পরচিত, সেইরূপ, এই জাগ্রদ্দেহও স্বসঙ্কল্পরচিত[১৯।২০]। হে রাম! তুমি স্বপ্নকালে যে দেহে পরিভ্রমণ কর, মনোরাজ্য কালে যে দেহে অবস্থান কর, তোমার সে দেহ কোথায় অবস্থিত ও কাহার কৃত তাহা ভাবিয়া দেখ। ঐ সকল দেহেও তুমি স্বর্গে ও সুমেরুতটে পরিভ্রমণ করিয়া থাক। হে মহাবাহু রাম! স্বপ্ন ও মনোরাজ্য গত হইলে সে দেহ থাকে কি? তাহা থাকে না। সেইরূপ, দেহবিভ্রম গত হইলেও এ দেহ থাকে না। তুমি যে তোমার অনুরাগিণী সঙ্কল্পকান্তার সহিত বিহার করিয়া সুখী

হও, সে কান্তা কি বস্তুতঃ সদেহ? তাহা নহে। হে রাম! ঐ সকল দেহ যেমন কেবল মনোময় এবং এক ভাবে সে সকল দেহ আছে ও অন্যভাবে সে সকল নাই, সেইরূপ এই ব্যবহ্রিয়মান দেহকেও তুমি ঐরূপ মনোময় ভাবিবে ও ব্যবহার কালে আছে ও ব্যবহারাতীত কালে নাই, এইরূপ স্থির করিবে[২১।২৩]। স্বপ্ন কালের দেহাদি যেরূপ, এই বিদ্যমান দেহও সেইরূপ। ইহা ধন, ইহা দেহ, ইহা দেশ, এ সমস্তই ভ্রম, বাস্তব নহে[২৭]। ঐ সমস্তই চিত্তের মহিমা ও সঙ্কল্পের বিস্তৃতি। ঐ সকলকে তুমি হয় দীর্ঘস্বপ্ন, না হয় দীর্ঘ বিভ্রম, অথবা একটা দীর্ঘ মনোরাজ্য বলিয়া জানিবে। সংসারের স্বপ্নাদিতুল্যতা তুমি সেই দিন বুঝিতে পারিবে যে দিন তুমি পরমাত্মার কৃপায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে[২৮।২৯]। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে সমস্তই দেখা যায় তেমনি প্রবোধ অর্থাৎ তত্ত্ববোধের উদয়েও এ সমুদয়ের স্বপ্নতুল্যতা অনুভূত হয়। ইতি-পূর্ব্বে আমি তোমাকে কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি কথা বলিয়াছি, তাহাও মনস্তত্ত্বের মহিমা ও প্রভাব। মনঃই বিচিত্র রচনার বীজ, তথা মনঃই ভ্রান্তিময়। সুতরাং এ সংসার তাহারই সঙ্কল্প, অন্য কিছু নহে। ব্রহ্মাও মনঃকল্পিত ও চিদাভাস, অন্য কিছু নহে[৩০।৩৩]। হে রামচন্দ্র! চিরাভ্যাসজনিত সুদৃঢ় সংস্কার দ্বারাই চিত্ত আপনার দেহ দর্শন করে, সুতরাং দেহকে তুমি বাসনাময় বলিয়া জানিবে। অতএব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার ও সঙ্কল্পের প্রবাহ স্থগিত করিবার জন্য কঠোরতর তপস্যার প্রয়োজন অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদি অবলম্বন আবশ্যক। সেই এই, সেই আমি, এই আমি, ইহা সংসার, এ সকল ভাবনা দৃঢ় হইলে এ সকল সত্যবৎ প্রতীয়মান হইবে এবং এ সকল মিথ্যা এতদ্রূপিণী ভাবনা দৃঢ়া হইলে তখন আর এ সকলের সত্যতা প্রতীতি হইবে না। মন অতি তীব্রপ্রযত্নে যাহা ভাবনা করে, ভাবনার পরে তাহাই প্রতীয়মান হয়[৩৪।৩৭]।

হে রামচন্দ্র! দিবসে যাহা অত্যভ্যস্ত হয়, রাত্রে তাহাই স্বপ্নযোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়, অত্যভ্যস্ত সঙ্কল্পের প্রভাবে এই সংসার দৃষ্ট হইতেছে। তাপতপ্ত আকাশে জলপ্রবাহ দৃষ্ট হয়, অথচ আকাশে তাহা নাই। সেইরূপ এই পৃথিবী না থাকিলেও সঙ্কল্পের প্রভাবে দৃষ্ট হইতেছে[৩৮।৪০]। দৃষ্টির দোষেই আকাশে পিচ্ছিকা দৃষ্ট হয়, তদ্বৎ জগৎও অজ্ঞান দোষে দৃষ্ট হয়। দৃষ্টি যথাবৎ হইলে

তখন আর আকাশে পিচ্ছিকা দৃষ্ট হয় না, জ্ঞানও অজ্ঞানাবরণ মুক্ত হইলে তখন আর জগৎ দর্শন করে না[৪১।৪২]। ভীরু ব্যক্তি স্বসঙ্কল্পিত বেতালে ভয় প্রাপ্ত হয় বটে, পরন্তু যখন সে জানে, দৃষ্ট বেতাল মিথ্যা, কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন আর তাহার ভয় থাকে না। সেইরূপ, জীব যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জানে, দৃষ্ট সংসার মিথ্যা, তখন সে সংসার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে রাঘব! এই সমস্ত প্রতিভাস আপনাতেই প্রকাশিত, অন্যত্র নহে[৪৩।৪৪]। হে রঘুনাথ! এ সমুদায়ই যখন আপনারই প্রতিভাস (ভ্রান্তি), তখন আর কে কি দেখিয়া ভীত হইবে? অতএব, যাহার যে মালিন্যে ভয়, মিথ্যা ভয়, তাহার সেই মালিন্য অবশ্য শোধনীয়। সে শুদ্ধ হইলে তখম আর এরূপ পার্থক্য ও এরূপ বিচিত্রতা দৃষ্ট হইবে না। এ জগৎও তখন মোহের মহিমা বলিয়া অবধারিত হইবে। শুদ্ধি কি? সম্যক্ দর্শনই শুদ্ধি, আত্মার পক্ষে তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ শুদ্ধি নাই। তাম্রই মলিন হয়, কাঞ্চন কখন মলিন হয় না। অথবা কাঞ্চন তাম্র বলিয়া জানা পর্য্যন্ত তাম্র থাকে, কাঞ্চন বলিয়া জানিলে আর তাহা তাম্র থাকে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এ জগৎ নাই, এ সমস্ত ভ্রমের বিলাস, এইরূপ জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হয়, সেই নিরাসই সম্যক্ দর্শন নামে প্রসিদ্ধ[৪৫।৪৭]। জীবন, মরণ, স্বর্গ, নরক, জ্ঞান, অজ্ঞান, কিছুই চিদ্‌ব্যতিরিক্ত নহে, সমস্তই চিৎ, ইত্যাকারের ঐক্য দর্শনকেই আমরা সম্যক্ দর্শন বলি। এই তুমি, এই আমি, এই দিক্, ইত্যাদিবিধ ভেদ ভাবই সংসার, অথচ ঐ সকল বাস্তবতঃ আমাতে নাই। সুতরাং সমস্ত আমার আভাস অর্থাৎ ভ্রান্তি। এইরূপ নিশ্চয়কে আমরা সম্যক্ দর্শন বলি[৪৮।৫০]। এই সংসার আপাত দর্শনে আছে, আবার বিচার দর্শনে নাই। সুতরাং ইহা সদসন্ময়। পরন্তু বিচার দর্শনে ইহাই স্থির হয় যে, ইহার উদয়ও নাই, অস্তও নাই। মিথ্যা বস্তুর আবার উদয় অস্ত কি? যখন ঐরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মে তখন মনঃও অমন হইয়া যায়। মন তখন ঐ নির্ণয়ের দ্বারা কামনা ত্যাগ করে, ও পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ মনস্বী তখন কোন কিছুর নিন্দা করেন না, কোন কিছুর প্রশংসাও করেন না, কোন কিছুর জন্য হৃষ্টও হন না, শোকও করেন না[৫১।৫২]। সম্যক্ দর্শনের বলে মন শীতল হয়,

সত্যাবলম্বী হয়, ও বন্ধু বিয়োগেও দুঃখী হয় না। তখন সে ভাবে, অবশ্য মর্ত্তব্য জীব মরিবে তজ্জন্য আবার শোক কি? জন্মিলেই যখন কিছু না কিছু বিভব প্রাপ্ত হয় তখন বিভব প্রাপ্তিতে হর্ষ কেন? যাহারা এই সংসারে ব্যবহার দশায় থাকে, তাহাদের সকলেরই ঐ দশা অপরিহার্য্য, তজ্জন্য শোক কেন? অর্থও যায়, অনর্থও আইসে, তজ্জন্য শোক করা বৃথা। সমুদ্রে বুদ্‌বুদ উঠিতেছে যাইতেছে আবার হইতেছে। এই জগজ্জাল ঠিক্ তদ্রূপ। যাহা সৎ তাহা সদা কালই সৎ, যাহা অসৎ তাহাও সদাকাল অসৎ অর্থাৎ নাই। ইহাতে ক্রিয়ার বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছু নাই এবং খেদের বিষয়ও কিছু নাই। আমি আমি নহি, আমি হই-ও নাই ও হইবও না এবং বর্ত্তমানেও নহি। তবে আবার পরিদেবনা কি? যদিও আমি দেহ হইতে অন্য অর্থাৎ পৃথক্, তথাপি, চিদাভাস (চিৎপ্রতিবিম্ব) হইতে অপৃথক্। চিৎ ও চিদাভাস এ দুএর আবার ভেদ কি? চন্দ্র ও চন্দ্রাভাস, এ দুএর কি বাস্তব ভেদ আছে? যে মননশীল এইরূপ সম্যক্ জ্ঞানে নিশ্চয়বান্, তাহার উদয় অস্ত তাপ পরিতাপ, কিছুই থাকে না[৩০।৩১]। সেই অত্যুত্তম পদে স্থিত মহাপুরুষের নিকট আত্ম-পর প্রভেদ থাকে না, সুতরাং কোনরূপ অশান্তি বা জালা যন্ত্রণাও তাহার থাকে না[৩২]। তিত্তিরি পক্ষী অতি কোমল তৃণাগ্র গ্রহণ করে, কর্কশাংশ গ্রহণ করে না। জ্ঞানী পুরুষেরাও এই সংসারের সদংশ গ্রহণ করেন, অসদংশে আস্থা বিহীন হন[৩৩]। আস্থাই বন্ধনের রজ্জু, আস্থার দ্বারাই জীব বদ্ধ হয়। সে জন্য বুদ্ধিমান্ লোক আস্থাপরিত্যাগী হন। হে অনঘ! ব্যক্তি মাত্রের আস্থা বা আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেক, যাহা অকর্ত্তব্য তাহা উপেক্ষা করিবেক। যাঁহারা মহাবুদ্ধিধর, তাঁহারা আস্থা অনাস্থা উভয় ত্যাগী হইয়া লীলার ন্যায় ব্যবহারে রত থাকেন। যাহার জ্ঞানে এ সকল আভাস-কণা বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার অন্তর সদা শীতল। হে অনঘ! তুমিও আস্থা অনাস্থা উভয়াতীত হইয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, এই সকল পদার্থ আভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে অর্থাৎ কোনরূপ সত্যদৃশ্য নহে। হে রাম! এই দৃশ্যবৃন্দ কেবল মাত্র আভাস ও চিত্তের কলঙ্ক। অতএব, তুমি এই সমস্ত আভাসের অতীত হও[৩৪।৩৯]। আভাস পরিত্যক্ত হইলে তুমি একান্ত নির্ম্মল হইবে।

আমি, আমার ভোগ, এ সকল অসত্য, এইরূপে পরিভাবিত হইলে তুমি সর্ব্ববর্জ্জিত, সর্ব্বগ ও নিত্য চিদাকাশময় হইবে[৭০]। এই যে আড়ম্বর, এ আড়ম্বর ব্যর্থ। কেবল ব্যর্থ নহে, পরন্তু অনর্থের মূল। চিদাত্মায় এ সকল নাই অথবা চিদাত্মাই সব, এই দ্বিবিধ ধ্যানই সিদ্ধিপ্রদ[৭১।৭২]। হে রামচন্দ্র! উক্ত উভয় পথের যে পথ হয় এক পথ আশ্রয় কর। অথবা উক্ত উভয় পথই অবলম্বন কর[৭৩]। রাগ ও দ্বেষ এই দুইটী যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা কর। ইহ লোকে, পর লোকে, আকাশে ও স্বর্গে যে কিছু আছে; সে সমস্তই রাগদ্বেষ ক্ষয় হইলে পাওয়া যায়। রাগদ্বেষবর্জ্জিত চেষ্টার দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, মূঢ়েরা রাগদ্বেষ প্রেরিত চেষ্টায় তাহা পায় না। যেমন দগ্ধারণ্যে হরিণ থাকে না, তেমনি, রাগদ্বেষাবরুদ্ধ চিত্তে সদ্‌গুণ থাকে না। মনোরূপ গর্ত্তে রাগ ও দ্বেষ এতন্নামধেয় দুইটী মহাসর্প যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার কিছুই অলভ্য থাকে না। যাহারা প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও রাগদ্বেষময়, তাঁহারা মানবাকৃতি জম্বুক, ধিক্ তাহাদিগকে ধিক্! অন্যে আমার ধন লইল, আমি প্রাপ্তিযোগ্য অন্যের ধন ত্যাগ করিলাম, এইরূপ এইরূপ ব্যবহারই রাগের ও দ্বেষের ক্রম অর্থাৎ ক্রিয়া বলিয়া জানিবে। ধন, বন্ধু ও মিত্র পুনঃ পুনঃ আইসে ও যায়, তজ্জন্য বিজ্ঞ নর তাহাতে রক্ত বা বিরক্ত হইবে কেন? এই যে ভাবাভাবময়ী সাংসারিকী লীলা, এই লীলাকেই আমরা পারমেশ্বরী মায়া বলি। ইহাতে ব্যাসক্ত হইলে ইহা অধঃপাতিত করিবে[৭০।৮০]। ধন, জন, মন, এ সকল সত্য নহে, প্রত্যুত অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা। কোন কিছু আগে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ কাল আছে বিচারে তাহা বর্ত্তমানেও নাই। অর্থাৎ আদ্যন্তের দৃষ্টান্তে ভাবিতে হইবে, তাহা মধ্যেও নাই[৮২।৮৩]। কোন্ প্রাজ্ঞ কল্পিত আকাশ বৃক্ষে অনুরক্ত হয়? যেমন এক ব্যক্তি আকাশে শরীর কল্পনা করে, অন্য ব্যক্তি তাহা ভোগ করে, এই সংসার রচনাকে তুমি সেইরূপ জানিবে। এ সকল ভ্রমদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের অনুরূপে রচিত, সুতরাং ইহার উত্থানও অসৎ। এই সংসার এক প্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন, জীব ইহাতে সংভ্রান্ত। এই অজ্ঞানময় গাঢ় নিদ্রা তুমি পরিত্যাগ কর[৮০।৮৯]। প্রবুদ্ধ হও, হইয়া দেখ, আত্মা নির্ব্বিকল্প চেতন[৯০]। প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ

হও, এ কথা আমি বার বার বলিতেছি। হে মহাবাহু রাম! তুমি প্রবুদ্ধ হও, হইয়া অনাময় আত্মসূর্য্যকে দেখ[১১]। আমি যে এই অতি শীতল জ্ঞানবারি বর্ষণ করিতেছি, ইহাতেই তোমার অজ্ঞান নিদ্রা বিনষ্ট হইবে। আর বিলম্ব করিও না, অদ্যই তুমি প্রবুদ্ধ হও, হইয়া এই জগৎ ভ্রম পরিত্যাগ কর[১২।১৩]। পরে দেখিবে, তোমার জন্ম নাই, মরণ নাই, দুঃখ নাই; দোষ নাই, ভ্রমও নাই। তুমি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প বা কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি স্থিতি লাভ কর[১৪]।

হে মহাত্মা রাম! তুমি বিকল্পরূপ দোষ সমূহে লিপ্ত নহ। তোমার দৃষ্টিও সুষুপ্তের ন্যায় স্থির অর্থাৎ নির্ব্বিক্ষেপ। সুতরাং তুমি অতি বিস্তৃত নিত্যাপরোক্ষরূপী পরব্রহ্ম। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি সেই আপন শান্ত আত্মায় সমাহিত হও[১৫]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ সর্গ।

——(*)——

বাল্মীকি বলিলেন, স্বস্থ ও সমচিত্ত রাম ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ ঐরূপ ঐরূপ বশিষ্ঠ বাক্য শুনিতে শুনিতে স্বাত্মানন্দসমাধি প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠও কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত বাক্‌বিন্যাসে বিরত হইলেন। মুহূর্ত্তার্দ্ধ পরে রাম ও সভাসদগণ ব্যুত্থান অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তথা বশিষ্ঠও পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১।৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সম্যক্ জ্ঞান তাহাই তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ ও স্বাত্মলাভ করিয়াছ। তুমি এইরূপ স্বাত্মাবলম্বী হইয়া কাল হরণ কর, অতঃপর আর সংসারে সমাসক্ত হইও না। সংসার একটী চক্র, এ চক্রের নাভি সঙ্কল্প[৪।৫]। হে রঘুনন্দন! যদি উক্ত নাভি নিরুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সংসার চক্রের ভ্রমণ স্থগিত হয়, নচেৎ

হয় না। মনোরূপ নাভির নিরোধ ব্যতীত বলপূর্ব্বক সংসার চক্রের ঘূর্ণন রহিত করা যায় না। তাই বলিতেছি, যৎপরোনাস্তি শাস্ত্রীয় পুরুষকার, উত্তমা প্রজ্ঞা ও সদ্‌যুক্তি অবলম্বন করিয়া সংসার চক্রের নাভি স্বরূপ চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবেক। যথাবৎ ও যথাযোগ্য পুরুষকারের অলভ্য কিছু নাই। সুতরাং দৈবমাত্র পরায়ণ না হইয়া পৌরুষ পরায়ণ হওয়া বিধেয়[৬।৯]। যে চিত্ত আদিজীব ব্রহ্মা হইতে প্রবৃত্ত, আগে সে চিত্তকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য[১০]। হে অনঘ! যাহা নাই তাহাই সতের ন্যায় অর্থাৎ আছে বলিয়া ভাসমান হইতেছে। যে কোন আকৃতি, সমস্তই-অজ্ঞাননামধেয় ভ্রমের বিস্তৃতি[১১]। এই যে দেহ সমুদায়, এ সমস্তই সঙ্কল্পসমুথ। সুতরাং এই এক দেহের বিনাশে সংসার চক্রের নিরোধ সিদ্ধ হয় না। কেননা, সঙ্কল্প পুনর্ব্বার দেহান্তর সৃজন করিবে[১২]। হে রামচন্দ্র! বুদ্ধিমান্ নর সুখ দুঃখের বিচার করেন না। বরং চিত্রস্থ নর ভাল, তথাপি, দুঃখম্লান জীবৎ নর ভাল নহে। চিত্রিত দেহে আধি ব্যাধি নাই, কিন্তু এ দেহে তাহা আছে। আধার পট বিনষ্ট না হইলে চিত্র দেহের বিনাশ হয় না, কিন্তু মাংসময় দেহ অতি অল্প কারণে বিনষ্ট হয়। যত্নে চিত্র মানবের শোভা দীর্ঘকালস্থায়ী করা যায় কিন্তু মাংসদেহ যত্ন সত্ত্বেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব, বরং চিত্রদেহ ভাল, তথাপি এই সঙ্কল্পসমুথ মাংসদেহ ভাল নহে[১৩।১৭]। চিত্র দেহে যে সকল গুণ আছে, সে সকল গুণ এই সঙ্কল্পদেহে নাই। যদি বল, চিত্রদেহ জড়, তদুত্তরে আমার বক্তব্য, মাংসদেহও জড়[১৮]। হে অনঘ! তাদৃশ দোষদুষ্ট মাংসদেহে আবার আস্থা কি? স্বপ্নদেহ ও সঙ্কল্পদেহ যেরূপ তুচ্ছ, এ দেহও সেইরূপ তুচ্ছ। ইহাতে যে সুখ দুঃখ, তাহাও সঙ্কল্পানুরূপ। অতএব, এই সঙ্কল্পদেহ আছে বলিলেও হয়, নাই বলিলেও হয়। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা আছে, কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা নাই। অজ্ঞানীরাই এই দেহের জন্য ক্লেশভাজন হয়। চিত্রদেহ, সঙ্কল্পদেহ, স্বপ্নদেহ ও মনোরাজ্যের দেহ বিনষ্ট হয় হউক, তাহাতে যেমন ক্ষতি নাই, প্রতিবিম্ব চন্দ্র যায় যাউক, তাহাতে যেমন ক্ষতি নাই, মৃগতৃষ্ণিকা নদী থাকে না, তাহা যেমন ইষ্টানিষ্টের অতীত, সেইরূপ, এই মাংস দেহের বিনাশও ইষ্টানিষ্টের অতীত[১৯।২০]। এই শরীর একটী চন্দ্র, ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হউক, আর ক্ষীণ হউক, তাহাতে আমার

ক্ষতি কি? এই দীর্ঘস্বপ্নময় ও চিত্তসঙ্কল্পকল্পিত দেহ ভূষিত হয় হউক, আর দূষিত হয় হউক, তাহাতে আমার কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্ম কোনও কিছুতে বিকৃত হন না, বিনষ্টও হন না। চক্রই ঘূর্ণিত হয়, চক্রস্থ নর ঘূর্ণিত হয় না। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ আপনার ঘূর্ণন অনুভব করে। মদমোহিত নরও মত্ততা দোষে আপনার ঘূর্ণন অনুভব করে। এইরূপ, দেহস্থ আত্মাও স্বাশ্রিত ও স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের দোষে দেহের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপিত করে[২৬,২৯]। দেহের ভ্রমণে, দেহের পতনে, দেহের বিনাশে ও দেহের জীর্ণতায় আপনাকে মিথ্যায় ব্যবস্থায় ভ্রান্ত, পতিত, হত, ও জীর্ণ হইতেছি বলিয়া ভাবনা করে। অতএব, যৎপরোনাস্তি ধীরতা অবলম্বন করিয়া উক্তবিধ দীর্ঘ ভ্রম পরিত্যাগ করা বিধেয়[৩০,৩১]। সঙ্কল্পের দ্বারা দেহের আবির্ভাব, সঙ্কল্পও মিথ্যা জ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং দেহভাব মিথ্যা। যাহা মিথ্যারচিত তাহার সত্যতার সম্ভাবনা কি[৩২]? যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গের উত্থান হয়, সেইরূপ, এই দেহও স্বাত্ম-অজ্ঞানে উত্থিত হইয়াছে। হে রামচন্দ্র! জড় যাহা করে তাহা প্রকৃত কৃত নহে। করিলেও জড় সে সকলের প্রকৃত কর্ত্তা নহে[৩৩,৩৪]। যে হেতু এই দেহ জড়, সেই হেতু ইহার চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এ কিছু করে না এবং ইহার কর্ত্তাও কেহ নহে। আত্মা ইহার কর্ত্তা নহে, কিন্তু দ্রষ্টা[৩৫]। দীপ যেমন নির্ব্বাত প্রদেশে আপন স্বরূপে স্থিতি করে, এই জগৎস্থিতি বিষয়ে সেইরূপ স্থিতি করা কর্ত্তব্য। ভাস্কর যেমন আপন স্বরূপে স্থিতি করেন, অথচ তৎপ্রভাবে দৈবসিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, হে রাঘব! তুমিও তদ্রূপ আত্মসংস্থ হও, জগৎ স্থিতিও তোমার প্রভাবে নির্ব্বাহিত হউক। এই অসৎ দেহরূপ গৃহ, ইহা বস্তুতঃ শূন্য। ইহার অস্তিত্ব বালককল্পিত বেতালের অনুরূপ। অহঙ্কারনামধেয় কু পিশাচ ইহাতে যে কি প্রকারে আবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না[৩৬,৩৯]। তুমি এই দুর্ম্মতি অহঙ্কারের বশ্য হইও না। হইলে নিরয়গামী হইবে[৪০]। দুরাকৃতি চিত্তবেতাল ইহাতে আপন বিলাসে ক্রীড়া করিতেছে[৪১]। চিত্তরূপ পিশাচ এই শূন্য দেহ-গৃহ প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ করিতেছে। মহান্ ব্যক্তিরা ইহারই ভয়ে সমাধিস্থ হন[৪২]। আপনার এই শরীররূপ মন্দির হইতে যদি চিত্তরূপ পিশাচকে তাড়িত করা যায় তাহা হইলে নির্ভয়ে এই সংসার নামক

শূন্য নগরে বিচরণ করা যায়[৪৩]। চিত্তভূতের আবেশে অভিভূত ব্যক্তিরা যে কি জন্য ইহাকে বিতাড়িত না করে তাহা বলা দুষ্কর। যাহারা এই দেহগৃহে চিত্তভূতের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে তাহাদের বুদ্ধি পিশাচের তুল্য এবং তাহারা মরণানন্তর পুনঃ পিশাচগ্রস্ত হয়, তাহার অন্যথা হয় না[৪৪।৪৫]। হে সাধো! এই পোড়া শরীরে নানা বৃহৎ ভূত বাস করে। তুমি তৎসহ বিচরণের আস্থা পরিত্যাগ করিবে। তুমি অহঙ্কারের অনুচর হইও না। অহঙ্কারকে ভুলিয়া গেলেই তুমি স্বাত্মাবলম্বী হইবে। যাহারা নরক ইচ্ছা করিবে তাহারাই অহঙ্কারের আনুগত্য করিবে। তাহারা এরূপ অন্ধ যে বন্ধু বান্ধব তাহাদের দৃক্‌পথে পতিত হয় না। মানুষ সাহঙ্কার বুদ্ধিতে যাহা কিছু করে সে সমস্তের ফল বিষবল্লীর ফলের তুল্য। বিবেক ও ধৈর্য্য বিহীন হইয়া যাহারা অহঙ্কারের উৎসাহে উৎসাহিত হয়, হইয়া কার্য্য করে, সেই সকল মূর্খকে তুমি হত বলিয়া জানিবে[৪৬।৫০]। হে রাঘব! যাহারা অহঙ্কার পিশাচের বশ্য তাহারা নরকাগ্নির কাষ্ঠ[৫১]। অহঙ্কাররূপ সর্প যাহার কোটরে বাস করে সেই দেহরূপ পাদপ অচিরে বিনষ্ট হয়[৫২]। হে মহান্ পুরুষ! অহঙ্কার এতদ্দেহে থাকুক, অথবা চলিয়া যাউক, তুমি তাহাকে মনের দ্বারাও দেখিবে না। যদি তুমি সর্ব্বদা উহাকে তিরস্কার কর ও তাড়াইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ পিশাচ ক্রমে তোমার বশ্য হইবে, কোন কুক্রিয়া করিবে না[৫৩।৫৪]। এই দেহরূপ গৃহে চিত্তনামক কুপিশাচ নানা বিচিত্র ক্রীড়া করে। করে করুক, তুমি তাহাতে বিস্মিত হইও না। যদি শতবর্ষ চেষ্টা করা যায় তথাপি চিত্তভূতাবিষ্ট ব্যক্তির বিপদের সংখ্যা কল্পনার দ্বারাও গণনা করা যায় না[৫৫।৫৬]। হায়! আমি মরিলাম, হায়! আমি দগ্ধ হইলাম, এ সকল দুঃখবচন অহঙ্কার পিশাচ হইতেই উদ্‌গত হয়[৫৭]। আকাশ সর্ব্বগামী, অথচ তাহার সহিত কোনও কিছুর লিপ্ততা নাই। এইরূপ সর্ব্বগামী আত্মার সহিতও কোন কিছুর লিপ্ততা নাই[৫৮]। এই শরীর যাহা করে, তাহা অহঙ্কারেরই চেষ্টা, শরীরের নহে[৫৯]। আকাশ কোন কিছুর কর্ত্তা নহে, অথচ তাহা বৃক্ষোৎপত্তির হেতু। এইরূপ অকর্ত্তা আত্মাও চিত্তচেষ্টার হেতু। দীপ নিকটে থাকাতেই রূপ জ্ঞানের কারণ হয়, তদ্রূপ, আত্মাও সান্নিধ্যপ্রযুক্ত মনঃস্ফূর্ত্তির কারণ হয়[৬০।৬১]। আত্মা ও চিত্ত

কোনও কালে সংশ্লিষ্ট নহে। আকাশ যেমন পৃথিবীর সহিত নিত্য অসংশ্লিষ্ট সেইরূপ। হে রঘুনাথ! অবোধ লোকেরা চিত্তকেই আত্মা মনে করে, কিন্তু তাহা নহে। আত্মা প্রকাশরূপী ও সর্ব্বত্রাবস্থিত, পরন্তু চিত্ত অপ্রকাশরূপী ও পরিচ্ছিন্ন (ক্ষুদ্র পদার্থ)। চিত্তই অহঙ্কার, তাহা আত্মা নহে। বাস্তবতঃ তুমি আত্মা, অহঙ্কার নহ। এ বিষয়ে যেন তোমার বুদ্ধিমৌঢ্য না হয়[৩২।৩৫]। হে রামচন্দ্র! দেহগৃহে মনোরূপ পিশাচ রহিয়াছে। সেই দুরাত্মাই দেহীকে এ সকল দেখায়। হে রঘুনাথ! তুমি সংসারজনক অমঙ্গলদায়ী ও ধৈর্য্যনাশক মনোরূপ পিশাচকে দূরীভূত করিয়া আপন স্বরূপে স্থিতিমান্ হও[৬৬।৬৭]। বন্ধু বান্ধব গুরু শাস্ত্র, ইহারা কেহই চিত্তভূতাক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে পারে না[৬৮]। যাহার চিত্তবেতাল সংশান্ত হইয়াছে তাহার উদ্ধার সহজ সাধ্য। চিত্ত ভূতের দ্বারাই এই জগন্নাম্নী শূন্যা পুরী দূষিতা হইয়া রহিয়াছে। এই জগৎ এক প্রকার অরণ্য, ইহাতে চিত্ত বেতালের বাস, সেইজন্য ইহা ভয়োৎপত্তির স্থান[৬৯,৭১]। এই জগন্নাম্নী নগরীতে কতিপয় মাত্র দেহগৃহ আছে, যাহাতে চিত্ত ভূতের দৌরাত্ম্য নাই অর্থাৎ কেবল। মাত্র কতিপয় মহাত্মাই চিত্তভূতের দৌরাত্ম্য রহিত। তাঁহারা কদাচ সাহঙ্কার দেহগৃহের সেবা করেন না[৭২]। অবশিষ্ট দেহ সকল চিত্তবেতালাক্রান্ত শ্মশান[৭৩]। যাহারা এই জগদরণ্যে বালকের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। অথবা ধীরতার দ্বারা আপনা আপনি আপনাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। এই জগৎ অন্য এক প্রকার অরণ্য, এই অরণ্যে প্রাণী সকল মৃগের ন্যায় বিচরণ করে, এবং তৃণের লোভে কূপপতিত হয়। হে রাম! তুমি যেন তদনুরূপ পতন প্রাপ্ত হইও না[৭৪।৭৫]। এই পৃথিবীরূপ অরণ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞান হস্তী বিচরণ করে, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য—অজ্ঞান হস্তী বিনাশের জন্য তুমি সিংহবৃত্তি অবলম্বন করিবে[৭৬]। এই জম্বুদ্বীপের জঙ্গলে মূর্খনররূপ অনেক মৃগ বিচরণ করে, পরন্তু তুমি তাহাদের ন্যায় চরমান হইও না। মহিষ যেমন পল্বলস্থ কর্দ্দমে নিমগ্ন হয়, তাহাদের ন্যায় তুমি বন্ধরূপ কর্দ্দমে নিমগ্ন হইও না[৭৭,৭৮]। ভোগ অভোগ দূরীকৃত করিয়া আর্য্যসেবিত পদের অনুসরণ করিবে ও বিচার পূর্ব্বক আত্মাশ্রয়ী হইবে[৭৯]। অতি অপবিত্র তুচ্ছ দুর্ভগ দুরাকৃতি দেহের জন্য সুদারুণ চিন্তাবর্ত্তীতে

নিমগ্ন ও দগ্ধ হইও না[৮০]। আশ্চর্য্য এই যে, এই দেহের রচনা অন্য কর্ত্তৃক হইয়াছে, পরন্তু অন্য এক ভূত ইহাতে অকস্মাৎ আবিষ্ট হইয়াছে। অপিচ, দুঃখ একের, কিন্তু তাহার ভোগ অন্যের। আত্মা প্রস্তরের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে একরূপ ও নির্ব্বিকার, সুতরাং তাহার ভোগ অসম্ভব। তাদৃশ আত্মার যে সর্ব্বসাধারণী সত্তা আছে, তাহারই অধ্যাসে বৃথা দুঃখের প্রসিদ্ধি বা অস্তিতা সম্পন্ন হইতেছে[৮১।৮৪]। এই বিষয়ে আমি অপর এক মোহ নাশন জ্ঞানের কথা বলিব, যাহা পূর্ব্বে কৈলাস শিখরে ভগবান্ চন্দ্রমৌলি আমাকে বলিয়াছিলেন[৮৫]।

উত্তর দিকে কুন্দবৎ সুশুভ্র কৈলাস নামে এক শৈলেন্দ্র আছে। ভগবান্ দেবদেব হর সেই স্থানে বাস করেন[৮৬।৮৭]। পূর্ব্বকালে আমি সেই গিরিবরের গঙ্গা প্রদেশে আশ্রম রচনা পূর্ব্বক দেবদেব মহাদেবের পূজাতৎপর হইয়া বাস করিতেছিলাম, এবং তাপসোচিত আচারে কাল হরণ করিতেছিলাম। আমার চতুর্দ্দিকে সিদ্ধসমূহ বিচরণ করিতেন, এবং আমিও অবসরে অবসরে শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিতাম, দেবদেবের পূজার্থ পুষ্প সংগ্রহ করিতাম, ও মালা গুম্ফন করিতাম। ঐরূপ তপশ্চর্য্যার দ্বারা আমার সেই স্থানে এক সুদীর্ঘ কাল অতিবর্ত্তিত হইল[৮৮।৯১]। একদা শ্রাবণ মাসের অষ্টম দিবস আগত হইলে, তদ্দিবসীয় ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধ গত হইলে, আমার সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন আমি বাহ্য দৃষ্টিতে নিমগ্ন হইলাম। সহসা দেখিলাম, সেই কাননের আমার সম্মুখ প্রদেশে এক অলৌকিক তেজ আবির্ভূত হইয়াছে। সে রূপ বা সে তেজ শত শত সুবৃহৎ শ্বেত মেঘের অথবা সহস্র সহস্র চন্দ্রবিম্বের অনুরূপ। সেই দিক্ ও সেই লতাকুঞ্জ তদীয় প্রতিভাসে আলোকিত হইয়াছে[৯২।৯৫]। আমি বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পরে দেখিলাম, আমার সম্মুখে ভগবান্ শশিশেখর আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি দেবী গৌরীর হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়াছেন ও তাঁহাদের অগ্রে নন্দীশ্বর[৯৬।৯৭]। তদ্দর্শনে আমি দূর হইতে শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম। পরে তাঁহাদের চরণে অর্ঘ্যপ্রদান ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম। তদনন্তর চন্দ্রপ্রভা নাম্নী গৌরী দেবীর সখী আমার প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি প্রেরণ করিবে আমি ভগবতী গৌরী দেবীর ও তদীয়া সখী চন্দ্রপ্রভার যথাযথ পূজা

করিলাম। পুনর্ব্বার আমি পুষ্পচয়োপবিষ্ট লোকসাক্ষী ভগবান্ মহাদেবের পূজা করিলাম ও তদীয় চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম। পরে নানাবিধ স্তুতি নতি করিলাম তথা গৌরী দেবীর সপর্য্যাও সেইরূপে সম্পন্ন করিলাম[৯৮।১০২]। পূজা সমাপ্ত করিয়া আমি সাঞ্জলিপুটে তদীয় সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমাকে অতি শীতল শান্ত বাক্যে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি ত পরম পদে বিশ্রান্ত হইয়াছ? তোমার ত কল্যাণপ্রদ সম্বিদ্ স্থায়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে? তোমার তপস্যা ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে[১০৩।১০৫]? যাহা প্রকৃত প্রাপ্য তাহা ত তুমি পাইয়াছ? তোমার ভয় ত ঐকান্তিকরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে[১০৬]? সেই দেবদেব ঐরূপ বলিলে আমি বলিলাম, হে মহেশ্বর! যাহারা আপনার দর্শন পায় তাহাদের আবার ভয় কোথায়? তাহাদের আবার দুষ্প্রাপ্য কি? অকল্যাণই বা তাহাদের কোথায়? যাহারা আপনার স্মরণজনিত আনন্দে পূর্ণমনা, তাহাদের আবার ভয়াদি কি[১০৭,১০৮]? এই জগৎকোষে এমন দেশ, এমন জনপদ, এমন পর্ব্বত ও এমন নর নাই যাহারা আপনাতে বিনত নহে। আমি জানি, আপনার দর্শন লাভ পূর্ব্বতপোর্জ্জিত বহু পুণ্যের ফল[১০৯।১১০]। আপনি জ্ঞানামৃতের কলশ, ধৈর্য্যজ্যোৎস্নার নিশাকর, মোক্ষ নগরের দ্বার, এবং আপনার অনুসরণ চিন্তামণিস্থানীয়[১১১।১১২]। আপনি সমুদায় আপদের মস্তকে পদাঘাত করেন। হে রামচন্দ্র! আমি ঐরূপ বলিলে ভগবান্ মহেশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন ও মৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি স্থাপিত করিলেন। পরে পুনর্ব্বার আমি যাহা বলিলাম, তাহাও বলি, শ্রবণ কর। বলিলাম, হে ভগবন্! দিক্ সকলকে আমি পরিপূর্ণ দেখিতেছি। পরন্তু আমার এক বিষয়ে এক মহান্ সন্দেহ আছে, তাহার নির্ণয়ার্থ আমার প্রার্থনা—আপনি আমাকে সে নির্ণেয় নির্দ্দেশ বা উপদেশ করিয়া গতোদ্বেগ করুন[১১৩।১১৫]। হে প্রভো! সর্ব্ব পাপের নাশক ও সর্ব্ব কল্যাণের বৃদ্ধিকারক দেবার্চ্চনার বিধান কিরূপ তাহা আমাকে বলুন[১১৬]।

ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ! যদপেক্ষা উত্তম নাই, এরূপ দেবার্চ্চনার কথা আমি তোমাকে বলি, শ্রবণ কর। সে অর্চ্চনা এক বার করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করা যায়[১১৭]। হে দ্বিজ!

দেব কি? তাহা কি তুমি জান? পুণ্ডরীকাক্ষও দেব নহেন, ত্রিলোচনও দেব নহেন, পদ্মযোনি ব্রহ্মাও দেব নহেন, দেবরাজ ইন্দ্রও দেব নহেন, বায়ু অনল চন্দ্র সূর্য্য ব্রাহ্মণ রাজা, ইঁহারা কেহই দেব নহেন। অধিক কি বলিব, তুমিও দেব নহ, আমিও দেব নহি। অহে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ! দেব দেবরূপীও নহেন ও চিত্তরূপীও নহেন[১১৮।১২০]। শোভা বা লক্ষী দেব নহে ও মতিও দেব নহে। দেব কে? দেব অকৃত্রিম ও অনাদি দেবন অর্থাৎ যাহা নিত্য নিরতিশয় সৎ চিৎ আনন্দ, তিনিই দেব অর্থাৎ প্রকৃত দেব পদের বাচ্য। ঐ লক্ষণ আকারাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থে সম্ভব হয় না। পণ্ডিতেরাও অকৃত্রিম ও অনাদি অনন্ত চিদ্রূপকে দেব বলিয়া তাঁহাকে শিব আখ্যা প্রদান করেন[১২১।১২২]। এই শিবই প্রকৃত বা প্রধান দেব ও ইঁহারই পূজা বিধেয়। এই দেব কেবল ও সত্তারূপী এবং ইঁহা হইতে এই সমস্ত অস্তিতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত[১২৩]। যাহারা এই দেবতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব না জানে তাহারা দেব বুদ্ধিতে আকারের অর্চ্চনা করে। যেমন যোজন গমনে অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি ক্রোশ গমনের উপদেশ, সেইরূপ নিরাকার শিবতত্ত্ব অবিদিত অধিকারীর প্রতি সাকার শিবতত্ত্বের উপদেশ[১২৪]। পরিচ্ছিন্ন রুদ্রাদি দেবতা হইতে পরিচ্ছিন্ন ফলই লব্ধ হয় পরন্তু আত্মদেবের অর্চ্চনে অনাদি অকৃত্রিম ফল লব্ধ হইয়া থাকে[১২৫]। অকৃত্রিম ফল পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম ফলে লোলুপ হওয়া আর পারিজাত উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া করঞ্জ বনে লোলুপ হওয়া সমান। বোধ, সাম্য (সর্ব্বত্র আত্ম বুদ্ধি) ও শান্তি, এই তিনকে তুমি শ্রেষ্ঠ পুষ্প ও কেবল নির্ম্মল চিন্মাত্রকেই তুমি পূজ্য শিব বলিয়া জানিবে[১২৬।১২৭]। শান্তি ও বোধাদি পুষ্পের দ্বারা যে আত্মদেবের পূজা করা হয় তাহাকেই তুমি শ্রেষ্ঠ দেবার্চ্চন বলিয়া জানিবে। যাহারা আত্মসম্বেদনরূপ দেবার্চ্চনা না করিয়া কৃত্রিম প্রতিমাদি পূজায় ব্যাসক্ত হয় তাহারা ক্লেশের হস্তে পরিত্রাণ পায় না[১২৮।১২৯]। যদিও দেখা যায়, তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা কখন কখন চিদাত্মধ্যান হইতে বিরত হইয়া সাকার দেব দেবীর পূজাদি করেন, তথাপি, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের সে পূজা বালক ক্রীড়ার অনুরূপে অথবা অজ্ঞ লোকের ভক্ত্যুদ্রেক উদ্দেশে কৃত হয় অর্থাৎ তাহা তাঁহারা ভোগ প্রত্যাশায় করেন না। হে ব্রহ্মন্! ইহা তুমি নিশ্চয়

জানিবে যে, আত্মধ্যান ব্যতীত অন্যরূপ পূজন মুখ্য পূজন নহে। আত্মাই দেবতা, আত্মাই ভগবান্, আত্মাই শিব, তাঁহারই পূজা পূজা ও তদীয় পূজার প্রধান সামগ্রী জ্ঞান। জ্ঞানরূপ পুষ্পের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা পূজনীয়[১৩০।১৩১]। তুমি এই অনাদি অনন্ত পারাবার বর্জ্জিত মহামহিম চিদাকাশকে আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে[১৩২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে প্রভো! এই জগৎ কিরূপে চিদাকাশ মাত্র, কি রূপেই বা সেই চিদাকাশের জীবত্বাদি, তাহা আমাকে বলুন[১৩৩]?

ঈশ্বর বলিলেন, পারাবার বর্জ্জিত এক চিদাকাশই আছে, আর কিছু নাই। তাহার নিদর্শন—কল্পান্ত। কল্পান্তে কিছুই থাকে না, কেবল চিদাকাশই থাকে। কল্পারম্ভে সেই চিদাকাশস্থ মায়িক আবরণ পূর্ব্বসংস্কারানুসারে পুনঃ জগদাকারে প্রকাশ পাইতে আরব্ধ হয়। সেই জন্যই বলা যায়, এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট নগরের সহিত সমান এবং চিদ্ব্যতীত পদার্থান্তর নহে[১৩৪।১৩৫]। যাহা চিতের প্রকাশ্য তাহা চেত্য, সুতরাং তাহা চিদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল নিদ্রা দোষাবৃত স্বাত্মচৈতন্যের অনতিরিক্ত, অর্থাৎ তাহা যেমন বস্তুসৎ নহে, সেইরূপ, সৃষ্টিও চিদাকাশের অনতিরিক্ত ও বস্তুসৎ নহে[১৩৭।১৩৮]। গিরি, নদী, অম্বর, জগৎ, আত্মা, জীব, ভূত, সমস্তই চিৎ[১৩৯]। উর্দ্ধ লোকে ও অধোলোকে কুত্রাপি চিদ্ব্যতীত কিছু নাই। যাঁহারা প্রমাণ কুশল, তাঁহারাও চিৎ ব্যতীত বস্বন্তর থাকার প্রমাণ দিতে পারিবেন না[১৪০]। আকাশ, পরমাকাশ, ব্রহ্মাকাশ, জগৎ ও চিৎ; এ সমস্তই তুল্যার্থ জানিবে[১৪১]। নামভেদ ব্যতীত বস্তুভেদ নাই বা নহে, ইহাও বিদিত হইবে। ঐরূপ ভেদ স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও মায়া এই তিন্ স্থানেই দৃষ্ট হয়। যাহা সংবিৎ তাহাই স্বপ্নে জগদাকারে প্রকাশ পায়। এইরূপ মহাচিদা-কাশই জাগ্রৎ জগতের আকারে প্রকাশ পাইতেছে[১৪২।১৪৩]। স্বপ্নে চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু থাকা অসম্ভব, সেইরূপ, জাগ্রতেও চিদা-কাশ ব্যতীত বস্বন্তর থাকা অসম্ভব। যে হেতু চেত্যের অস্তিতা অস-ম্ভব সেই হেতু এ সমুদায় চিৎ। এই যে জগত্রয়ের উৎপত্তি, ইহা স্বপ্নেরই অনুরূপ[১৪৪।১৪৫]। চিদাকাশই নিদ্রাদোষে ঘট পটাদির আকারে প্রকট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নদৃষ্ট গ্রাম নগরাদি সম্বিত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেইরূপ জাগ্রদ্দৃষ্ট গ্রাম নগরাদিও চিদ্ ব্যতীত নহে।

অধিক কি বলিব, সমগ্র ত্রিভুবন চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে ১৪৭,১৪৮। যে কিছু দর্শন, যে কোন ভাব, যে কোন দেশ, কাল ও চিত্ত, সমস্তই চিদ্ব্যোম। যাহা প্রকৃত দেব, তাহা তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে তুমি ভাবিবে, সেই দেবই তুমি আমি ও জগৎ[১৪৯।১৫০]। এ সমুদায়ের বাহ্য রূপ যাহাই হউক পরন্তু, পারমার্থিক রূপ পরমাত্মা। যেমন সঙ্কল্পে ও স্বপ্নে চিদ্ব্যোম ব্যতীত অন্য কিছু নাই সেইরূপ এ সৃষ্টিতেও পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই[১৫১।১৫২]।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

——(০)——

ঈশ্বর বলিলেন, এই সমুদায় বিশ্ব কেবল পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই ব্রহ্ম ও পরমাকাশ। আকাশের ন্যায় বিভু ও নিরাকার বলিয়া নাম আকাশ ও আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষণ পরম। এই পরমাত্মা ব্রহ্ম ও পরমাকাশ নামধেয় বস্তুই শ্রেষ্ঠ দেব এবং এই শ্রেষ্ঠ দেবের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। ইঁহারই পূজায় জীব সর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হয় ১।২। ইহা হইতে অকৃত্রিম, অনাদি, অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অখণ্ড সুখ লাভ করা যায়[৩]। হে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ! তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ, সেই জন্য তোমাকে এই মানসী শিবপূজার কথা বলিলাম। তুমি এই শ্রেষ্ঠ দেব পূজার উত্তমাধিকারী। এ পূজায় রাশি রাশি পুষ্প ও ধূপাদি আহরণ করিতে হয় না। যাহারা শ্রেষ্ঠ দেবে অব্যুৎপন্ন, স্বল্পপ্রত্যয়ী, তাহারাই কৃত্রিম প্রতিমাদি পূজার অধিকারী, তাহাদেরই জন্য বাহ্য পূজার বিধান[৪।৫]। তাহাদের শান্তির ও জ্ঞানের অভাব আছে, তাই তাহারা পুষ্প পত্রাদি লইয়া পূজা করে। তাহারা আদর পূর্ব্বক আপন সঙ্কল্পানুযায়ী অর্চ্চনা করে, করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হয়[৬।৭]। তাহারা মোহ বশতঃ আত্মসঙ্কল্পক্রমে কতকগুলি কল্পিত ফলের জন্য কল্পিত প্রতিমাদির অর্চনা করিয়া কতকগুলি মিথ্যা ফল অর্জ্জন করে[৮]। হে

ব্রহ্মন্! যে অর্চ্চনা পুষ্প ধুপাদির দ্বারা নিষ্পাদিত হয় সে অর্চ্চনা অব্যুৎপন্ন বুদ্ধির কার্য্য। তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিরা যে পূজার যোগ্য, সে পূজার কথা পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর[৯]। হে শ্রেষ্ঠবুদ্ধিমন্! আমরা দেব, পরন্তু পরম দেব নহি। দৃশ্যমূর্ত্তিরূপ দেব মাত্রই মায়িক, সে জন্য সে সকল দেব পরম নহে। ত্রিভুবনাধার পরমাত্মাই পরম দেব[১০]। শিব, সকল পদের উপরে ও সর্ব্ব সঙ্কল্পের অতীত এবং সমুদায় সঙ্কল্প তাঁহারই অধীন বা আশ্রিত। দিক্ ও কাল প্রভৃতি তাঁহার অবচ্ছেদ জন্মাইতে পারে না, যে কোন ক্রিয়া বা কার্য্য, সমস্তই তাঁহাতে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি কেবল চিৎ। হে মুনিবর! সেই দেবই প্রকৃত দেব[১১,১২]। যাহাকে শুদ্ধ সম্বিৎ বলা যায়, তাহা ক্রিয়াদির অতীত অথচ তাহা সর্ব্বত্র অবস্থিত। সেই সম্বিৎই অন্যকে অস্তিতাযুক্ত করে অর্থাৎ প্রতীতি ও অপ্রতীতি জন্মায়[১৩]। হে ব্রহ্মন্! বর্ণিত পরম দেব সৎ অসৎ এই দুই বিভাগের অন্তরালবর্ত্তী, এবং ইহার শাস্ত্রীয় নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তৎ, সৎ ও ওম্। ইহা সত্তাসামান্যরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত। সেইজন্য ইহাকে মহাচিৎ ও পরমার্থ বলা যায়[১৪,১৫]। রস যেমন লতার অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্র স্থিতি করে সেইরূপ পরমাত্মাও সত্তারূপে সর্ব্বত্র স্থিতি করেন। যে চিৎ অরুন্ধতীতে, যে চিৎ তোমাতে, যে চৈতন্য পার্ব্বতীতে, যে চিৎ গণদেবতায়, যে চিৎ আমাতে, অধিক কি বলিব, যে মহাচিৎ ত্রিজগদ্ব্যাপী, সেই মহাচিৎ-ই প্রধান দেব[১৬।১৮]। হে ব্রহ্মন্! সম্বিৎ-ই জগত্রয়ের সার, সম্বিৎ-ই সংসারের সার, সুতরাং সম্বিৎ-ই মুখ্য দেবতা। তিনি দূরে নহেন; দুষ্প্রাপ্যও নহেন। তিনি সদাই দেহের অন্তরালে আকাশের ন্যায় বিরাজিত। কার্য্যকরণ, খাদ্যভক্ষণ, দ্রব্যধারণ, গমনাগমন, শ্বাস প্রশ্বাস, জানা না জানা, সমস্তই তৎকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে[১৯।২১]। হে মুনিবর! তিনিই বিচিত্রচেষ্ট পুরে অর্থাৎ সেই সেই স্বরূপে রহিয়াছেন[২২।২৩]। তাঁহারই প্রসাদে এই শরীররূপ মহাগৃহ চলায়মান এবং তিনিই এতন্মধ্যস্থ হৃদ্গুহার ঈশ্বর। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নাম না থাকিলেও উপদেশ ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি নাম কল্পনা করা হয়[২৪।২৫]। তিনি চিন্ময়, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী ও নিরঞ্জন। আরোপ বা অধ্যাস কালে তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যায় পরন্তু অপবাদ কালে (কারণে কার্য্যের লয় অনুসন্ধান

করিতে গেলে) তিনি অকর্ত্তা[২৩]। তিনি যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল ও জগৎ কার্য্যের শোভা জনক। যে কিছু মনোজ্ঞ, যে কিছু চমৎকার, সমস্তই সেই মহাচিতের আশ্রিত[২৭,২৮]। তদনুসারেই আকাশ, জীব, চিত্ত, কাল, কলা, দেশ, ক্রিয়া, দ্রব্য, ষড়্‌বিধ ভাববিকার, তথা জাতি, গুণ, প্রকাশ, অপ্রকাশ, নদ, নদী, পর্ব্বত, তম, সূর্য্য, চন্দ্র, যক্ষ, রক্ষঃ, ইত্যাদি ইত্যাদি নামভেদ উৎপন্ন হইয়াছে[২৯,৩১]। চিদাত্মা নিজ ভোগার্থ অথবা ক্রীড়ার্থ জগৎ সৃষ্টি করেন না। যেমন বসন্ত ঋতু স্ব স্বভাবে অঙ্কুরাদি জন্মায়, সেইরূপ, চিদাত্মাও স্ব স্বভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন[৩২]। চিৎ পদার্থই এই লোকত্রয়রূপ সমুদ্রের জল, তদ্‌ব্যতীত অন্য কিছু নহে। চিদ্রূপিণী ঈশ্বরী শরীররূপ পঙ্কজে মনোরূপ ভ্রমরের সহিত সঙ্কল্পরূপ মধুর স্বাদ গ্রহণ করেন[৩৩,৩৪]। যেমন জলের আবর্ত্তে জলই বহমান, তেমনি, চিতিস্থিত জগৎও চিতে বহমান[৩৫]। এই ভ্রমময় সংসারচক্র চিৎচক্রে ভ্রাম্যমান[৩৬]। চিৎ-ই চতুর্ভুজরূপে অসুর বিনাশ করিয়াছেন এবং চিৎ-ই (চিৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। চিৎ শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ সর্ব্বত্র) ত্রিনয়নরূপে গৌরীকমলিনীর ভ্রমর হইয়া রহিয়াছেন। আবার চিৎ-ই বিষ্ণুর নাভিপদ্মের ভ্রমর হইয়া চিদ্‌ধ্যান পরায়ণ হন, তথা বেদরূপ নলিনীর সরোবর হন[৩৭,৩৯]। হে ব্রহ্মন্! চিতের শরীর অসংখ্য। যেমন একই হেমে ক্রিয়াভেদে কেয়ূর কটকাদি নানা আকার প্রকটিত হয়, তেমনি, একাধার চিৎ পদার্থে নানা মায়িক রূপ প্রতিভাসিত হয়। চিৎ-ই ইন্দ্র, চিৎ-ই সূর্য্য, চিৎ-ই চন্দ্র, চিৎ-ই দিক্, এবং চিৎ-ই সর্ব্বাবভাসক দর্পণ[৪০,৪৪]। চিৎ-ই চতুর্দ্দশ ভুবনকে ও ভূত মণ্ডলকে অস্তি (আছে) বলিয়া প্রতীত করায়[৪৫]। উক্ত মহাচিৎ যেন একটী লতিকা। প্রকাশ শক্তি তাহার কুসুম, সঙ্কল্প তাহার পল্লব, ব্যোম তাহার কেদার অর্থাৎ আলবাল, সত্তা তাহার ফল[৪৬]। জীব তাহার মৃত্তিকা, বাসনা তাহার রস, সংবেদন অর্থাৎ সবিকল্পজ্ঞান তাহার ত্বক্, চিত্তবৃত্তিনিচয় তাহার কলিকা[৪৭]। অতীত অসংখ্য ত্রিজগৎ তাহার পর্য্যুষিত কেশর, ঋতু সকল তাহার পর্ব্ব, শৈলাদি তাহার গুল্ম (মূল বা কন্দ), শরীর সকল তাহার গ্রন্থি, প্রবৃত্তি তাহার প্রতান (লতাইয়া থাকা)[৪৮,৪৯]। এই চিল্লতা বিকসিতা হইয়া বিচারসহ নানাবিধ দৃশ্যরূপ কুসুম প্রসব করিতেছে[৫০]। এই চিল্লতারই

ছায়ায় জন্ম মরণ মনন কথন ও নানা কার্য্য ক্রিয়মান হইতেছে[১০]। এই মহাচিতের দ্বারাই ভাস্করাদি প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, দেহ সকল স্পন্দিত হইতেছে, এই চিতে জড়ভ্রম ও জড়ে চিদ্‌ভ্রম জন্মিতেছে। এই চিৎ-ই নিজ সত্তার দ্বারা জগৎকে দৃশ্যত্বে স্থাপিত করিয়া তৎ-পার্থক্যে অবস্থান ও নর্ত্তন করিতেছে[২।৫৩]। চিৎ-ই এই ত্রৈলোক্য মন্দিরের একমাত্র মহাদীপ[৫৪]। চিৎ-ই নির্ম্মল চন্দ্রবিম্বের শশ (চিহ্ন) এবং চিদ্রূপ রসের প্রসেকে পদার্থ সকল রূপী বলিয়া প্রকাশ পাই-তেছে[৫৫।৫৬]। যাহাতে এই চিতের স্ফুরণ নাই তাহাই জড়[৫৭]। যেমন আলোক দ্বারা গৃহ প্রাসাদাদি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির অস্তিতা সিদ্ধ হয় সেইরূপ লোকত্রয়ান্তর্গত গো অশ্ব ঘট পট প্রভৃতির আকৃতিও একা-দ্বয় চৈতন্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়[৫৮]। এই দেহরূপ গৃহের মধ্যে যে চিদাকাশের প্রকাশ রহিয়াছে সেই প্রকাশে ক্রিয়ারূপিণী কুলবধূ সঙ্কল্পশিশু ক্রোড়ে করিয়া স্ফুরিত হইতেছে[৫৯]। রসনায় রস থাকিলেও কে কবে তাহা চিদাকাশ ব্যতীত বিদিত হইতে পারিয়াছে[৬০]? চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত, কে কবে কোথায় এই দেহ বৃক্ষকে দৃষ্ট করিয়াছে? জন্ম ও বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই চিজ্জলের অধীন। সে জন্য সিদ্ধান্ত—চিৎ-ই আছে, তদ্ব্যতীত কিছু নাই[৬১।৬২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেব ত্রিনয়ন আমাকে অতি মধুর বাক্যে ঐরূপ ঐরূপ বলিলে আমি পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, হে দেব! যদি কেবল মাত্র একাদ্বয় ও সর্ব্বব্যাপিনী চিৎ-ই থাকে, অন্য কিছু না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই এই দেহ চিন্ময়, এ কথা স্বীকার্য্য হইবে। তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্য—এই দেহ নিদ্রা মূর্চ্ছা মরণাদি অবস্থায় নিশ্চৈতন্য কেন হয়[৬৩।৬৪]। এই দেহ প্রথমে চিদ্বিশিষ্ট থাকে না, পরে চিদ্বিশিষ্ট হয়, পুনর্ব্বার চিদ্বিহীন ও মৃদ্বিকারে দৃষ্ট হয়। ইহা হয় কেন? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি[৬৫]।

ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ কর। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতেছি। তোমার প্রশ্ন যৎপরোনাস্তি মহত্তর[৬৬]। এই দেহে দ্বিবিধা চিৎ আছে। এক বিম্বরূপিণী, অপরা প্রতিবিম্বময়ী। * তন্মধ্যে

---

* কোন বস্তুতে যাহার প্রতিচ্ছায়া পড়ে তাহা বিম্ব, আর যে প্রতিচ্ছায়া, তাহা প্রতিবিম্ব। জলে চন্দ্রের প্রতিচ্ছায়া পড়ে, তাই চন্দ্রকে বিম্ব বলা যায় এবং সেই

যাহা বিম্বভূতা তাহা কূটস্থা ও নিত্যা নির্ব্বিকল্পা। আর যাহা প্রতিবিম্বরূপা তাহা চলায়মানা ও সবিকল্পা। দেহের অন্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব আছে সেই বুদ্ধিতত্ত্ব থাকাতেই তাহাতে অনাদি অনন্ত কূটস্থা ও নিত্যা চিতির প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই প্রতিবিম্ব চিতের অপর নাম বিজ্ঞানময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময় কোষই কর্ত্তা ও ভোক্তা ও জীব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। যেমন কোন সাধ্বী স্ত্রী স্বপ্নে উপপতি গ্রহণ করিয়া তৎকালের জন্য দুঃশীলা হয়, পূর্ব্ব ভাব পরিত্যাগে যেন তদ্ব্যতিরিক্তা হয়, অথবা যেমন কোন সাধু লোক ক্রোধাবেশ দ্বারা ক্ষণকালের জন্য রাক্ষসাদির ন্যায় ক্রূর হইয়া পড়ে, সেইরূপ, নির্দ্দোষ বিম্ব চিৎ সদোষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিম্ব হইতে পৃথক্‌বিধ হইয়া পড়ে[৬৭।৬৯]। হে ব্রহ্মন্! চিৎ উক্ত ক্রমেই স্বরূপ চ্যুত হইয়া ক্রমে জড়ভাবাপন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ আপনি আপনাকেই সেই সেই ভাবে কল্পনারূঢ় করে[৭০]। প্রথম কল্পনায় আকাশভাব ও আকাশতন্মাত্রানামক সূক্ষ্ম ভূত ভাব, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম বায়ুভাব, এবং ক্রমে দেশ কালাদি বিভাগ ও জীবভাব প্রাপ্ত হয়। ক্রমে বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি জন্মে। মন হইলেই সংসারভাব উপস্থিত হয়। যেমন কোন দ্বিজ আপন কল্পনায় "আমি চণ্ডাল" এই ভাবে ভাবিত হইয়া নিজ দ্বিজত্ব হইতে চ্যুত হয়, সেইরূপ, সেই সংসারাতীত চিৎ পদার্থও মনঃকল্পনায় প্রতিবিম্বিত বা তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপচ্যুত হয়। জল যেমন নিবিড়তার দ্বারা পাষাণতুল্য হয়, সেইরূপ, চিৎও জাড্যতাদাত্ম্যে অনন্তসঙ্কল্পময়ী পীবরতায় অবভাসিত হয়[৭১।৭৫]। সেই জাড্যেরই চিত্ত, মন, মোহ, মায়া, এই সকল নাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে মুনিবর! ঐ প্রকার জাড্য জন্মের দ্বারাই সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে[৭৬]।

প্রতিচ্ছায়াকে প্রতিবিম্ব বলা যায়। গৃহভিত্তিতে সামান্যতঃ সূর্য্যালোক ব্যাপ্ত থাকে, তদুপরি আবার যদি কাচের সাহায্যে প্রতিচ্ছায়াময় আলোক পাতিত করা যায় তাহা হইলে সেই দ্বিগুণিত আলোকের একটীকে বিম্বালোক ও অপরটীকে প্রতিবিম্বালোক বলা হয়। ইহাকে ইংরাজিতে Solar light ও Reflected Solar light বলে। এতদ্দৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তির যোগে দ্বিগুণকল্প হইতেছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য বিম্ব, আর বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিফলিত চৈতন্য প্রতিবিম্ব।

সংসার কি? না মোহ বশে স্বাত্মতিরস্কার, তৃষ্ণারূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ, কাম ক্রোধ ভয় প্রভৃতিতে অভিভূত, উৎপত্তি বিনাশের অনুগামী হওয়া, বিকারী ও বিচ্ছিন্ন হওয়া, দুঃখদাবানলে দগ্ধ হওয়া, শোকে ক্লিষ্ট হওয়া, আমি অমুক ও এইরূপ হইয়াছি ভাবিয়া বিকল হওয়া, দেহের উপরেই আস্থা স্থাপন ও তদনুযায়ী দীনতাদি অনুভব করা, জীর্ণ শীর্ণ বন্যহস্তীর ন্যায় মোহ পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া, বায়ুর আঘাতে লতার ন্যায় ভাবাভাব চিন্তায় চঞ্চল হওয়া, এই সকল হওয়াই সংসার পদের বাচ্য ৭৭।৮০। এবংক্রমে প্রাপ্তসংসার জীব অসার ও অপার সংসার বিকারে অভিভূত, তদনুযায়ী ব্যবহারে রত, তাপত্রয়ে তপ্ত, রাগে ও তেজে রঞ্জিত, ও ভ্রষ্টযুথ মৃগের ন্যায় দিশাহারা হইয়া নানা কষ্ট অনুভব করে। আবির্ভাবে হৃষ্ট হয় ও তিরোভাবে কষ্ট পায়৮১।৮২। বালকেরা যেমন স্বকল্পিত ভূতের ভয়ে ভীত হয়, সেইরূপ, ইহারাও স্বসঙ্কল্পিত সংসারের দ্বারা ভয় প্রাপ্ত হয় এবং উষ্ট্র যেমন দুঃখবহুল কণ্টকের অভ্যন্ন মধুর রস আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ, ইহারাও দোষবহুল বিষয় হইতে সুখকণা আহরণের চেষ্টা করে, করিয়া ক্রমে অধঃপতিত হয় ৮৩।৮৪। যার পর নাই বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, সঙ্কট হইতে সঙ্কটান্তরে, দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ও বিপদ হইতে বিপদান্তরে গমন করে। তথা অসংখ্য অনর্থে জড়িত হয়, আশা ও চেষ্টা পাশে বদ্ধ হয়, হইয়া কষ্টাধিক কষ্টের অনুপাতী হয়৮৫।৮৬। মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়া বাল্য হইতে ব্যবহার কৌশলে দক্ষতা লাভ করে, করিয়া যাহা আত্মবন্ধনের উপকরণ গৃহ ক্ষেত্র ধনাদি, তদ্বিষয়েই পরাক্রান্ত হয়, মোক্ষোপযোগী বিবেক পথ পরিত্যাগ করে৮৭। সর্ব্বদা ভয়, সর্ব্বদা শঙ্কা, সর্ব্বদা প্রাণ বিনাশের আতঙ্ক করে, এবং জলহীন মীনের ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে। বাল্যে পরবশ, যৌবনে চিন্তা, বার্দ্ধক্যে দুঃখ ও মরণে কর্ম্মের বশতাপন্ন হইতে থাকে। কর্ম্মানুসারে স্বর্গে দেবতা, পাতালে নাগ, দৈত্যদেশে অসুর, ধরাতলে নর, রক্ষঃপুরে রাক্ষস, বনকোটরে বানর, গিরিগহ্বরে সিংহ, কুলপর্ব্বতে কিন্নর, দেবগিরিতে বিদ্যাধর, বনগর্ত্তে সর্প, তরুশাখায় পক্ষী, গিরিশৃঙ্গে লতা, ও অরণ্যে মৃগ হয়। ক্ষীরোদে নারায়ণ, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, কৈলাসে হর ও স্বর্গে ইন্দ্র হয়। সূর্য্য হইয়া দিন ও মেঘ হইয়া বর্ষণ করে এবং বায়ু হইয়া বহমান হয়। সেই সম্বিৎ-ই

আপনাতে সমুদ্র, ঋতু, বৎসরাদি কাল, দিন, রাত্রি, তেজ ও তিমির প্রভৃতি দৃষ্ট করিতেছে। সেই সম্বিৎ-ই বীজ, বীজস্থ রস, বাক্ বিবর্জ্জিত প্রস্তর, জলবাহিনী নদী, শোভাময় কুমুদ, সুপক্ব ফল, কাঠ ও তন্মধ্যগত বহ্নি, শৈত্য, হিম ও আকাশ। কোথাও অত্যুজ্জ্বল আকার, কোথাও কষ্টপ্রদ শিলা, কোথাও নীলাদি বর্ণ, কোথাও বহ্নি ও কোথাও মৃত্তিকারূপে প্রকাশ পাইতেছে[৮৮।৯৮]। যে হেতু সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগত ও সর্ব্বশক্তি, সেই হেতু সেই চিৎ-ই সর্ব্ব অথচ আকাশ অপেক্ষা স্বচ্ছ অর্থাৎ নির্লিপ্তস্বভাব[৯৯]। সেই চিৎ আপনাকে যে স্থানে যখন যে ভাবে ভাবিত করে সে স্থানে তখন তিনি সেই ভাবেই দৃষ্ট হন[১০০]। হে ব্রহ্মন্! তৃণ যেমন জলাবর্ত্তে ভ্রাম্যমান হয়, সেইরূপ, জীবশক্তিও সংসাররূপ জলাবর্ত্তে নিপতিত হইয়া হংসী, ক্রৌঞ্চী, বকী, কাকী, সারসী, তুরগী, বৃকী, পারাবতী, বানরী, কিন্নরী, শুনী, বটিকা বা বর্ত্তিকা, পিঙ্গলী, শারিকা, মক্ষিকা, ভ্রমরী, শুকী, ধী, শ্রী, হ্রী, প্রীতি, রতি, শম্বরী, শর্ব্বরী ও শশী প্রভৃতি যোনি জাতিতে বিবর্ত্তমান হয়[১০১,১০৩]; গর্দ্দভী যেমন আপনি আপনার শব্দে ভীতা হয় সেইরূপ ইহারাও স্ব সঙ্কল্পের দ্বারা ভয় প্রাপ্ত হয়। এই জীবশক্তির সদৃশী মুগ্ধা ও দুর্ব্বলা আর নাই[১০৪]। হে মুনিবর! আমি তোমাকে যে জীবশক্তির কথা বলিলাম, এই জীবশক্তি নিতান্ত হেয়। এই জীবশক্তির অপর নাম কর্ম্মাত্মা। এ অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহার অন্ত নাই ও ইহা দুঃখ বহুল। এ অবস্থা কেবলমাত্র স্বাত্মবিভ্রমজনিত। ইহা স্বরূপতঃ সৎ না হইলেও ও অত্যন্ত নশ্বর হইলেও এতদ্দ্বারা বৃথা আক্রান্ত হইয়াছে ও হইতেছে[১০৫।১০৭]। আপন অনন্ত বিভব ভ্রষ্ট হওয়ায় ঐরূপ ঐরূপ বৃথা দুর্ভাগ্য বহন করিতেছে ও শোকে অধীর হইতেছে।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! তুমি অবিদ্যার শক্তি বা সামর্থ্য কিরূপ তাহা দর্শনগোচর কর, যাহার সামর্থ্যে ব্রহ্মস্বভাবা চিৎ ঘটাধস্ত্র প্রবিষ্ট ঘটাকাশের ন্যায় নিরন্তর ঊর্দ্ধাধঃ গতির বশ্য হইতেছে[১০৮।১০৯]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

—— (*) ——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ঈশ্বর পুনরপি বলিলেন, যেমন স্বপ্ন, উন্মত্তা, মোহ ও সম্ভ্রম (ভ্রান্তি) কালে আমি দুঃখী আমি বিপন্ন এইরূপ মিথ্যা অবভাস অনুভব করে, সেইরূপ, নির্দ্দুঃখস্বভাবা চিৎ পদার্থও মিথ্যা বা আরোপিত ভাবময় ভাবনার দ্বারা আমি দুঃখী আমি সুখী আমি বিপন্না এইরূপ এইরূপ অবভাসে আবিভূ'ত হইতেছে[১]। অনষ্টা কুলবধূ যেমন মিথ্যা নষ্টতার আরোপে হায় আমি নষ্টা হইলাম ভাবিয়া রোদন করে সেইরূপ অমৃতা চিৎও মতিবিপর্য্যয়ের প্রভাবে আপনাতে হায় আমি মরিলাম এতদ্রূপ মিথ্যা মরণের আরোপ উত্থাপন করিতেছে[২]। ভ্রান্ত যেমন ভ্রাম্যমান কুলাল চক্রকে স্থির দেখে, সেইরূপ, চিৎও ভ্রমের আবেশে অস্থির জগৎকে স্থির দেখিতেছে[৩]। চিত্তের ঐরূপ সংশয়ানুভবের কারণ চিত্ত। ফলতঃ ঐ কারণটীও মিথ্যা। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে চিত্তও নাই[৪]। যে হেতু চিত্ত নাই, সেই হেতু চেত্যও নাই। চন্দ্রে কলঙ্ক যেরূপ, চিদ্ব্রহ্মে দৃশ্য, দর্শন, দ্রষ্টা, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, মাতা, মেয়, মান, এ সকলও সেইরূপ। আমি, তুমি, তিনি, এ সকল ভাবও আকাশে পর্ব্বত কল্পনের অনুরূপ। নানা, অনানা, শব্দ, শব্দার্থ, এ সকল ভেদও বাস্তব নহে। যেমন সূর্য্যমণ্ডলে রাত্রি নাই সেইরূপ চিদ্ব্রহ্মে এ সকল কিছুই নাই। বস্তুত্ব অবস্তুত্ব এ দুই বিভাগও তুষারে উষ্ণতা না থাকার ন্যায় জানিবে[৫]।[১০]। শূন্যতা অশূন্যতা প্রভৃতিকেও ঐরূপ জানিবে। চিতে অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যে সমষ্টিচিত্তরূপ দোষে চতুর্ব্বিধ শরীর জন্মিয়াছে এবং তৎকারণে সংসার দুঃখ অনিবার্য্য, এরূপ মনে করিও না। কেননা উহা সত্য বলিয়া পরিভাবিত হইলেই অনর্থ জন্মায়, নচেৎ নহে। যাহারা ইহার তত্ত্ব বা রহস্য জানে, তাহাদের সম্বন্ধে এ সকল দুঃখদ নহে। তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে তৃণ ও ত্রৈলোক্য সমান অর্থাৎ তুচ্ছ। যাহা বলিলাম, ইহা নিশ্চয়ই আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ ত্রৈলোক্যের

মিথ্যাত্ব সত্যভাবনাপরিত্যাগসাধ্য। যাহা অসাধ্য তাহা তুমি কোথায় পাইবে? সেই নির্ব্বিশেষ চিৎ, যাহা সর্ব্বগামিনী, তাহা যৎপরোনাস্তি নির্ম্মলা এবং তেজঃপদার্থেরও তেজ[১১,১৬]। সেই চিৎ-ই সর্ব্বাবভাসিনী, নির্ম্মলা, নিত্যোদিতা, নির্ম্মনস্কা, নির্ব্বিকারা ও নিরঞ্জনা[১৭]। ঘটে, পটে, বটে, শকটে, বানরে, ঘরে, অসুরে, সাগরে, ভূতে, নরে ও নাগে স্থিতি করিতেছে[১৮]। তাহা সাক্ষীর ন্যায় উদাসীন, কোথাও যায়ও না, কোথা হইতে আসেও না এবং কোন ক্রিয়াও তাহার নাই[১৯]। চিৎ উক্ত প্রভাবান্বিতা, অমলিনস্বভাবা ও নির্ব্বিকল্পরূপা হইলেও দেহাদি ভাবে ভাবিতা হইয়া এই বিচিত্র কল্পনায় নিরূঢ়া হইতেছে[২০]। বস্তুতঃ উক্ত চিৎ পদার্থ নির্ব্বিকল্প ও যার পর নাই পরম সূক্ষ্ম ও প্রত্যেক দেহে আনখাগ্র পরিব্যাপ্ত[২১]। সেইজন্য জাগ্রৎ পুরুষের চেতনা বাহিরে রূপ দর্শনাদি ও অন্তরে মনোবৃত্তি প্রভৃতি অনুভব করে পরন্তু সুষুপ্তিতে স্বজ্ঞানমাত্রের সাক্ষী হইয়া স্থিতি করিতে থাকে[২২]। সাধু যেমন অসাধুর সংসর্গে অসাধু হয়, তেমনি, উক্ত ব্রহ্ম চিৎও দেহাদি তাদাত্ম্যে চিন্তাদি কালুষ্য প্রাপ্ত হয়। মালিন্যের দ্বারা স্বর্ণও তাম্রাকার হয় পরন্তু মল উন্মার্জ্জিত হইলে তখন আর তাম্রাকার থাকে না। এইরূপ মনের সংসর্গে জীবাকার হইলেও মনের উন্মার্জ্জনে পুনর্ব্বার সমলা চিৎ নির্ম্মলা হইয়া থাকে[২৩,২৪]। নির্ম্মল আদর্শ স্বনিশ্বাসে মলিন হইলে সে মালিন্য মার্জ্জন দ্বারা অপগত হয়, তখন তাহাতে যথাবৎ স্বাত্মপ্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অজ্ঞান যোগে মলিন চিদ্দর্পণও অজ্ঞান মার্জ্জনের পর কেবল হইয়া থাকে[২৫]। চিৎই অসৎ অজ্ঞানের ভাবনায় সংসারী এবং স্ব স্বভাব জ্ঞানে অসংসারী। অনাশস্বভাবা চিং অহন্তার প্রাপ্তির দ্বারাই নাশবতীর ন্যায় হয়। অত্যল্প স্পন্দন দ্বারা ঊর্দ্ধস্থানস্থ বৃক্ষের ফল নিম্নগামীই হয়, তাহার ন্যায় চিৎও অজ্ঞান সংসর্গে অধঃপতিতই হইয়া থাকে[২৬,২৮]। রূপ রসাদির যে সত্তা বা অস্তিতা সে সত্তা চিতেরই এবং এটী দ্বিতীয়, ওটী তৃতীয়, এ সকল ভেদও অধ্যাসমূলক সুতরাং চিতের অনতিরিক্ত। যেমন আলোক থাকিলেই লোক সকল ক্রিয়া করণে ব্যাপৃত থাকে, সেইরূপ, চিত্ত থাকিলেই ইন্দ্রিয়াদিবিষয়ক জ্ঞান প্রবর্ত্তিত থাকে[২৯,৩০]। চিৎসান্নিধ্যবশতঃ শরীরস্থ ব্যান্ বায়ুর দ্বারা যে

নেত্রকনীনিকায় স্পন্দন হয় এবং তাহাতে যে দীপ্তিবিশেষ স্থিত থাকে, সেই দীপ্তিবিশেষ দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে পরিচিত। তদ্দ্বারা নীল পীতাদি রূপের বোধও হইয়া থাকে সে বোধও সেই পরা চিৎ[৩১]। ত্বক্ ও শরীর বায়ু উভয়েই জড়, অর্থাৎ স্বাধীনসত্তাবিরহিত। চিত্তের সত্তাতেই তদ্দ্বয় সত্তাশালী হয়, হইয়া স্পর্শেন্দ্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহাও পরা চিৎ। এইরূপে গন্ধ বোধও পরা চিৎ, শব্দ বোধও পরা চিৎ এবং মনন বা কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক সঙ্কল্পও পরা চিৎ। কেননা, পরা চিৎব্যতীত মন ক্রিয়োন্মুখ হইতে পারে না[৩২,৩৩]। চিৎ পদার্থ স্বপ্রকাশ, স্বতঃ কালুষ্যরহিত, নিত্য, আপনা আপনি বা স্বয়ং ব্যবস্থিত [৩৩]। ইনি অদ্বিতীয় হইলেও এবং অবিকারী হইলেও ঐ সকল সন্নিবেশ স্ফটিকের প্রতিবিম্ব সন্নিবেশ ধারণের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। ইহার উদয়, অস্ত, স্পন্দন, হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় না[৩৭]। ইনি স্বরূপে নিঃসঙ্কল্প স্বভাব, অথচ সঙ্কল্পের বশে জীবভাব প্রাপ্ত হন[৩৮]। এই পরা চিতের রথ জীব, জীবের রথ, অহঙ্কার, অহঙ্কারের রথ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ মন, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের রথ দেহ, দেহের রথ স্পন্দন। স্পন্দন অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য। এই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণই সংসার ও জরা মরণের পিঞ্জর[৩৯,৪১]। এ সকল স্বরূপতঃ অস্তিত্বশূন্য হইলেও স্বাপ্ন প্রতিভাসের ন্যায় প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে ও মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় এ সকল নিতান্ত অসত্য[৪২]। "মনের রথ প্রাণ" এ সকল কেন বলিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। যে আধারে প্রাণ, সেই আধারেই মনন, অবশ্যই ইহা অনুভবগম্য। যে স্থানে আলোক সেই স্থানেই রূপের প্রকাশ, অন্যত্র নহে। ইহার দৃষ্টান্ত, জীবন দশাতেই দেহের ব্যবহার, মরণ দশায় নহে[৪৩,৪৪]। মন হৃদয়াকাশে লয় প্রাপ্ত হইলে তখন আর প্রাণস্পন্দন থাকে না[৪৫]। যেমন তেজের উপশমে রূপ প্রকাশ থাকে না, তেমনি, প্রাণের উপশমে অন্তরে মনঃসত্তাও থাকে না। বায়ুর বহমানতা লুপ্ত হইলে কি ধূলির উড্ডয়ন থাকে? তাহা থাকে না। প্রাণ বায়ু যে স্থানে পাঠায় মন সেই স্থানেই যায়। রথ যে স্থানে যায় সারথিও সেই স্থানে যায়। চিত্ত প্রাণেরই প্রেরণায় ক্ষণমধ্যে দেশ দেশান্তরে যায়[৪৬,৪৮]। যে স্থানে পুষ্প সেই স্থানে গন্ধ, যে স্থানে বহ্নি সেই স্থানে উষ্ণতা, যে স্থানে চন্দ্র সেই স্থানেই কিরণ অথবা মনঃ। অতএব,

পৃথক্ পৃথক্ বা প্রত্যেক সম্বিত্তিতে প্রাণ বায়ুর সহায়ভাব আছে। বায়ুই ভুক্ত দ্রব্যের রস সর্ব্বাঙ্গে প্রেরণার্থ সর্ব্বনাড়ী স্পর্শ করিয়া আছে। লিঙ্গশরীরের অভ্যন্তরে চিত্তের প্রতিবিম্ব পাত হওয়ায় বিম্বচৈতন্য প্রতিবিম্বের দ্বারা দ্বিগুণীভূত হইয়া সম্বিত্তিরূপে প্রকটিত হইতেছে। অতএব, কি জড় কি অজড়, কুত্রাপি চিদাকাশের অভাব নাই[৪৯।৫১]। তবে কি না চিৎ পদার্থ জড়ে স্বসত্তা মাত্রে স্থিত, তাহা দ্বিগুণিত নহে[৫২]। জড়েও বেদনা বা সম্বিত্তি আছে, পরন্তু অনভিব্যক্ত। প্রাণ বিলোপ বশতঃ মন ও মনোবৃত্তি সকল লুপ্ত থাকে, সেই জন্য জড়ে স্পন্দন দৃষ্ট হয় না। হে মুনিবর! চিৎ পদার্থ পুর্য্যষ্টকেই প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন স্বচ্ছ আদর্শে প্রতিবিম্ব পাত হয়, উপলে নহে, সেইরূপ। হে মুনিনায়ক! তুমি মনকেই পুর্য্যষ্টক বলিয়া জানিবে (পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ লিঙ্গশরীর)। এই মনকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কল্পনায় আরূঢ় করায়[৫৩।৫৫]।

হে মহাত্মন্! যাহা হইতে জীব, জীবের উপাধি, জীবের ভোগ্য, এতত্রিতয়াত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, স্থিত আছে এবং লয় হইবে, এবং যাঁহার প্রভাবে মন দেহ সৃষ্টির জন্য বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেই চিৎকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া স্থির কর[৫৬]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

——(*)——

ঈশ্বর বলিলেন, মুনিবর! পূর্ব্বোক্ত পরমাচিৎ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল চৈতন্য) যে প্রকারে শরীরপ্রবিষ্ট হয়, এবং ঐহিক পারলৌকিক কর্ম্ম করে, তথা যে প্রকারে শরীরচেষ্টা নির্ব্বাহ করে, সে সমস্তই তোমাকে বলি, শ্রবণ কর[১]। যাহা চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহাই জীব, তাহার যে প্রচলন, তাহা দেহপ্রচলনের কারণ। কাম-কর্ম্ম-বাসনানুযায়ী যে কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টা বিশেষ জন্মে, সেই চেষ্টা বিশেষের নাম কর্ম্ম, তাহার

বিভাগ দ্বিবিধ। বিহিত ও নিষিদ্ধ। এ কথার তত্ত্ব বা বিবরণ এইরূপ —শাস্ত্র যাহাকে অনাদি মায়াশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি বলেন, সেই মায়াশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি স্বকীয় আবরণ শক্তির দ্বারা আপনার আশ্রয় ব্রহ্মকে আবরণ করে অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই বা প্রতিভাত হইতেছে না, এইরূপ প্রতীতির বিষয় করিয়া তুলে। দীর্ঘকালে সে প্রতীতি বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং তাহা ক্রমিক বিবিধ কাম কর্ম্মাদির সংস্কারে স্থিত হইতে থাকে। ক্রমে তাহা মনোরূপে পরিণত হয়। তদ্বিধ মনঃপরিণামের পর, তদীয় আধার ব্রহ্মচিৎ তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্তের ন্যায় হয়, তথা মনঃও ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা চিন্তাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইহারই নাম চিজ্জড়ের মিশ্রণ এবং এইরূপ মিশ্রণ হইতেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনাদি লৌকিক বৈদিক ব্যবহার নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। অতএব, পূর্ব্বোক্ত মায়া-শক্তিরূপ মূলই এই বিস্তৃত সংসার বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া প্রকাশমান রহিয়াছে[২।৩]। হে মুনিবর! বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা এবং অবিদ্যা দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, জগৎ অমিথ্যা। ব্রহ্মের সন্নিধান থাকিলেও চিত্ত ব্যতিরেকে দেহা-দির প্রচলন জন্মে না। সুতরাং চিত্ত থাকাতেই দেহাদির স্ফূর্ত্তি সংঘ-টন হয়[৪।৫]। পরমাত্মা সর্ব্বগামী বা সর্ব্বত্রাবস্থিত, সেজন্য তিনি জীব-ত্বের সাধারণ কারণ সত্য, পরন্তু জীবত্বের অসাধারণ কারণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি[৬]। এই জীব আত্মনাম্নী চিচ্ছক্তির দ্বারাই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্ব-পর-প্রকাশে সমর্থ হয়। মুকুর যেমন দ্রব্যাতিরিক্ত গুণা-দির প্রতিবিম্বও গ্রহণ করে, তেমনি, লিঙ্গশরীরও স্বাতিরিক্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে[৭]। সেই ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীবপদাভিধেয় হইলেও তাহা জাড্য অর্থাৎ নিদ্রা আলস্যাদি দোষ বশতঃই মোহ প্রাপ্ত হইয়া রহি-য়াছে[৮]। চিৎ-ই উক্ত ক্রমে স্ব স্বভাবের তিরস্কারে (প্রচ্ছন্নতায়) চিত্তত্ব প্রাপ্ত হয় ও মোহ বশতঃই (মোহ=ঠিক্ না বুঝা) দৈন্যাদি অনুভব করে। এই দেহ জড়স্বভাব হইলেও স্পন্দশক্তি প্রাণের অধ্যাসে চল-নাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে[৯।১০]। অতিতুচ্ছ কর্ম্মাত্মা জীব এই প্রস্তরতুল্য অচল দেহকে বায়ুর ন্যায় সচল করিয়া রাখিয়াছে[১১]। হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মাই এই দেহশকটকে মনের ও প্রাণের দ্বারা বহন করিতেছে[১২]। উক্তপ্রকারে চিৎ ও জড় উভয়ের আধ্যাসিক সম্মীলনে জীবত্ব প্রাপ্ত

হইয়া মনোরূপ রথের রথী হইয়াছে ও প্রাণরূপ তুরঙ্গম তাহা বহন করিতেছে[১৩]। নিজপদচ্যুত চিৎব্রহ্ম প্রোক্ত প্রকারে কখন জন্মবান্ পদার্থ, কখন বিনষ্ট পদার্থ, কচিৎ এক পদার্থ ও কোথাও বা বহু পদার্থ রূপে প্রথমান হইতেছে, তথা ভিন্ন অভিন্ন ও অস্তি নাস্তি ভাবে প্রকাশ পাইতেছে[১৪।১৫]। আলোক যেমন রূপপ্রথার উপজীব্য, তেমনি পর-আত্মাও বৃত্ত ও বর্ত্তিষ্যমান পদার্থের (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান পদার্থের) উপজীব্য[১৬]। পরমাত্মা চিত্ততত্ত্বে স্থিত থাকিলেও নিরাময়। তরঙ্গ, বারি, ফেন, এ সকল জলেরই বিকার। সেইরূপ, আধি ব্যাধি ও দৈন্য প্রভৃতি চিত্তেরই বিকার, চিৎপদার্থের নহে[১৭।১৮]। জল যেমন তরঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্মই চিত্তোপাধিক জীব হইয়া আধিব্যাধি-সমাকীর্ণের ন্যায় হন[১৯]। চিৎ পদার্থে সকল শক্তিই আছে। সুতরাং আমি কেবলা চিৎ নহি, এই ভাবে ভাবিতা হওয়াতেই চিৎ বহু ভাবের বশতাপন্ন হইতেছে। মূঢ়তা বশতঃ স্বকীয় সংবিন্ময়তা (চিন্ময়তা) বুঝিতে পারিতেছে না[২০।২১]। যে মুহূর্ত্তে জীব আপনার সংবিন্ময়তা জানিতে পারিবে সেই মুহূর্ত্তেই সে মোহসমুত্তীর্ণ হইবে[২২]। যে মুহূর্ত্তে প্রাণ-বায়ুর স্পন্দশক্তি প্রমোষ (লোপ) প্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই জীব হস্ত পদাদি অঙ্গের অনুসন্ধানরহিত হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু সংজ্ঞা জন্মে। হৃদ্‌পদ্মের স্পন্দন রহিত হইলেই অসংবিৎ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন আর কোনও অঙ্গের জ্ঞান থাকে না। যেমন তালবৃন্তের অসঞ্চলনে বহিঃ পবন উপশান্ত হয় তেমনি হৃদ্‌পদ্মের অসঞ্চলনে শ্বাস প্রশ্বাসাদি উপশম প্রাপ্ত হয়[২৩।২৫]। প্রাণের উপশমে জীব জীবনশূন্য হইয়াছে এতদ্রূপ ব্যবহার জন্মে, পরন্তু তখনও মন থাকে[২৬]। অভি-হিত ক্রমের কারণপরম্পরার বৈকল্যে কার্য্য পরম্পরা অধ্যস্ত হওয়ায় দেহ নিশ্চল ও ভূপতিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়[২৭।২৮]। পূর্ব্বানুভব জনিত বাসনাসঙ্কলিত মন থাকায় পুনর্ব্বার পুর্য্যষ্টকযুক্ত দেহ জন্মে। পুর্য্যষ্টক= কাম, কর্ম্ম, বাসনা, প্রাণ, মন, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চেতনা, এই ৮টের সম্মীলন। হে মুনিবর! দেহে পুর্য্যষ্টকথাকা পর্য্যন্তই জীবন ও পুর্য্যষ্টকের অভাবে মরণ, এইরূপ ব্যবহার প্রথিত আছে[২৯।৩১] বিরুদ্ধ বাত পিত্তাদি মলের ও রাগদ্বেষাদি বাসনা মলের প্রকোপ বশতঃ অথবা অস্ত্রাদি কৃত ছেদ ভেদ বশতঃ অভ্যন্তরস্থ হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রে

স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে পুর্য্যষ্টকও উপশান্ত হয়। জীব তখন কেবল মাত্র বাসনাত্মক সঙ্কল্পে অবস্থান করতঃ মরণ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে। যাহাদের ভোগ বাসনা থাকে না, যাহারা রাগদ্বেষাদির অতীত, তাহারা মৃত্যুর বশ্য হয় না অর্থাৎ মরণ দুঃখ অনুভবকরে না। তাহারা স্থিরস্বভাব ও জীবন্মুক্ত ও দীর্ঘজীবী[৩২।৩৫]। পদ্মযন্ত্র রুদ্ধ ও প্রাণ উপশান্ত হইলেই দেহ তখন কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় ভূপতিত হয়[৩৬]। হে মুনিবর! যেমন হৃদয়াকাশস্থ বায়ুতে পুর্য্যষ্টক লীন হয় তেমনি তদাকাশে মনও লয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তৎশরীরের কাম কর্ম্ম বাসনাদি লোপ প্রাপ্ত হইয়া ভাবী শরীরের ও ভাবী ভোগের অনুরূপ সঙ্কল্পাদি উদিত হইতে থাকে। শরীর তখন শব হয়, মন ও প্রাণ তখন তদ্দেহকে ত্যাগ করে, গৃহস্বামিশূন্য গৃহের ন্যায় নিপতিত থাকে[৩৭।৩৯]। তৎপরে পুনর্ব্বার তাহার পুনঃ শরীর জন্মিবার উপক্রম হইতে থাকে। চিৎ পদার্থ সর্ব্বত্রই বিদ্যমানা, তাহা কোথাও যায়ও না, কোথা হইতে আসেও না। মন যে স্থানে জীবভাবাপন্ন সেই স্থানেই তাহার তদনুরূপা স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তাদৃশী স্ফূর্ত্তি শাস্ত্রীয় ভাষায় জীবে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ এইরূপে অভিহিত হয়। প্রাণ নির্গম কালে তৎসঙ্গে পুনঃ শরীরোৎপত্তির বীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূত তন্মাত্রাপঞ্চক স্থিত থাকে এবং সেই সকলের দ্বারা প্রথমতঃ ভাবনাময় বা সঙ্কল্পময় দেহ তাহার অনুভবগোচরে স্থিতি করিতে থাকে। সেই ভাবনাময় দেহের অপর নাম আতিবাহিক দেহ। সেই আতিবাহিক দেহও কিছু কাল পরে বিস্মৃতির অধিকারে গমন করে, অহং-শক্তি প্রবলা হয়, মনঃও তখন পুনর্ব্বার পুর্য্যষ্টক রথে আরোহণ করে, করিয়া পুনঃ স্থূল শরীর জন্মিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অনুভব করিতে থাকে। যেমন বেতালের আবেশে শবীভূত শরীর পুনরুত্থিত হয়, সেইরূপ, মনঃ প্রভৃতি পুর্য্যষ্টকের আবেশে পুনর্ব্বার স্পন্দনশীল স্থূল দেহ প্রথা প্রাপ্ত হইতে থাকে। আবার পুর্য্যষ্টকের ক্ষয়, চিত্তের বিলয়, দেহের স্পন্দবিনাশ ও আবার মরণ হয়[৪০।৪৬]। হে মুনে! এইরূপে জীব আপনার অজর অমর ব্রহ্মরূপ ভূলিয়া যায়, এবং শরীরের বশ্য হইয়া তদনুযায়ী ক্লেশাদি প্রাপ্ত হয়[৪৭]। মুনিবর! স্মৃতি প্রভৃতি জীবশক্তির অন্তর্দ্ধান, পদ্মযন্ত্রের ও প্রাণধর্ম্মের নিরোধ; এই সকলের অধীন হইয়া জীব পুনঃ পুনঃ মৃত হয় ও প্রাগুক্ত

নিয়মে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। যেমন পুরাতন বৃক্ষপত্র গলিত হয় ও পুনর্ব্বার অভিনব পত্র জন্মে সেইরূপ পুরাতন দেহ বিগলিত ও অভিনব দেহের জন্ম হইয়া থাকে[৪৮।৪৯]। যখন জীর্ণ পর্ণ ন্যায়ে দেহের অপায় ও উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী তখন তজ্জন্য পরিদেবনা কেন[৫০]? এই সকল দেহ চিৎসমুদ্রের বুদ্বুদ ও এই সকল বুদ্বুদ মনুষ্যের ন্যায় চিতের প্রতিবিম্ব বহন করে[৫১।৫২]।

হে দ্বিজ! পরিপূর্ণ ও নির্ম্মল স্বভাব চিদ্রূপ আকাশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব শুভাশুভ কর্ম্মের ফল স্বরূপ এই সকল দেহ স্বাত্মমোহের উপকরণ হইয়া প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ মিথ্যা প্রতীতির বিষয় হইতেছে[৫৩]।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

---*---

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে চন্দ্রার্দ্ধধারিন্! মহামহিম অনন্ত ও একরূপ চিৎ পদার্থ কিরূপে দ্বৈতভাবাপন্ন হইল, এবং কি প্রকারেই বা তাদৃশ দ্বৈতের সুসূক্ষ্ম লতা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি? হে মহাদেব! যদি ইহা অজ্ঞানজনিত হয় তাহা হইলে জ্ঞানের পরে ইহার অনস্তিতা না হয় কেন? রজ্জুজ্ঞানের পর সর্পাভাবের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিশ্বাভাব না হয় কেন? ইহা আমাকে বলুন[১।২]।

ঈশ্বর বলিলেন, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম যখন একরূপে থাকেন, তখন দ্বিত্ব-কল্পনা থাকে না। যেমন দ্বিত্ব থাকে না, তেমনি একত্বও থাকে না। একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্ব, এ সকল সাপেক্ষ শব্দ, সে ভাবে বুঝিতে হইবে যে, একত্বাদিও কল্পিত, ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ কল্পিত, বস্তুভূত নহে। বস্তু চিৎ[৩।৪]। কার্য্য ও কারণ বস্তুতঃ এক বা অভিন্ন। যেমন ফল ও তদন্তর্গত বীজ, সেইরূপ। তদ্দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চিত্তই নানা কল্পনায় নানা আকারে স্ফুরিত হয়। সুতরাং সারকল্পে চেত্যগণ চিতের অনতিরিক্ত[৫।৭]। এই যে, ছয় প্রকার বিকারের আশ্রয় স্থান ঘটাদি পদার্থ, (বিদ্যমানতা, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, হ্রাস, ক্ষয় ও ধ্বংস) এ

সমস্তই এক সদ্বস্তু হইতে উদ্ভূত হয় ও জলাহরণাদি কার্য্য করিয়া নামভেদাদি ব্যবহার নির্ব্বাহ করে, করিয়া ভোগ ভেদ জন্মায়। এই ভোগ ভেদ কথার অর্থ—চিৎপর্য্যবসান হওয়া। তাই তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, যাহার আদ্যন্তে চিন্মাত্রতা, মধ্যেও তাহার চিন্মাত্রতা। অতএব, চিৎ-ই সমুদায় পদার্থের সার[৮]। জগৎ এক প্রকার কল্পনা, অন্য কিছু নহে, তাই তত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টিতে জলতরঙ্গাদি ব্যবহারিক ব্যতীত পারমার্থিক নহে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। মৃগতৃষ্ণা জল ও তাহার তরঙ্গ যদ্রূপ মিথ্যা, ব্যবহারিক জল ও তাহার তরঙ্গও তদ্রূপ মিথ্যা। ইহা অমুক, তাহা অমুক, এতদ্রূপ বোধ যখন অজ্ঞানকৃত, তখন আর এ বিষয়ে অজ্ঞানের অপনয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাচনিকী যুক্তি অবতীর্ণ করা বৃথা[৯,১০]। তরঙ্গ, কণা, কল্লোল, বুদ্বুদ, এ সকল যেমন জল হইতে সত্য সত্য ভিন্ন নহে, তেমনি, ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিতাও (সব হওয়ার সামর্থ্য) সত্য সত্য ভিন্ন নহে। পত্র পুষ্প ফল পল্লব এ সকল যেমন লতাই, লতা ছাড়া নহে, সেইরূপ, দ্বিত্ব, একত্ব, জগত্ব, ত্বত্ব ও অহন্তা প্রভৃতিও চিৎ, অর্থাৎ চিদ্ভিন্ন নহে[১১,১২]। তুমি যাহা ভিন্ন বা বিভিন্ন বলিতেছ, ভাবিয়া দেখ, তাহা চিৎ-ই, অন্য কিছু নহে, ঐ সকল কল্পিত উপাধির দ্বারা চিৎ-ই ঐ সকল ভেদ অবভাসে ভাসিত হইতেছে। সুতরাং তোমার প্রশ্ন উচিত প্রশ্ন নহে। অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্যরূপিণী মায়ার উপর আবার প্রশ্ন কি[১৩]? দেশ, কাল, ক্রিয়া, সত্তা, নিয়তি, অধিক কি, সমুদায় শক্তিই চিদাত্মিকা ও চিতের সত্তায় সত্তাবতী[১৪]। বীচি প্রভৃতি জলেরই নাম, তেমনি, চিৎ, চিত্ত, তত্ত্ব, অহং, ব্রহ্ম এ সকলও চিতের নাম। তরঙ্গ কি? তরঙ্গ মহোদধির বিলাস। সেইরূপ জগৎ কি? জগৎও ব্রহ্মের বিলাস। যাহার বিলাস জগৎ তাহা কোন পণ্ডিতের নিকট পরব্রহ্ম, কাহার নিকট সত্য, কাহার নিকট ঈশ্বর, কাহার নিকট শিব বিষ্ণু প্রভৃতি, কাহার নিকট শূন্য ও কাহার নিকট পরমাত্মা। যাহা সমুদায় পদের অতীত অথচ সমুদায়ের অধিষ্ঠান বা আধার, এবং যাহা সেই পরমাত্মার বাস্তব স্বরূপ, তাহা বাক্যের অবিষয়[১৭,১৮]। এই যে বিস্পষ্ট জগৎ দেখিতেছ, ইহা সেই মহতী চিৎ-লতার ফল পত্র ও পুষ্পাদি। চিৎ-ই মহতী অবিদ্যায় উপরঞ্জিতা হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং আপনাকেই বাহ্য জগদ্ভাবে

দেখিয়া থাকেন[১৯।২০]। আপনিই আপনাকে অব্রহ্ম ভাবেন, ভাবিয়া অন্যের ন্যায় বা ভিন্নের ন্যায় হন[২১]। বস্তুতঃ তিনি নিষ্কলঙ্কস্বভাব, পরন্তু সংসার সরিতে নিপতিত হইয়া সকলঙ্কের ন্যায় হইতেছেন। অর্থাৎ পুর্য্যষ্টকের সহিত একীভূত হওয়াতে জীবভাবান্বিত হইয়া তদ-মুরূপ ভাবে ভাবিত হইতেছে (পুর্য্যষ্টক কি তাহা বলা হইয়াছে)। যে হেতু চিৎ-ই জীব, সেই হেতু জীবে চৈতন্যের প্রাচুর্য্য[২২]। পুর্য্যষ্টক-তাদাত্ম্যে যে দেহ, সে দেহ আতিবাহিক, সেই আতিবাহিক দেহ স্থূল দেহ লাভের পুর্ব্বে ব্রীহি যবাদি ভাবে পরিভাবিত হয়। পরে তৎসহযোগে পুংশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রেতোরূপে সম্পন্ন হয়, তৎপরে আপনাকে প্রাণবান্ অস্থিমাংসাদিময় স্থূল দেহের দেহী বলিয়া অনুভব করে[২৩।২৫]। অতএব, অনুভবাত্মক ব্রহ্মই আপনাকে উক্ত ক্রমে অন্তরে স্থূল দেহী বলিয়া জানে এবং চক্ষুরাদির দ্বারা বাহিরেও স্থাবর জঙ্গম জীবজাতি বলিয়া জানে। পরে সেই সেই জীবজাতিবিষয়ক ভাবনা জনিত দৃঢ় সংস্কার দ্বারা সেই সেই জীবজাতিতে সম্পন্ন হয়[২৬]। কাক-তালীয় সংযোগের ন্যায় অভ্যস্ত বাসনার অভিভব ও বহু পূর্ব্বের সঞ্চিত বাসনার উদ্ভব ঘটনা হয়, তাহাতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আকার পরি-ত্যাগ ঘটে। ভাবার্থ এই যে, তাহার আতিবাহিক দেহস্থ কর্ম্মাশয়ে নানা জন্মের নানা সংস্কার আবদ্ধ থাকে, তন্মধ্যে দেহ ত্যাগ কালে যে সংস্কার উন্মুখ হয় মরণের পর তাহার সেই দেহই জন্মে। এতন্নিয়-মানুসারেই মনুষ্য মনুষ্যশরীর পরিত্যাগের পর মশকাদি শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৭]। যেমন এককে দুই ভাবিলে তাহা দু-ই হয়, অথবা যেমন মানুষ আপনাকে বেতাল বলিয়া জানে ত সে বেতালই হয়, সেইরূপ নরশরীরস্থ জীব মৃত্যু কালে নরভাব বিস্মৃত হইয়া আপনাকে মশক ভাবে জানে, ক্রমে মশক শরীর জন্মে[২৮]। যেমন দুই বলিয়া না জানিলে দুই থাকে না, আমি করি না, এইরূপ স্থির জ্ঞান থাকিলে কর্ত্তৃতা নিবৃত্তি হয়, তেমনি, দুই আত্মা নাই, এতদ্রূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে আত্মদ্বিত্ব বিনিবৃত্ত হয়[২৯]। যেমন দ্বিত্ব কল্পনা করিলেই এক দুই হইয়া যায়, সেইরূপ, দুই নাই ভাবিলেও দুএর বিনাশ সম্পন্ন হয়[৩০]। আত্মা পরমার্থতঃ দুই নহেন, তিনি এক অবিকারী ও সর্ব্বদা সর্ব্বগামী[৩১]। বরং সঙ্কল্পের রচনায় মানসিক পরিশ্রম আছে, পরন্তু সঙ্কল্পের বিনাশ করিতে

কিছু পরিশ্রম নাই। কেননা, ঔদাসীন্য মাত্রেই তাহা সম্পন্ন হয়[৩২।৩৩]। অতএব হে মুনিবর! কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারা এই যে সংসার দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এ দুঃখ কেবল মাত্র সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা নিবারিত হইবে। সঙ্কল্প মাত্রেই দুঃখদায়ক এবং তাহার ত্যাগ সুখদায়ক[৩৪।৩৫]। তোমার চেতনা যদি সঙ্কল্পসর্পরহিত না হয় তাহা হইলে নন্দনকাননেও তোমার সুখের সম্ভাবনা নাই[৩৬]। তুমি স্ববিবেকরূপ বায়ুর দ্বারা সঙ্কল্পমেঘ বিতাড়িত করিয়া শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল হও[৩৭]। তুমি সঙ্কল্পময়ী উন্মত্তা নদীতে উহ্যমান হইতেছ, অসঙ্কল্পরূপ মন্ত্রে উক্ত নদী শুষ্ক কর, করিয়া আপনার উদ্ধার সাধন কর[৩৮]। তুমি সমুদায় প্রাণীর হৃদয়াকাশস্থ চিদাত্মা অবলম্বন করিয়া দেখ, চিদাত্মা বায়ুভ্রান্ত তৃণাংশের ন্যায় সঙ্কল্পবায়ুর দ্বারা বৃথা ভ্রান্ত হইতেছে। তুমি আপনা আপনি সঙ্কল্প কালুষ্য মার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ ও আনন্দময় হও[৩৯।৪০]। যে হেতু আত্মা সর্ব্বশক্তি, সেই হেতু তিনি যেরূপ ভাবনা করেন আপনাকে সেই রূপই দেখেন। পরন্তু সে সমস্তই সঙ্কল্পের বিজৃম্ভণ[৪১]। এই জগৎ কেবল মাত্র সঙ্কল্প; সুতরাং মিথ্যা। হে ব্রহ্মন্! যদি সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া দেখ, তাহা হইলে আর ইহাকে দেখিতে পাইবে না[৪২]। এই যে জন্মজাল, এ জাল কেবল সঙ্কল্প বায়ুতে ঘূর্ণমান। সে জন্য অসঙ্কল্প মাত্রেই ইহা পরম পদে বিলীন বা বিশ্রান্ত হইয়া যায়[৪৩]। এই যে তৃষ্ণারূপিণী করঞ্জ লতিকা, ইহার মূল সঙ্কল্প। তুমি অসঙ্কল্পের দ্বারা ইহার মূল ছেদন কর, করিলে ইহা শুষ্ক হইয়া যাইবে[৪৪]। ইহার উত্থানও ভ্রান্তি, বিনাশও ভ্রান্তি। যেমন কোন রাজা আপনার প্রভুত্ব বিস্মরণে শোকান্বিত হয়, দুঃখিত হয়, পুনর্ব্বার তৎস্মরণে সুখী হয়, সেইরূপ, চিদাত্মাও আপনার ব্রহ্মত্ব বিস্মরণে দুঃখী হয় এবং তৎস্মরণে সুখী হয়[৪৫।৪৬]। এক বার যদি আমি ব্রহ্ম, এতদ্রূপ স্মৃতি জন্মে তাহা হইলে আর তাহার পূর্ব্বস্মৃতি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম ভিন্ন, এ স্মৃতি কষ্টপ্রদা হয় না। ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা ও আপ্তোপদেশ দ্বারা যে স্মৃতি জন্মে সে স্মৃতি যৎপরোনাস্তি প্রবলা, সে জন্য তাহা পূর্ব্বস্মৃতির পুনরুদয় অবরুদ্ধ করে। তুমি ইহাই ভাবিবে যে, আমিই একাদ্বয় আত্মা সদাবস্থিত আছি। এই ভাবনা দৃঢ় হইলে তুমি তাহাই হইবে অর্থাৎ অদ্বয়াত্মাই হইবে[৪৭।৪৮]।

হে মুনিবর! অভিহিত প্রণালী আশ্রয় করিয়া তুমি ভাবময়ী পূজা করিবে, বাহ্য পূজা পরিত্যাগ করিবে। বাহ্যপূজা তোমার ন্যায় জ্ঞানীর যোগ্য নহে। কেননা, পরমার্থ সৎ একাদ্বয় পরব্রহ্মই তোমার দেবতা এবং তোমাতে পূজ্য পূজক পুজোপকরণাদি নাই। যাহারা কল্পনার অতীত হইতে পারে নাই, তাহারাই অমুক আমার পূজ্য, আমি তাঁহার পূজক, অমুক অমুক আমার পূজার দ্রব্য, আমার পূজ্য দেবতার মূর্ত্তি বা প্রতিমা এবম্বিধ, এই সকল কল্পনা করে[৫০]।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর বলিলেন, আমি দেবপূজা প্রসঙ্গে যাহা বা যেরূপ বলিলাম, বিশ্বকে তুমি সেই প্রকার জানিবে। ইহা বাধ বুদ্ধিতে নাই, অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে আছে। ইহা তত্ত্বতঃ দ্বৈতও নহে, একও নহে। অথচ দ্বৈতাদ্বৈত-রূপে ইহার ব্যবহার নির্ব্বাহ হয়[১]। চিৎপদার্থের স্বরূপে কোনরূপ কলঙ্ক নাই। তিনি অসংসারী, অভিন্ন ও অদ্বয়। তাঁহার বৈরূপ্য অর্থাৎ জড় ভাব ও সংসারিত্ব মোহ বশতঃ উত্থিত। সেই অনির্ব্বাচ্য স্বরূপ মোহও তদীয় শক্তি বিশেষ[২]। অস্মি—অর্থাৎ আমি আছি এই ভাবের উদয় হওয়াই চিতের মোহ বা কলঙ্ক এবং তাহাই তাঁহার বন্ধন বা সংসার। ঐ রহস্য বোধগম্য হওয়ার পর তিনি পুনঃ অসংসারী ও মুক্ত হন[৩]। চিৎ আপনি আপনাকে পদার্থাকার ভাবনায় ভাবিত করিয়া নিজের অখণ্ডতা বিস্মৃত হয় ও আপনাতে দেহ, সুখ ও দুঃখাদির অধ্যাস দ্বারা মিথ্যা স্থিতি ধারণ করে। ইহারই নাম সকলঙ্কা স্থিতি। শুদ্ধা স্থিতি কি তাহাও বলি শ্রবণ কর। শুদ্ধা স্থিতি সত্যাসত্য চিন্তার অতীত ও সর্ব্ব-কল্পনা বিমুক্ত[৪।৫]। এই শুদ্ধা স্থিতির প্রথমে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় পূর্ণ সর্ব্বব্যাপীরূপে প্রথা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ মনোমধ্যে ঐরূপ অখণ্ডা বৃত্তির উদয় হয়। পরে মনের বিলয়ে বর্ণিত ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও লুপ্ত

হইয়া যায়। অর্থাৎ সত্য সাক্ষাৎকার হওয়ায় মিথ্যা জগজ্জাল দর্শন তিরোহিত হয়[৬।৭]। উক্ত রীতিতে সংসার কল্পনা বিনাশ প্রাপ্ত হইলে জীব তখন ভৃষ্ট বীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া কেবল মাত্র স্বসত্তায় অবস্থান করে। এবম্বিধা প্রথমা স্থিতির অপর নাম জীবন্মুক্ত স্থিতি। কোন কোন জ্ঞানী উহাকে পশ্যন্তী অবস্থাও বলেন। (পরা, পশ্যন্তী, বৈস্বরী, এই সকল নামের অবস্থা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই সকল অবস্থা যোগশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ সমাধি) এ অবস্থায় চেত্যচর্ব্বণ থাকে না। চিত্তের বিষয় চেত্য, তাহার চর্ব্বণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান, তাহা থাকে না। সুতরাং জীব তখন মনোমোহরূপ মেঘের প্রচ্ছাদন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শরদাকাশের ন্যায় নিতান্ত নির্ম্মল অবস্থায় স্থিত থাকে[৮।৯]। সুতরাং এতদবস্থায় চিৎ স্বসত্তায় স্থিতি করে এবং এতদবস্থাকে আমরা জীবদ্দশায় মুক্ত বলিয়া ও জীবন্মুক্ত বলিয়া বর্ণন করি[১০]। সুষুপ্তি যদি পুনরুত্থানযুক্তা না হয় (অর্থাৎ চির সুষুপ্তি হয়) তাহা হইলে তাহার সহিত এই জীবন্মুক্ত অবস্থা কথঞ্চিৎ উপমিত হইতে পারে। কেননা ইহাও অপুনর্ভব অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মবর্জ্জিত[১১]। এই প্রথমাবস্থার পরে যাহা হয় তাহাও বলি, শ্রবণ কর[১২]। তৎপরে চিৎশক্তি মনোমালিন্য রহিত হইয়া যৎপরোনাস্তি শান্তিমতী হয়। অসীম আকাশ যদি জ্যোতিঃ ও তমঃ উভয় বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে তাহারই সহিত এই দ্বিতীয়াবস্থা উপমিত হইতে পারে[১৩]। চিৎ পদার্থ যখন নিবিড় সুষুপ্তি পরিণামের ন্যায়, শিলাসন্নিবেশের ন্যায়, সৈন্ধব রসের ন্যায় ও বায়ুস্থ স্পন্দশক্তির ও আকাশে শূন্যশক্তির ন্যায় হয়, তখন চিৎ আর চেত্যোন্মুখ হয় না। (চেত্য=চিত্তের বিষয়) সমুদ্র যেমন চাপল্য ত্যাগ করিয়া স্থির হয়, চিৎও তদ্রূপ সুস্থির ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়[১৪।১৬]। এমন কোন শব্দ নাই যদ্দ্বারা ঐ অবস্থা বুঝান যাইতে পারে। ঐ অবস্থাকে জড় অজড় কাল ক্রিয়া আকাশ কিছুই বলা যায় না[১৭]। এই পদকে দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছেদ করা যায় না। ইহা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তথা বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত, এ সকল কল্পনারও অতীত। এ অবস্থা কেবল সাক্ষীর ন্যায় স্থিত ও অত্যন্ত স্পৃহণীয়[১৮।১৯]। হে সুব্রত! অতঃপর তৃতীয় পদের (অবস্থার) কথা বলি, শ্রবণ কর।

পরবর্ত্তিনী তৃতীয়াবস্থা ব্রহ্ম ও আত্মাদি শব্দেরও অবিষয়। পূর্ব্বাবস্থা

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির গম্য, এ অবস্থা তাহারও অতীত অর্থাৎ ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুরূপ। এই পদ ষড়বিধ বিকার বর্জ্জিত ও অত্যন্ত স্থির। যাহা যৎপরোনাস্তি পরম পদ বা পরম পুরুষার্থ, এই পদ তাহাই। ইহাই উৎকর্ষের চরম সীমা ও ইহাই পরম শিব অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল। এই অবিচ্ছিন্না চিৎস্থিতি পরম পাবনী নামে প্রসিদ্ধা [২০।২৩]। এই পদ শৈব শাস্ত্রোক্ত ষড়ধ্ব পন্থার, শ্রুত্যুক্ত অর্চ্চিরাদি পন্থার ও সর্ব্বপ্রকার উপাসনাপ্রাপ্য লোকের উপরে অবস্থিত। সুতরাং এ পদ আমারও বাক্যের অবিষয় অর্থাৎ আমিও এ পদ বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে অক্ষম। হে মুনে! হে বশিষ্ঠ! আমি তোমাকে সেই সনাতন দেবের কথা বলিলাম, যে দেব মার্গত্রয়ের অতীত অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির উর্দ্ধে অবস্থিত। এই বিশ্ব তন্ময় পরন্তু তিনি সর্ব্ব বিকল্পের অতীত। ইহা ছিল না হইয়াছে, এরূপ নহে এবং ইহা থাকিবে না, এরূপও নহে। ইহা পরম শান্ত অর্থাৎ সর্ব্বোপদ্রব রহিত[২৪।২৭]। যেমন একই প্রকার সমুদ্র প্রলয় কালে স্বয়ং সংক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপ এই চিদ্‌ঘন একাদ্বয় সমুদ্রের সংক্ষোভ হয় না। পরে যে সংক্ষোভ হয় সে সংক্ষোভ ঔৎপাতিক অর্থাৎ এই দেব স্বয়ং সংক্ষুব্ধ (বিকৃত) হন না। তাঁহার সংক্ষোভ (নানা ভাব) মায়িক। অর্থাৎ বিশ্বভবন (সৃষ্টি হওয়া) ভাব মায়াকৃত ব্যতীত বাস্তবতঃ নহে। এই জগৎ তদীয় কোষ বটে; পরন্তু ইহার সহিত তাঁহার কিছুমাত্র ভেদ নাই। সৎও তিনি তথা অসৎও তিনি[২৮।২৯]। তিনিই বিশ্ব, তিনিই শিব, তিনিই শান্ত, এবং একমাত্র তিনিই বাক্যের ও মনের অবিষয়। তিনি প্রলয়ের চতুর্থমাত্রা তথা তুর্য্য পদেরও উর্দ্ধে রাজমান[৩০]।

বাল্মিকি বলিলেন, ঈশান এই প্রকার উপদেশ করিলেন। মুনিবর বশিষ্ঠ ও শিবপার্শ্বগ নন্দী প্রভৃতি দেবদেব ঈশানের ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম শিবোক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। মনের বিশ্রামে তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল সেই স্থলেই ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জ্জিত হইয়াছিলেন[৩১]।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর গৌরীনাথ হর মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া নেত্রোন্মীলন করিলেন[১]। যেমন মেঘাবরণের অভাবে সূর্য্যের উদয়ে দিবসের উদয় ভাব জানা যায়, বোধগম্য হয়, তেমনি, তন্মুখাকাশস্থ নেত্রত্রয়ের উন্মীলনে বুঝা গেল, তিনি সমাধি হইতে উন্মুক্ত ও প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। পরে সেই ঈশ্বর আমাকে বলিলেন, হে মুনে! তুমি বিচার উত্থাপন কর, করিয়া আপনার পারমার্থিক স্বরূপ অবধারণ কর। পবন যেমন নির্ম্মল আকাশকে ধূল্যাদি মলে মলিন করে, তুমি ত্বংপদবাচ্য জীবভাব দ্বারা অথবা বাহ্য দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে সেরূপ মলিন করিও না[২।৩]। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের দৃষ্টিতে সব সমান অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় দুএর কিছুই নাই[৪]। তুমি শান্তি ও অশান্তিময় বিকল্প ত্যাগ কর, ধীর হও ও আত্মদর্শী হও[৫]। যদি তুমি শীঘ্র সেরূপ না হইতে পার তবে যৎকিঞ্চিৎ কাল (দু-চার বার) বাহ্য দৃষ্টি অবলম্বনে যত্নবান্ থাকিবে অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিতৎপর থাকিবে এবং তদন্তে আমার উক্তি সমূহ অনুভব করিবে[৬]। ভগবান্ শূলপাণি এইরূপ কহিয়া অবশেষে আমাকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি দেহী, এরূপ মনে করিও না। অর্থাৎ দেহই আত্মা, এরূপ ভাবিও না। এই যে দেহরূপ গৃহ, ইহা প্রাণের দ্বারা স্ফুরিত হয়[৭]। প্রাণবিহীন দেহে কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না, পরন্তু ইহা নিশ্চেষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দেহের প্রচলনশক্তি পবনশক্তির অধীন ও ইহার সংবেদনী শক্তি (জ্ঞান) চিৎশক্তির অধীন[৮]। ক্রিয়া ও ক্রিয়ামূল প্রাণপবন, তদ্দ্বয়ের বিনাশ হইলেও চিৎশক্তি অবিনাশিনী থাকে, তাহার বিনাশ হয় না। কেননা তাহার বিনাশের কারণ নাই। চিদাত্মা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মও স্বচ্ছ, সে জন্য তাহার ধ্বংস অসম্ভব। এই যে মনঃপ্রাণময় দেহ, এই দেহে তাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র হয়, জন্ম হয় না[৯।১০]। নির্ম্মল মুকুরেই প্রতিবিম্বপাত হয়, অস্বচ্ছ মলিন পদার্থে কোন কিছুর

প্রতিবিম্বপাত হয় না। সেইরূপ স্বচ্ছস্বভাব লিঙ্গ দেহেই চিদাত্মা প্রতিভাসিত হন, অস্বচ্ছ মাংসাস্থিময় স্থূল দেহে তাঁহার প্রতিফলন হয় না। অতএব, আত্মা সর্ব্বব্যাপিতারূপে স্থূল দেহে থাকিলেও না থাকার ন্যায় গণ্য হইয়া থাকেন[১১]। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যেমন সমল মুকুরে প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না তেমনি গতপ্রাণ দেহেও চিদাভাস স্থিত হয় না। যদিও চিৎ পদার্থ সর্ব্বাবস্থিত, তথাপি, বুদ্ধিময় লিঙ্গ দেহ ব্যতীত অন্যত্র তিনি কি ক্রিয়াকারিত্ব বিষয়ে কি স্বতত্ত্ববোধ বিষয়ে কোনও বিষয়ে সমর্থ হন না। লিঙ্গদেহে বুদ্ধির স্থিতি, তদ্দ্বারা তিনি কি ক্রিয়া কি স্বতত্ত্ববোধ সর্ব্ব বিষয়ে সমর্থ হন। যখন তিনি মায়াকলঙ্ক উত্তীর্ণ হন তখন তাঁহার সংজ্ঞা পরম শিব[১২।১৩]। তত্ত্বজ্ঞগণ সেই সর্ব্বসত্তাপ্রদ দেবকে শিব, হরি ও ব্রহ্মা, সুরেশ্বর ইন্দ্র, অনিল ও অনল, চন্দ্র ও সূর্য্য এবং পরমেশ্বর বলিয়া জানেন। সেই এই সর্ব্বব্যাপী আত্মা চিৎ নামে স্মৃত হন[১৪।১৫]। অধিক কি বলিব, দেবদেব, ঈশ্বর, বিধাতা, স্বর্গপতি ইন্দ্র, ইহারা সকলেই ঐ মহাচিতের উল্লাস এবং ইহারা সকলেই মোহবর্জ্জিত[১৬]। এই জগতে যাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর নামে প্রসিদ্ধ, সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু হর উক্ত পরব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত। এ কথা শাস্ত্রীয় ব্যবহার দর্শনে কিন্তু পরমার্থ দর্শনে ইহারাও ভ্রমসৃষ্ট অর্থাৎ উক্ত পরম পদের প্রতিভাসে আবির্ভূত[১৬।১৮]। ভ্রান্তির বীজ অবিদ্যাই কল্পনা জালের রচয়িত্রী, এবং তাহার শাখা অসংখ্য[১৯]। বেদ, বেদার্থ, সৃষ্টিক্রম, প্রলয়ের নিয়ম, ক্রিয়াকলাপ, উপাসনা, তদধিকারী জীবসঙ্ঘ, তাহাদের কাম কর্ম্ম বাসনা ও জন্ম মরণ জীবন, এ সমস্তই অবিদ্যা হইতে প্রবৃত্ত। অধিক কি বলিব, অবিদ্যাকার্য্যের সঙ্খ্যা নির্ণয় ও বর্ণনা অস্মদাদিরও অশক্য। যে হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ইহাদেরও শরীর অবিদ্যামূলক, সেই হেতু বলা যায়, চিদাত্মা ব্রহ্মাদিরও পিতা[২০।২১]। বৃক্ষ যেমন স্বাঙ্গীভূত পল্লবাদির কারণ, সেইরূপ, মহাদেবও ব্রহ্মাদি তৃণান্ত পদার্থের কারণ। যত নাম আছে সে সমস্তই তাঁহার নাম, যত জ্ঞান আছে, সে সমস্তেরই কর্ত্তা তিনি, সুতরাং তিনিই সব। তিনিই বন্দনীয়, তিনিই পূজনীয়, যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে সে ব্যক্তির নিকট তিনি নিত্যপ্রত্যক্ষ[২২।২৩]। সম্বেদনরূপে তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বগোচর। কাযেই তাঁহার আবাহন করিতে হয় না ও তজ্জন্য মন্ত্রও পাঠ করিতে হয়

না[২৪]। তিনি নিত্যাহূত, সর্ব্বত্রাবস্থিত ও সর্ব্বদা সর্ব্বলভ্য। হে মুনিবর! যে, যে বস্তু ও যে অবস্থা প্রাপ্ত থাকুক, সে, সেই বস্তুতে ও সেই অবস্থায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। তিনি স্বয়ংই রূপ, আলোক ও তদ্দ্রষ্টা মনের সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সে জন্য তিনিই পূজাদি ব্যবহারের মূল। অতএব, তিনিই আদ্য ও দেব, তিনিই নমস্কার্য্য, তিনিই স্তুত্য, তিনিই পূজ্য ও তিনিই অন্যান্য দেবতার ঈশ্বর[২৫।২৬]। ইঁহাকেই তুমি জ্ঞাতব্য পদার্থের চূড়ান্ত স্থান ও মহত্ত্বের শেষ সীমা বলিয়া জানিবে। এই পরম দেব পরমাত্মার দর্শনে জরা শোক ও ভয় থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন ভৃষ্ট বীজে অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ, এতত্তত্ত্বজ্ঞ জীবের জীবত্ব থাকে না, অর্থাৎ তাহারা জন্মমরণাদি রহিত হইয়া যায়। তুমিও সর্ব্বজীবে ইঁহাকে বিদিত হও, হইয়া পরম পদ লাভ কর, বৃথা বাহ্য দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ থাকিও না[২৭।২৮]।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর বলিলেন, ব্রহ্মজ্ঞগণ বিদিত আছেন যে, একই চিদ্রূপী দেব রুদ্র। তিনি সংসাররূপ রুজা (রোগ) বিদ্রাবিত করেন বলিয়া রুদ্র। সকলের নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর, দ্যোতমান বলিয়া দেব ও ঘটসত্তা পট সত্তা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সত্তার অন্তরে অনুস্যূত সত্তা বলিয়া সৎ। ইনি স্বানুভূতিময়, শুদ্ধস্বভাব ও বীজের বীজ। ইনি সংসার পদার্থের সার, কর্ম্মের কর্ম্ম ও কারণ সমূহের কারণ। তিনি নিজে অকারণ ও মালিন্য রহিত। ইনি সংসার দৃষ্টিতে সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বোৎপাদক কিন্তু পরমার্থ দর্শনে কোন কিছু না থাকায় কারণও নহেন, কার্য্যও নহেন, কর্ত্তাও নহেন[১।৩]। ইনি চেতনের চেতন ও নিজে চেতনারূপে রাজমান। ইনি সূর্য্যাদিরও সূর্য্য অর্থাৎ প্রকাশক, অথচ চক্ষুরাদির অপ্রকাশ্য। তত্ত্বজ্ঞগণ ইঁহাকে কেবলা চিৎ ও বৎপরোনাস্তি বিমলা বলিয়া জানেন[৪।৫]। এই

দেবে ক্ষিত্যাদি ভূত নাই, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক (কাল্পনিক) সত্যতা নাই ও নামগ্রাহিণী বিশেষ সত্তাও ইঁহাতে নাই, ইনি সর্ব্বানুস্যূতা (সর্ব্বব্যাপী) মহাসত্তা[৬]। ইনিই প্রথমে রাগরূপী, পরে বিষয় স্মৃতিকালে রঞ্জক, বিষয় সম্বন্ধ কালে রঞ্জনা, তদ্বিয়োগে কেবলরূপী হন ও নিজে আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত হইলেও কুড্যের ন্যায় মূর্ত্ত হন[৭]। এই দেবই সর্ব্বচিত্তের আধার, তদ্দ্বারা এতদাধারে কোটী কোটী জগৎ মরু-মরীচিকার অনুরূপে প্রস্ফুরিত হইয়াছে হইতেছে ও হইবে[৮]। ইনি স্বপ্রকাশস্বভাব, ইনি আছেন বলিয়াই এই জগৎ এতদ্রূপে সম্পন্ন হইতেছে[৯]। ইনি অণু অপেক্ষা অণু অথচ বৃহত্তম সুমেরু ইঁহার গর্ভস্থ[১০]। ইনি কল্পকল্পান্ত কাল আক্রম করিতেছেন অথচ কাল ইঁহাতে নাই। অর্থাৎ ইহা অল্প তাহা অধিক, গণনা ইহার উপর প্রক্ষিপ্ত নহে। কেশ সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে শতভাগ কল্পনা করিলে যে সূক্ষ্মতা কল্পিত হয়, এই দেব তদপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম। অথচ এই দেব সর্ব্বব্যাপী[১১,১২]। ইনি সংসার রচনা করেন নাই, অথচ ইনি কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হন। ইনিই নানা কর্ম্ম করেন, অথচ কিছু করেন না[১৩]। ইঁহাকে দ্রব্য, অদ্রব্য ও দ্রব্যবান্ বলা যায় ও অকায় ও মহাকায় বলাও যায়[১৪]। ইঁহাকে এতদ্দিন, অর্থাৎ অদ্য বলা যায়, প্রাতঃও বলা যায়। অথচ ইনি অদ্যও নহেন, প্রাতঃও নহেন[১৫]। উন্মত্ত, বালক ও ম্লেচ্ছাদি গণ যে নিরর্থক শব্দ উচ্চারণ করে, সে সকল নিরর্থক শব্দও তিনি। অর্থাৎ ভিড়্ ভিড়্, বা ভিট্ ভিট্, খিল্ খিল্, পিচ্ পিচ্, ইত্যাদি নিরর্থক বাক্যও তিনি। আবার তাঁহারই প্রসাদে ঐ সকল বাক্য সার্থক্যে পরিণত হয়। যাহা সত্য নহে বা যাহাতে সত্য নাই, তাহা নাই[১৬,১৭]। হে মুনিবর! যাঁহাতে এই বিশ্ব আছে, যাঁহা হইতে ও যিনি এই বিশ্ব হইয়াছেন, অথবা হইয়াছে ও অভেদে বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ব্বাত্মদেবকে আমি নমস্কার করি[১৮]। না থাকিলেও যাঁহাতে আরোপ করা যায় ও তৎপ্রভাবে যাহা না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথা ঐ সকল অনর্থক শব্দও যাঁহার প্রসাদে সার্থক হইয়া দাঁড়ায়, সেই সর্ব্বরূপী বা বহুরূপী দেবকে আমি নমস্কার করি[১৯]।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

——()○()——

ঈশ্বর বলিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত শব্দ রাশির অর্থ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় সেই সর্ব্বেশ্বরের শক্তিপুঞ্জে না হয় এমন কি আছে[১]? এমন কিছুই নাই যাহা চিন্তামণিতুল্য চিন্মণিতে প্রতিভাসিত না হয় এবং এমন কোন পদার্থ নাই যাহা বিচিত্র বা অদ্ভুত বলিয়া গণ্য হইতে পারে[২]। সেই ঈশ্বরীয়া চিৎ শক্তিই ক্ষেত্রপতিত বীজকে অঙ্কুরাদিরূপে পরিণামিত করে ও অবশেষে তাহা অন্নরূপে গৃহীত হয়[৩]। এইরূপ, রসসামান্যরূপিণী চিৎ শক্তিই উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে আগত ও জলরূপে পরিণত হয়, তথা, জিহ্বেন্দ্রিয় যোগে লৌল্য প্রাপ্ত হয়[৪]। সেই শক্তিই কুসুমে গন্ধরূপে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যরূপে, শিলামধ্যে প্রতিমারূপে ও স্থিতিশীল হিমালয়াদিরূপে প্রকটিত হইতেছে। পবনের স্পন্দ, ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শ, সেই চিৎ শক্তির বিলাস[৬।৭]। তাঁহারই প্রবৃত্তি শক্তিতে সংসার, তথা, তাঁহারই নিবৃত্তি শক্তিতে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি ক্রম পরম্পরা দ্বারা মোক্ষ প্রকটিত হয়[৮]। নিমেষাদি কল্পান্তগণাত্মক কালও সেই চিৎ শক্তির বপু অর্থাৎ শরীর[৯]। অধিক কি বলিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, এ সকল সংজ্ঞা কেবল শক্ত্যুৎকর্ষের তারতম্য মূলক অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যব্যবস্থাপিকা সেই মূল শক্তিরই অবান্তর নাম বা অবান্তর ভেদ[১০]। দীপ যেমন গৃহমধ্যে স্বক্রিয়া বিস্তার করে, করিয়া পদার্থ প্রকাশের কারণ হয়, সেইরূপ, অতি বিস্তৃত ও অতি নির্ম্মল সেই সাক্ষিচৈতন্যে এই জগৎ কার্য্য প্রকাশিত হইতেছে[১১]। চিদাত্মা আকাশে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নাট্যশালা (দেহ), তত্রস্থ রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় (জাগ্রদাদি অবস্থার কার্য্য), সে নাট্য আত্মশক্তি রচিত সংসার, চিদাত্মা এই সংসার নাট্য তিনি সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া দর্শন করিতেছেন[১২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে জগন্নাথ! শিবের শক্তি কি? কত প্রকার? কি প্রকারে স্থিত? এবং তাহার সাক্ষিত্বই বা কি? তাহার সখ্যা

ও কার্য্যই বা কত? এই সকল কথার নিরবশেষ অথবা সংক্ষেপ বর্ণনা আমাকে বলুন[১৩]।

ঈশ্বর বলিলেন, শিব অপ্রমেয়, শান্ত, পরমাত্মা, চিন্মাত্র, সর্ব্বময় ও নিরাকার। ঈদৃশ শিবের ইচ্ছাশক্তি, ব্যোমশক্তি, কালশক্তি, নিয়মন শক্তি ও সর্ব্বানুস্যূত এক মহাশক্তি বা মহাসত্তা আছে। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্ত্তৃশক্তি ও অকর্ত্তৃশক্তি প্রভৃতি (কর্ত্তৃতাশক্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তি শক্তি। অকর্ত্তৃতাশক্তি অর্থাৎ নিবৃত্তিশক্তি।) এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন অবান্তরশক্তি যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই[১৪।১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে দেব! অভিহিত শক্তি সকল কুত্রত্য অর্থাৎ কোথা হইতে আইসে? শক্তির আবার বহুত্ব কি? কেনই বা উহা বহু? কি প্রকারেই বা ঐ সকল শক্তির উদয় বা উদ্রেক হয়? এবং ঐ সকল শক্তি শক্তিমান্ পদার্থ হইতে ভিন্ন? কি অভিন্ন? এই সকল বিষয় আমাকে বলুন।

ঈশ্বর বলিলেন, শিব অপরিচ্ছিন্নস্বভাব, সুতরাং অনন্ত ও চিন্মাত্র। তাঁহার সেই চিন্মাত্রতাই তাঁহার শক্তি। অর্থাৎ মায়িক কল্পনা প্রযুক্ত যে চিদ্ভেদ, চিতের ভিন্ন ভাব, সেই চিদ্ভেদকেই আমরা শক্তি সংজ্ঞায় ব্যবহার করি। বস্তুতঃ তাহা চিৎ-ই, চিৎ হইতে ভিন্ন নহে। তাহা যে বিভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয় সে প্রতীতি কল্পনা ঘটিত[১৭।১৮]। জল যেমন তরঙ্গ, বীচি ও লহরী, এ সকল বিভিন্ন হইলেও জলাকারে অভিন্ন বা এক, তেমনি, জ্ঞানিত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষিত্ব প্রভৃতিও ঐরূপ ঐরূপ কল্পনায় বিভিন্নের ন্যায় হইলেও চিদাকারে এক বা অভিন্ন। অতএব, কল্পনাভেদের অনুবিধানে শক্তির ভেদ অর্থাৎ বহুত্ব অঙ্গীকৃত হয়[১৯]। এই ব্রহ্মাণ্ডনামক জগৎ, ইহা যেন একটী নৃত্যমণ্ডপ, কাল যেন ইহাতে সুশিক্ষিত নর্ত্তক। কোন কোন বাদী ঈশ্বরীয় জগদ্ব্যবস্থাপিকা কল্পনাকে তদীয় কৃতি, যত্ন ও ইচ্ছা প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং কেহ বা উহাকে ঈশ্বরীয় ইচ্ছা বলিয়াও উল্লেখ করেন। অপিচ ঐ ইচ্ছাকে কেহ কেহ ঈশ্বরীয় কাল বা কাল শক্তি বলেন। কেহ বা এই কালকে গণনায় দ্বিপরার্দ্ধ বলেন, (মহাপ্রলয়কে সীমা করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ পরিমাণ (এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, লক্ষ, এইরূপ গণনার শেষ সংখ্যা পরার্দ্ধ বা শেষ সীমা) স্থির করেন এবং

বলেন, ব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল এই দ্বিপরার্দ্ধসঙ্খ্যক।) কিন্তু আমরা বলি, কলনকারী (লয়কারী) বলিয়া কাল, আর কল্পকারী (সৃজনকারী) বলিয়া কল্প[২০।২১]। এই কালশক্তিরই অপর নাম নিয়তি। নিয়মনকারী বলিয়া নাম নিয়তি। নিয়ম দ্বিবিধ। ইহা এইরূপ হউক বা হইবেক, থাকুক বা থাকিবেক, এই এক নিয়ম। এ নিয়মকে আকারনিয়ম বলা যায় এবং ইহা হইতে তাহা হইবে, অবশ্য হইবে, এই ভাবের অপর এক নিয়ম। এ নিয়মকে বিকারনিয়ম বলা যায়। অতএব, উক্ত কালশক্তির সত্তায় আকারনিয়ম ও বিকারনিয়ম, এই দ্বিবিধ নিয়ম অব্যাহত ভাবে স্থাপিত হওয়ায় প্রোক্ত কালশক্তিরই অপর নাম "নিয়তি" হইয়াছে। (নিয়মনাৎ নিয়তিঃ।) সে দিকে মহারুদ্র ও এ দিকে তৃণ হইতে ব্রহ্মা, সমস্তই উক্ত নিয়তির অধীন[২২]। যাবৎ না নিয়তি তত্ত্ববোধ দ্বারা পরিমার্জ্জিত হয়, তাবৎ জগজ্জাল নামক নাট্য শালায় কালনামক নটের নৃত্যের অবসান নাই[২৩]। এই নাট্যে নানা রস ও নানা বিলাস চলিতেছে। এ নাট্যের বিশ্রাম কালে পুষ্কর ও আবর্ত্তক প্রভৃতি কল্পান্ত মেঘের দ্বারা ঘর্ঘর বাদ্য হয়। এ নাট্যে ছয় ঋতু ও ছয় ঋতুর ধর্ম্ম প্রকটিত হয়, এবং এ নাট্যের মন্দির (এই জগৎ) বর্ষা বারিতে আপ্লুত হয়। মেঘ সকল নীল বস্ত্রের ভ্রম জন্মায়, সমুদ্র সপ্তক নাট্যমন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে, এ নাট্যমন্দির কখন জলমগ্ন কখন বা উন্মগ্ন হয়, মস্তকোপরি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত ধারণ করে, ইহার উর্দ্ধদেশ চন্দ্র সূর্য্য ও গঙ্গা এই তিন্ মুক্তাফল শোভা বিস্তার করে, এ নাট্য মন্দির লোক, লোকপাল ও ভুবন দ্বারা সজ্জিত হয়, এতন্মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন্ স্থানে নাট্যকার নট পাদ বিহরণ (পদক্ষেপ) করে, চন্দ্র ও সূর্য্য এতন্নাট্যকারের কুণ্ডল, তারা সকল ঘর্ম্মকণা, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড এতন্নাট্যমন্দিরের বিতান, ইত্যাদি[২৪।৩১]।

হে মুনে! নিয়তির বিলাসস্বরূপ এই যে সংসারনাট্য, এ নাট্য নানা বিকারে ও আকারে পরিপূরিত। সর্ব্বনাট্যের শ্রেষ্ঠ এই নাট্য চিরব্যাপী। ঈশ্বরনামধেয় একমাত্র দ্রষ্টা (দর্শক) ইহাতে অবস্থিত। তিনি নিত্যোদিত ও সাক্ষীর ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া এই স্বাত্মভূত সংসারনাট্য দর্শন করিতেছেন। এ নাট্য তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, এবং তিনিও এতন্নাট্য হইতে ভিন্ন নহেন[৩২]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

——(*)——

ঈশ্বর বলিলেন, যাঁহার বর্ণনা করিলাম তিনিই পরম দেব ও সাধুগণের নিত্যপূজ্য। তিনি চিদ্‌ঘন, তাঁহার স্বরূপ অনুভূতি, তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাশ্রয়[১]। ইনি ঘটে, পটে, বটে, কুড্যে, শকটে ও নরে স্থিত আছেন এবং ইনিই শিব, হর, হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের ও যম। ইনি সর্ব্বাত্মা সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে উভয়ত্রই বিদ্যমান। সকল সদ্বুদ্ধিশালী এই ভগবান্‌কে স্বাত্মভাবে ও নানা ক্রমে পূজা করিয়া থাকেন[২।৩]। হে মহাবুদ্ধিধর! হে তত্ত্বজ্ঞ! বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এই দ্বিবিধ পূজাক্রমের মধ্যে প্রথমে বাহ্যিক পূজার ক্রম বলি, শ্রবণ কর, পশ্চাৎ আন্তর ক্রমের পূজা শ্রবণ করিও[৪]। যদ্যপি দেহরূপ গৃহ স্নান আচমনাদির দ্বারা পবিত্র হয়, তথাপি, ইহাতে যে সাক্ষিচৈতন্যের প্রকাশ আছে, সেই প্রকাশই (স্বাত্মনির্লিপ্ততা জ্ঞানই) বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ পূজায় গ্রাহ্য। কেননা, তদ্বিজ্ঞান দ্বারা দেহের যেরূপ শুদ্ধি হয় সেরূপ শুদ্ধি স্নানাচমনাদির দ্বারা হয় না। এ বিষয়ের অপর এক স্থূল কথা এই যে, ভাবশুদ্ধিই মুখ্য শুদ্ধি, স্নানাদি তাহার উত্তেজক মাত্র। অপিচ, অন্তরে যে ধ্যান অনুষ্ঠিত হয় সেই ধ্যানই তাঁহার মুখ্য পূজন, অন্য প্রকার পূজন তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ মাত্র[৫।৬]। অতএব, ধ্যানের দ্বারাই সেই ত্রিভুবনাধার দেবের পূজা করা সদা বিধেয়। তিনি চিদ্রূপ, বাহিরে সূর্য্যাদি প্রকাশেরও প্রকাশক, অন্তরে সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী ও অহম্ভাবের সার। ঊর্দ্ধাকাশ তাঁহার স্কন্ধ ও অধস্তনাকাশ তাঁহার পাদপদ্ম। (পৃথিবী আকাশে অবস্থিত, অর্থাৎ পৃথিবী আকাশের মধ্য বিতানে অবস্থিত। সে ভাবে ঊর্দ্ধতনাকাশ ও অধস্তনাকাশ বলা যায়।) দিঙ্মণ্ডল তাঁহার বাহু, ভূলোক ভবলোক জনলোক ও সত্যলোক প্রভৃতি লোকসমূহ তাঁহার সেই হস্তবিধৃত আয়ুধ[৭।৯]। এবংবিধস্বরূপ হইলেও তিনি হৃদ্‌পদ্মমধ্যে বিশেষরূপে প্রকাশমান হন। ইনি তমঃপারগামী ও স্বয়ং পার ও পর্য্যন্তরহিত[১০]। ইঁহারই অধঃ, ঊর্দ্ধ,

দিক্, বিদিক্, সর্ব্বত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র, হরি, রুদ্র ও ঈশ প্রভৃতি অমরবৃন্দ শোভা বিস্তার করিতেছে[১১]। এই সকল ভূতবৃন্দ তাঁহার রোমাবলি, ও ইহার শক্ত্যাদিনামক ত্রিজগৎপরিচালক যন্ত্ররজ্জু তাঁহার বপুস্থ নাড়ী। প্রক্রান্ত পরম দেব এবম্বিধ প্রকারে সর্ব্বদা সাধু পুরুষের পুজনীয় ১২-১৩। ইনি কেবলচিৎ, অনুভূতিময়, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাশ্রয়। ঘট, পট, বট, শকট, নর, বানর, কুত্রাপি ইহার অবিদ্যমানতা নাই। শিব, ব্রহ্মা, হর, হরি, ইন্দ্র ও কুবের, এ সমস্তই ইনি। রূপভেদ গ্রহণে ইনি অনন্ত ও রূপভেদ পরিত্যাগে ইনি এক ও ইঁহার বিগ্রহও কেবল মাত্র মহাসত্তা[১৪।১৫]। যিনি জগজ্জালের বিবর্ত্তন করেন সেই কাল ইঁহার দ্বারপাল। (অভিপ্রায় এই যে, কালই চিত্তের অশুদ্ধি কালে প্রবেশ নিষেধ করে ও চিত্তশুদ্ধি কালে প্রবেশের অনুকূল হয়)। ১৬। এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তাঁহারই মায়াযুক্ত একাংশভাগী হইয়া রহিয়াছে। সাধক এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, সকল প্রাণীর শ্রবণ, চক্ষুঃ, মস্তক ও হস্তপদাদি তাঁহারই মায়িক অবয়ব, অন্য কিছু নহে। সাধক এবম্প্রকার চিন্তা বা ধ্যান করিবেন বটে; পরন্তু তাঁহার অসঙ্গাদ্বয়তা বিস্মৃত হইবেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার মননের অতীত, অথচ সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্ব সঙ্কল্পদাতা, সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ ও সমুদায়তঃ অদ্বিতীয়, এবম্বিধা চিন্তাও করিবেন। এইরূপ চিন্তার পর, ধ্যানের পর, যথাবিধি অর্চ্চনা করিবেন। হে ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ! অর্চ্চনার বিধানও বলি, শ্রবণ কর। এই আত্মদেব স্বাত্মসম্বিৎ দ্বারাই পূজিত হন, উপহার দ্বারা অর্থাৎ পুষ্পাদির দ্বারা পূজিত হন না[১৭।২২]। এই দেবের পূজায় ধূপ, দীপ, পুষ্প, অলঙ্কার, অন্ন, চন্দন, বিলেপন, কুঙ্কুম, কর্পূর ও ছত্র চামরাদি কিছুই প্রদান করিতে হয় না। একমাত্র অক্লেশলভ্য শীতল ও অনশ্বর স্বাত্মবোধরূপ অমৃত দ্বারাই ইনি পুজিত হন, এবং তাহাই তাঁহার ধ্যান ও তাহাই তাঁহার শ্রদ্ধা বা শুদ্ধা পূজা[২৩।২৫]। অনবরত স্বান্তঃস্থ বিশুদ্ধচিন্মাত্রসাক্ষাৎকার করাই পরম শিবের জ্ঞানিসম্মতা মুখ্যা পূজা। দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, পান, ভোজন, শ্বাস, প্রশ্বাস, স্বপ্ন, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, সকল কার্য্যেই শুদ্ধ সম্বিন্ময় হইবেক। পরমাস্বাদযুক্ত ধ্যানরূপ অমৃতে আপনিই আপন আত্মার পূজা করিবেক। একমাত্র ধ্যানই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজোপহার। ধ্যানই অর্ঘ্য, ধ্যানই পাদ্য, এবং ধ্যানই পুষ্প, অধিক কি

বলিব, সমস্তই ধ্যানাত্মক, ইহা বিদিত হইবে[২৬।২৯]। ধ্যানামৃত উপহার ব্যতীত ইতর উপহারের দ্বারা আত্মলাভ হয় না। ধ্যান প্রভাবেই আত্ম-দেব প্রসন্ন হন ও তদ্দ্বারা ভোগসুখও লব্ধ হয়[৩০]। হে মুনে! এই আত্মদেব দেহরূপ গৃহে ভোগোপভোগ করিতেছেন। হে মতিমন্! ত্রয়োদশ নিমেষ ব্যাপিয়া ধ্যানামৃতের দ্বারা পূজা করিলে অতি মূঢ়ও গো দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক শত নিমেষব্যাপী পূজায় ততোধিক ফল লব্ধ হয়। অর্দ্ধ ঘটিকা কাল পূজায় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় ও ঘটিকাব্যাপী পূজায় সহস্র অশ্বমেধের ফল হয়। ধ্যানই বলি, ধ্যানই উপহার ও ধ্যানই জপাদি[৩১,৩৪]। ধ্যানযোগে এক ঘটিকা কাল পূজা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। মধ্যাহ্ন কালে এই প্রকার পূজার ফল আরও অনেক অধিক। দিবসব্যাপিনী পূজার দ্বারা পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই পরম যোগ ও ইহাই শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া এবং ইহারই নাম পরম শিবের বাহ্য পূজা। এইরূপ পূজা যৎপরোনাস্তি পবিত্র ও সর্ব্ব পাপ বিনাশের হেতু। মনুষ্য যদি ক্ষণকালও এই পূজার যথাযথ অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে সে ইহলোকে সমস্ত লোকের পূজ্য হয় ও অবশেষে মুক্তি লাভ করে[৩৫,৩৭]।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

—○*()*○—

ঈশ্বর বলিলেন; যাহা যৎপরোনাস্তি পবিত্রকারক ও সর্ব্বপাপবিনাশক, সেই আত্মপূজনের ক্রম এক্ষণে বর্ণন করি, সাবহিত হও[১]। এই ধ্যানাত্মিকা পূজা গমন, অবস্থান, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সকল সময়েই বিহিত। এই যে শরীরস্থ পরম শিব, পূজক ইঁহারই সদা ধ্যান করিবেন। ইনিই অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধি মাত্রের দ্বারা সমুদায়ের কর্ত্তা ও বোধয়িতা[২,৩]। ইনিই শয়ন, উত্থান, গতি, স্থিতি, স্পর্শন ও অস্পর্শন প্রভৃতির প্রয়োজয়িতা ও ইনিই ভোগ সমূহের কর্ত্তা ও ভোক্তা। যে কিছু বাহ্য

পদার্থ সে সমস্তই এই জ্ঞানরূপী পরম শিবের নির্ম্মিত[৩,৫]। এই দেহ তাঁহার লিঙ্গ, এই লিঙ্গে তাঁহার অর্চ্চনা করিবেক। (পদ্মাসনে বসিয়া সম্মুখ ভাগে প্রসারিত হস্ত ও অঞ্জলিবদ্ধ হইলে দেহটা দেখিতে শিব-লিঙ্গের মতনই হইবে)[৬]। চঞ্চল না হইয়া ও উদ্বেগশূন্য হইয়া প্রারব্ধ ভোগে স্থিত থাকিবেক, স্বাত্মজ্ঞানরূপ জলে স্নান করিয়া শুচি হইবেক, এবং ভাবিবেক, আমি নিত্যাববোধ স্বরূপ। এই নিত্যাববোধই শিব ও তদ্ভাবনাই তাঁহার পূজা[৭]। ঐ সময়ে মন যদি অন্ধকারে নিমগ্ন হয় তাহা হইলে আপনাকে সর্ব্বনভঃপরিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডল ভাবনা করিবেক। মন যদি পরিতাপে নিমগ্ন হয় তবে চন্দ্রমণ্ডল ধ্যান করিবেক। কি বাহ্যবিষয়িনী বুদ্ধিবৃত্তি, কি আন্তর্ব্বিষয়িনী মনোবৃত্তি, সর্ব্ববৃত্তিপ্রকটিত পদার্থ রাশির সহিত এই পূজ্য পরম শিব অনুস্যূত রহিয়াছেন অর্থাৎ ইনি সর্ব্ববুদ্ধিপ্রকাশক নিত্য সম্বিৎরূপে বিরাজ করিতেছেন ও মুখ নাসিকাদি পথে বাহিরেও আপনার অবভাস প্রাপ্ত করিতেছেন[৮,৯]। ইনি শব্দাদি বিষয়কে স্বাত্মানন্দ রসে সিক্ত করিয়া তাহা হইতে আপ-নিই আপনার আনন্দ রসের স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। ইন্দ্রিয় ও মন এই দুটী তাঁহার অশ্ব, প্রাণ ও অপান ইঁহার রথ, বুদ্ধি ইঁহার গুহা অর্থাৎ গুপ্ত বাসস্থান[১০]। এই পরম শিব জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞাতা, কর্ম্ম সত্ত্বের কর্ত্তা, ভোগ্য পদার্থের ভোক্তা ও জ্ঞান সমূহের স্মরণকারী[১১]। যাহা কিছু বিদিত সে সমস্তই ইঁহার অঙ্গ। ইনি বিষয়ভাবনা ও বিষয়ের অভাবনা এতদুভয় দ্বারা লক্ষিত হন। ইনি সূর্য্যাদি প্রকাশক পদার্থেরও প্রকাশক সুতরাং অত্যধিক ভাস্বর। এই সর্ব্বগামী পরম শিবকে বক্ষ্যমাণ প্রকারেও চিন্তা করিবেক। ইনি নিষ্কলও বটেন, সকলও বটেন, ইনি দেহেও আছেন, ব্যোমেও আছেন, রঞ্জিতও বটেন, অরঞ্জিতও বটেন, এবং ইনিই নিত্যসংবিৎ ও অনিত্য বা আগন্তুক সংবিৎ (জ্ঞান)[১২,১৩]। ইনি মনে ও মননে, প্রাণে ও অপানে, তথা তদ্দ্বয়ের অন্তরালে ও হৃৎ কণ্ঠ তালু ভ্রূ ও নাসা প্রদেশেও আছেন[১৪]। ইনি শৈব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ৩৬ তত্ত্বের সীমাস্থান ও উন্মুখন্ত * অবস্থার অর্থাৎ

---

* মূলা প্রকৃতি ১ তৎপ্রভব তন্মাত্র ৫, তাহাদের ধর্ম্ম ৫, স্থূল ভূত ৫, তাহা-দের বিশেষ গুণ ৫, জ্ঞান কর্ম্মভেদে ইন্দ্রিয় ১০, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত, এই ৪ অন্তঃকরণ ও জীব ১ এই ৩৬ তত্ত্ব, শিব এ সকলের অতীত। যোগীরা যাহাকে

শিবযোগ প্রসিদ্ধ সবীজ সমাধির অতীত। ইনিই মনোরূপ পক্ষীকে শব্দাদি বিষয়ে প্রেরণ করেন[১৫]। ইনি ব্যবহারে বিকল্পী অর্থাৎ নানা বিশেষণ যুক্ত, পরন্তু নির্ব্বীজ সমাধিতে ও মোক্ষে নির্ব্বিশেষণ অর্থাৎ কেবল। অপিচ, ইনি বাচ্য ও লক্ষ্য এই দ্বিবিধ বাক্যার্থের বিষয়। তৈল যেমন তিলের সর্ব্বাবয়বব্যাপী, সেইরূপ, ইনিও সর্ব্বদেহীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী। সর্ব্ব-ব্যাপী হইলেও ইনি অন্তরস্থ অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে অদৃশ্য[১৬]। ইনি ভূত মাত্রার অতীত অর্থাৎ অমূর্ত্ত, অথচ ভূতমাত্রার দ্বারা কঠিন অর্থাৎ মূর্ত্ত। (ভূতগণের পরিণামে যে দেহ জন্মে, সে দেহও তিনি, অর্থাৎ দেহ তাঁহার অতিরিক্ত নহে)। দেহের এক দেশে যে হৃদ্‌পদ্ম, সেই হৃদ্‌পদ্মে ইনি রাজমান[১৭]। ইনি চিন্ময়, নির্ম্মল, অনিরবয়ব ও সাবয়ব কল্পনায় দক্ষ। ইঁহার স্বরূপ কেবল স্বানুভূতি, সে ভাবে ইনি প্রত্যক্ষ[১৮]। ইনিই প্রত্যক্‌চেতনা অর্থাৎ প্রতিশরীরস্থ নির্ব্বিশেষ আত্মচৈতন্য। এতাদৃশ স্বরূপ হইলেও ইনি আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হন, হইয়া ভোগ কামনা করেন ও ক্ষণমধ্যে কল্পনার দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী হইয়া অথবা ভোক্তা ও ভোগ্য হইয়া তদ্রূপ দ্বিত্বে স্থিত হন[১৯]। সাধক এই অর্চ্চনা কালে ভাবিবেন যে, এই দেহ তাঁহারই পরিচারক সুতরাং হস্ত পদ কেশ নখ ও দন্ত প্রভৃতি অবয়ব তাঁহারই অবয়ব[২০]। পত্নীগণ যেমন উত্তম পতির সেবা করে সেইরূপ বহু বিচিত্র শক্তি নানা উপচারে শিবরূপ আমার সেবা করে[২১]। মন আমার দ্বারপাল, সে আমাকে ত্রিজগতের সংবাদ দেয়, শুদ্ধিরূপিণী চিন্তা বা ধ্যান আমার প্রতীহারী অর্থাৎ দ্বার রক্ষক, আত্মবুদ্ধি আমার শক্তি, ক্রিয়া কৌশল আমার বরাঙ্গনা, বিবিধ জ্ঞান আমার বিচিত্র আভরণ, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ আমার ক্ষুদ্র দ্বার, বুদ্ধি-ন্দ্রীয়গণ আমার বৃহৎ দ্বার, পরন্তু আমি সেই ও সেই আমি আকৃতি বর্জ্জিত পরিচ্ছেদরহিত ও অনন্ত বা অপরিসীম[২২।২৩]। একই আত্মা আমি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ভাবে স্থিত আছি। হে মুনিবর! যে সাধক এইরূপ লোকোত্তরী (অলৌকিক) আত্মচমৎকৃতি প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রত্যক্‌তত্ত্ব সাক্ষাৎকার অবস্থায় স্থিত হয়, সে সাধকের অন্তর দেবত্ব প্রাপ্তে অখিন্ন ও পরিপূর্ণ হয়। তাহার অস্তও হয় না, উদয়ও হয় না, সে রোষ তোষের অতীত হয়, তৃপ্তি অতৃপ্তি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাহাকে কাতর করে

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলেন, শৈবেরা তাহাকেই উন্মনস্ত অবস্থা বলেন।

না, সে কিছু বাঞ্ছাও করে না, কিছু ত্যাগও করে না, সে জীবন্মুক্ত ও সুন্দরাশয়। যাবৎ না দেহপাত হয় তাবৎ পর্য্যন্ত অভিহিত প্রকারে দেবার্চ্চনায় রত থাকিবেক। বর্ণিত প্রকারের চিত্তত্বযুক্ত দেহই তাঁহার দেবতা, এই দেবতাকেই তিনি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে (যে পদ্ধতি বলা হইল) দিবারাত্র অর্চ্চনা করিবেন[২৫।২৯]। প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা; সর্ব্বত্র সম বুদ্ধির দ্বারা, ও যথা প্রাপ্ত ক্রমে এই চিদ্দেবতার অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। গন্ধপুষ্পাদি আহরণ বিষয়ে যত্ন অকর্ত্তব্য[৩০।৩১]। যাহারা ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্ত তাহারা ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যের ও যাহারা ক্ষত্র দেহ প্রাপ্ত তাহারা ক্ষত্র-বিহিত কার্য্যের দ্বারা এই চিদাত্মরূপ শোভন শিবের পূজা করিবেন[৩২]। অযত্নলভ্য ভক্ষ্য ভোজ্য অন্ন পান শয্যা আসন বিভব কান্তাসম্ভোগ বিলাস ও সুখ বিষয়ে পূজা বুদ্ধি উত্থাপিত রাখিবেন ও আধি ব্যাধি মোহ ও তজ্জনিত দুঃখকেও পূজোপহার অর্থাৎ আত্মপূজার উপকরণ বিবেচনা করিবেন। অভিপ্রায় এই যে, সুখ কালে সুখে ব্যাসক্ত ও দুঃখ কালে দুঃখে উদ্বিগ্ন হইবেন না। ভাবিবেন, ইহাও আত্মদেবের পূজার দ্রব্য। চেষ্টা, চেষ্টাফল, জীবন, মরণ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, দারিদ্র্যদশা, রাজ্যপ্রাপ্তি, এ সকল প্রবাহপতিত অর্থাৎ প্রারব্ধানুসারে উপস্থিত, হইলে তৎসমুদায় পদার্থকে আত্মপূজার পুষ্প মনে করিবেন এবং কলহে কল্লোল, ললনায় উল্লাস ও রাগদ্বেষাদির বিলাস, এ সকলকেও পুষ্পবৎ জ্ঞান করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে যে সদাসর্ব্বদা সুশীতল মৈত্রী করুণা মুদিতা প্রভৃতি ধর্ম্ম বিরাজ করে, সে ধর্ম্মের দ্বারাও এই আত্মশিব অর্চ্চনীয়[৩৩।৩৯]। যে শক্তির দ্বারা ক্রোধাদির দমন হয় সেই বিশুদ্ধা শক্তি এই আত্মদেবতা পূজার উত্তম দ্রব্য। অর্থাৎ ভোগলাম্পট্য পরিত্যাগ দ্বারা আত্মদেবতার উত্তম পূজা নির্ব্বাহিত হয়[৪০।৪১]। অনিষিদ্ধ ভোগ, নিষিদ্ধ ভোগের পরিত্যাগ, তথা রাগ বর্জ্জন অর্থাৎ বিষয়াসক্তি বর্জ্জন, অন্যায্য যত্ন পরিত্যাগ ও ন্যায্য যত্নে শৈথিল্য, এ সকলও আত্মপূজার উপকরণ। বিনষ্ট বস্তুর প্রতি উপেক্ষা ও যাদৃচ্ছিকরূপে আগত বস্তুর গ্রহণ, বিকারে বিকৃত চিত্ত না হওয়া অর্থাৎ নির্ব্বিকার হওয়াও আত্মশিবের পূজা দ্রব্য। ইষ্টানিষ্ট উভয় বিষয়ে সমভাব থাকাও আত্মপূজার প্রধান উপকরণ। বলা বাহুল্য যে, সমগ্র চেষ্টায় ও সমগ্র বোধে যৎপরোনাস্তি সাম্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং তাদৃশ সাম্যা-

বলম্বন পূর্ব্বক আত্মশিবের পূজারূপ ব্রতে রত হইতে হয়[২।৩৫]। এই নিত্যাত্মপূজারূপ ব্রতের ব্রতীরা সর্ব্বং ব্রহ্ম এতদ্রূপ দৃষ্টিমান্ হন ও শুভাশুভ বিভাগ নগণ্য করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি অথবা সর্ব্বত্র আত্মদর্শী হন[৩৬]। তাহাদের নিকট আপাতরম্য ও আপাততঃ দুঃসহ সমস্তই সমান। সেই আমি, এই আমি, আমিই অমুক, আমি নহি, এ বিভাগ ত্যাগ করিয়া, সমুদয়ের উপর ব্রহ্মবুদ্ধি নিশ্চল রাখিয়া শিবের পূজা বা শিবব্রত অনুষ্ঠান করিবেক। সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকার পদার্থে সর্ব্বভাবে সর্ব্বাত্মক আত্মার অর্চ্চনা করিবেক। ইহা ভাল, তাহা ভাল নহে, এরূপ বিচার করিবেক না। পরন্তু যথোপস্থিত বিধানে নিত্য আত্মপূজা করিবেক[৩৭।৪০]। অবাঞ্ছ হইয়া অর্থাৎ বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবসমাগত ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিবেক[৪১]। উদ্বেগ ও তুচ্ছাতুচ্ছ জ্ঞান বর্জ্জিত হইবেক, অথবা সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিবেক। কাল দেশ ক্রিয়া যখন যাহা বা যেরূপ উপস্থিত হইবে তখন সে সকলকে বিনা বিকারে গ্রহণ করিবেক। আত্মপূজার বিধান এই যে, রাগদ্বেষাদি চিত্তবিকারের কারণ সমূহকে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিভাগোক্ত দ্রব্য সমূহকে ও কটুতিক্তাদি স্বাদু অস্বাদু দ্রব্য নিচয়কে একই আত্মানন্দ রসে ভাবিত করিবেক। ভাবনা দৃঢ় হইলে তখন আর ঐ সকল ভেদ উদ্বোধিত হইবে না, সমস্তই তখন একই রস বলিয়া বিনিশ্চিত হইবেক। তখন ইহা কটু তাহা তিক্ত উহা কষায় এ ভাবের অনুভূতি থাকিবেক না। কেবল মাত্র একই মধুর ভাব অনুভূত হইতে থাকিবেক। আত্মাই মূল আনন্দ রস, তদ্দ্বারা যাহা যাহা প্লাবিত বা আচ্ছাদিত হইবেক, তাহা তাহাই আনন্দ রস বলিয়া গৃহীত হইবেক[৪২।৪৭]। মন যদি আকাশের ন্যায় সাম্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই অবিকার ও অনায়াসময় ভাবকে আমরা মুখ্য দেবার্চ্চনা বলিয়া গণনা করি। সাধক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শীতল ও পরিপূর্ণচিত্ত হইবেন, স্বস্থ ও সমজ্যোতি হইবেন। যেমন প্রস্তরের ভিতরে ও বাহিরে প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছু নাই, সেইরূপ, সাধকও ভিতরে ও বাহিরে চিন্ময় হইবেন। সমুদায়ই চিৎ; চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিবেন না। অথবা স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় হইবেন[৪৮।৫২]। যাহার অন্তর আকাশের ন্যায় নির্লেপ, রাগ বা রঞ্জনা রহিত, বাহিরে শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান উভয় ভাবেই তিনি শৈব অর্থাৎ সেই

ব্যক্তিই যথার্থ জ্ঞানী, উপাসক ও প্রধান শিবপূজক[৬০]। অজ্ঞান মেঘের বিনাশে কামনা বিদ্যুতের ক্ষয় ও অহঙ্কার মিহিকার অভাব হওয়ায় জ্ঞানীর হৃদয় শরদাকাশের ন্যায় সুশোভন হয়[৬১]।

হে মুনে! তুমি এইরূপ উত্তমতার চূড়ান্ত পদে স্থিত হও। যথা— আনন্দামৃতে পরিপূর্ণ সোমের ন্যায়, স্বপ্রকাশের আতিশয্যে সূর্য্যের ন্যায়, চঞ্চল মনোবৃত্তি নিবহের নিবৃত্তিতে একাদ্বয় চেতনের ন্যায় ও শিশুদিগের ন্যায় বিকল্পবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানী হইয়া চিদাভাসের ও চিত্তের মূলীভূত স্বাত্মশিবসন্দর্শননিষ্ঠ হও। এইরূপ স্থিতিই উত্তমতার চূড়ান্ত ও ইহারই নাম জীবন্মুক্তি[৬২]।

তুমি সুখ দুঃখ ভ্রম পরিত্যাগ কর, মনোরথ সকল বর্জ্জন কর, করিয়া শরীরনায়ক স্বাত্মশিবের অর্চ্চনা কর, করিলে তাহাই তোমার মুখ্য শিব পূজা হইবেক[৬৩]।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ।

—○*()*○—

ঈশ্বর বলিলেন, তুমি যদি আত্মজ্ঞ হও, অন্তরে যদি চিন্মাত্রদর্শী হও, তাহা হইলে যাহা কিছু করিবে অথবা না করিবে, সমস্তই শিবার্চ্চনা বলিয়া গণ্য হইবে[১]। আত্মরূপী শিব তাহাতেই প্রসন্ন হন, তাহাতেই প্রকট অর্থাৎ আবরণশূন্য হন, কেননা তাহাই তাঁহার পারমার্থিক রূপ[২]। আত্মবিৎ সাধক জানেন যে, আত্মায় পরমার্থতঃ রাগদ্বেষাদি নাই, অথবা রাগদ্বেষাদি শব্দও আত্মায় প্রযুক্ত হয় না। যাহাতে ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়, সে সমস্তই আত্মা, আত্মা ছাড়া নহে[৩]। এই সকল অভিজ্ঞ লোক সম্পৎ বিপদ দৈন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা এ সমস্তই আত্মায় আরোপণ করা হইতেছে বলিয়া জানেন, সুতরাং সে সমুদায় পুষ্পাদি আরোপণের সদৃশ[৪]। সমস্ত আরোপিত বিজ্ঞান নিত্যাত্মার পূজা[৫]। যে কোন জাগ্রৎ প্রত্যয়, সমস্তই আত্মার রূপ[৬]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,

আত্মা আপনারই স্বরূপে বিস্মৃতের ন্যায় হইয়া আপনিই আপনাকে বিভিন্নের ন্যায় দর্শন করিতেছেন[৭]। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, শিব সর্ব্বাত্মক ও অনন্ত অথচ তাঁহার পূজ্য পূজক ও পূজা এই ত্রিবিধ বিভ্রম উদিত হইতেছে[৮]। হে ব্রহ্মন্! কল্পনা ব্যতীত ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট আকার অসম্ভব, সুতরাং আমি পূজক, ইহা পূজা ও তিনি পূজ্য, এ সকল সঙ্কল্প বা কল্পনা অবাস্তব ব্যতীত বাস্তব নহে[৯]। মালিন্যবর্জ্জিত আত্মদেব ঐ সকল ভেদ ক্রমের দ্বারা বাস্তবতঃ পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন না। যাঁহা হইতে জগত্রয় বিস্তৃত হয় তাদৃশ ঈশ্বরের আবার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি কি? অথবা নির্দ্দিষ্ট নামই বা কি[১০,১১]? যাহারা জানে, পরমেশ্বর দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ এক প্রকার পরিমিত পদার্থ, সেই সকল লোকই আমাদের উপদেশ্য। পরন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের কেহই আমাদের উপদেশ্য নহেন[১২]। তুমি পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি পরিত্যাগ ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান আশ্রয় কর, শান্ত স্বস্থ ও রাগাদি রহিত হও, হইয়া যথোপস্থিত সুখ দুঃখ শুভাশুভরূপ পুষ্পের দ্বারা আত্মাকে অর্চ্চনা করতঃ স্থিত হও[১৩,১৪]।

যে ব্যক্তি আপনাকে শুদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়াছে, সেই পুরুষই সাধু। ঈদৃশ সাধু পুরুষে অমানিত্ব ও অদাম্ভিকত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ জন্মে, পূজ্য পূজক পূজাদি বিচার উৎপন্ন হয় না, সেই জন্য তিনি মায়াতৎকার্য্যের অতীত হন সুতরাং তাঁহাতে সুখ দুঃখাদি কলঙ্কের চিহ্ন পর্য্যন্তও সংলগ্ন হয় না[১৫]।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে দেব! যদি ঈশ্বরের কোন আকৃতি না থাকে এবং যদি তিনি সত্য সত্যই অব্যপদেশ্য হন, নামের অযোগ্য হন, তাহা হইলে শিব, ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা, এ সকল নাম কিরূপে হইল?[১] গুণ অথবা ক্রিয়া প্রভৃতি অনুসারেই নাম জন্মে, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়

ও নিরাকার বস্তুর নাম কি অনুসারে প্রবৃত্ত হইল? কেহ তাঁহাকে সৎ বলে, কেহ ন কিঞ্চিৎ বলে, কেহ শূন্য বলে, কেহ বা বিজ্ঞান বলে, এ সকল ভেদই বা কিরূপে প্রসিদ্ধ হইল১।২ ?

ঈশ্বর বলিলেন, একই পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, আভাস নাই, এবং যাহা কেবল অস্তি-আছে-এতদ্রূপে গোচরিত হয় ও কেবল অস্তি স্বরূপ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ বলাও যায় তথা ইন্দ্রিয়গণের অগম্য বলিয়া ন কিঞ্চিৎ বলাও যায়৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন; হে ঈশান! যদি তিনি বুদ্ধ্যাদির দৃশ্য না হন তাহা হইলে সাধকগণ কি উপায়ে তাঁহাকে দর্শন করেন? তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন৪ ?

ঈশ্বর বলিলেন, উপায়জ্ঞ রজক (ধুপী) যেমন এক মলের দ্বারা অপর মল ক্ষালন করে সেইরূপ সাধকও এক অবিদ্যাংশের দ্বারা অপর অবিদ্যাংশ বিদূরিত করেন। এক সাত্ত্বিকাংশ মুমুক্ষু হয় অপর সাত্ত্বিকাংশ গুরু শাস্ত্রাদি হয়, মুমুক্ষু তদ্দ্বারা সমুদায় আত্মমল অবিদ্যা বিদূরিত করতঃ স্বপ্রতিষ্ঠ বা স্বরূপ প্রাপ্ত হন৫।৬। উক্তরূপে আত্মা আপনার দ্বারাই আপনাকে দেখেন ও উদ্ধার করেন। অর্থাৎ অবিদ্যা ক্ষয় হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়, ইহা আত্মারই স্বভাব৭। অবিদ্যাংশের দ্বারা অবিদ্যা ক্ষয়ের দৃষ্টান্ত অঙ্গার দ্বারা অঙ্গারের ক্ষয়। অর্থাৎ শিশুরা ক্রীড়া কৌতুক প্রসঙ্গে ২ খণ্ড অঙ্গার লইয়া এক খণ্ডের দ্বারা অপর খণ্ডের ঘর্ষণ করে, ক্রমে দুই খণ্ডই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও তদ্দ্বারা হস্ত-নৈর্ম্মল্যও জন্মে৮। অতএব, শাস্ত্ররূপ অবিদ্যাভাগের সাহায্যে চিদাত্মার বিচার আরম্ভ করিলে ক্রমে শাস্ত্ররূপ সাত্ত্বিক অবিদ্যাভাগ ও অজ্ঞান-রূপ তামস অবিদ্যাভাগ উভয় ভাগই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তৎপরে আত্ম-নৈর্ম্মল্য জন্মে৯। আত্মা আপনি আপনাকে দেখেন, বিচার করেন, বিচারের সিদ্ধান্তে জানেন যে, কেবল আত্মাই আছেন, অবিদ্যা নাই। অবিদ্যা নাই, এতদ্রূপ নিশ্চয় হওয়ার নাম অবিদ্যা ক্ষয়১০। গুরু, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ, এ সকল আত্মাও নহে, আত্মজ্ঞানের বাস্তব হেতুও নহে১১। গুরু দৃশ্য বা দৃষ্ট পদার্থ, সেজন্য তিনি স্বরূপতঃ আত্মলাভের হেতু নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ক্ষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেজন্য তাহা ইন্দ্রিয়াতীত। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাই আত্মা ও ব্রহ্ম১২। হে দ্বিজ! আত্মা বা ব্রহ্ম

স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইলেও তজ্জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত গুরূপদেশাদি ক্রিয়া ক্রম আশ্রয়ণীয়। গুরূপদেশাদি ক্রমের অনুষ্ঠানে শিষ্যের বোধ জন্মে, তাহাতেই অনির্দ্দেশ্য ও অদৃশ্য আত্মা স্বতঃই প্রসন্ন অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃত হন। মলাবরণ ক্ষয় হইলে আত্মা আপনা আপনি প্রকাশিত হন, শাস্ত্রার্থের বোধ ও গুরুর উপদেশ তাহাতে উপলক্ষ্য মাত্র[১৩।১৫]। ঐ উপলক্ষ্য ব্যতীত আত্মা অববুদ্ধ হন না। গুরু, তাঁহার উপদেশ, তৎশ্রোতা শিষ্য, এই সকলের সংযোগে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়[১৬।১৭]। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ক্ষয়ে যে ক্ষণভঙ্গুর বা নশ্বর সুখ দুঃখের উৎপত্তি স্থগিত হয়, হইলে তৎকালে যাহা অবশেষিত অর্থাৎ অক্ষয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম শিব, আত্মা ও সৎ প্রভৃতি[১৮]। যাহাতে এই সকল দৃশ্যের কিছুই নাই, অথবা যাহা এই বিশ্বাকারে অবস্থিত, কিম্বা যাহা নির্ব্বিশেষ সত্তা বা কেবল সত্তা, তাহা আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও অনন্ত। মুমুক্ষুগণ, মনোমুক্ত মনীষিগণ, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও রুদ্র প্রমুখ দেবতাগণ ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞগণ মুক্তির নিমিত্ত তথা জীবন্মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত, উপাসকদিগের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ প্রচারের নিমিত্ত, বেদসিদ্ধান্ত স্থাপনের নিমিত্ত, সেই অনন্ত বস্তুতে চিৎ, ব্রহ্ম, শিব, আত্মা, ঈশ্বর ও পরমাত্মা, প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়াছেন [১৯।২৩]। ইহাই জগত্তত্ব, আত্মতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব। যাহা জগত্তত্ত্ব তাহাই আত্মতত্ত্ব ও তাহাই শিবতত্ত্ব। হে বশিষ্ঠ! শিব, আত্মা, পরব্রহ্ম, এই সকল শব্দের দ্বারা যে ভেদ প্রতীত হয় সে ভেদ বাস্তব নহে, কাল্পনিক। কিন্তু সে কল্পনাও পুরাতনপ্রসূত অর্থাৎ পূর্ব্ব গুরুদিগের কল্পিত। হে মুনিনায়ক! জ্ঞানী নর সদা এতদ্রূপ দেবার্চ্চনা করেন বলিয়া আমরা যে পদের ভৃত্য সেই পদ প্রাপ্ত হন[২৪।২৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে ভগবন্! এ সকল না থাকিলেও থাকার মত দেখায় কেন? তাহা আমাকে সংক্ষেপে বলুন[২৭]।

ঈশ্বর বলিলেন, যাহা ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের অর্থ তাহা কেবলা সম্বিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পরমাণুর নিকট সুমেরু যেরূপ স্থূল, সেই চিৎ পদার্থের নিকট আকাশ সেইরূপ স্থূল। বলা বাহুল্য যে, জড়ের সূক্ষ্মতা ও চিতের সূক্ষ্মতা একরূপ নহে, অত্যন্ত প্রভেদযুক্ত[২৮]। চিৎ এই নাম সেই সময়ে কল্পিত হয় যে সময়ে তাহা চেত্যকল্পনার দিকে লোলীভূত

হয়। তৎপূর্ব্বে তাহা নির্ব্বিকার নিরাকার ও নির্নাম। সমাধিপ্রসিদ্ধ চিদানন্দৈকরসস্বভাবে তাহা স্থিতা থাকে[২৯]। যে-ই তাহা বেদ্য কল্পনায় উন্মুখী হয়, সেই তাহা অহন্তার অনুগামিনী হয়। দেশকালাদি কল্পনা উক্ত অহংকল্পনার সখী। সম্মিলিত সেই সকল কল্পনার সমষ্টি জীব[৩০-৩২]। এই জীবশক্তির বিলাস বা প্রধান কার্য্য নিশ্চয়, যাহার অপর নাম বুদ্ধি[৩৩]। এই জীব শব্দশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির অনুগামী[৩৪]। ঐ সকল সমূহই স্মৃতির অর্থাৎ স্মরণশক্তির মেলনে মন। এই মনই মৎপরোনাস্তি বৃহৎ সঙ্কল্প বৃক্ষের বীজ ও আতিবাহিক দেহ, এই উক্তির বিষয়। এই সকল সমূহের অন্তরস্থ যে ব্রহ্মশক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি, তাহারই ব্যাপ্তিতে জ্ঞাতা ও প্রমাতা। এইরূপ আন্তর কল্পনার দ্বারা বাহিরে সেই সেই দৃশ্যের কল্পনা উদিত হয়[৩৫,৩৭]। স্পন্দশক্তি বায়ুর সত্তার, স্পর্শশক্তি ত্বক্‌সত্তার, তেজঃশক্তি চক্ষুঃসত্তার বা রূপসত্তার, জলশক্তি স্বাদসত্তার ও মৃত্তিকাশক্তি সেই সেই কল্পিত গন্ধসত্তার কারণরূপে ব্যবস্থিত হয়[৩৮,৩৯]। এবংক্রমে অতি মহতী ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডসত্তা ব্যবস্থিত হইয়াছে ও এই ব্রহ্মাণ্ডসত্তা সর্ব্বসত্তার আঢ্য। বীজ যেমন উত্তরোত্তর পরিণামী অঙ্কুর কাণ্ড শাখা পত্র ও পুষ্পাদি ক্রোড়ীকৃত করিয়া স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় সেইরূপ কথিত ও অকথিত প্রকারের সত্তাগণ (অস্তিতা বা শক্তিসমূহ) ক্রোড়ীকৃত অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া প্রাগুক্ত মূলসত্তা স্থিতি করে, পরে সেই সত্তা হইতে উত্তরোত্তর পরিণামে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার বা শক্তির উদয়ে বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায় এই অতি স্থূল ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড উদিত হইয়াছে[৪০,৪১]। যাহার ক্রোড়ে ঐ সর্ব্বসত্তা, তাহারই সংজ্ঞা পুর্য্যষ্টক ও প্রকারান্তরে দেহত্রয় এবং তাহারই সংস্কার ভাব আতিবাহিক দেহ। অপার অপর্য্যন্ত বোধময় ব্রহ্ম কথিত বিভাগে প্রকাশ পাইতেছেন। এই যে উৎপত্তি ক্রম, এ ক্রম অজ্ঞান দৃষ্টিতে, নচেৎ জ্ঞান দৃষ্টিতে এ সকল আরোপ মাত্র, অর্থাৎ কল্পনা মাত্র। তত্ত্বজ্ঞগণ জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখেন ও জানেন, কোনও কিছু হয় নাই অর্থাৎ জন্মে নাই[৪২,৪৩]। জলে যেমন জলদ্রব্যের বিলাস, সেইরূপ ব্রহ্মেও ব্রহ্মের বিলাস। এ সকল ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে[৪৪]। যে হেতু দৃশ্য সকল সম্বিদের সহিত একলোল, অর্থাৎ সম্বিৎ ছাড়া হয় না, অথবা সম্বিৎ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিতে গেলে এ সকল নাস্তি হইয়া

যায়, সেই হেতু এ সকলকে সঙ্কল্পনগরের ন্যায় নাস্তি বলা যায়[৪৫]। যদি এ সকলকে সম্বিৎ বলিয়া জানা যায় তাহা হইলেই এ সকল শিব ব্যতীত অন্য প্রতীতির বিষয় হয় না। অতএব, অজ্ঞাত অবস্থাতেই এ সকল বস্তু, জ্ঞাত অবস্থায় বস্তুরও অতীত[৪৬]। যাঁহারা ভাবেন বা বলেন, সেই চিন্মাত্রস্বভাব পরম সূক্ষ্ম পরমাত্মাই আপনাতে আপন কল্পনায় এই সকল অংশাংশিভাবাক্রান্ত দৃশ্যমণ্ডল দর্শন করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের মতে এ সমস্ত বাহিরে নহে, সমস্তই অন্তরে, তাহাদের মতেও অদ্বয়াত্মবাদ সুদৃঢ়। এই যে স্থূল ভাব, এ ভাব চিরাভ্যস্ত দৃঢ় সংস্কারের প্রভাবে, অর্থাৎ অন্তরস্থ ভাবনাময় সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ডক্রমাভ্যাসের দ্বারা স্থূলভাবান্বিত ও বহিঃস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়[৪৭,৪৮]। বাহিরে রূপাদি সত্তা দর্শনের দ্বার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। এবং আন্তরস্থ পুরুষোল্লেখী অহঙ্কারের (আমি মনুষ্য বা পশু, এই সংস্কারের) সহিত হস্তপদাদি অবয়ব সঙ্ঘাতের একসমাবেশ ভাবনায় আমি পুরুষ, আমি মনুষ্য, আমি পশু, এতদ্রূপ জ্ঞানব্যবহার ও তদনুগত হর্ষাদিব্যবহার সম্পন্ন হয়[৪৯]। সত্য দেহ না থাকিলেও জীবদবস্থায় দেহ দর্শনের ব্যাঘাত হয় না। যেমন গন্ধর্ব্বনগর নাই, স্বাপ্ন মনুষ্যও নাই, অথচ ভ্রমের দ্বারা গন্ধর্ব্বনগর ও নিদ্রাদোষের দ্বারা স্বাপ্ন মনুষ্য দৃষ্ট হয়, তেমনি, কোনরূপ দেহ না থাকিলেও ভ্রমের দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইতে পারে[৫০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরের ও স্বাপ্নদৃষ্ট নরের ন্যায় কল্পনাময় হইলেও দুঃখপ্রদ, পরন্তু দুঃখ ক্ষয়ের উপায় কি তাহা আমাকে বলুন[৫১]।

ঈশ্বর বলিলেন, বাসনার প্রভাবে দুঃখ জন্মে, সুতরাং যাহাতে বাসনা বিনাশ হয় তাহা করাই কর্ত্তব্য। বাসনা বিনাশ দৃঢ়তর মিথ্যাত্ব বোধ ব্যতীত সামান্যতঃ মিথ্যা এই বচনের দ্বারা হইবে না। তদ্‌বিষয়ের যুক্তি এইরূপ—

বাসনা থাকিলেই দুঃখ হয় ও বিদ্যমান পদার্থেই বাসনা জন্মে, পরন্তু জগৎ মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় অবিদ্যমান[৫২]। সুতরাং স্থির করা উচিত—বাসনাও নাই, বাস্যও নাই ও বাসকও কিছু নাই। কবে ও কোথায় কোন্ স্বাপ্ন নর কোন মৃগতৃষ্ণা জল পান করিয়াছে? দ্রষ্টা, অহন্তা, মন ও মনন সম্বলিত জগৎ যখন নাই, তখন প্রকৃত পক্ষে

তাহার বাসনাও নাই[৩।৫৪]। কেবল এক সৎ-ই আছে, যাহাতে বাস্ত সত্যতঃ বাসক ও বাসনা কোনও প্রভেদ নাই[৫৫]। যে জানে, এক পারমার্থিক সত্য ব্যতীত ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্য নাই, সে কেবল কৈবল্যই জানে, সুতরাং তাহার দুঃখাদি উদ্বেগও থাকে না[৫৬]। বেতাল যেমন কেবল শূন্য, সেইরূপ এই জগৎ নামক বাসনাও কেবল শূন্য। ইহার উদয়াদি বেতালের ন্যায় কল্পনাময় সুতরাং অসৎ। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিলেই শান্তি অক্ষয় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়[৫৭]। অহংএ, জগতে ও মৃগতৃষ্ণা জলে যাহার আস্থা, সে মনুষ্যকে ধিক্, এবং সে মনুষ্য উপদেশের পাত্র নহে[৫৮]।

তত্ত্ববিদ্গণ বিবেকী পুরুষকেই তত্ত্বোপদেশ করেন, অজ্ঞানোন্মত্তদিগকে উপদেশ করেন না। যে ব্যক্তি অজ্ঞের অনুশাসন করে সে পুরুষ স্বপ্ন দৃষ্ট পুরুষে কন্যা প্রদান করার ফলভাগী হয়[৫৯]।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে ভগবন্! সৃষ্ট্যারম্ভ কালে জীবের প্রথমতঃ দেহ জন্মে; তৎপরে কি হয় তাহা আমাকে বলুন[১]।

ঈশ্বর বলিলেন, জীব সেই পরাৎপর ব্যোমে (চিদাকাশে) পূর্ব্বোক্ত ক্রমে এই সকল সম্পন্ন হইতে দেখে। সে দর্শন স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ[২]। চিৎ পদার্থ সর্ব্বগত, সর্ব্বত্রাবস্থিত ও সর্ব্বশক্তিমান্, সেইজন্য তাহা হইতে সর্ব্বসৃষ্টি অসম্ভব হয় না। যেমন স্বাপ্ন নর স্বাপ্ন জগৎ সৃজন করে, তন্মধ্যে রথ গজ তুরঙ্গাদি সন্দর্শন করে, তাহার ন্যায় সেই আদি শরীরী জীবও আপনাতে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। যে রূপে সৃজন করেন সে রূপ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে[৩]। সেই প্রথম পুরুষ কোন কোন সৃষ্টিতে (হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা) সনাতন, অহং, অব্যক্ত, পুরুষ, এই সকল নামে প্রথিত। কোন কোন সৃষ্টিতে সদাশিব, কোন কোন সৃষ্টিতে

বিষ্ণু, কোন কোন সৃষ্টিতে পিতামহ ও কোন কোন সৃষ্টিতে অন্যান্য নাম অর্থাৎ কালী দুর্গাদি নাম প্রাপ্ত হন। যাহাই হউক, সদাশিব নামধেয় প্রথম পুরুষ কেবল সঙ্কল্পময়, অর্থাৎ মায়িক সঙ্কল্পরূপী থাকেন, তৎপরে তদীয় সেই সকল সঙ্কল্প সূক্ষ্ম ভূতাদি সৃষ্টির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। পরিপুষ্ট হওয়ার পর ইনি সমষ্টি মনোরূপে স্থিত হন। ব্যষ্টি মন সকল সমষ্টি মনেরই অন্তর্গত। এই ব্যষ্টিসমষ্টিমনোরূপী হিরণ্যগর্ভাদি মূর্ত্তি যে যে ভুবনের ও যে যে প্রজাদির কল্পনা করেন, সেই সেই ভুবন ও সেই সেই প্রজাদি তাঁহার দর্শনে তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত ও ব্যবহার যোগ্য হয় [৪।৭]। অতএব, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রম দৃষ্টিতে সৎ অর্থাৎ আছে এতদ্রূপ প্রতীতির গোচর হয় ও তত্ত্বদৃষ্টিতে এ সকল যেন আছে অর্থাৎ না থাকিলেও থাকার মত, এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় হয়। অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টিতে এ সকল থাকিলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে ও ভ্রান্তিজ্ঞানে এ সকল সত্য সত্যই আছে, এইরূপ বিচারণা হইতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, অহংএর ও জগতের রূপ ও গতি উক্ত প্রকারে সত্যাসত্যরূপা এবং উক্ত রীতিতেই সেই আদিপুরুষ স্বসৃষ্ট পদার্থের দ্রষ্টা হন, স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া নিমেষমধ্যে চিদাকাশমাত্র হন; তথা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিমেষমধ্যে অপার সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হন[৮।৯]। যাহাকে কল্প বলা যায়, কল্পনার প্রভাবে তাহাও নিমেষ এবং যাহাকে নিমেষ বলা যায়, তাহাও কল্পনার প্রভাবে কল্প; অর্থাৎ যেমন কল্পনা, সেইরূপ অনুভব উপস্থিত হইয়া থাকে[১০]। প্রতিভাসেরই বৈপরীত্যে পরমাণু, ব্যোম, ক্ষণ, কল্প, মহাকল্প ও ভাব, অভাব সম্পন্ন হইতেছে[১১]। এই সকল বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি কেবল জীব-বাসনানুসারী, সুতরাং দর্শন ও অদর্শনাদি ব্যবহার জীবগণের বাসনানুরূপে সম্বাদী অর্থাৎ সত্য। অতএব, দর্শন কথার অর্থ—রূপবিশেষের কল্পনা এবং অদর্শন কথার অর্থ—রূপবিশেষের অকল্পনা। সুতরাং যাহাকে অদৃশ্য বলা যায়, তাহাও অধিষ্ঠানাংশে সত্য[১২।১৩]। সেই আদি সৎ বস্তুই কল্পনা দ্বারা সদ্রূপী ও অসদ্রূপী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। যেমন শৈল না থাকিলেও স্বাপ্ন কল্পনায় শৈল হয়, সেইরূপ। সুতরাং সৃষ্টির জন্য কল্পনা ব্যতীত স্বরূপতঃ দেশ, কাল, কর্ত্তা, কিছুরই আবশ্যক হয় না। কাল্পনিক বলিয়া এ সকল স্বরূপতঃ সৎও নহে, অসৎও

নহে, হয়ও না ও যায়ও না[১৪।১৫]। সমস্তই চিন্ময় আত্মার সঙ্কল্পেরই উল্লাসে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হয়[১৬]। তজ্জন্য দেশ ও কাল প্রভৃতি আক্রান্ত হয় না। সঙ্কল্পরচিত শৈল কি কখন স্থান ও কাল অপেক্ষা করে[১৭]? স্থানাদি প্রতীত হইলেও তাহা সঙ্কল্প ব্যতীত বাস্তব নহে[১৮]। যেমন, দেশকালাদি বস্তুকল্পে অসৎ অর্থাৎ নাই, তেমনি, সমুদায় জগৎও বস্তুকল্পে অসৎ অর্থাৎ নাই; সেই আত্মানামক পুরুষই সংকল্প দ্বারা এ সকল করে ও করিয়াছে। সেই আত্মানামক পুরুষই স্বসঙ্কল্প দ্বারা কীট, পতঙ্গ, স্থাবর ও জঙ্গম। কি উচ্চ কল্পে রুদ্র, কি নীচ কল্পে তৃণ, সমস্তই স্বস্ব সঙ্কল্পের মহিমা। সঙ্কল্পের বা বাসনার সূক্ষ্মতায় অণু এবং তাহারই বৈপুল্যে মহৎ[১৯।২১]। ইহাই সংসার-মায়ার ক্রম এবং অভ্যাস দ্বারা উক্ত ক্রমের উপশান্তিই শিব। চিৎশক্ত্যাত্মক শিব যদি নিমেষের শত ভাগের একভাগ কাল স্বরূপবিস্মৃত হন অর্থাৎ বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিতে স্থিত হন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহাতেই অনন্তকল্পবিস্তৃত অনর্থের উদয় হয়। অতএব, তিনিই সংসারিরূপেও জ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌রূপে প্রথিত হন। অপিচ, তিনিই ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হন। যেমন যেমন মিথ্যাভিমানের অর্থাৎ সৃষ্টিসঙ্কল্পের বৃদ্ধি ও তদনুযায়িনী সৃষ্টি আবির্ভূত হয়, তেমনি তেমনি চিদ্‌বিদ্যোতনের হ্রাস হইয়া থাকে। দেখাও যায় পরিচ্ছেদাধিক্য ক্ষুদ্রতার আধিক্য[২২।২৫]। হে সাধো! মিথ্যা দিক্ দেশ কাল প্রভৃতি পরিচ্ছেদ দ্বারাই আত্মার ক্ষুদ্র মশকাদি ভাব, বৃহৎ হস্ত্যাদি ভাব, শ্রেষ্ঠ দেবাদি ভাব ও অশ্রেষ্ঠ অসুরাদিভাব উপস্থিত হইয়া থাকে[২৬।২৭]। বিশ্ব এবম্প্রকার সদসৎ রূপে প্রথিত, তন্মধ্যে যাহা সৎ তাহাই বিশ্বকারক ও বিশ্বব্যাপী। তাই তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, তিনি দূরে নহেন, নিকটে নহেন, ঊর্দ্ধে নহেন, অধঃও নহেন, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং তিনি সৎ অসৎ উত্তম অধম মধ্যম, এ সকল পদের অতীত বা অবাচ্য[২৮]। এ বিষয়ে স্বানুভব ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই। যে হেতু, অন্য প্রমাণ সেই পরম চিতে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় কল্পিত, সেই হেতু, লৌকিক অন্য প্রমাণ বারিতে বহ্নির ন্যায় তাঁহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না[২৯]।

হে মুনিবর! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন করিলাম। শুনিয়া অবশ্যই তুমি মদুক্ত

বচনাবলীর অর্থ বোধগম্য করিয়াছ। তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে আমরা যথাভিমত প্রদেশে গমন করি[৩০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ নীলকণ্ঠ আমাকে ঐ সকল কথা বলিয়া গগনোদ্যত হইলে, আমি তাঁহার চরণোপরি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম। অনন্তর তিনি পরিবার সহ গগন-কোটরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই ত্রিভুবন নাথ উমাপতি গমন করিলে পর, আমি ক্ষণকাল তাঁহার উপদেশসকল পর্য্যালোচনা করিলাম, এবং বুঝিলাম ও ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম যে ভগবদাদিষ্ট শিবার্চ্চনই শ্রেষ্ঠ, জড় দেবার্চ্চন অশ্রেষ্ঠ। অপিচ, ঐরূপ জ্ঞানলাভ অবধি আমি বাহ্যোপচারের আহরণ ও জড়-দেবার্চ্চন পরিত্যাগ করিয়াছি[৩১।৩২]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই ঈশ্বর স্বয়ং আমাকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও তদনুরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জগৎ যেরূপে অবস্থিত, তাহা তুমিও জ্ঞাত আছ[১]। ইহা যাহাতে ও যৎকর্ত্তৃক মিথ্যা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা সেই ভ্রমরূপিণী মায়া—তদুপহিত জীব। অতএব, অলীক পদার্থেই অলীক জীব কর্ত্তৃক অলীক জগৎ দৃষ্ট হয় ও তাদৃশী সংসার মায়াকে অসদসদ্রূপিণী বলিয়া বর্ণন করিতে পারি[২]। যেমন কোন কবি কোন রাজাকে তুমি কল্পবৃক্ষ, তুমি সুমেরু ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করে ও রাজাও আপনাকে তদনুরূপ বোধ করিয়া অভিমানধারী হয়, সেইরূপ এই আত্মরাজাও স্বরূপভ্রান্তি দ্বারা বর্ণিত ও বর্ণনানুরূপ অভিমানী হন[৩]। জলে দ্রবত্বের, বায়ুতে গতির ও আকাশে শূন্যতার অবস্থিতি যেরূপ, আত্মায় সৃষ্টির অবস্থিতিও সেইরূপ[৪]। অর্থাৎ কল্পনাজাল অজ্ঞায়মান আত্মারই স্বভাব। হে রঘুনাথ! পূর্ব্বোক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া অবধি আমি প্রোক্ত প্রকারে আত্মার

অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছি; অথচ যথোপস্থিত ব্যবহার অপরিত্যক্ত রহিয়াছে। আমি যথোপস্থিত ক্রিয়াকে ও যথোপস্থিত আচারকে আত্ম-দেবতার পূজোপকরণ পুষ্প মনে করি, তাহাতে সুষুপ্তি-কালেও আমার পূজা অবিচ্ছিন্না থাকে[৫।৭]। এমন কি, অজ্ঞ জীব আত্মার গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব বিদিত নহে, সেই জন্য তাহাদের যথোপস্থিত ক্রিয়া ও আচার আত্মদেবতার পূজাস্থানীয় নহে, কিন্তু যোগীরা ঐ সকল তথ্য জানেন বলিয়া তত্তাবৎ তাঁহাদের নিকট পুষ্পসদৃশ পূজোপহার[৮]। হে রঘু-নায়ক রাম! তুমিও উক্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হও, আসক্তি পরিত্যাগ কর, ও এই সঙ্কল্পরূপ অরণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ কর[৯]। হে সুব্রত! ধননাশজ ও বন্ধুবিয়োগজনিত দুঃখ উপস্থিত হইবামাত্র তুমি ঈশ্বরোক্ত ও মদুক্ত জ্ঞান অবলম্বন করতঃ বিচারনিষ্ঠ হইবে[১০]। ধনাগমাদিজনিত সুখের ও তদ্বিয়োগাদিজনিত দুঃখের উদয় হইবামাত্র সে সকলকে তুমি মিথ্যা বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে অভ্যা-সের প্রভাবে আর তাহাদের উদয় হইবে না[১১]। সংসারের সকল পদা-র্থই নশ্বর ও তাদৃগ্ স্বভাববিশিষ্ট। হে রামভদ্র! তুমিও বিষয়নিব-হের বিচিত্রা গতি বিদিত আছ এবং এ সকল যেরূপে যায় ও আইসে, তাহাও তোমার অগোচর নাই[১২]। প্রেম (ভালবাসা বা বিষয়স্নেহ) ও ধন অবিচারপ্রসঙ্গেই আইসে, অর্থাৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আবার বিচারপ্রসঙ্গে ঐ সকল মিথ্যা হইয়া যায়[১৩]। বলিতে কি, কোনওপ্রকার জগৎকার্য্য বস্তুতঃ তোমার অন্তরে নাই ও তুমিও এ সকলের মধ্যে নহ। তুমি বুদ্ধি-মোহ বশতঃ বৃথা পরিতাপ করিও না, জগৎক্রিয়ামাত্রেই তুচ্ছ[১৪]। যদি তুমি জগৎকে তুচ্ছ ভাবিতে না পার, তাহা হইলে ভাব, আত্মাই জগৎ। জগতে আত্মদর্শন করিতে পারিলে, তাহাতেও তুমি শোক ও হর্ষের অতীত হইতে পারিবে[১৫]। বৎস! রাম! তুমি চিন্মাত্র এবং এই জগৎও তোমা হইতে পৃথক্ নহে; অর্থাৎ জগৎও চিৎশক্তির অতিরিক্ত নহে। অতএব, ইহা হেয় ও তাহা উপাদেয়, এ কল্পনা উক্তবিধ জ্ঞানের দৃঢ়তায় বিনিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহার অন্যথা হয় না[১৬]। এ সকল জগদ্রূপ চিৎসমুদ্রের তরঙ্গ, ইহাতে শোকের বা হর্ষের স্থিতি বা প্রসক্তি নাই[১৭]। আজ্ হইতে তুমি চিদেকরস ও চিদেকতান হও, ক্রমিক অভ্যাসে সৌষুপ্তিতেও তুর্য্যাবস্থায় স্থিত হও[১৮]।

তুমি প্রোক্ত প্রকারে আত্মপূজায় রত হইয়া পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্প হইয়া থাক[১৯]। তুমি মদুক্তিসকল শ্রবণ করিলে এবং তোমার বুদ্ধিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য কি শুনিবার বাঞ্ছা কর, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর[২০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এখন আর আমার কোনও বিষয়ে সংশয় নাই[২১]। আমি সমুদায় জ্ঞাতব্য জানিয়াছি, উত্তমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, দ্বৈতমল উন্মার্জ্জিত হইয়াছে, এবং কল্পনাও উপশান্ত হইয়াছে[২২]। ইতিপূর্ব্বে যে আমাতে অজ্ঞান-কলঙ্ক লিপ্ত হইয়াছিল, সে কলঙ্ক এক্ষণে অপগত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমার যে ভ্রান্তি ছিল, সে ভ্রান্তি এক্ষণে আর নাই। আমি এখন বুঝিয়াছি, আত্মা জরামরণাদি-বর্জ্জিত ও সদা নিষ্কলঙ্ক[২৩।২৪]। এখন আমার প্রতীতি হইতেছে, এ সমস্তই ব্রহ্ম। এখন আমি সকল সংশয়ের, সকল প্রশ্নের ও সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছার অতীত হইয়াছি[২৫]। আমার চিত্ত এখন অত্যন্ত নির্ম্মল, অত্যন্ত ভাস্বর ও সর্ব্বপ্রকারে নিরাকাঙ্ক্ষ। সুতরাং সুমেরু যেমন সুবর্ণাকাঙ্ক্ষী নহে, সেইরূপ, আমিও এখন নিরাকাঙ্ক্ষ। এমন কিছু নাই, যাহাতে আমার আশা ও ইচ্ছা জন্মিতে পারে[২৬।২৭]। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাহা নাই, যাহা হেয় অথবা উপাদেয় হইতে পারে। হে মুনে! ইহা হেয়, তাহা উপাদেয় ও ইহা উপেক্ষ্য, এ বিভ্রম আমার অপগত হইয়াছে। আমি এখন স্বর্গ-বাঞ্ছাও করি না এবং নরক দ্বেষও করি না[২৮।২৯]। আমি এখন গতভ্রমণ মন্দরাচলের ন্যায় আপনাতেই আপনি স্থিতিলাভ করিতেছি[৩০]। ইহা অবস্তু, উহা বস্তু, এ বিভাগ যাহার হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) স্থিতি করে, নিশ্চয়ই সে কুসন্দেহ অনলে দগ্ধকল্প হয়। হে মুনীশ্বর! যে ব্যক্তি জগৎকে উক্ত প্রকারে বিদিত হইয়াছে, জগতে এমন কিছু নাই, যাহা তাহাকে কার্পণ্য দশায় পাতিত করিতে পারে। হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি বিচিত্র-কোলাহলময় ও অস্তিতা-বর্জ্জিত জড়স্বভাব ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং সম্পদের ও বিপদের চরম সীমা কি, তাহা বিদিত হইয়াছি[৩১।৩৪]। যাহা সমস্ত বিকল্পের সার, তাহাতে আমি দীনতাবর্জ্জিত হইয়াছি। এখন আমি পরিপূর্ণ এবং আমার মনকে এখন আমি আশামাতঙ্গ দলনে ও সংসার-সমুদ্র-সন্তরণে মহাশূর বলিয়া গণনা করিতেছি[৩৫]।

হে ভগবন্! আমার মন এখন বিকল্পজাল পরিত্যাগ করিয়াছে, বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছে, দৈন্যতা ত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহা ত্রিজগতের সার ও প্রসন্ন বস্তু, আমার মন এখন তাহাতেই পরিপূর্ণ ও প্রমুদিত হইয়াছে[৩৩]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কেবল অর্থাৎ রাগরহিত ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসঙ্গরহিত মন দ্বারা যাহা করিবে, তাহা কৃত বলিয়া গণ্য হইবে না; অর্থাৎ সেরূপ কর্ম্মের ফল কোনও প্রকার ভোগজনক নহে[১]। বস্তু যে সময়ে পাওয়া যায়, মাত্র সেই সময়ে তাহা তুষ্টিজনক হয়, পূর্ব্বে ও পরে তাহা তোষজনক হয় না, এ সত্য সকলেই বিদিত আছেন। বস্তুর তোষজনকতা যখন কেবলমাত্র বাঞ্ছাকালে, অন্য কালে নহে, তখন ইহাই বুঝা উচিত যে, বৈষয়িক সুখ মাত্রেই ক্ষণিক। এইরূপে যাহারা বিষয়-সুখের ক্ষণিকত্ব নিশ্চয় করিয়াছে, কি জন্য তাহারা ক্ষণিক সুখে আসক্ত হইবে? যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই বিষয়-সুখে মগ্ন হয়, যাহারা জ্ঞ, তাহারা নহে[২।৩]। যখন দেখা যায়, বাঞ্ছাসমকালেই তুষ্টি অর্থাৎ সুখ, সদা বা অন্য কালে নহে, তখন এইরূপ অবধারণ করা উচিত যে, বাঞ্ছাই সে সকল সুখের কারণ এবং সে সুখের অবসান দুঃখময়। অতএব, হে রাম! তুমি বাঞ্ছা পরিত্যাগ কর[৪]। এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিবার কারণ এই যে, তুমি ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার অহম্ভাবরূপ পঙ্কে নিমগ্ন হইবে না[৫]। আত্মজ্ঞানরূপ উচ্চ পর্ব্বতে বিশ্রান্তিলাভ করিয়া পুনঃ অহংগর্ত্তে পতিত হওয়া উচিত নহে। আত্মজ্ঞতারূপ সুমেরু শিখরে স্থিতি লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পাতাল-পতন স্বীকার অনুচিত[৬।৭]। তোমার স্বভাব সমতাময় ও সত্যতাময়। আমার মনে হইতেছে, তোমার বিকল্প ও তন্মূলীভূত অবিদ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে[৮]। হে রামচন্দ্র!

তুমি এখন স্বস্বভাবে স্থিত, তোমার মতি এখন নির্ম্মলা[৯]। তোমার আশা নিরাশা হউক, অভাব ভাব হউক ও মন অমন হউক, তুমি সঙ্গরহিত জীবন প্রাপ্ত হও[১০]। তুমি যে যে বস্তু দেখিবে ও যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, সে সমুদায়কে তুমি চিদ্‌ঘন ব্রহ্মভাবে বৃংহিত করিবে[১১]। যদি তুমি আপনাকে বিদিত হইয়া থাক, তাহা হইলে মুক্ত এবং বিদিত না হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি বদ্ধ। অতএব, রঘুনাথ! তুমি আপনিই আপনাকে প্রবুদ্ধ কর[১২]। যাহাতে ভোগসুখ স্থান পায় না, [illegible]ানুসারে উপস্থিত দুঃখও যাহাতে সংলগ্ন হয় না, তাহাকেই তুমি বাসনা ক্ষয় বলিয়া জানিবে। এই নির্ব্বাসনতাকে সাম্য ও আকাশ-সদৃশ বলা যায়[১৩]। শত শত ঝঞ্ঝা প্রভৃতির তাড়নাতেও আকাশ যেমন সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না, তেমনি, তুমিও বাসনাশূন্য অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য করিলে বিকার গ্রস্ত হইবে না[১৪]। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই তিন্ বিভাগকেই যদি তুমি আত্মা বলিয়া জান, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সংসারাতীত হইবে[১৫]। বিষয়াকারা চিত্তবৃত্তির উদয়ে সংসারের উদয় ও তাহার অনুদয়ে সংসারের বিলয় হয়। অতএব তুমি বাসনা ও প্রাণের প্রচলন নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিবে[১৬।১৭]। অজ্ঞতার উন্মেষ ও অজ্ঞতার অনুন্মেষ কর্ম্মোদয়ের ও কর্ম্মনিবৃত্তির কারণ, সে জন্য তুমি গুরূপদেশ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য ও সংযম অবলম্বন করিয়া কর্ম্মকেও বিলয় কর[১৮]। যেমন, বায়ুর ও ধূলিকণার স্পন্দনে ও মালিন্যে আকাশের স্পন্দন ও মালিন্য প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, চিত্তেরই বিষয়াকারা বৃত্তির উদয়ে আত্মার সক্রিয়ত্ব ও দৃশ্য-দ্রষ্টৃত্ব সম্পন্ন হইতেছে[১৯]। যেমন, আ-লোক ও কুড্য উভয় সম্পর্কে দ্রষ্টা বিচিত্রাকারের বর্ণ (রং) দর্শন করে, তেমনি, দৃশ্য দর্শনেরই সম্পর্কে জগদ্ভাবের প্রস্ফুরণ দৃষ্ট হইতেছে[২০]। যদি দৃশ্য দর্শন না হয়, তাহা হইলে এতদ্রূপ জগদ্ভাবও থাকে না[২১]। চিত্রিত মনুষ্যের কি হৃদয় থাকে? না কোনও প্রকার ভাবো-দয় হয়? মায়া কি? মায়া চিত্তেরই বিশেষ বিশেষ চাঞ্চল্যের সমষ্টি। সেই চাঞ্চল্যকে যদি নিরুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে মায়া থাকে না, নিরুদ্ধ হইয়া যায়। জলের স্পন্দন বীচি; জল যদি স্পন্দিত না হয়, তাহা হইলে কি বীচি থাকে[২২]? বাসনা পরিত্যাগ ও প্রাণ নিরোধ এই উভয় দ্বারাই চিত্তের নিস্পন্দতা জন্মে[২৩]। সম্বিৎ নিস্পন্দ হই-

সেই চিত্তের চিত্ততা থাকে না ও তাহা প্রাণ নিরোধ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে[২৪]। দৃশ্য দর্শনে অথবা তৎসম্পর্কে যে সুখ অভিব্যক্ত হয় সে সুখও ব্রহ্ম, এরূপ অবধারণ মনোলয়ের কারণ হইয়া থাকে অর্থাৎ মন ঐরূপ ভাবে পরিভাবিত হইতে হইতে স্বরূপ শূন্যের হয়[২৫]। যাহাতে চিত্তের অভ্যুদয় নাই অর্থাৎ যাহা চিত্তের দ্বারা জন্মে না, সেই সুখকে তুমি অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে[২৬]। চিত্তনাশজনিত অকৃত্রিম সুখকে তুমি বর্ণনার অতীত ও তারতম্যবর্জ্জিত বলিয়া জানিবে। তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই[২৭]। তত্ত্ববোধই চিত্তের নাশক ও অতত্ত্ববোধ তাহার জনক ও রক্ষক। সমূলে নাশ না হইলেও, তত্ত্ববোধ দ্বারা চিত্তের লয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা মিথ্যাভূত হইয়া থাকে। সুবর্ণীকৃত তাম্রকে যদি তাম্র বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে সুবর্ণাকারসত্ত্বেও যেমন তাহার সুবর্ণত্ব থাকে না, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্ত থাকিলেও তাহা না থাকার ন্যায় হইয়া যায়। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞচিত্ত চিত্ত সংজ্ঞায় গণনীয় না হইয়া সত্ত্ব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়[২৮।৩০]। চিত্ত কোন বস্তু নহে অর্থাৎ সৎ পদার্থ নহে। চিত্ত এক প্রকার ভ্রান্তি বিশেষ। সে জন্য তাহা তত্ত্বজ্ঞানে দূরীভূত হয়। নিয়ম এই যে, যাহা সৎ, তাহার আত্যন্তিক অভাব হয় না[৩১]। বিকল্পময় চিত্ত অবস্তু অর্থাৎ শশশৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যা। অতএব, চিত্ত হউক, আর চেত্য হউক, সমস্তই সদাত্মার বিবর্ত্তন অর্থাৎ আত্মারই মিথ্যা প্রতীতি। আর যে হেতু তাহা মিথ্যা প্রতীতি, সেই হেতু সত্য প্রতীতির উদয়ে তাহার বিলয় হয়[৩২]। উক্ত চিত্তাবস্থা সার্ব্বকালিক নহে, পরন্তু কিঞ্চিৎকালিক। অর্থাৎ যাবৎ না বিদেহমুক্তি বা কৈবল্যস্থিতি উপস্থিত হয়, তাবৎ ব্যবহার নির্ব্বাহক বলিয়া চিত্তের ব্যবহারিক সত্যতা মান্য করা যায়[৩৩]।

হে রঘুনাথ! ব্রহ্মই ব্রহ্মে স্বরূপ বিস্মৃতি বশতঃ এই সমস্ত ভুবন সন্নিবেশ দর্শন করিতেছেন। তিনি এক ও সমস্বভাব হইলেও স্বারোপ-ক্রমে অনেক ও অসম হইয়াছেন। অতএব, তিনি সর্ব্বস্বরূপ। আর যে হেতু তিনি সর্ব্বস্বরূপ সেই হেতু চিত্তাদি পদার্থও তিনি[৩৪]।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! উপরি উক্ত বিষয় বিস্পষ্টরূপে বুঝা যায় ও উল্লাস জন্মে এরূপ একটী সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর[১]। এমন একটী বিল্বফল আছে—যাহা সহস্র যোজন ব্যাপ্ত সুতরাং বিপুল—যৎপরোনাস্তি বিপুল। কত যুগ যুগান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইবে, তথাপি উক্ত বিল্বফল জীর্ণ হয় নাই ও হইবে না[২]। উহার রস ও স্বাদ অত্যন্ত মধুর ও অবিনাশী। ইহা অনাদিসিদ্ধ অথচ পুরাতন হয় না। চিরকালই নূতন[৩]। অভিহিত বিল্ব ভুবনমধ্যগত মেরুর সদৃশ, মন্দরাচলের ন্যায় অচল ও কল্পান্তবায়ুর অবিচাল্য[৪]। ইহার বৈপুল্যের ইয়ত্তা নাই এবং ইহাই এই জগৎস্থিতির মূল[৫]। কোন উচ্চ পর্ব্বতের নিকট সর্ষপের কণিকা যেরূপ, এই বিল্বের নিকট ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ (অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র)।[৬]। হে রঘুনাথ! এই বিল্বফল হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহা অতি সুস্বাদু ও অতিচমৎকারজনক[৭]। সাধারণ বিল্ব পাকিয়া অধঃপতিত হয় কিন্তু এ বিল্ব পাকেও না ও পড়েও না। এ বিল্ব চিরপক্কই রহিয়াছে অথচ বিচ্যুত হয় না। অর্থাৎ পচিয়া যায় না। যাহারা অতি বৃদ্ধ, যাহাদের অধিক বৃদ্ধ নাই, সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতিরা এই বিল্বের উৎপত্তি বিদিত নহেন। মূল কোথায়, বৃন্ত কোথায়, তাহাও বিদিত নহেন[৮।৯]। ইহার বীজ, অঙ্কুর, বৃদ্ধি, পুষ্প, শাখা, কাণ্ড, কিছুই দৃষ্ট হয় না এবং ইহার উৎপত্তি ও বিকারাদি বা পরিণাম দেখা যায় না[১০।১১]। ইহা সমস্ত ফলের সার এবং এই মহাকৃতি ফলের মজ্জা ও অষ্ঠি দুএর কিছুই নাই। ইহা নির্ব্বিকার ও নির্ম্মল—অত্যন্ত নির্ম্মল[১২]। যেমন প্রস্তরের মধ্য নীরন্ধ্র সেইরূপ ইহাও নীরন্ধ্র। ইহার রস অমৃত অপেক্ষাও সুমধুর পরন্তু তাহা সংবিন্মাত্রের আস্বাদ্য[১৩]। ইহাই সকল সুখের কোষ। ইহা শৈলের ও পিণ্ডায়মান অমৃতের সহিত তুলিত হয়। কবিগণ ইহাকে স্বাত্মচমৎকার বলেন, সেই স্বাত্মচমৎকার এই বিল্বের পরম মজ্জা এবং ইহার

সন্নিবেশ অর্থাৎ গঠন অতি বিচিত্র। পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা ফলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ফল এই নামে কল্পিত হইয়াছে। এই ফল পরম সূক্ষ্ম, আবার অন্য ভাবে ইহা যৎপরোনাস্তি স্থূল[১৫,১৬]। যাহা নাই, এই বিল্ব অধ্যাস দ্বারা তাহা উৎপাদন করে। ইহা ভুবন, উহা ভবন, এ সকল ভেদ সত্যতঃ নাই। না থাকিলেও এই বিল্ব ঐরূপ কল্পনা করায়। আগে অহংএর উদয় হয়, তৎপরে ঐরূপ আভিমানিক সৃষ্টি হয়[১৭,১৮]। এই বিল্বের যে মজ্জা, তাহা স্বরূপ সম্বিদ্, সে স্বরূপ এ কদাচ পরিত্যাগ করে না। অথচ সে-ই এই সকল প্রসারিত করিয়াছে[১৯,২০]। যথা—ইহা ব্যোম, ইহা কাল, ইহা নিয়তি, ইহা ক্রিয়া, ইত্যাদি। এরূপ বাহ্যিক ভেদ ব্যতীত ইহা সঙ্কল্প, তাহা বিকল্প, ইহা আশা, ইহা ভ্রান্তি, ইহা রাগ ও দ্বেষ, ইহা হেয়, উহা উপাদেয়, তথা তুমি ও আমি, এইরূপ এইরূপ আন্তরিক ভেদ (ভিন্নভাব) বিস্তারিত করিয়াছে। উর্দ্ধ, অধঃ, পূর্ব্ব, পশ্চাৎ, সম্মুখ, পার্শ্ব, দূর, নিকট, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দবাচ্য অসংখ্য কল্পনা ঐ বিল্বের অন্তঃস্থ। কল্পনাময় অসংখ্য পদ্মের আকর স্বরূপ জীবসমূহ উক্ত বিল্বেরই অন্তর্ভূত। এবং এই ব্রহ্মাণ্ড-রূপ মণ্ডপ ও তদন্তর্গত নানাবিধ ক্রীড়ামণ্ডপ উক্ত বিল্বে স্থিতি লাভ করিয়াছে। এই বিল্ব ভগবান্ হরির হৃদ্‌পদ্ম, যে পদ্ম অনন্ত কল্পনা-তত্ত্বে পল্লবিত এবং যাহার কর্ণিকায় এই সকল লোক প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্মের কোটর মহারুদ্রাদির দ্বারা প্রপূরিত। ইহাতে বিষয়লম্পট স্বর্গি পুরুষ দিগের ও নারকী জীব দিগের গমনাগমন জন্য অতি বিস্তীর্ণ পথ প্রসারিত রহিয়াছে[২১,২৭]। এই জগৎ যেন একটী পদ্ম, তৎকর্ণিকা সুমেরু, তত্রস্থ মধু চন্দ্র, তত্রস্থ অমৃতের প্রত্যাশী দেবতারা এই পদ্মের ভ্রমর। ঈদৃশ পদ্মও বর্ণিত বিল্বের অন্তর্গত[২৮]। এই জগৎ একটী জীর্ণ বৃক্ষ, এই বৃক্ষের পুষ্প সত্ত্বগুণ বা স্বর্গ ও ইহার মূল রজোগুণ বা নরক[২৯]। ব্রহ্মসমুদ্রের তটে অবস্থিত এই যে অপার ও অসীম ব্যোম, এই যে সুকৃত দুষ্কৃতরূপ মহাভীষণ গ্রাহ, এই যে সৃষ্টিরূপ ঘোর আবর্ত্ত, এই যে কালরূপ মহাপদ্ম, এ সমস্তই বর্ণিত বিল্বের অন্তঃ-সন্নিবিষ্ট। ষড়্‌বিধ ভাববিকার, জরামরণাদি দশা, বিদ্যার ও অবিদ্যার বিলাস, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ, এ সমস্তই বিল্ব। বিল্ব ছাড়া কিছু নাই।

এই বিশ্বের নিজমজ্জা চমৎকার অর্থাৎ অতি বিস্ময়জনক বা অনির্ব্বাচ্য। ইহার সন্নিবেশ অর্থাৎ রচনা কেবল মাত্র সঙ্কল্প। ইহার স্থিতিও সঙ্কল্প। সঙ্কল্পে স্থিতি হইলেও ইহার অশান্তি নাই, অস্বাস্থ্য নাই, বাধাও নাই। ইহা সৌম্য, ভাবনাবর্জ্জিত, কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও ইহা অকর্ত্তা। ইহা এক ভাবে এক, বহু ভাবে বহু, অথচ ইহা একও নহে বহুও নহে ইহা সমরূপ ও সর্ব্বাত্মক। বাক্য ইহাকে কি বলে? বাক্য ইহাকে বলে, ইহা মহতী চিতিশক্তি৩০।৩৬।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—()○()—

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্ব্বসারজ্ঞ! হে ভগবন্‌! আপনি যে বিশ্বের কথা বলিলেন, উহার অর্থে আমি বুঝিলাম, উহা ব্রহ্মনামক মহাচিৎ১। এ সমস্তই সেই চিন্মজ্জার রূপ এবং উহা হইতেই এই অহম্ভাবাদি তুচ্ছ তৃণান্ত পদার্থ আতত হইয়াছে। আরও বুঝিয়াছি, দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুই ভেদ বাস্তব ভেদ নহে২।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! কেবল অহম্ভাবাদিই যে চিদ্বিশ্বের মজ্জা, তাহা নহে। এ সমস্ত বিশ্বই উক্ত চিদ্বিল্বের মজ্জা৩। এই যে সৃষ্টি, ইহাও চিদ্বিল্বের মজ্জা, পরন্তু এ বিল্ব প্রাকৃত বিল্বের ন্যায় মজ্জা ও মজ্জাধার বিল্বখর্পর উভয়ের ন্যায় ভেদবিশিষ্ট নহে। তথা পরিণাম বিশিষ্টও নহে। প্রাকৃত বিল্বের বিনাশ আছে, এ বিল্বের বিনাশ নাই। প্রাকৃত বিল্বমজ্জা বিল্বখর্পররূপ আধারে স্থিত থাকে, এ বিল্বমজ্জা আত্ম-স্বরূপেই স্থিত, ইহার আর অন্য আধার নাই। ইহাতে আধারাধেয় ভাব নাই। এই যে জগৎ-নামধেয় এক অত্যদ্ভুত চমৎকার, ইহা সেই চিৎ পদার্থেরই বিবর্ত্ত, অন্য কিছু নহে। ইহার সন্নিবেশ (রচনা বা সাজান) ও শিলার মধ্যে শিল্পিমনঃকল্পিত পদ্মবনের অনুরূপ৪।৫। হে ইন্দুবদন!

হে রাম! অভিহিত রহস্য বুদ্ধিগোচর করাইবার জন্য আমি অন্য এক চিত্তবিস্ময়ক আখ্যান বলি, শ্রবণ কর[৬]।

কোন এক প্রদেশে স্নিগ্ধ, বিস্পষ্ট, কোমলস্পর্শ, যার পর নাই বিস্তৃত ও সদা অক্ষোভ্য, এরূপ এক মহাশিলা আছে[৭]। তন্মধ্যে অনেক প্রফুল্ল পদ্মবন রহিয়াছে। সেই পদ্মের পত্র সকল পরস্পর অনুবিদ্ধ ও পরস্পর বিরুদ্ধভাবে সংঘটিত অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট। সংশ্লিষ্টও বটে, প্রকট প্রাপ্তও বটে[৮,৯]। সে সকলের কতক ঊর্দ্ধমুখ, কতক অধোমুখ, কতক তির্য্যক্মুখ, কতক বা পরস্পর সম্মীলিতমুখ এবং সে সকল মুখ পরস্পর পরস্পরের মুখে নিখাত অর্থাৎ প্রোথিত[১০]। ইহাদের কর্ণিকা অনেক, সে সকল মূলবৎ প্রোথিত, (মূল যেমন প্রোথিত সেইরূপ প্রোথিত) তথা কোন কোন কর্ণিকা মূল মধ্যে সন্নিবিষ্ট। অভিহিত পদ্ম নিবহের মধ্যে কাহার মূল ঊর্দ্ধে, কাহার মূল অধঃ এবং কাহার মূল নাই[১১]। সে সকলের নিকটে শত শত সহস্র সহস্র শঙ্খ রহিয়াছে তথা বিপুলাকার চক্র সমূহও পদ্মের ন্যায় সাজান রহিয়াছে[১২]।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি যে মহাশিলার কথা বলিতেছেন সে শিলা আমি শালগ্রাম ক্ষেত্রে দেখিয়াছি[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি যখন দেখিয়াছ, তখন তুমি অবশ্যই বিদিত আছ। তাহাতে যে প্রাণ আছে তাহা সমান ও অনবকাশ অর্থাৎ তাহা কেবল ঘনচৈতন্য ও নিরতিশয় আনন্দ। বিদিত থাকিলেও আমি তোমাকে সেই শিলার দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। যেমন বিল্বের দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইয়াছি, তেমনি এবার, শিলার দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইলাম। শিলায় যেমন শঙ্খ পদ্মাদি আকৃতি আছেও বটে; নাইও বটে, সেইরূপ, ব্রহ্মেও এ সকল আছেও বটে, নাইও বটে। শিল্পীর মনঃকল্পনায় আছে, আবার কল্পনা ত্যাগে নাই। শিল্পী স্বকল্পনানুরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সে সকলকে স্থূল দৃশ্যে প্রকট করায়, ব্রহ্মও মায়িক কল্পনাকে মায়িক পরিণতির দ্বারা এ সকল স্থূলাকারে প্রকট প্রাপ্ত করিয়াছেন[১৪,১৫]। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে প্রাকৃত শিলার কথা বলি নাই, চিৎ-শিলার কথাই বলিয়াছি। চিদ্বস্তুকে শিলা বলিবার কারণ এই যে, শিলা যেমন নিবিড়, একাত্মক, নীরন্ধ্র ও বিবিধ শালভঞ্জিকাশক্তিবিশিষ্ট (শালভঞ্জিকা=খোদাই করা ছবি), চিৎও সেইরূপ নিবিড়,

একাত্মক অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহে একরূপ ও জগৎরচনাশক্তিবিশিষ্ট। আকৃতি-রহিত আকাশে যেমন বিপুল বায়ু অবস্থিতি করে, সেইরূপ, আকৃতি-বর্জ্জিত চিদ্বস্তুতে এই জগৎ ছিল ও আছে[১৬,১৭]। স্বর্গ বা অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, দিক্‌সমূহ, সরিৎ, সমুদ্র, এ সমস্তই উক্ত শিলায় রহিয়াছে। উক্ত চিৎ হইতেই জগৎরূপ পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছে। এমন বস্তু কিছু নাই যাহা চিৎ হইতে পৃথক্‌ভূত। শিল্পীরা যেমন শিলায় শঙ্খ পদ্মাদির আকৃতি লিখিত বা খোদিত করে, সেইরূপ, বর্ণিত চিদ্বস্তুতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক পদার্থ খোদিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, শিলাখোদিত আকৃতি যেমন শিলাই, আকৃতিভাগ মিথ্যা, তাহার ন্যায় চিৎকল্পিত জগৎও চিৎ, কল্পিত জগৎ-ভাগ মিথ্যা[১৮।২০]। শঙ্খপদ্মাদির আকৃতি রচিত হইলেও সে সকল শিলার অনতিরিক্ত[২১,২২]। সেইরূপ এই সৃষ্টিও চিতের অনতিরিক্ত। চিতের উদয় ও অস্ত দুএর কিছুই নাই। যদ্রূপ শিলাস্থ শঙ্খপদ্মাদির রেখা সুষুপ্ত, অর্থাৎ টঙ্কচ্ছেদের পূর্ব্বে (টঙ্কচ্ছেদ=খোদাই) অনভিব্যক্ত থাকে, তদ্রূপ এই জগৎও প্রথমে চিতের অজ্ঞানাংশে সুষুপ্ত অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে অথবা ছিল[২৩,২৪]। যেমন সুচরিত্রা সতী নারীর অন্তরে তাহার কান্ত সদা বিরাজিত থাকে সেইরূপ এই জগৎও চিতের অন্তরে সদা বিরাজিত রহিয়াছে। নানা বিকারময়ী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলী ছিল না, পরে হইয়াছে, এ উক্তির কোন সার্থক্য নাই[২৫।২৬]। যেমন জল-বিকার বিন্দু বুদ্বুদাদি অবশেষে যে জল সেই জলই হয়, সেইরূপ, এ সকল বিকারও অবশেষে চিৎপদার্থে পর্য্যবসন্ন হয়। অতএব, বিকার সমুদায়ও ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম ব্যতীত, পৃথক্‌ বিকার নাই। তাই বলা যায় যে, ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই প্রোক্তপ্রকার উৎপত্তি ও লয় হয় ও ব্রহ্মই স্থিত আছেন[২৭,২৯]। চিৎপদার্থে ভাসমান বিশ্ব সৌরকিরণে ভাসমান জলের ন্যায় মিথ্যা। যেমন বীজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিকারের পরিবর্ত্তনে অঙ্কুরাদিরূপে প্রথা প্রাপ্ত হয় তেমনি চিদ্রূপ জগদ্বীজ ক্রমিক বিকার পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে[৩০।৩১]। আগে এক পরে দুই এতদনুসারে দ্বৈতকল্পনা একেরই অধীন, সুতরাং একাদ্বয় চিৎই তত্ত্ব, আর সব অতত্ত্ব। চিৎ কখনও অচিৎ জড় হয় না। মহাশিলার অন্তরে শিল্পি কল্পিত লাঞ্ছনের (ছবির) সত্তা আর চিতের অন্তরে মায়াকল্পিত জগ-

তের সত্তা তুলিত হয়[৩২,৩৩]। যেমন বিল্বে মজ্জা, তেমনি, জগতে চিৎ। শিলা যেমন রেখা ও উপরেখাদির দ্বারা অন্যাকারে প্রতীয়মান হয় সেইরূপ ব্রহ্মও ত্রৈলোক্যরূপ রেখার ও উপরেখাদির দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছেন। শিলালিখিত শঙ্খপদ্মাদি সদা সুষুপ্ত, সেইরূপ চিদ্ভাসিত বিশ্বও সদা সুষুপ্ত এবং ইহার উদয় ও অস্ত বাস্তব নহে। শিলায় যে রেখোপরেখা থাকে তাহা কি শিলা হইতে ভিন্ন? না সে শিলা অন্য শিলা হইতে ভিন্ন? যে হেতু চিৎ-ই জগতের সার অর্থাৎ স্থির বস্তু, সেই হেতু জগদন্তর্গত কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্তই অসার অর্থাৎ কল্পনামাত্র। শিলালিখিত পদ্মাদির যেমন স্পন্দন অস্পন্দন কিছুই নাই, সেইরূপ, চিৎপ্রকাশিত কোনও পদার্থের বাস্তব কর্ত্তৃত্বাদি নাই। চিৎপ্রকাশিত পদার্থ সকল জড়, জড়ের আবার কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব কি? অতএব, কেহ কিছু করেও না, কোন কিছুর নাশও হয় না[৩৪,৩৮]। সৃষ্টি স্থিতি লয় এ সকল নিয়তির কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। একই শিলা যেমন নানা শিল্পীর কল্পনায় নানাত্ব প্রাপ্ত হইলেও শিলার নানাত্ব হয় না, তেমনি, নানা জীবের নানা কল্পনা উপস্থিত হইলেও চিতের নানাত্ব জন্মে না[৩৯]। জগৎ নানা বিকারে ও নানা ভাবে যতই আঢ্য হউক না কেন, ইহাকে তুমি এক মহৎ ভ্রম বলিয়া মনে করিবে[৪০]।

এই যে কার্য্যভূত জগৎ ইহাকে তুমি সুষুপ্তবৎ জানিবে। বস্তুতঃ ইহার তত্ত্ব প্রশান্ত, সম অর্থাৎ উচ্চ নীচ ও উত্তমাধমাদি বর্জ্জিত ও কেবল নিবিড় চিন্মাত্র বলিয়া জানিবে। শিলান্তর্গত কল্পিত পদ্মাদি যেমন অসার, সেইরূপ, চিৎকর্ত্তৃক উদ্ভাসিত এই দেহাদিও সেইরূপ অসার[৪১]।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিদ্রূপ তত্ত্ব যাবৎ স্বরূপপ্রতিসন্ধানশূন্য থাকে তাবৎ তাহা সৃষ্টিকারণ। ফল যেমন অঙ্কুরাদি সৃষ্টির কারণ বলিয়া গণ্য সেই-রূপ প্রচ্ছন্ন স্বাত্মরূপা চিৎ সৃষ্টিকারণ বলিয়া গণ্য। জীবচৈতন্য যেমন স্বপ্ন সন্দর্শনের কারণ, তেমনি, ব্রহ্মচৈতন্যও স্বপ্নতুল্য বিশ্বসৃষ্টির কারণ। অতএব, চিৎপদার্থের সত্তার ভেদ কল্পনাই সৃষ্টি, সেজন্য সৃষ্টির পৃথক্ সত্তা নাই। স্বপ্নেরও পৃথক সত্তা নাই[১]। দেশ কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই যখন চিন্ময়, তখন অবশ্যই ইহা তাহা এ সে প্রভৃতি বাস্তব ভেদ অনুপপন্ন[২]। আবার ইহাও দেখা যায়, সমুদায় শব্দ, অর্থ ও সে সকলের সংস্কার একরূপই আছে ও থাকে, অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয় না। সৃষ্টি আত্যন্তিক অসৎ হইলে কিরূপে ঐ সকল সঙ্গত হইতে পারে? তাই বলা হয়, সৃষ্টির রহস্য সৎও নহে, অসৎও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য[৩]। যেমন কোন ফলের অন্তর্ব্বাহ্য নানাও বটে, অনানাও বটে, অর্থাৎ সমুদায়তঃ এক বা অভিন্ন, পরন্তু অবয়ব ক্রমে নানা নাম ধারণ করে, অর্থাৎ ইহা মজ্জা, ইহা খর্পর, ইত্যাদি প্রকারের নাম কল্পনা করা যায়, তেমনি, চিৎ ও সৃষ্টি এতদুভয়কে এক ভাবে ভেদ ও অন্য ভাবে অভেদ বলা যায়[৪।৫]। চিদ্রূপ দর্পণে চিদ্‌ভিন্ন জগন্নামক নগর প্রতিবিম্বিত হইতেছে[৬]। যেমন চিন্তামণিতে নানা ফলপ্রদান শক্তি থাকে তেমনি পরম চিন্তামণি চিত্তত্ত্বে কোটী কোটী জগৎসৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে[৭]। যেন চিৎ একটী মুক্তাকোষ, তন্মধ্যে যেন এই জগদ্রূপ মুক্তা[৮]। যেন চিৎ একটী সূর্য্য, যেন তিনি এই জগদ্দ্রব্য দর্শন করিতেছেন[৯]। সমুদ্র-গর্ভে জলাবর্ত্তের বিলাস যদ্রূপ, সে সকল যেমন অনানা হইলেও নানার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, (ফেণ, বুদ্বুদ, তরঙ্গ, বীচি প্রভৃতি), চিদ্‌গর্ভে বিশ্বের বিলাসও তদ্রূপ, তথা এ সকল অনানা হইলেও নানার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে[১০]। চিতে যাহা আছে তাহাও শিলায় শালভঞ্জিকার (ছবির) ন্যায়, যাহা নাই, তাহাও শালভঞ্জিকা না থাকার ন্যায়[১১]।

এই ভাবাভাবময়ী জগতের সার বা মজ্জা চিৎপদার্থ[১২]। পদ্মাদি নাম ও সে সকলের অর্থ পরিত্যাগ করিলে যেমন কেবল মাত্র শিলাই অবশেষিত হয় সেইরূপ জগৎ এই নাম ও নামার্থ পরিত্যাগ করিলে কেবলা চিৎ অবশেষিত হয়। নানা হইলেও যেমন শিলাস্থ পদ্মাদি অভেদ বুদ্ধির গ্রাহ্য কালে একত্বে পর্য্যবসন্ন হয় সেইরূপ এই নানা কল্পনায় কল্পিত জগৎকেও কল্পনাংশ পরিহারে একত্ব বুদ্ধির গম্য করা যায়। সুতরাং বুঝাও যায় যে, ইহার আধার চিদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং আধেয় জগৎও তদতিরিক্ত নহে[১৩।১৪]। মরুভূমিস্থ মরীচিকা যেমন তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের দৃষ্টিতে জল ও অভিজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সূর্য্যাতপ, সেইরূপ, চিদাশ্রিত জগৎও অজ্ঞদৃষ্টিতে জগৎ ও জ্ঞানিদৃষ্টিতে জগৎ নহে [১৫]। রাশীভূত জলের মধ্যে যেমন স্পন্দাস্পন্দ দ্বিবিধ ভাব অর্থাৎ দ্রবতা হেতু প্রচলন ও ক্বচিৎ অচাঞ্চল্য ভাব বিদ্যমান থাকে, তেমনি সেই চিদ্‌ঘন বস্তুর মধ্যে ক্বচিৎ চাঞ্চল্যের ন্যায় অর্থাৎ মিথ্যা সৃষ্টিরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়[১৬]। শিলাশ্রিত শঙ্খপদ্মাদি যেমন তন্ময় (শিলাময়) তেমনি চিদাশ্রিত জগৎও তন্ময় অর্থাৎ চিন্ময়। উক্ত মহাচিৎ উক্ত প্রকারে প্রকৃত পক্ষে মহাশিলার সদৃশ, এবং এ মহাশিলা বস্তুতঃ নীরন্ধ্র, নির্দ্বন্দ্ব ও অরচিত। অর্থাৎ কাহার রচিত নহে। যদিও রচিত নহে তথাপি রচিতের ন্যায় অনুভূয়মান হইতেছে। কালাত্মক সূর্য্য চন্দ্রের কোন এক অবান্তর ভেদ কল্পনা করিয়া লোকে বলে, শরৎ নির্ম্মল কিরণ দান করিতেছে ও চন্দ্র স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এইরূপ আমরাও বলি, ব্রহ্ম জগৎ প্রকাশ করিতেছেন ও ব্রহ্ম জগদ্রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন[১৭।১৯]। ব্রহ্মে এই বিশ্ব সুষুপ্তের ন্যায় এবং শিলোৎকীর্ণ পদ্মাদির ন্যায়। ইহা নাশবর্জ্জিত। ব্রহ্মত্ব যেমন ব্রহ্মেই স্থিত, তেমনি এই জগৎও ব্রহ্মে স্থিত[২০]। যেমন তরু ও পাদপ ভিন্ন নহে, তেমনি, ব্রহ্ম ও জগৎ ভিন্ন নহে[২১]। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ভাব ও অভাব দুএর কিছুই নাই। মরুভূমিস্থ সৌরকিরণ জলরূপে ভাসমান হওয়ার ন্যায় ব্রহ্মচিৎ এই জগদ্রূপে ভাসমান হইতেছেন। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, তৃণাদি ব্রহ্মাণ্ডান্ত বাহ্য দৃশ্য ও চিত্তাদি হিরণ্যগর্ভান্ত আন্তর প্রপঞ্চ, সমুদায় পদার্থের বিভাগক্রম অবলম্বন করিলে সর্ব্বশেষে যাহা অবিভাজ্য বলিয়া নির্ণীত হয় তাহাই ব্রহ্মের রূপ ও তাহা পরম সূক্ষ্ম।

বিভাগক্রমলব্ধ সূক্ষ্ম ভাবের সেই সেই সংঘাত বা মিলিত ভারই পর পর স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতমাদিরূপে কল্পিত হয়। উচ্চতার দৃষ্টান্ত সুমেরু প্রভৃতি ও ক্ষুদ্রতার দৃষ্টান্ত তৃণাদি। অতএব, যখন সূক্ষ্মতার সার অর্থাৎ প্রথম আধার বা আদি সীমা সৎ (কেবল মাত্র অস্তিতা), তখন ইহা অবশ্য বোধ্য যে, স্থূলতার সারও সৎ অর্থাৎ কেবল অস্তিতা। যেমন জলীয় পরমাণুস্থ রস শক্তিই স্থূল জলে অনুভূত হয়, তেমনি, সর্ব্ব মূল ব্রহ্মসত্তাই ঘটাদি পদার্থে অনুভূত হইতেছে। (অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাই অথবা অস্তি-স্বরূপ ব্রহ্মই এই ঘট, ঘট আছে, ঘট রহিয়াছে, এইরূপে ঘটের সঙ্গে ব্যক্ত হইতেছে) যে রসশক্তি জলে, সেই রসশক্তিই তৃণাদি পদার্থে। একই রসশক্তি তৃণাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইতেছে। সেইরূপ একই ব্রহ্মসত্তা ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশমান হইতেছে[২২।২৩]। যেমন ময়ূরাণ্ড রসে কাঠিন্য ও বিচিত্র পুচ্ছাদি শক্তিরূপে থাকে বলিয়াই পশ্চাৎ পরিণাম ক্রমে সে সকল প্রকট প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মায়াশবল ব্রহ্মে বিশ্বশক্তি থাকায় ক্রমপরিণামের ফলরূপে এই বিশ্বমণ্ডল প্রকট প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব, যেমন বিচিত্র ময়ূরপিচ্ছ তাহার ডিম্বরস ব্যতীত পদার্থান্তর নহে, তেমনি, এই বিচিত্র বিশ্বও ব্রহ্মরস ব্যতীত অন্য বস্তু নহে[২৭।৩১]। যেমন ব্রহ্ম বাস্তব, জগৎ অবাস্তব, তেমনি, অদ্বৈতই বাস্তব ও দ্বৈত জগৎ অবাস্তব। বাস্তব ও অবাস্তব উভয়ই একই আধারে স্থিতি করিতেছে। যে তত্ত্বে দ্বৈতাদ্বৈতসত্তার স্থিতি বা সমাবেশ, সেই তত্ত্ব-কেই তুমি পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ভাবের ন্যায় অভাব পদা-র্থেরও একটা আশ্রয় আছে এবং সর্ব্বাশ্রয় পদার্থই ব্রহ্ম শব্দের অভি-ধেয়[৩২।৩৩]। যেমন ময়ূরাণ্ডে পিচ্ছশক্তিসমন্বিত রস থাকে তেমনি চিৎ-পদার্থে জগৎশক্তিসমন্বিত মায়া থাকে। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি জগৎকে চিৎসম্বলিত ভাবিবে। যেমন ময়ূরাণ্ডের রস একরূপ ও নানা রূপ তেমনি চিদ্ব্রহ্মও একরূপ ও নানারূপ[৩৪]।

সেই আদ্যা চিৎ এই জগদ্রূপ ময়ূরাণ্ডের রস, সেই রসে ময়ূর ও অময়ূর উভয় রূপই আছে, অর্থাৎ জগৎ ও জগতের অভাব উভয় রূপই আছে। অতএব, ময়ূরাণ্ড রসই যথাকালে ময়ূর, সেজন্য ময়ূর ও ময়ূ-রাণ্ড এক বা অভিন্ন পদার্থ। এবং ইহার ন্যায় চিৎ ও জগৎ এক বা

অভিন্ন বস্তু। যেমন ময়ূরাবস্থা বিচিত্রিত, তেমনি, জগৎ অবস্থাও বিচিত্রিত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহাতে এ সমস্ত বিস্তৃত সে বস্তুকে তুমি শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। সে বস্তুতে এ সকল উদ্ভূত হইয়াছে সত্য, এবং তাহাতেই এ সকল আছেও সত্য, কিন্তু এ সকল তাহাতে সত্যতঃ সমুদ্ভূত ও সত্যতঃ অবস্থিত নহে। সেই চিৎপদার্থই এই দেহে স্বীয় অজ্ঞান বিসৃষ্ট প্রাণাদির প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হইতেছে ও স্বর্গাদি সুখ ও নরকাদি দুঃখ কল্পনা করিতেছে১।২। দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সর্ব্বদাই তুরীয় পদে অবস্থান করতঃ আপনারই সুখ আস্বাদন করিতেছেন। যাঁহারা নির্নিমেষ নেত্রে কাল কর্ত্তন করেন, তুমি জানিবে, তাঁহারা দৃশ্যদর্শনের অতীত, অসঙ্গ ও অক্রিয় পদে অবস্থিত ৩।৪। যাঁহারা কর্ম্ম করিলেও তদ্দারা লিপ্ত হন না, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতদুভয়ের সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিত আছেন ৫। যাঁহাদের প্রাণ স্পন্দিত হয় না, দেখিতে চিত্র লিখিতের ন্যায়, যাঁহাদের মনঃও স্পন্দিত হয় না, তুমি স্থির করিবে যে, তাঁহারা চিত্ত চেত্য এতদুভয়ের সম্বন্ধের অতীত ও স্বাত্মপদে স্থিত। ঈশ্বর যেমন অন্তরে সদা স্বরূপানন্দে স্থিত থাকেন অথচ বাহিরে মায়ার দ্বারা জগতের শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ, ইঁহারাও অন্তরে শুদ্ধ সদানন্দ অথচ বাহিরে ব্যবহার নিষ্পাদক। যেমন স্বচ্ছ চন্দ্রকিরণ পল্লবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পল্লবকে আহ্লাদিত করে, সেইরূপ, এই আত্মা অন্তঃপ্রবিষ্ট দৃশ্যদর্শন সম্বন্ধ দ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করেন। চন্দ্র দূরে প্রসৃত হইয়াছে অথচ ভিত্ত্যাদি পদার্থে নিপতিত হয় নাই এরূপ আন্তরালিক

চন্দ্রকিরণ যেরূপ, আত্মার স্বরূপানন্দও সেইরূপ। অর্থাৎ আত্মার বিষয়-সম্পর্কের পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বিশেষ অবস্থার আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। এ আনন্দ দৃশ্যান্তর্গত নহে, বর্ণনার বিষয় নহে, এবং উহাতে দূর নিকটাদি ভাবও নাই। উহা কেবল, ও স্বানুভবগম্য এবং উহাই আত্মার বিশুদ্ধ রূপ। ইহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, চিত্ত, বাসনা, জীব, স্পন্দ, অস্পন্দ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জগৎ, দূর, নিকট, আদি, মধ্য, অন্ত, শূন্য, অশূন্য, দেশ, কাল, বস্তু অবস্তু এ সকলের অতীত৬।১৩। এই দৃশ্যবৃন্দ যে আধারে বা যাহার অধীনে স্পন্দিত হইতেছে সে আধার কেবল ও আত্মা। আত্মা অনাদি, অনন্ত, অবিনাশী ও অবিরোধী। সহস্র সহস্র দেহরূপ ঘট জন্মিতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে কিন্তু এতদুপহিত আকারের তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষতি হইতেছে না। হে আত্মজ্ঞ! হে রাম! এই যে দেহাদি, এ সকল সেই আত্মাই, অন্য কিছু নহে১৪।১৬। ইহা কেবল, পরন্তু বুঝিবার দোষে ঈষৎ পার্থক্যের মত। এই বিশ্ব তন্ময়, ইহা আমরা সুসিদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা বিদিত হইয়াছি১৭। তুমি কার্য্যে দেদীপ্যমান হও পরন্তু অন্তরে নির্ব্বাণ ও নির্ম্মল হও। এই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক দৃশ্য, এ সমস্তই ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত নহে১৮। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্ম, নির্গুণ, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, শান্ত ও শমাত্মক১৯। তুমি যদি কাল, ক্রিয়া, করণ, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, জন্ম, স্থিতি, লয়, স্মরণ, অস্মরণ প্রভৃতি সমুদায়কে এক ব্রহ্ম বলিয়া জান, তাহা হইলে তোমার অতঃপর আর সংসারভ্রমণ হইবে না২০।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

—০•()•০—

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন; হে ব্রহ্মন্! এ সমস্ত যদি না থাকে আর ব্রহ্মেরই বৃংহণ হয় তাহা হইলে এই ভাবাভাবময় জগৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় কেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহার পূর্ব্বরূপ বা পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রত্যা-বর্ত্তিত না হয় এরূপ বিপর্য্যয়ের নাম বিকার। বৎস! রাম! এই বিকার বুঝিবার দৃষ্টান্ত—দুগ্ধাদির দধ্যাদি আকার প্রাপ্ত হওয়া। দুগ্ধ দধি হইলে পুনর্ব্বার তাহা দুগ্ধ হয় না। এতল্লক্ষণক বিকার ব্রহ্মে নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম দুগ্ধ দধি হওয়ার অনুরূপে বিশ্ব বা জগৎ হন না। ব্রহ্ম বিশ্বের আদিতে যদ্রূপ, মধ্যেও তদ্রূপ ও বিশ্বের পুনরবসানেও তদ্রূপ। অতএব ব্রহ্ম দুগ্ধাদির ন্যায় বিকারী নহেন, পরন্তু নির্ব্বিকার স্বভাব। ব্রহ্মের আদি অন্ত মধ্য, কোনও বিভাগ নাই, সেজন্য ইঁহাকে সূত্রের বস্ত্র হওয়ার অনু-রূপে জগৎজন্মের কারণ বলা যায় না[২।৪]। ব্রহ্ম সর্ব্বদা একরূপ, সেজন্য এই আকস্মিক অন্যথাভাব অর্থাৎ এই জগদ্ভাব তাঁহাতে বিবর্ত্ত অর্থাৎ মিথ্যাদর্শন ব্যতীত বাস্তব নহে। যেমন রজ্জুতে সর্পসংস্পর্শ না থাকি-লেও অজ্ঞানের মহিমায় সর্পদর্শন হয় সেইরূপ ব্রহ্মে দৃশ্য ও দর্শন সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বাশ্রিত ও স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের মহিমায় দৃশ্য দর্শনাদির ভান হইয়া থাকে[৫।৬]। এই জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ কাল আছে মাত্র। যাহা আদিতে থাকে না, পরেও থাকেনা, তাহাই অজ্ঞান নির্ম্মিত[৭]। আত্মা আদি অন্ত মধ্য এই তিন্ কালেই সমান ও সর্ব্বত্র সদা বিদ্যমান। সেজন্য আত্মাই সত্য ও তদবশিষ্ট সমস্তই মিথ্যা[৮]। ইনি নিত্য, নির্ব্বিকার, এক ও সর্ব্বপ্রকার আকৃতি বা রূপ বিবর্জ্জিত বলিয়া ভাবধর্ম্মের বশ্য হন না। ভাবধর্ম্ম অর্থাৎ জন্মবান্ পদার্থের ধর্ম্ম[৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল, এক ও অস্তিতামাত্র-রূপী। তাদৃশ নির্ম্মল তাঁহাতে কিরূপে ও কোথা হইতে ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যার সমাগম সম্ভাবিত হইতে পারে[১০]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অবিদ্যা আছে এ কথা আমরা অজ্ঞদিগের বোধ উৎপাদনার্থ কল্পনা করিয়া বলি। নচেৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতবর্জ্জিত[১১]। ব্রহ্ম বলিলেই তৎসঙ্গে বাচ্যবাচক ভাব প্রতীত হয় বটে, পরন্তু তাহাও উপদেশের জন্য বলিতে হয়, বস্তুতঃ ব্রহ্মে বাচ্যবাচক ক্রমও নাই[১২]। তুমি, আমি, জগৎ, দিক্, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, অনল, অনিল, দিবা, রাত্রি, সমস্তই ব্রহ্মের অনতিরিক্ত অবিদ্যাও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[১৩]। ঐ সকল নাম মাত্র, অবিদ্যাও নাম মাত্র, নাম

ভ্রমকল্পিত ও অসৎ। হে রামচন্দ্র! যাহা নাই কোনও কালে যাহার সত্তা নাই, কিরূপে তাহা সত্য হইবে[১৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি উপশমপ্রকরণে যে ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যা থাকার কথা বলিয়াছেন, তাই আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, অবিদ্যা আছে কৈ? ভ্রান্তির আবার থাকা কি[১৫]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! তদ্‌যাবৎ তুমি অবুদ্ধ ছিলে, তাই আমি তোমার বোধ উৎপাদনার্থ তাদৃশ কল্পনা অবলম্বন করিয়াছিলাম। বাক্যবিশারদ পণ্ডিতগণ অপ্রবুদ্ধদিগকে বুঝাইবার জন্য ইহার নাম অবিদ্যা, ইহার নাম জীব, এইরূপ এইরূপ কাল্পনিক ক্রম (উপদেশ প্রণালী) অবলম্বন করিয়া থাকেন[১৬।১৭]। যাবৎ কাল মন অবোধ থাকে তাবৎ কাল শাস্ত্রকল্পিত ব্যবহার অবলম্বন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অবোধ মনকে বুঝান যায় না[১৮]। যুক্তির দ্বারা অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বিনিবৃত্ত হয়, তৎপরে জীব বোধ প্রাপ্তে পরমাত্মায় যোজিত হয়[১৯]। যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে "সর্ব্বং ব্রহ্ম" বলে, সে ব্যক্তি স্থাণুর নিকট (স্থাণু মুড়োগাছ) আত্মদুঃখ বিজ্ঞাপিত করে[২০]। যুক্তির দ্বারা মূঢ়দিগকে বুঝান যায়, আবার তত্ত্ব কথার দ্বারা প্রাজ্ঞ দিগকে বুঝান যায়। যুক্তি কথা না বলিলে মূঢ়েরা বুঝে না, সেজন্য তাহারা প্রাজ্ঞও হয় না। যখন তাহারা যুক্তির দ্বারা বোধিত হয়, তখন তাহারা প্রাজ্ঞ হয়। তখন তাহারা তত্ত্ব কথা বলিলে বুঝিতে পারে[২১]। তুমি যে পর্য্যন্ত অবুদ্ধ ছিলে সে পর্য্যন্ত তোমাকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছি। এখন তুমি প্রবুদ্ধ, সেজন্য তোমাকে তত্ত্ব কথাই বলিব। আমি ও তুমি, ত্রিজগৎ, তদন্তর্গত দৃশ্যনিচয়, সমস্তই ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে[২২।২৩]। একমাত্র মহাসম্বিৎ-ই এই জগত্রয়, এতদাকারের একজ্ঞান যাহার অন্তরে সদা রাজমান থাকে সে বাহিরে কোন কিছু করিলেও করে না বলিয়া গণ্য[২৪]। হে রঘুনাথ! তুমি সর্ব্বদা সকল অবস্থায় আপনাকে, আমি স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী চেতন পরমাত্মা, এইরূপে অনুভব করিতে থাক[২৫]। তুমি এখন নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়াছ, প্রশস্তবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি এখন চিন্ময় ব্রহ্মমাত্র হও। ব্রহ্মই পরম পদ, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, সে পদ তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। ঐ পদ আদ্যন্তরহিত, আভাসবর্জ্জিত, সুতরাং শুদ্ধসম্বিদ্রূপী

ও সত্তামাত্র। যেমন কুম্ভ যতই থাকুক, মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সেইরূপ, অবিদ্যা থাকুক আর প্রকৃতিই বা থাকুক, ব্রহ্ম ভিন্ন নহে[২৭,২৮]। ঘট যেমন মৃত্তিকা বিকার হইতে ভিন্ন নহে, আবর্ত্ত যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। মৃত্তিকাই ঘটাদি আকারে তথা জলই আবর্ত্তের আকারে স্থিতি করে, তাহার ন্যায় পরমাত্মাই প্রকৃতির আকারে স্থিতি করিতেছেন[২৯,৩০]। যেমন স্পন্দ ও পবন, তথা ঔষ্ণ্য ও অগ্নি এক বৈ দুই নহে, বাস্তবতঃ বিভিন্ন নহে, তেমনি, আত্মা ও প্রকৃতি এ দু-ইও বাস্তবতঃ অভিন্ন বৈ ভিন্ন নহে[৩১]। বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত ঐরূপ ভেদপ্রত্যয় থাকে, বুঝিতে পারিলে তখন আর ভেদপ্রত্যয় থাকে না[৩২]। চিদাত্মা যেন একটী ক্ষেত্র, ইহাতে যদি কোনও ক্রমে একবারমাত্র কল্পনাবীজ রোপিত হয়, তাহা হইলে সেই বীজ কর্ম্মাঙ্কুর উৎপাদন দ্বারা ভাবী সংসারারণ্য উৎপাদন করে[৩৩]। তাহাকে যদি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ অনলে দগ্ধ করা যায় তাহা হইলে সে বীজ আর কর্ম্মাঙ্কুর জননে সক্ষম হয় না। সুতরাং তাহা সুখদুঃখবহুল সংসার বৃক্ষের উৎপাদকও হয় না[৩৪,৩৫]।

হে রঘুনাথ! এই যে জগদ্রূপ দ্বৈত, ইহা অসৎ ও কেবল অজ্ঞান। তুমি ইহাকে জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট কর। তুমি কেবল আত্মা, তোমাতে দুঃখও নাই ও ভয়াদিও নাই।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ।

—○()•()○—

রাম বলিলেন, যে কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই আমি জানিয়াছি। যে কিছু দ্রষ্টব্য সে সমস্তই আমার দেখা শেষ হইয়াছে। আপনার উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতে আমার পূর্ণা তৃপ্তি হইয়াছে[১]। এখন আমি বুঝিয়াছি, পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উপাধি গ্রহণ ক্রমে উৎপন্ন যে জীব তাহা পূর্ণস্বভাব

এবং তদুৎপন্ন আকাশাদিও সেই পূর্ণপদার্থ। অতএব, এ সমুদায় সেই পূর্ণ ব্রহ্মে প্রপূরিত ও ইহারই পর্য্যবসান সেই পূর্ণ[২]। ইহা বুঝিয়াও জ্ঞান বৃদ্ধি কামনায় আপনাকে পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি, পিতা যেমন পুত্রের প্রতি ক্ষমাই করেন, কোপ করেন না, সেইরূপ, আমার প্রতিও ক্ষমা করিবেন, কোপ করিবেন না[৩]। হে ব্রহ্মন্! মৃত দেহেও শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা ও নাসিকা থাকা দৃষ্ট হয়, অথচ উহারা কেহই বিষয় গ্রহণ করে না। উহারা যে জীবদ্দেহেই বিষয় গ্রহণ করে, মৃত দেহে করে না, ইহার কারণ কি[৪।৫]? অপর প্রশ্ন এই যে, ইন্দ্রিয়গণ জড়, ঘটাদি পদার্থ বাহিরে, অথচ সে সকল শরীরের অভ্যন্তরে অনুভূত হয়, আবার কখন বা নাও হয়। এরূপ কেন হয় তাহা জানিতে ইচ্ছা করি[৬]। ঘটাদি ও ইন্দ্রিয় পরস্পর অশ্লিষ্ট (অসংযুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ স্থানে স্থিত)। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা দেখি না[৭]। যদিও এ বিষয়ের তথ্য জানিতেছি, তথাপি, ভালরূপ জানিবার প্রত্যাশায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুকম্পা প্রকাশে এই কয়েক বিষয় আমাকে বলুন[৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ইন্দ্রিয়াদি, চিত্তাদি ও ঘটাদি অতীব তুচ্ছ অর্থাৎ বস্তুতঃ উহারা নাই। একাদ্বয় চৈতন্য ব্যতীত অন্য বস্তু থাকা অসম্ভব[৯]। আকাশ অপেক্ষাও সমধিক নির্ম্মল সেই চিৎ মিথ্যা বা তুচ্ছা মায়ায় আবিষ্টা হইয়া আপনাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে পুর্য্যষ্টকরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন[১০]। সেই যে প্রথম কল্পনা, তাহাই ভবিষ্যৎ জগতের প্রকৃতি তথা তাহারই অবয়ব ইন্দ্রিয়াদি ও ঘটাদি। যে চিত্ত আপন স্বভাবে পুর্য্যষ্টকত্ব প্রাপ্ত, ঘটাদি পদার্থ সেই চিত্তের অবয়ব, অর্থাৎ তদতিরিক্ত নহে। অপিচ, ঘটাদি পদার্থ তাহাতেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এতাবতা ইহাই বলা হইল যে, ঘটাদি পদার্থ উক্ত প্রকারে কল্পিত বলিয়া কল্পনারই মহিমায় বহির্ব্বস্তু বলিয়া কল্পিত তথা অন্তঃস্থ বলিয়া অনুভূত হইতেছে[১১।১২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যাহার মহিমা জগৎ সহস্র নির্ম্মাণ করিতে পারে, যে পুর্য্যষ্টক সহস্র জগদ্দর্শনের দর্পণ, সে পুর্য্যষ্টকের স্বরূপ কি প্রকার তাহা আমাকে বলুন[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগতের মূল বা বীজ ব্রহ্ম। তাহা অনাদি,

অনন্ত, প্রকাশস্বরূপ ও চিন্মাত্র। তাঁহাতে প্রথমে আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূত, তৎপরে লিঙ্গশরীর বা ভাবময় সূক্ষ্ম শরীর, তৎপরে সূক্ষ্ম ভূতের স্থূলতা, তৎপরে ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয় (তাঁহারই মায়িক কল্পনাক্রমে)। এই সমুদায়ের অভ্যন্তরে যে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বই জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। সেই জীবই এই স্থূল শরীরে বাসনানুরূপ কার্য্যে চেষ্টমান হয় ও শত শত ব্যাপার নির্ব্বাহ করে[১৪।১৫]। "আমি" ইত্যাকার অভিমান ধারণ করায় অহঙ্কার। সঙ্কল্প বিকল্প করায় মন, বোধ নিশ্চয় করায় বুদ্ধি, ইন্দ্রের অর্থাৎ আত্মার দর্শক বলিয়া ইন্দ্রিয়, দেহ ভাবনায় দেহ, ঘট ভাবনায় ঘট, এইরূপ এইরূপ সর্ব্বব্যাপার সাধারণ ভাবে পুর্য্যষ্টক[১৬।১৭]। ঐরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে জ্ঞাতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে কর্ত্তা, সুখ দুঃখাদির আশ্রয় ভাবে ভোক্তা, তথা সর্ব্বপ্রকাশক ভাবে সাক্ষী প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে সম্বিৎ জীব নামের নামী, সেই সম্বিৎকেই তুমি পুর্য্যষ্টক বলিয়া জানিবে। চিদংশ লক্ষ্য করিয়া জীব ও জড়াংশ লক্ষ্য করিয়া পুর্য্যষ্টক, এই দ্বিবিধ সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হয়[১৮]। ঐরূপে জীবই কালভেদে অবস্থাভেদে ও বাসনাভেদে নানা ভাবে ভাবিত হইতেছে[১৯]। অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, এ সকল যেমন একই বীজের আকার ভেদ, সেইরূপ, এই জগৎও সেই ব্যষ্টিসমষ্টি জীবের আকার ভেদ। কিন্তু জীব "আমি সেই আদিম চিদাত্মা" এ রহস্য জানিতেছে না, জানিতেছে, আমি শরীরাদি সমন্বিত ও আমার দৃশ্য এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ[২০।২১]। সমুদ্রপতিত কাষ্ঠখণ্ড যেমন তরঙ্গের তাড়নায় মগ্ন উন্মগ্ন হয়, তেমনি, জীবও বাসনাজালে জড়িত হইয়া কখন বা উর্দ্ধগতি কখন বা অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে[২২]। দৈবাৎ কখন কোন জীব বিশুদ্ধ জন্ম লাভ করে, করিয়া জ্ঞান লাভ দ্বারা সেই অনাদি অনন্ত পদ প্রাপ্ত হয় তথা কোন কোন জীব বহুকাল বহু যোনি ভ্রমণের পর অতিক্লেশে আত্মজ্ঞান লাভ করে, করিয়া পরম পদে স্থিতি লাভ করে[২৩।২৪]। হে মতিমন্! বর্ণিত প্রকারে জীবই শরীরী হয়, হইয়া শরীরাংশ সকল অনুভব করিতে থাকে। এই জীব যে প্রকারে নেত্রাদির দ্বারা বহিঃস্থ ঘটাদি পদার্থ নিচয় স্বকীয় অন্তরে বলিয়া অনুভব করে, সে প্রকার কি তাহা বর্ণনা করি, শ্রবণ কর[২৫]। প্রাগ্বর্ণিত পুর্য্যষ্টকে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্বন, তাহা নখ পর্য্যন্ত

সমুদায় শরীরব্যাপী। সেজন্য তাহা দেহপরিমিত ও দেহান্তর্গত সুখ দুঃখাদির জ্ঞাতা। এই জীবচৈতন্য যখন চক্ষুরাদির দ্বারা ঘটাদি বহিঃ পদার্থে গমন করে, সংস্পৃষ্ট হয় সেই ঘটাদি পদার্থ তখন তাহার বিষয় অর্থাৎ তাহার প্রকাশ্য হইয়া দাঁড়ায়[২৬।২৭]। চিত্তসমন্বিত ইন্দ্রিয়ই বাহ্যার্থ বিজ্ঞানের কারণ, চিত্তসংযোগ ব্যতীত কেবল ইন্দ্রিয় জ্ঞানকারণ নহে। সেইজন্য মৃতশরীরস্থ ইন্দ্রিয় ও মুক্তশরীরস্থ ইন্দ্রিয় চিত্তসংযোগশূন্য বলিয়া বাহ্যার্থ বোধ জন্মায় না[২৮]। মনোবৃত্তি ও নয়নরশ্মি যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল, তাহাতেই বাহ্যাকাশস্থ ঘটাদি পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয় ও তৎ-ক্রমে সেই সেই প্রতিবিম্ব মনোবৃত্ত্যন্তর্গত জীবে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় জীব তাহা অনুভব করে[২৯]। জীব যে কেবল শরীরাবচ্ছেদেই আছে, তাহা নহে। বাহিরেও আছে কিন্তু প্রাণসম্বন্ধ না থাকায় শরীর ভিন্ন অন্যত্র জীবভাবান্বিত নহে। অর্থাৎ প্রাণব্যাপ্তির অন্যত্র অর্থাৎ বাহিরে অহং— আমি এ জ্ঞানের উদয় হয় না। যে সময়ে নেত্রের মণি দিদৃক্ষা বশতঃ নৈর্ম্মল্য ও বিস্ফারযুক্ত হয়, সেই সময়েই তাহাতে বাহ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব আবিষ্ট ও জীবের জ্ঞেয় হয়[৩০।৩১]। পদার্থজ্ঞান যে ঐরূপ সংশ্লেষঘটিত তাহা বালকেরাও বুঝে, পশুরাও বুঝে, এমন কি কোন কোন স্থাবর জীবেরাও বুঝে। (ইহার নিদর্শন—লজ্জাবতী প্রভৃতি ক্ষুপজাতীয় বৃক্ষ। তাহারা পত্র স্পর্শে যে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহাই তাহাদের বোধ থাকার নিদর্শন[৩২]।) জীবসংশ্লিষ্ট নির্ম্মলতম নয়নরশ্মি বহিঃস্থ ঘটাদি পদার্থকে যেরূপে ক্রোড়ীকৃত করিবে, জীব তাহাকে সেই রূপেই জানিবে[৩৩]। স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, এ সকলও উক্ত ক্রমে সম্পন্ন হয়, কেবল শব্দ কর্ণগত হইয়া জীবের বোধগম্য হইয়া থাকে[৩৪।৩৫]।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনোবৃত্তি, আদর্শ ও কাচ প্রভৃতি পদার্থে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তাহা কি? কিংস্বরূপ[৩৬]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বিদিতবেদ্য! প্রতিবিম্বকে তুমি ভ্রান্তি বিশেষ বলিয়া জানিবে[৩৭]। কেবল প্রতিবিম্ব নহে, এই জগৎকেও তুমি ভ্রান্তি বলিয়া জানিবে। জগৎকে তুমি সত্য বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। তরঙ্গ যেমন জলসামান্য হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, অহং ও তদ্গ্রাহ্য জগৎ, সমুদায়কেই তুমি চিজ্জল হইতে অভিন্ন মনে করিবে[৩৮]। সেই যে শ্রেষ্ঠ সমুদ্র, তাহাতে দেশ কাল ক্রিয়া কিছুই নাই। তাহা এক

অদ্বয় ও সর্ব্বতোব্যাপী। হে রামচন্দ্র! তুমি অন্যাসক্ত ও প্রশান্ত হও, হৃষ্টস্বভাবে ও সমতায় অবস্থান করতঃ নিরাময় হও[৩৯।৪০]।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে তোমায় এই চক্ষুরাদি ছিল না। কমলজ ব্রহ্মা যেমন অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম, সেইরূপ, তুমিও অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম[১]। আদি শরীরী ব্রহ্মার যেরূপ কল্পিত পুর্য্যষ্টক, সেইরূপ, তোমারও কল্পিত পুর্য্যষ্টক[২]। গর্ব্ভাবস্থায় যথনই ইন্দ্রিয়গণের উদয় হয় তথন হইতেই পুর্য্যষ্টকোপহিত জীবে ভাবনা ক্রিয়া জন্মিতে থাকে। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এই উভয়কেই তুমি আদিম মন ব্রহ্মার ন্যায় ভাবময় বলিয়া জানিবে[৩।৪]। সম্বিৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশুদ্ধা থাকে, সৃষ্টির পরে তিনি জীবভাবাদিযুক্তা হন, তথাপি তিনি অনিন্দিতা। কেননা, একমাত্র তিনিই পরমার্থ সৎ, আর সব অসৎ। বুদ্ধিবৃত্তি অনেক, তাহাতে সংবিদের প্রতিভাস বা প্রতিবিম্বন মাত্র হয়, সুতরাং সত্য পক্ষে সংবিৎ একই, নানা নহে। অতএব, পুর্য্যষ্টকান্বিত জীবভাবও অসত্য, কেননা তাহাও প্রতিবিম্ব। অতএব পরমাত্মা, মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ের উপরে বিরাজিত! অবিদ্যার কার্য্য তাঁহাতে অসম্ভব[৫।৮]। কেবল শিষ্যোপদেশের জন্যই বলা যায় যে, তাহা হইতে জীবের জন্ম হয়। পরন্তু বাস্তব পক্ষে মন ও জীব উভয়েই ভ্রমজাত। অবিদ্যারূপ ব্যাধি যে স্থান হইতে ও যে প্রকারে আগত হউক বা না হউক, উপদেশে ও বিচারে তাহা বিলীন হইয়া যায়[৯।১০]। অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য লয় প্রাপ্ত হইলে তথন এক মাত্র নির্ম্মল জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। তুমিও ভ্রমরূপিণী অবিদ্যা বিনাশ করিয়া, অস্থায়ী জগদ্ভাব বর্জ্জন করিয়া; নিজ নির্ম্মল রূপে স্থিতি লাভ কর[১১।১২]। অসৎই অবিদ্যার স্বরূপ; সেইজন্য দেখিতে গেলে তাহা

থাকে না। যাহা কোন বস্তু নহে, কে কবে তাহা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হয়? শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও কেহ মৃগতৃষ্ণিকা জল প্রাপ্ত হয় না[১৩।১৪]। যাহা অসৎ, তাহা সকল কালেই অসৎ। অসৎ বলিয়া জানা না থাকাতেই তাহা সৎ বা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। পরে যখন জ্ঞান হয়, জানা যায়, তখন আর সে ভ্রম থাকে না[১৫]। জীব ও পুর্য্যষ্টক প্রভৃতি সমস্তই অসত্য, কল্পনা মাত্র, এইরূপ বিচারণা অবিদ্যার নাশক। শাস্ত্রের দ্বারা বুঝাইবার নিমিত্ত জীবাদিবিষয়িণী কল্পনার কথা বলি, তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর[১৬।১৭]। ইতিপূর্ব্বে যে চিৎ-শক্তির কথা বলিয়াছি, সেই চিৎশক্তি পুর্য্যষ্টক উপাধানে জীবত্ব প্রাপ্তের ন্যায় হন। সেইজন্য তিনি যখন যে প্রকার ভাবে ভাবিত হন, সেই প্রকার ভাবই অনুভব করেন। সত্যতঃ হউক বা না হউক, তিনি ভাবেন, অমুক হইয়াছে বা হইয়াছি। যক্ষ সত্যতঃ থাকুক বা না থাকুক, রাত্রিকালে বালকেরা ভাবিয়া লয়, যক্ষ আছে[১৮।১৯]। পঞ্চতন্মাত্রার ও ইন্দ্রিয়াদির কল্পনা ঐরূপেই সম্পন্ন হয় ও সেই কল্পনা হইতেই বহিঃস্থ পঞ্চভূত ও তন্ময় জগৎ জন্ম লাভ করে। অঙ্কুর যেমন শত শাখান্বিত হয়, সেইরূপ, সেই একই কল্পনাবীজ হইতে অসংখ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হয়। পরে সেই চিতিশক্তি উক্ত প্রকারে ইহা ভিতরে, ইহা বাহিরে, এইরূপ এইরূপ অবধারণ করিয়া লয়[২০।২২]। সে যে বিষয়স্পর্শে সুখানুভব করে, সে সুখ তাহার নিজেরই। পরন্তু ভ্রমের দ্বারা বিবেচনা করে, বিষয় আমাকে সুখী করিতেছে। মরীচের তীক্ষ্ণতা, আকাশের শূন্যতা (অনাবরণত্ব) যেমন অপৃথক্ হইলেও পৃথক্ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেই-রূপ, সুখও আপনার অব্যতিরিক্ত হইলেও ব্যবহারে ব্যতিরেকীকৃত হয়[২৩।২৪]। অতএব, জীব প্রোক্ত প্রকার বিষয় ভোগই পুরুষার্থ, ইত্যাকার নিশ্চয় দ্বারা তৎপ্রাপ্ত্যর্থ নানা নিয়ম ও উপায় আশ্রয় করে। এই করিলে এই হয়, অমুক করিলে অমুক হয়, ইত্যাকার দৃঢ় নিয়মের অপর নাম স্বভাব এবং তাহারই দ্বারা কখন কিছু হয়, কখন বা কিছু নাও হয়। সেই প্রাগবর্ত্তী অদ্বয় ব্রহ্ম কথিত প্রকারে দ্বৈত হই-য়াছে। যেমন মধুই খণ্ড (চিনি), যেমন মৃত্তিকাই ঘট, তেমনি, আত্মাই জগৎ। সন্নিবেশ, বিকার, দেশ, কাল, এ সকল ক্রম ঈশ্বরে স্বরূপতঃ অসম্ভব; পরন্তু কল্পনাক্রমে সম্ভবের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে[২৫।২৮]।

বৃক্ষপ্রবিষ্ট একই রস এক স্থানে রস, অন্য স্থানে পত্র, অপর স্থানে পুষ্প, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করে, সেইরূপ, একই ব্রহ্মসত্তা কোথাও ঘট, কোথাও পট, কোথাও কুড্য এবং কোথাও বা অহন্তাদি রূপে প্রকাশ পাইতেছে[২৯।৩০]। একই বারিপ্রদ পদার্থই গ্রীষ্মে তাপরূপে ও বর্ষারম্ভে মেঘরূপে অবস্থান করে, তাহার ন্যায় আত্মাই একত্র সদ্রূপে আবার অন্যত্র অসদ্রূপে প্রথা প্রাপ্ত হন। ইহা এইরূপেই হইবে, ইত্যাদিবিধ অখণ্ড নিয়ম সেই সর্ব্বেশ্বরেই স্থাপিত, তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য। আকাশ আকাশে প্রতিবিম্বিত হয় না, দর্পণ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না, উহারা স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবেই প্রকাশ পায়। সেইরূপ, মায়াতীত আত্মাও সর্ব্বত্র স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। যেমন আকাশ ছাড়া বস্তু নাই, সেইরূপ, আত্মা ছাড়া কিছু নাই[৩১।৩৩]। ভূতান্তরে যে আকাশ ভাগ আছে, সে ভাগ প্রথা প্রাপ্ত নহে। কেননা তাহা ভূতান্তরের সহিত একীভাবে অবস্থিত। সেইরূপ, প্রত্যেক মায়া কার্য্যে ব্রহ্মব্যাপ্তি থাকিলেও মায়ার সঙ্গে থাকায় প্রথা প্রাপ্ত নহে। হে রঘুনাথ! কথিত প্রকারে সেই অদ্বয় পদার্থ সদ্বয় হইয়াছে। সৃষ্টিকালে তিনি স্বকীয় মায়া শক্তির দ্বারা যে ভাবে ও যে নিয়মে যদাকারে প্রকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, অসত্য হইলেও সে ভাবকে তিনি বর্ত্তমানে সত্য বলিয়া জানিতেছেন[৩৪।৩৫]। হেমত্ব ও কটকত্ব এই দুই রূপের একটী সত্য, অপরটী মিথ্যা। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজাত এই উভয় রূপের একটী রূপ সত্য, অপর রূপ মিথ্যা। চিৎ পদার্থ সর্ব্বত্র থাকিলেও মনঃপদার্থে তাহার প্রকাশ ভাব অধিক। মনঃপদার্থ অর্থাৎ চিত্ত দ্ব্যাত্মক। আরও স্পষ্ট কথা—চিদ্ভাব ও জড়ভাব উভয়রূপী। এই চিত্ত যে ভাব ভাবনা করে সেই ভাবই অনুভব করে, তাহার অন্যথা হয় না। সেই সকল ভাবনার দৃঢ় সংস্কার থাকে, সেই সংস্কার আবার সেই সেই পদার্থের আকারে প্রকট প্রাপ্ত হয়[৩৬।৩৯]। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গ্রাম নগরাদি ক্ষণমধ্যে অন্যথা হইয়া যায়, সে সকল যেমন প্রতিভাময়, জীবের দেহ ও দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ প্রতিভাময় সুতরাং বাস্তব নহে[৪০।৪১]। তেমনি মরণ ও জন্ম স্বপ্নের ন্যায় অসত্য, অর্থাৎ কেবল ভাবময়। বাল্য গেল, যৌবন আসিল, যৌবন গেল বার্দ্ধক্য আসিল, তথা এ দেহ গেল অন্য দেহ হইল, এ সমস্তই ভাবমূলক বা বাসনামাত্র-

স্থষ্ট। স্বপ্নে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ অনুভূত হয়, আবার অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থও অনুভূত হয়। এই যে বিচিত্র জগদ্দর্শন, ইহাও জীবের এক প্রকার জাগ্রৎ স্বপ্ন[৪২,৪৫]। তুমি এমন মনে করিও না যে, ব্রহ্মভাবও স্বপ্ন তুল্য মিথ্যা ও বাসনামাত্রবিনির্ম্মিত। কেননা, ব্রহ্মদর্শনে বা ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রতাই সিদ্ধ হয়। সেজন্য তাহা স্বপ্নাদি অবস্থার তুল্য হইতে পারে না[৪৬]। বর্ত্তমান পুরুষকার সমধিক বলশালী হইলে প্রাক্তনী-বাসনার অভিভব হইয়া থাকে, ইহা সুক্রিয়ার দ্বারা এতদ্দেহের কুক্রিয়ার অভিভব দৃষ্টে অনুমিত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, যত্নজাত প্রবল ব্রহ্মজ্ঞানে আজ্ঞানিক বাসনা নিচয় নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মভাব প্রতিভাসরূপী নহে।) বাসনা, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে, বিনষ্ট হয় না, সেইজন্য বাসনাজাত দেহজন্মাদি ঘটিতে থাকে[৪৭,৪৮]। যেমন শিশুর স্বকল্পিত যক্ষ তাহার সম্মুখে স্থিতি করে সেইরূপ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ভবিষ্যৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ অপরিহার্য্য হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পাঁচ তন্মাত্রা, এই অষ্টকের নাম পুর্য্যষ্টক ও আতিবাহিক দেহ[৪৯,৫০]। এ পুর্য্যষ্টক অমূর্ত্ত অর্থাৎ কেবল ভাবনাময়। বৈরাগ্য ও অভ্যাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে শমদমাদি সাধন সম্পন্ন ব্যক্তির মন নির্ম্মল হইয়া যায়। অর্থাৎ মনের কল্পনা সকল বিলীন হইয়া যায়। কাযেই ব্রহ্মবোধক মহাবাক্য শ্রবণ দ্বারা কাল্পনিক প্রপঞ্চের বাধ ও তৎক্রমে মুক্তি জন্মে। শাস্ত্রে যে স্থূল পুর্য্যষ্টকের কথা আছে, তদ্বিনাশে মুক্তি হয় না। যেমন জাগ্রৎ অবস্থা গেলেও সুপ্তি থাকে, তাহা হইতে পুনর্জ্জাগ্রৎ আইসে, সেইরূপ, মূর্ত্ত পুর্য্যষ্টক (স্থূল দেহ) গেলেও তৎসঙ্গে সূক্ষ্ম পুর্য্যষ্টক যায় না, সুতরাং মুক্তিও হয় না। অতএব, মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণিত আতিবাহিক দেহ স্থিত থাকে, এবং সেই দেহই পুনঃ পুনঃ স্থূল দেহে প্রবিষ্ট হয়[৫১,৫৪]। কখন বা সুষুপ্তের ন্যায় লুপ্তস্মৃতি অবস্থায় অবস্থান করে[৫৫]। এই যে স্থাবরাদি অবস্থা দেখিতেছ, এই স্থাবরাদি অবস্থাই তাহার (জীবের) দীর্ঘ সুষুপ্তি। যদিও কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরে পুণ্যাধিক্য বশতঃ কৃমি-কীট-ক্ষুৎ-তৃষ্ণাদিজনিত দুঃখের অভাব দৃষ্ট হয়, *

* কল্পবৃক্ষ দেবলোকের বৃক্ষ। ইহার অন্য নাম কল্পতরু। সাধারণ বৃক্ষের নানা দুঃখ, কল্পবৃক্ষের এরূপ নানা দুঃখ নাই। তাহা না থাকার কারণ তাহার পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যসঞ্চার।

তথাপি, সে সকল অবস্থায় প্রবোধের সম্ভাবনা নাই। জড়তাই সুষুপ্তি, স্বপ্নই সংসার, এবং প্রবোধই মুক্তি। জীব কি? কিংস্বরূপ? তাহা বুঝিলেই মুক্তি হয় ও মুক্তি হইলেই পরমাত্মসম্পন্ন হয়। প্রবোধ হইতে যে মুক্তি হয় তাহা দুই প্রকার। জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি[৫৮,৫৯]। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তির নাম জীবন্মুক্তি। আর দেহ পাতের পর তুর্য্যাতীত হওয়ার নাম বিদেহমুক্তি। বোধরূপী জীব, তাহার প্রবোধ, এ কথার অর্থ—উপাধি পরিত্যাগে চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপে স্থিত হওয়া। সে অবস্থা শাস্ত্রীয় প্রযত্নেরই লভ্য[৬০]। জীবের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, জীব যদি তাহা জানে, তাহা হইলে সে সর্ব্বাবভাসক চিন্ময়তায় স্থিত হয় এবং যে ঐ তত্ত্ব না জানে, সে এই দীর্ঘস্বপ্নরূপ সংসার ও ভয় প্রাপ্ত হয়[৬১]। সংসারের উদয়ও মিথ্যা ও ভয় প্রাপ্তিও মিথ্যা। বস্তুতঃই চিদংশ ব্যতীত জীবহৃদয়ে অন্য কিছু নাই[৬২]। জীব মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা আপনিই আপনাকে বিভিন্নরূপে দেখে ও মিথ্যা শোকে অভিভূত হয়। ফলতঃ জীবে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন সৎ পদার্থের অবস্থান নাই[৬৩]। অহো! মায়ার কি চমৎকার প্রভাব! যাহাতে জগৎ নাই, অথচ তাহাতেই জগদ্দৃষ্ট হয়। স্থালীমধ্যগত জল যখন ক্বথিত হইতে থাকে তখন যেমন তাহাতে নানা ভাব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম জীবে বিচিত্র সংসারের দর্শন হইয়া থাকে। বাসনাই ইহার বন্ধন ও বাসনার বিনাশই ইহার মোক্ষ[৬৪,৬৫]। বাসনার চরম সীমা সৌষুপ্তি স্থিতি। কেননা বাসনারই ঘনীভাবে সুষুপ্তিবৎ অবস্থা জন্মে। সেই ঘনীভূত অব্যক্ত বাসনাপুঞ্জের বৈচিত্র্য ও কিঞ্চিৎ স্ফুটভাব স্বপ্নে এবং তাহারই যৎপরোনাস্তি বিস্পষ্টতা জাগ্রতে। মোহের বা মায়ার যৎপরোনাস্তি গাঢ়তায় স্থাবর, তদপেক্ষা অল্প বাসনায় তির্য্যক্, তদপেক্ষা অল্প বাসনায় মনুষ্য, তদপেক্ষা ন্যূন বাসনায় গন্ধর্ব্ব ও তদপেক্ষা অল্প বাসনায় দেবতাদি ভাব প্রাপ্ত হয়। এই জীব যখন আপনাকে দেহমাত্রব্যাপী বলিয়া জানে, তখনই কে আপনার বাহিরে আছে ও বাহিরে ঘটাদি পদার্থ আছে এইরূপ পৃথক্ প্রতীতির বশ্য হয়[৬৬,৬৭]। জীবচৈতন্য শরীরের ন্যায় শরীরের বাহিরেও আছে, যে স্থানে ঘটাদি সে স্থানেও আছে, জীব তাহা জানে না। তাই সে যখন মনোবৃত্তির দ্বারা বহির্ভাগবর্ত্তী ঘটাদি প্রদেশে এক হইয়া যায় (মিলিত হইয়া যায়) তখনই সে আমি ঘট

জানিতেছি বলিয়া মনে করে[৬৮]। অতএব, অভিহিত প্রকারের গ্রাহ্য গ্রাহক ভেদ মরুমরীচিকায় জল বুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা। বাহিরে ও অন্তরে, সর্ব্বত্রই একাদ্বয় আত্মারই প্রকাশ, ইহা অবধারিত জানিবে[৬৯।৭০]।

সমুদ্র ও জল বস্তুতঃ একই পদার্থ। অর্থাৎ সমুদ্র জল ভিন্ন অন্য কোন পৃথক্ বস্তু নহে। সেইরূপ এই জগৎও সেই অনাদি অনন্ত অনাময় পরম পদ হইতে পৃথক্‌ভূত নহে[৭১]।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রথম জীবের (জীবঘন বা সমষ্টিজীব ব্রহ্মার) যে স্বপ্ন, তাহাই অস্মদাদি ব্যষ্টি জীবের জাগ্রৎ ও সংসার। ইহা সত্যও নহে, অসত্যও নহে, পরন্তু অনির্ব্বচনীয়[১]। এই যে অস্মদাদি ব্যষ্টি জীবের জাগ্রৎ প্রসিদ্ধ ভূত ভুবনাদি, ইহা সেই প্রথম জীবের স্বপ্ন (কল্পিত বলিয়া স্বপ্ন) সুতরাং ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়বিধ। হে অনঘ! যে হেতু ইহা অসত্য বা অবস্তু, সেই হেতু ইহা স্বপ্ন[২।৩]। জীব এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্নে অভিনিবিষ্ট হইতেছে (এক জন্ম ত্যাগের পর অন্য জন্ম অনুভব করিতেছে) এবং মিথ্যা হইলেও ইহাকে সত্য ভাবিতেছে[৪]। বৎস! বলা বাহুল্য যে, জীব অসংখ্য প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়া কেবল ভ্রান্ত অভিমানেই কাল কর্ত্তন করিতেছে[৫।৬]। জীব সর্ব্বগত ও আদ্যন্ত রহিত। তথাপি ভাবনার দ্বারা এ সকলকে সত্য মনে করিতেছে[৭]। হে মহাবাহো! আগামী কালে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের উপদিষ্ট সঙ্গত্যাগরূপা গতি অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্ত হইবেন[৮।৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন কোন্ সময়ে জন্মিবেন এবং ভগবান্ হরি তাঁহাকে কিরূপ সঙ্গ ত্যাগের কথা উপদেশ করিবেন তাহা আমাকে বলুন[১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আকাশ যেমন স্বমহিমায় স্থিত, সেইরূপ, স্বমহিমায় স্থিত আদ্যন্তরহিত সদ্রূপ পরমাত্মায় এই সংসার ভ্রান্তি স্ফুরিত হইয়াছে। যেমন সুবর্ণে হার কেয়ূরাদি, যেমন জলে ফেণ তরঙ্গাদি, সেইরূপ, তাঁহাতেই এই চতুর্দ্দশ ভুবন ও ভুবনান্তর্গত ভুতসমূহ (প্রাণিগণ) এই সংসার জালে জড়িত। যম, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি ইহাতে লোকপাল পদে অবস্থিত। ইহা ভাল, ইহা কর্ত্তব্য, ইহা মন্দ, ইহা অকর্ত্তব্য, এ সকল নিয়ম তাঁহাদেরই দ্বারা স্থাপিত[১১.১৫]। তাঁহারা সকলেই বহুকাল যাবৎ স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবান্ যম প্রত্যেক চতুর্থ যুগে প্রাণিবধজনিত পাপ বিমোচনার্থ তপোনিষ্ঠ হন। কোন যুগে ৮ বৎসর, কোন যুগে ১২ বৎসর, কোন যুগে ১৫ বৎসর এবং কোন যুগে ১৬ বৎসর স্বকার্য্যে উদাসীন হন অর্থাৎ প্রাণিহিংসা করেন না। তৎকারণে পৃথিবী প্রাণিপরিপূর্ণা ও ভারাক্রান্তা হয়। এই সময়ে অন্যান্য দেবতাদিগকে ভারাবতরণপ্রয়োজনে প্রাণিবিনাশার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এরূপ ব্যবহার ও এরূপ যুগ ও যুগবিপর্য্যয় যে কত অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই[১৬।২২]। এখন যিনি পিতৃপতি, যাঁহার নাম বৈবস্বত যম, তিনি এই বর্ত্তমান মহাযুগের শেষ ভাগে প্রাণিবধজনিত পাপের বিনাশার্থ দ্বাদশ বার্ষিক অহিংসা ব্রত ধারণ করিবেন, তাহাতেই এই পৃথিবী তৎকালে ভারাক্রান্তা হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্না হইবেন। এবং হরিও দুই দেহে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন[২৩।২৭]। এক দেহ বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব আখ্যা প্রাপ্ত হইবে তথা অন্য দেহ দ্বিতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাম প্রাপ্ত হইবে[২৮]। প্রথম পাণ্ডবের যুধিষ্ঠির নাম হইবে। এই যুধিষ্ঠির সসাগরা ধরার অধিপতি ও ধার্ম্মিকোত্তম হইবে। ইহার পিতৃব্য ভ্রাতা দুর্য্যোধন, তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডুপুত্র ভীম, ইঁহারা পৃথিবী রাজ্য লইবার জন্য যুদ্ধপ্রবৃত্ত হইবে এবং সেই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইবে[২৯।৩১]। অর্জ্জুনদেহধারী বিষ্ণু সে সমুদায় যুদ্ধে বিনাশ করিয়া ভারাক্রান্তা পৃথিবীকে স্বস্থা করিবেন। তিনি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় হর্ষবিষাদাদি দেখাইবেন এবং সেনামধ্যগত বন্ধুবিনাশের আশঙ্কা দেখাইয়া যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করিবেন[৩২।৩৩]। হে রঘুনাথ! ভগবান্ হরি কৃষ্ণ দেহে স্বতঃসিদ্ধ আত্মবোধযুক্ত অর্জ্জুন দেহকে বক্ষ্যমাণ উপদেশ

সকল প্রদান করিবেন[৩৫]। "আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধিও নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। শরীরই হত হয়, আত্মা হত হন না। যে ইহাকে হন্তা বলিয়া জানে, সে ইহাকে জানে না। অথবা যে ইহাকে হত বলিয়া জানে, সেও ইহাকে জানে না[৩৬।৩৭]। যে আত্মা অনন্ত, একরূপ, নিত্যসৎ, আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম (দুর্লক্ষ্য) ও সকলের উপাদান ও নিমিত্ত, কি প্রকারে ও কে তাঁহার নাশক হইবে[৩৮]?"

হে সম্বিদাত্মন্! তুমি আপনাকে দেখ। তুমি অনন্ত, অব্যক্ত, অনাদি, অমধ্য, নির্দ্দোষ, অজ, নিত্য ও নিরাময়। নিরবচ্ছিন্ন সম্বিদ্‌ই তোমার স্বরূপ[৩৯]।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

—০*০—

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি হন্তা নহ। আমি হন্তা, এ অভিমান মিথ্যা। সেজন্য তুমি ঐ অভিমান ত্যাগ কর। তুমি জরা মরণ বর্জ্জিত শাশ্বত আত্মা[১]। যাহার আমি করি এ ভাব নাই, এবং যাহার বুদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত হয় না, সে এই সমুদায় লোক হনন করিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হয় না[২]। মনোবৃত্তিই জন্মে, সংবিদ্ তাহাতে প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিফলনকেই আরোপক্রমে "জন্মে" বলা হয় ও তাহাকেই লোকে অনুভব শব্দে উল্লেখ করে। অতএব এই, ইহা, তাহা, সেই আমি, উহা আমার, এবমেবং সম্বিৎ তুমি পরিত্যাগ কবিবে অর্থাৎ মিথ্যা বা তুচ্ছ বোধ করিবে[৩]। হে ভারত! যদি তুমি উহাতে লিপ্ত হও তাহা হইলে তুমি সুখদুঃখভাগী ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইবে[৪]। আপনার অন্তর্গত সত্ত্বাদি গুণই কার্য্য করে, তাহারাই কর্ত্তা, পরন্তু মোহ বশতঃ আমি করি, এইরূপ অভিমান আবির্ভূত হয়[৫]। চক্ষু দেখুক, কর্ণ

শুনুক, ত্বক্ স্পর্শ করুক, রসনা রস গ্রহণ করুক, তাহাতে অহং-যোগ কর কেন? সঙ্কল্প বিকল্প মনোধর্ম্ম, মন তাহা করুক, তাহাতে অহং আরোপ করিয়া ক্লেশভাগী হও কেন? বহুর সংঘাত শরীর, সমস্ত তাহারই দ্বারা কৃত হয়, অথচ অজ্ঞ লোক ভাবে, আমি করিলাম। ঐ প্রকার অভিমানই অর্থাৎ অহং-অভিমানই দুঃখের ও উপহাস্যের কারণ [৮]। যোগীরা স্বাত্মশুদ্ধি কামনায় অসঙ্গ হইয়া শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এ সকলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন[৯]। অহন্তারূপ বিষ যাহাকে আক্রম করিতে পারে না, তাহারা কর্ম্ম করিলেও তন্নিমিত্তক সুখদুঃখ-ভাগী হয় না[১০]। মমতারূপ দোষে দূষিত শরীর অত্যন্ত অশোভন[১১]। যে নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সমদর্শী, ক্ষমাশীল, সে কৃতকর্ম্মে ও তাহার ফলে অলিপ্ত থাকে[১২]। হে পাণ্ডব! তুমি ক্ষত্রিয়, এই যুদ্ধকার্য্য তোমার স্বধর্ম্ম। শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত ক্রূর অনুষ্ঠানও শ্রেয়স্কর, স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ নির্দ্দোষ অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে। যখন মূর্খের অনুষ্ঠিত স্বকর্ম্ম মঙ্গলাবহ বৈ অমঙ্গলাবহ নহে, তখন জ্ঞানীর অনুষ্ঠিত স্বকর্ম্ম মঙ্গলাবহ, এ কথা বলা বাহুল্য। অহঙ্কার যাহার বুদ্ধি হইতে বিগলিত হইয়াছে সে কোন প্রকার তাপ পাপে লিপ্ত হয় না[১৩।১৫]। হে ধনঞ্জয়! তুমি ফলাফল লক্ষ্য না করিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে। নিঃসঙ্গ থাকিয়া যথোপস্থিত কর্ম্ম করিলে তাহা তোমার বন্ধনজনক হইবে না[১৬]। তুমি ব্রহ্ম ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্ম করিবে ও কৃত-কর্ম্মকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিবে। সমুদায় পদার্থ, সমুদায় প্রার্থনা, সমুদায় কামনা ও সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরে অর্পণ করতঃ স্বয়ং ঈশ্বরাত্মা (ঈশ্বরাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে পরিপূর্ণ অথবা ঈশ্বরে নিমগ্ন) হও[১৭।১৮]। সঙ্কল্প সমুদায় পরিত্যাগ কর, সম ও শান্তমনা হও এবং সঙ্গত্যাগরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্ত হও[১৯]।

অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবন্! সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মার্পণ, ঈশ্বরার্পণ, সংন্যাস, জ্ঞান ও যোগ, এই ছয়ের বিভাগ কিরূপ তাহা আমাকে বলুন[২০।২১]?

ভগবান্ বলিলেন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের ও বাসনার (কর্ম্মসংস্কারের) শান্তি হইলে তখন ভাবনার কোন প্রকার আকার থাকে না। পণ্ডি-তেরা সেই অবস্থাকে ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ বলেন। ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি উদিত হইয়া অজ্ঞানকে নিরবশেষ বিনাশ করিলে তাহা জ্ঞান আখ্যা

প্রাপ্ত হয়। যে মনোবৃত্তির প্রবাহ অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ, সেই ব্রহ্ম-বুদ্ধির প্রবাহ যোগ। কি জগৎ কি আমি সমস্তই ব্রহ্ম, এই বুদ্ধিকে কর্ম্মকরণ কালে অবিচ্ছিন্ন রাখার নাম ব্রহ্মার্পণ[২২,২৩]। ব্রহ্মভাব এইরূপে ব্যাখ্যাত হয়—যেমন কোন প্রস্তরের অন্তরে ও বাহিরে একরূপ, সেই প্রকার ব্রহ্মও অন্তরে ও বাহিরে একরূপ। আকাশ যেমন স্বচ্ছস্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মও স্বচ্ছস্বভাব। তিনি দৃশ্যপ্রপঞ্চের অতীত অথচ দৃশ্যপ্রপঞ্চের দ্রষ্টা, প্রকাশক ও সাক্ষী[২৪]। তাহাতেই অত্যল্পমিথ্যা ভেদরূপী এই জগৎ প্রতিভাসিত হইতেছে[২৫]। অহং—আমি এ ভাব তাহারই অন্তর্গত ও তদ্রূপে ভাসমান। অহং—আমি এ ভাবটী তাহাতেই অধ্যস্ত বা অসত্য। সেজন্য অহং ভাবের গ্রহণ প্রকৃত গ্রহণ নহে অর্থাৎ আমি বলিয়া আগ্রহ করা উচিত নহে[২৬]। যাহাতে অর্থাৎ যে আধারে অহং—আমি এই ভাবের উদয় হইয়াছে সে আধার পরিচ্ছেদবর্জ্জিত। অর্থাৎ অসীম ও তাহা আমি এই ভাব হইতে অপৃথক্। সেইজন্য সকলেই আমি আছি এইরূপ জানে, আমি নহি বা নাই বলিয়া কেহ জানে না[২৭]। যেমন অহম্ভাব অপৃথক্ তেমনি এই ঘট, এই পট, ইত্যাদি ভাবও সেই অসীম ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্। কেননা ঘটাদি ভাবও সেই অসীম ব্রহ্মে উদিত হইতেছে[২৮]। যে অসীম ব্রহ্মে অহং মম—আমি আমার অথবা এই ইহা এই দ্বিবিধ ভাব স্ফুরিত হইতেছে। জলে লহরীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সেই অসীম ব্রহ্মই প্রতি দেহে আত্মচৈতন্য আখ্যায় প্রথিত। অতএব, উক্ত প্রকারে বিচিত্র হইলেও বাস্তবতঃ সেই ব্রহ্মনামক সংবিৎ এক বলিয়া গণনীয়[২৯]। অপর উপদেশ এই যে, বুদ্ধিবিশেষের দ্বারা অহং মম ভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অহং মম ভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মফলত্যাগরূপ সংন্যাস বিনা চেষ্টায় সুসিদ্ধ হয়[৩০]। সঙ্কল্পজাল পরিত্যাগের নাম অসঙ্গ এবং সমুদায় দ্বৈতপ্রপঞ্চ ঈশ্বরের অনতিরিক্ত, যেমন সমুদায় মৃদ্বিকার মৃত্তিকার অনতিরিক্ত সেইরূপ অনতিরিক্ত, এই জ্ঞানের নাম ঈশ্বরার্পণ। ভেদ অজ্ঞানমূলক এবং তাহাও কেবল নামে, অর্থে নহে। অর্থ সেই একাদ্বয় চিদাত্মা[৩১,৩২]। শব্দই বল, আর অর্থই বল, সমস্তই বোধ। অন্য কিছু নহে। সুতরাং দিক্, জগৎ, আমি, আমার, তুমি, তোমার, ক্রিয়া, কাল, এ সমস্তই বোধাত্মা আমি। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি মদেকচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও

তথা আমাকেই নমস্কার কর। যদি তুমি মৎপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে অর্থাৎ আমারই একীভাবে স্থিত হইবে[৩৩।৩৪]।

অর্জ্জুন বলিলেন, আপনার রূপ দ্বিবিধ। সগুণ ও নির্গুণ। তন্মধ্যে কোন্ অবস্থায় কোন্ রূপ আশ্রয়ণীয় তাহা আমাকে বলুন[৩৫]।

ভগবান্ বলিলেন, আমার যে রূপ জনসাধারণের বোধ যোগ্য, তাহা সামান্ত নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই সামান্ত রূপ হস্তপদাদিবিশিষ্ট ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর আমার যে স্বরূপ অনাদি অনন্ত ও সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ বা ভেদ বিবর্জ্জিত, সেই রূপকেই পরম বলিয়া বিদিত হইবে। আমার এই পরম রূপই ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি শব্দে অভিহিত হয়[৩৬,৩৭]। যাবৎ না তুমি প্রবুদ্ধ হইবে, মৃষ্ট-অজ্ঞানমালিন্ত হইবে, তাবৎ তুমি আমার সেই চতুর্ভুজ রূপের পূজাদি করিবে[৩৮]। চতুর্ভুজ রূপের পূজাদি করিতে করিতে তোমার অজ্ঞানমালিন্ত বিদুরিত হইবে, তুমি প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি আমার অভিহিত পরম স্বরূপ জ্ঞানগোচর করিয়া কৃতার্থ হইবে[৩৯]। যদি তুমি আমাকে ও আপনাকে একাদ্বয় বিশুদ্ধ চিন্মাত্র বলিয়া জান, তাহা হইলে তন্নিষ্ঠ হইয়া থাক। আমি যে তোমাকে আমি তুমি ও তাহা ইহা বলিতেছি, এ সমস্তকে তুমি উপদেশের পন্থা বলিয়া জানিবে, ফলতঃ ঐ সমস্তই এক আত্মতত্ত্ব[৪০।৪১]। তুমি সর্ব্বভূতে আত্মাবস্থান ও আত্মায় সর্ব্বভূতের অবস্থান দর্শন করিবে[৪২।৪৩]। যে ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বভূতাবস্থিত ও এক দর্শন করে, সে জরাজন্মমরণাদির অতীত হয়[৪৪]। জীব যখন আত্মাতেই সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান, সর্ব্বভূত তদব্যতিরেকে স্থিত, এইরূপে আত্মদর্শী হয়, তখন সেই সর্ব্বশব্দ একত্বে পর্য্যবসিত হয় এবং একত্বও আত্মায় সমাপ্ত হয়। এই তত্ত্ব অবগত হইবামাত্রই কৈবল্য জন্মিয়া থাকে। যাহাতে বা যাহার দ্বারা এই ত্রৈলোক্য প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে তাহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে[৪৫।৪৬]। যে পদার্থ লোকত্রয়বর্ত্তী জলের রস ও দুগ্ধাদি পদার্থের স্বাদ জানিতেছে সেই পদার্থকে তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে[৪৭]। যিনি সমুদায় শরীরের অন্তরে দুর্লক্ষ্য অথচ অনুভবরূপে স্থিতি করিতেছেন, অনুভবনীয় বিষয়ের অতিরিক্ত সেই পদার্থকে তুমি সর্ব্বব্যাপী আত্মা বলিয়া জানিবে। দুগ্ধে ঘৃতের অবস্থিতির ন্তায় যিনি সমুদায় পদার্থে অবস্থিত, সেই পদার্থকে

তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে[৪৮।৪৯]। যেমন সমুদায় রত্নের অন্তরে ও বাহিরে তেজের অবস্থিতি, সেইরূপ, সমুদায় দেহের অন্তরে ও বাহিরে আত্মার অবস্থিতি[৫০]। যেমন সহস্র সহস্র কুম্ভের অন্তরে ও বাহিরে আকাশের অস্তিতা, তেমনি, ত্রিজগতীস্থ সমুদায় দেহের অন্তরে ও বাহিরে আত্মার অস্তিতা[৫১]। যেমন শত শত মুক্তা একই সূত্রে গ্রথিত, সেইরূপ, লক্ষ লক্ষ দেহ এক আত্মায় গ্রথিত, অথচ দুর্লক্ষ্য[৫২]। ব্রহ্মাদি তৃণান্ত পদার্থের সত্তাকে সাধারণ সত্তা বলা যায়, সেই সাধারণ সত্তাই আত্মা[৫৩]। সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপে আত্মার নির্ব্বিকার অবস্থানের নাম ব্রহ্মতা, এই ব্রহ্মতাই বাস্তবী, আর সর্ব্বান্তর্যামিরূপে মুক্তা সমূহে সূত্রের ন্যায় অবস্থিতির নাম জীবতা। এই জীবতা অবাস্তবী। হন্তা ও হন্তব্য প্রভৃতি ভাব এই অবাস্তব ভাবের অন্তর্গত। সুতরাং হে অর্জ্জুন! জগতের এইরূপ যখন আত্মারই রূপ, তখন আর বাস্তবতঃ কে কাহাকে হনন করিবে? তথা কে-ই বা জগতের শুভাশুভ দ্বারা লিপ্ত হইবে[৫৪।৫৫]। যে ব্যক্তি আদর্শে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় আত্মায় জগদ্ভাবের অবস্থান দেখে, ও জগতের বিনাশে আত্মার অবিনাশ দেখে, সেই ব্যক্তির দর্শনই যথার্থ[৫৬]। হে পাণ্ডব! আমি বলিতেছি কি, আমি বলিতেছি, এ সমস্তই আমি, এ সকল অন্য কিছু নহে। তুমিও আমাকে ঐরূপ সর্ব্বাত্মক বলিয়া জান। এ সকলের সৃষ্টি ও প্রলয় আত্মাতেই প্রকটমান এবং সামুদ্রতরঙ্গের অনুরূপ[৫৭।৫৮]। পদার্থের আত্মতা শৈলের প্রস্তরত্বের, বৃক্ষের কাষ্ঠত্বের ও তরঙ্গের জলত্বের অনুরূপ[৫৯]। যে ব্যক্তি আপনাকেই সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতে আপনাকে স্থিত দেখে, সেই ব্যক্তিই আপনাকে অকর্ত্তা দেখে। যেমন নানা আকারের তরঙ্গে জল, হার কেয়ূরাদি অলঙ্কারের সুবর্ণ, হে অর্জ্জুন! সেইরূপ সমুদায় ভূতে আত্মা[৬০।৬১]। যেমন জলে নানা আকারের তরঙ্গ, সুবর্ণে হারকেয়ূরাদি, সেইরূপ পরমাত্মায় এই বিশ্ব[৬২]। হে ভারত! এই সকল পদার্থ, এই সকল ভূত ও ব্রহ্ম, এ সকল একই, পৃথক্ নহে[৬৩]। ব্রহ্ম যখন এক ও নির্ব্বিকার, জগৎ যখন নানা ও সবিকার, তখন ইহাও বুঝা উচিত যে, অসমাবেশ প্রযুক্ত জগৎ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মে জগৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হয়। অতএব, বন্ধুবধাদিসমুত্থ পরিতাপ মোহ ব্যতীত বাস্তব নহে[৬৪]। এই তত্ত্ব শ্রবণের দ্বারা তুমি অভয় ব্রহ্ম অনুভব করতঃ

জীবন্মুক্ত হও[৩৫]। যাঁহারা মোহগ্রস্ত নহেন, মান মোহ ও সঙ্গদোষ ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মরতি, নিবৃত্তকাম, দ্বন্দ্বাতীত, সুখদুঃখ-ব্যাসক্ত নহেন, তাঁহারা বর্ণিত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন[৩৬]।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

—○()*()○—

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহু অর্জ্জুন! আমি প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার তোমাকে যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর[১]। হে কুন্তীপুত্র! ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সম্পর্ক লাভ করিয়া শীত ও উষ্ণাদি অনুভব করায়, তাহাকেই সুখ ও দুঃখাদি জন্মিতেছে বলা যায়। হে ভারত! উৎপত্তি ও বিনাশ বিশিষ্ট ঐ সকলকে তুমি উপেক্ষা করিবে। উপেক্ষা করা একাত্মদর্শীর পক্ষে অসম্ভব নহে। উপেক্ষা বা বৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে তখন ঐ সকল স্বাত্মভূত হইয়া যায়। অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা ঐ সকলের সেই সেই অনুভব প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়। অনবয়ব ও পরিপূর্ণস্বভাব আত্মার আবার সুখ কি? দুঃখই বা কি[২।৩]? যাহার ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের সত্যতা বোধ উপশান্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ধীর ও মোক্ষভাগী[৪]। এ সমস্তই যখন আনন্দময় আত্মা, ইহা সুখ ও ইহা দুঃখ, এ সকল ভেদ যখন ভ্রমাত্মক, তখন তাহা কেন না উপশান্ত হইবে[৫]? যখন কেবল মাত্র আত্মারই অস্তিতা আছে, অন্য কিছুর অস্তিতা নাই, তখন অনাত্মবিষয়ের ও তৎসংস্পর্শজনিত সুখ দুঃখাদির অস্তিতা থাকিবে কেন[৬]? যাহা নাই তাহা হয় না এবং যাহা আছে তাহারও অভাব হয় না। সর্ব্বগ পরমাত্মাই আছে, সুখ দুঃখাদি নাই[৭]। তুমি জগৎ ও আত্মা এ দুয়ের সত্তা ও অসত্তা অর্থাৎ জগৎ আছে, পরমাত্মা নাই, এরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, তথা উক্ত উভয়ের সম্বন্ধঘটক অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, চিন্মাত্রপ্রতিষ্ঠ হও[৮]। আত্মা শরীরের

অন্তরে স্থিত, চেতন ও দৃশ্যদর্শী হইলেও সুখের দ্বারা হৃষ্ট হন না, দুঃখের দ্বারা ম্লান হন না। হর্ষ ও গ্লানি মনের, আত্মার নহে[৯]। জড়স্বভাব মনই দুঃখভাগী, তাহার প্রক্ষয়ে আত্মার ক্ষতি হয় না[১০]। এই যে চিত্তাদিঘটিত জীবভাব, এই জীবভাবই ভোক্তা অর্থাৎ সুখ-দুঃখভোগী। এই জীবভাব ও সুখদুঃখাদি ভোগ, সমস্তই মায়াসৃষ্ট অর্থাৎ ভ্রান্তিজনিত। সত্যকল্পে দেহাদিও নাই, দুঃখাদিও নাই[১১।১২]। যে হেতু দুঃখ এক প্রকার ভ্রান্তি, সেই হেতু তাহা সত্যজ্ঞাননাশ্য। (সত্য-জ্ঞান আত্মতত্ত্বজ্ঞান)। যেমন রজ্জুজ্ঞানে অজ্ঞানজাত সর্পভয় বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞানজাত দেহাদিঘটিত দুঃখাদির বিনাশ হয়[১৩।১৪]। জন্মাদিরহিত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের জন্মও নাই, নাশও নাই, এইরূপ বোধ সত্য, পরম সত্য[১৫]। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে এ সকল তরঙ্গের ন্যায় হইতেছে ও যাইতেছে। বোধের উদয় হওয়ায় এখন তুমি নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসমুদ্র[১৬]। কাল, ক্রিয়া, দেশ, তুমি, আমি, সেনা, এরূপ ভেদবুদ্ধি যে ব্রহ্মসমুদ্রের তরঙ্গ, সে ব্রহ্মসমুদ্রে সত্যতঃ কোন ভাব বা অভাব নাই। তুমি মান, মদ, শোক, ভয়, চেষ্টা, সুখ, অসুখ, এরূপ দ্বৈত বুদ্ধি ত্যাগ কর, করিয়া কেবল সম্বিন্ময় হও। তুমি যে সেনা ক্ষয় করিবে, সে সেনাও তুমি, এইরূপ অনুভব করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মময় হও। সুখদুঃখবোধশূন্য ও লাভালাভজ্ঞানশূন্য ও জয়পরাজয় অনুসন্ধানবর্জ্জিত হও। কেননা তুমি নিষ্কলঙ্ক নিরাময় ব্রহ্ম[১৭।২০]। লাভালাভে সমবুদ্ধি হইয়া নিঃসঙ্কল্পে কার্য্য কর। যে কার্য্য করিবে, যাহা ভক্ষণ করিবে, যে হোম বা দান করিবে, সমস্তকেই তুমি পরমাত্মা ভাবিবে। জীব অন্তকালে যন্ময় হয় জন্মকালে তাহাই হইয়া জন্মে। এই দৃষ্টান্তে তুমি সত্য ব্রহ্ম পাইবার জন্য সত্য ব্রহ্মময় হও[২১।২৩]। ফলানুসন্ধান বর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হও। ব্রহ্মজ্ঞগণ ঐরূপ কেবল কর্ম্ম অর্থাৎ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া যথোপস্থিত কার্য্য করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করে, এবং অকর্ম্মে অর্থাৎ ব্রহ্মে নিত্য-প্রতিষ্ঠরূপ কর্ম্ম দর্শন করে, সেই ব্যক্তি মনুষ্যসংঘের মধ্যে বুদ্ধিমান্। তুমি কর্ম্মফল প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মকরণে সমাসক্ত হইও না। হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগে অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মবোধে স্থিত ও কর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিবে[২৪।২৬]। মূঢ়তা, কর্ম্মাসক্তি ও নিষ্কর্ম্মতা বর্জ্জন করিয়া সম ও

স্বস্থ ও যথাপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থান কর। যে কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগী ও নিত্যতৃপ্ত, সেইযোগী কর্ম্ম করিলেও তাঁহাকে কিছু করেন না বলিতে পারা যায়। আসক্তিই করে, সুতরাং তাহাকেই কর্ম্মকর্ত্রী বলা যায়। যদি আসক্তি ত্যাগ না হয় তাহা হইলে না করিলেও করার ফল হয়। মন যদি মূর্খতাগ্রস্ত থাকে তাহা হইলে তৎসঙ্গে আসক্তিও থাকে। অতএব, মূর্খতাই সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য[২৭।২৯]। তত্ত্বজ্ঞ ও আসক্তিশূন্য, এরূপ মহাত্মা কর্ম্ম করিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃতার উদয় হয় না। কর্ত্তৃতার অনুদয়ে ভোক্তৃতার অনুদয়, ভোক্তৃতার অনুদয়ে সাম্য, সেই সাম্য হইতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়[৩০।৩১]। হে অর্জ্জুন! তুমি যদি ভেদ-বুদ্ধি বর্জ্জনপূর্ব্বক পরমাত্মপর হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি সত্য সত্যই অকর্ত্তা হইবে। যে ব্যক্তি কাম ও সঙ্কল্পরহিত হইয়া কার্য্যা-নুষ্ঠান করে ঋষিরা তাহাকেই পণ্ডিত বলেন। হে অর্জ্জুন! জ্ঞানরূপ বহ্নি সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে, এ কথার অর্থ—ঐরূপ জ্ঞানীর ঐরূপ কার্য্য মিথ্যা বা নিষ্ফল হইয়া যায়[৩২।৩৩]। যে ব্যক্তি উৎকর্ষাপকর্ষ প্রতীক্ষা করে না, চন্দ্রের ন্যায় শীতলস্বভাব থাকে, স্থির ও আত্মনিষ্ঠ, ও সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া কাল কর্ত্তন করে, বুঝিবে যে, সে অব্যগ্র হইয়াছে। তুমিও দ্বন্দ্বাতীত, সত্ত্বস্থ, যোগক্ষেমস্পৃহাশূন্য ও আত্মরত হইয়া যথোপস্থিত ব্যবহার নির্ব্বাহ করিবে[৩৪।৩৫]। যে মনুষ্য কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করে, অথচ বিষয় বিস্মৃত হয় না, এরূপ মনুষ্য মূঢ় ও মিথ্যাচারী। যে মনের সহিত অন্তরিন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালন করে, তাহাকে আমরা বিশিষ্ট মনুষ্য বলি[৩৬।৩৭]।

যেমন নদ নদীর সমগ্র প্রবাহ পরিপূর্ণস্বভাব সমুদ্রে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় সমুদায় কামনা যাহাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই শান্তি লাভ করে। যে কাম্যকামী সে শান্তি লাভ করিতে পারে না[৩৮]।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ বলিলেন, ভোগ ত্যাগের জন্য যত্নও করিবেক না এবং ভোগ সৌষ্ঠবের চিন্তাও করিবে না। লাভ অলাভ সমান জ্ঞান করিয়া যথোপস্থিতের অনুবর্ত্তী হইবে[১]। এই দেহ আত্মা নহে, ইহাতে তুমি আত্মভাব স্থাপন করিও না। হে মহাবাহু অর্জ্জুন! দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। আত্মা অবিনাশী[২।৩]। শীর্ণতা দেহেরই ধর্ম্ম, দেহই জীর্ণ শীর্ণ হয়, আত্মা অশীর্ণস্বভাব। যে সর্ব্বপ্রকার মমতা পরিত্যাগ করিয়াছে, সে কিছু করিলেও করেনা বলিয়া উক্ত হয়[৪]। পণ্ডিতেরা বলেন, আসক্তিই করে অর্থাৎ আসক্তিই কর্ত্তা, এবং তাহা যাহার ত্যাগ হয় নাই, সে বাহিরে কিছু না করিলেও অন্তরে কর্ত্তা। যে হেতু তাহা মনের মূর্খতা বশতঃ সংঘটন হয় সেই হেতু মূর্খতা সর্ব্বতঃ উপায়ে পরিত্যাজ্য[৫]। আসক্তিশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তৃতার উদয় হয় না[৬]। মনীষিগণ জানেন যে, আত্মা অবিনাশী ও অনাদি অনন্ত। "আত্মা বিনষ্ট হয়", এ দুর্ব্বোধ যেন তোমার না হয়[৭]। আত্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্মাকে নশ্বর বলিয়া জানেন না। কেননা তাঁহারা আত্মাকেই আত্মা বলিয়া জানেন, অনাত্মদেহাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানেন না[৮]।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে জগন্নাথ! মূঢ়েরা দেহাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানে জানুক, পরন্তু বিজ্ঞেরা ত তাহা জানেন না, তবে কেন তাঁহাদের ধন পুত্রাদি ইষ্ট বস্তু বিনষ্ট হয়? ধন পুত্রাদির বিনাশ কি তাঁহাদের ইষ্ট বিনাশ হয় না?

ভগবান্ বলিলেন, তাহাই বটে। অর্থাৎ বিজ্ঞদিগের ইষ্ট বিনাশ হয় না। কেননা তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্তই একমাত্র অবিনাশী আত্মা। যাঁহারা জানেন সমস্তই আত্মা ও তাহা অবিনাশী, তখন আর কোথায় কাহার কি বিনষ্ট হইবে? ইহা নষ্ট হইল, ইহা লব্ধ হইল, এ সম্ব:

স্তই মোহের কার্য্য। মোহ ব্যতীত ঐ সকলের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্বা বন্ধ্যাপুত্রের অস্তিতার অনুরূপ[৯।১১]। যাহা নাই, তাহার আবার হওয়া কি? যাহা আছে তাহার আবার বিনাশ কি? তত্ত্বদর্শীরা ভাব অভাবের এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, যাহা আছে তাহা সদাকালই আছে এবং যাহা নাই তাহা সদাকালই নাই[১২]। তুমি সেই পদার্থ অবিনাশী বলিয়া জানিবে—যে পদার্থ সর্ব্বব্যাপী। কেহই সেই অনশ্বর পদার্থের নাশ সম্ভাবনা করিতে সমর্থ নহে[১৩]। এই সকল দেহই নশ্বর, দেহী নশ্বর নহে। সেই জন্যই বলিতেছি, হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধ কর[১৪]। একই আত্মা আছেন, দুই নাই। যাহা নাই তাহার আবার সম্ভব অসম্ভব অর্থাৎ হওয়া না হওয়া কি? সদ্রূপী আত্মার বিনাশ নাই। দ্বিত্ব ও একত্ব অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য, সে অপেক্ষাবুদ্ধি উন্মার্জ্জিত হইলে যাহা থাকে, এবং সৎ অসৎ উভয় ভাবের অন্তরালে যাহা সদা বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই তুমি পরম পদ বলিয়া বিদিত হও[১৫।১৬]।

অর্জ্জুন বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে আমি মরিলাম, অমুক স্বর্গী ও অমুক নারকী, এ সকল কথার অর্থ কি[১৭]?

ভগবান্ বলিলেন, ক্ষিতি, জল, বায়ু, বহ্নি, আকাশ, এই পাঁচ সূক্ষ্মভূত ও মন তথা বুদ্ধি, এই সাত পদার্থের সমবায়ে (সংযোগে) জীব, তাহাই এতদ্দেহে স্থিতি করে। এই জীব রজ্জুর দ্বারা পশুশাবকের ন্যায় বাসনা (কৃতকার্য্যের সংস্কার) দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই শরীর মধ্যে পঞ্জরে পক্ষীর ন্যায় রহিয়াছে[১৮।১৯]। যেমন বৃক্ষের পত্র উদ্‌গত ও পুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক ও বৃক্ষচ্যুত হয়, সেইরূপ, দেহও উদ্ভূত ও পুষ্ট হইয়া যথাকালে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জীব হইতে প্রচ্যুত হইয়া যায়। বায়ু যেমন পুষ্প হইতে সুরভি গ্রহণ করতঃ স্থানান্তরগামী হয়, সেইরূপ জীবও পতনোন্মুখ দেহ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করতঃ পুনর্ব্বার নূতন দেহ গ্রহণের নিমিত্ত উৎক্রান্ত হইয়া যায়[২০।২২]। তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, এই স্থূল দেহ বাসনামূলক। সুতরাং যাবৎ বাসনা তাবৎ দেহ এবং বাসনার প্রক্ষয়ে শরীরোৎপত্তির অভাব ও পরম পদ প্রাপ্তি, ইহা পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে[২৩]। জীব বাসনাবেষ্টিত হইয়াই ঐন্দ্রজালিক কৃত মিথ্যা পুরুষের ন্যায় নানা দেহ ধারণ করে ও বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে এবং নিষ্ক্রান্তি কালে ইন্দ্রিয়শক্তি সহ নিষ্ক্রান্ত হয়[২৪]।

জীব নিক্রান্ত হইবামাত্র দেহ নিশ্চল নিস্পন্দ হয়, সেই অবস্থাকেই লোকে মরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে[২৫,২৬]। নিক্রান্তির পর জীব আকাশে কিছু-কাল বায়বীয় মূর্ত্তিতে অবস্থান করে এবং সে সময়েও আপনার বাসনানুরূপ মূর্ত্তি অনুভব করে[২৭]। অপিচ, যে দেহ উক্ত প্রকারে বিনষ্ট হইল, সে দেহকে তখন সে মিথ্যা ও নশ্বর বলিয়া জানিতে থাকে। অপিচ, দেহের বিনাশ দেখিয়া তুমিও ইহাকে মিথ্যা অর্থাৎ অসৎ বলিয়া অবধারণ করিবে অথবা সুষুপ্তের ন্যায় ইহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইবে[২৮]। মনুষ্য ও মনুষ্যের বিনাশ, উভয়ই বাসনাবশে কল্পিত, বস্তু বিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত নহে অর্থাৎ সত্য নহে। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও গো অশ্ব মনুষ্য প্রভৃতি আকারের পূর্ব্বকল্পীয় বাসনানুরূপ কল্পনার দ্বারা এতৎকল্পে গো অশ্ব মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্ট করেন, অন্য কোন উপাদান লইয়া কুম্ভকারের ঘটাদি সৃষ্টি করার ন্যায় সৃষ্টি করেন না। সত্য হউক মিথ্যা হউক, উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে যে আকার দৃষ্ট হইবে সে আকার তাহার বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না। পূর্ব্বোপার্জ্জিত অশুভ বাসনা যে পশ্চাদুপার্জ্জিত শুভ বাসনার দ্বারা অভিভূত হয় তাহার দৃষ্টান্ত প্রায়শ্চিত্ত। যেমন প্রায়শ্চিত্তাদি যত্নের দ্বারা পূর্ব্বদুষ্ক্রিয়া বিধ্বস্ত হয়, যেমন বর্ত্তমান দাহাদি যত্নের দ্বারা পূর্ব্বকৃত গৃহাদির বিনাশ করা যায়, সেইরূপ, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি শাস্ত্রীয় যত্নের দ্বারাও প্রাগ্‌ভবীয় দুর্ব্বাসনা বিনাশ করা যায়[২৯,৩১]। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চার বিষয়ের বাসনার মধ্যে যে বিষয়ের বাসনা অত্যন্ত তীব্রা হইবে, সেই বিষয়ের বাসনাই জয়লাভ করিবে। অতএব, যাহাতে শাস্ত্রীয় শুভ বাসনার সম্যক্ উদ্দীপন হয় শুভপ্রার্থী পুরুষ তাহাই করিবেন[৩২,৩৩]। মৃদু বাসনা বলবৎ বাসনা জয় করিতে পারে না। সেইজন্য যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ মননাদির দ্বারা চিরাভ্যস্ত জন্ম মরণ স্বর্গ নরকাদি বিভ্রম বিনষ্ট হয় না[৩৪]।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বর্গ নরকাদি বিভ্রমের কারণ বা মূল কি? জীবেরই বা স্থিতিকারণ কি? তাহা আমাকে বলুন[৩৫]।

ভগবান্ বলিলেন; এই সংসার বিভ্রম স্বপ্নের অনুরূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারই পর পর বিভ্রমের কারণ। ইহা অনাদি প্রবাহ ন্যায়ে সিদ্ধ হয়। অতএব, চিরাভ্যস্ত সংসার বাসনার সংস্কারই সংসারের অর্থাৎ

জীবস্থিতির কারণ, শাস্ত্রীয় প্রযত্নে তাহার প্রক্ষয় হওয়াই মোক্ষ[৩৩]।

অর্জ্জুন বলিলেন, বাসনার উৎপত্তি কোথায়? ও তাহার বিনাশ কিসে হয়?

ভগবান্ বলিলেন, মূর্খতাই বাসনার উৎপত্তি স্থান এবং তত্ত্বজ্ঞানই বাসনার নাশক। অনাত্মায় আত্মভাব স্থাপনের নাম মূর্খতা, আর আত্মায় আত্মজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান[৩৭]। হে কৌন্তেয়! তুমি আপনাকে বিদিত হইয়াছ, সত্য কি তাহা জানিয়াছ, এখন তুমি এই সেই আমি তুমি তোমার আমার ও আমার দ্বারা, এই সকল ভাব পরিত্যাগ কর[৩৮]।

অর্জ্জুন বলিলেন, বুঝিয়াছি, বাসনা বিনাশে জীবের বিনাশ সিদ্ধ হয়। যে যাহার সত্তায় সত্তাবান্ তাহার অসত্তায় তাহার অসত্তা অনিবার্য্য[৩৯]। অতএব, জীবের লয় হইলে তখন আর কে জন্মমরণাদিভাগী হইবে? তাহা হইবে না[৪০]।

ভগবান্ বলিলেন, হে বুদ্ধিমন্! জীব কি? জীব অন্য কিছু নহে। আপনিই আপনার মালিন্য কল্পনা করিয়াই জীব এবং তাদৃশ কল্পনাই বাসনার মূল বা বীজ। সুতরাং সে কল্পনা ও সে বাসনা বিনষ্ট হইলে যাহা প্রকৃত আত্মরূপ তাহাই অবশেষিত ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়। বাসনামুক্ততাই মোক্ষ, মোক্ষ অন্য কিছু নহে[৪১।৪২]। হে মহাবাহু অর্জ্জুন! বাসনাক্ষয়ে যে জীবদ্দশাতেও মুক্তি, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রসিদ্ধি। যাবৎ নির্ব্বাসন না হওয়া যায় তাবৎ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইলেও মুক্ত নহে[৪৩।৪৪]।

যাহার অন্তরে বাসনা থাকে, সেই ভ্রান্তি বশতঃ গগনতলে শিখিপিচ্ছ দর্শনের ন্যায় (কখন কখন আকাশে এমন এক পদার্থ দেখা যায়, যেন শত শত ময়ূরপুচ্ছ স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। অথচ সে সকল মেঘ, ময়ূরপুচ্ছ নহে।) সংসার দর্শন করে এবং যাহার বাসনা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে সে আর কোনও প্রকার ভ্রমদর্শন করে না সুতরাং মুক্ত হয়[৪৫]।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

—০*০—

ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি উক্ত প্রকারে বাসনা ক্ষয় করিয়া জীবন্মুক্ত ও অন্তঃসুশীতল (তাপাদিশূন্য) হও, হইয়া বন্ধুবধ নিমিত্তক দুঃখের ত্যাগকারী হও[১]। জরামরণের আশঙ্কা ত্যাগ কর, আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত হও, ইষ্টানিষ্ট কল্পনা পরিত্যাগ কর, রাগ বা আসক্তি বর্জ্জিত হও এবং প্রবাহের ন্যায় উপস্থিত কার্য্য সকল যথোপস্থিত নিয়মে করিতে থাক। ঐরূপে কার্য্য করা, করা বলিয়া গণ্য নহে। কেননা সত্যতঃ কোন কিছুর বিনাশ হয় না[২।৩]। জীবন্মুক্তদিগের স্বভাব এই যে, তাঁহারা অনাসক্তচিত্তে যথোপস্থিত কর্ম্ম করেন। পরন্তু মূঢ়ের স্বভাব বিপরীত। মূঢ়েরা এই কর্ম্ম করি বা করিব অথবা এই কার্য্য করিব না, এইরূপ অভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মপ্রবৃত্ত অথবা কার্য্যনিবৃত্ত হয়[৪।৫]। যে সকল শান্তচিত্ত জীবন্মুক্ত প্রবাহন্যায়ে যথোপস্থিত নিয়মে কার্য্য করে সেই সকল মুক্ত পুরুষ সুষুপ্তের ন্যায় প্রকাশমান হয়। অর্থাৎ সুষুপ্ত পুরুষ যেমন নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রে অবস্থান করেন, কার্য্য করিলেও জীবন্মুক্তেরা সেইরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন[৬]। যেমন কূর্ম্মদিগের মস্তক ঝটিতি অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় সেইরূপ জীবন্মুক্তদিগের ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। জীবন্মুক্তেরা এই জগৎকে সেই বিশ্বাত্মায় চিত্রিতের ন্যায় দেখেন[৭।৮]। এ চিত্র সেই চিত্তনামক চিত্রকরের চিত্রিত মাত্র। চিত্তনামক চিত্রকর অজ্ঞানরূপ আকাশে এই বিশ্বচিত্র চিত্রিত করিয়াছে। অজ্ঞানময় চিত্রকে প্রতিবিম্বচৈতন্যরূপ দীপ প্রকাশপ্রাপ্ত করিতেছে[৯]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সামান্য বা লৌকিক চিত্র কোন একটা আধারে চিত্রিত হয়। পরন্তু এই বিশ্বচিত্র বিনা আধারে চিত্রিত। আগে চিত্র, পরে আধার, ইহাও যৎপরোনাস্তি অদ্ভুত। কেন? তাহা ভাবিয়া দেখ। ব্যোমকে শূন্য বলা যায় বটে, পরন্তু মনোরূপ চিত্রকরের রচিত এই বিশ্বচিত্র তদপেক্ষা অধিক শূন্য অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ। মনোরূপ চিত্রকর ক্ষণমধ্যে এই

লোকত্রয়ের ক্ষয় ও উদয় নির্ব্বাহ করে[১০,১২]। মনও তৎকার্য্যভূত জগৎ এই স্বপ্নের ন্যায় শূন্য অর্থাৎ মিথ্যা[১৩]। ভ্রমের আবার সত্যতা কি? ভ্রান্তিকল্পিত সর্প যেমন রজ্জু দর্শনে কোথায় লীন হইয়া যায়, সেইরূপ, ইহাও স্বাত্মদর্শনে লুক্কায়িত হইয়া যায়[১৪]। যেমন শরন্মেঘ সৌরালোকে দৃষ্ট হয় আবার তাহারই দ্বারা অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহাও সেইরূপ জানিবে। এ চিত্রের কোন ভিত্তি নাই, সেজন্য ইহাও নাই। সুতরাং তুমিও তুমি নহ, ইহারাও ইহারা নহে। অতএব, বধ্য ও বধক এ মোহ পরিত্যাগ করিয়া তুমি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত হও। শূন্য কখন হয়ও নাই, হইবেও না[১৫,১৭]। এ সমস্তই ব্রহ্মাকাশ, অন্য কিছু নহে। মনোরাজ্য যেমন মনেরই রচনা ও মিথ্যা, তেমনি, বাহিরের এই জগৎও মনোবিশেষের রচিত ও মিথ্যা[১৮]। এই সমুদায় জগৎকে তুমি প্রসিদ্ধ শূন্য অপেক্ষাও শূন্য বলিয়া জানিবে। চিত্তই ইহার ভিত্তি এবং এ চিত্রের চিত্রকরও চিত্ত। ব্যোম যেমন সর্ব্বশূন্য, সেইরূপ, ইহাও সর্ব্বশূন্য। শূন্যতাপক্ষে উভয়ের অল্পমাত্র ভেদ নাই। জগতের নির্ম্মাণ ও বিনাশ উভয়ই চিত্তের মহিমা[১৯,২০]। হে অর্জ্জুন! আমার উপদেশে তোমার বিবিধ ভেদবুদ্ধিযুক্ত মনোরাজ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হউক[২১]। তুমি ভাবিতে পার বটে, আকল্প বিস্তীর্ণ সংসার মনঃকল্পিত কিরূপে? পরন্তু বিচার সহকারে ইহাও ভাবা উচিত যে, মন যেমন অসৎ রচনায় পটু, তেমনি, কল্প রচনাতেও পটু। মন ক্ষণকে কল্প করিতে পারে আবার কল্পকে ক্ষণ করিতে পারে। অল্পকে বহু করিতে পারে, আবার বহুকে অল্প করিতে পারে। যে মন যাহা নাই ক্ষণমধ্যে তাহারই সৃষ্টি করে, সেই মন যে ক্ষণকে কল্প করিবে, তাহাতে অদ্ভুত কি? আশ্চর্য্য কি? অতএব, মনেরই তাদৃশ সামর্থ্যে এই জগদ্ভ্রান্তি উত্থিত হইয়াছে ও মনই ইহাকে সত্যরূপে প্রতীত করাইতেছে[২২,২৩]। নিত্যমুক্ত আত্মায় এই জগৎ ভ্রান্তি ক্রমে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞানীর পক্ষে ইহা নিতান্ত তুচ্ছ, ও অজ্ঞানীর পক্ষে বজ্রসার অর্থাৎ চিরস্থায়ী বা দুরুচ্ছেদ্য[২৫,২৬]। যাহা থাকে তাহারই নিরাস যত্নসাপেক্ষ। পরন্তু ইহা নাই। চিত্তই এই জগচ্চিত্রের চিত্রকর, সুতরাং কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এ চিত্রের ভিত্তি নাই, রঞ্জন দ্রব্য নাই, অথচ ইহা উজ্জ্বল[২৭,২৮]। ইহা দেখিতে ভাল, ইন্দ্রিয় প্রলোভন, নানাবিধ ভমোরূপ

মসীর দ্বারা অঙ্কিত ও নানা তেজে বিভূষিত[২৯]। নানা কল্প ইহার অঙ্গ, সে সকল নানা রাগে রঞ্জিত, নানা দর্শনের বিলাস ও নানা অনুভবের বিষয়। ইহাতে আবার পূর্ব্বপশ্চিমাদি দিক্ ও ব্যোমরূপ একটী বৃহৎ সরোবর। চন্দ্র ও সূর্য্য এই সরোবরের পদ্ম ও মেঘ সকল তাহার পত্র। এই চিত্রে ভিত্তিশূন্য অনেক প্রকোষ্ঠ, তাহাতে সুর অসুর মনুষ্য প্রভৃতি পুত্তলিকা চিত্রিত। এই সকল প্রকোষ্ঠ চন্দ্র সূর্য্যের আলোকরূপ সুধায় প্রলিপ্ত অর্থাৎ ধবল বর্ণ[৩০।৩২]। ইহাতে ত্রিলোকরূপিণী তিনটী নটী চিত্রিত হইয়াছে। অতিচপল ও কামুক চিত্ত আপনার আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মাকাশে অতিচমৎকার তিনটী নটী চিত্রিত করিয়াছে। * ইহাদের নৃত্যশালা প্রতিভা অর্থাৎ উন্মেষবতী বুদ্ধি, প্রদীপ সাক্ষিচৈতন্য, বুদ্ধির বৃত্তিসমূহ ঐ নটীদিগের আভরণ, ইহারা নানাবিধ হাবভাববিলাসে সদা ব্যাকুলা[৩৩]। সুবর্ণবর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ইহাদের শরীর, মেঘ ইহাদের কেশ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইহাদের বস্ত্র, সপ্ত পাতাল ইহাদের পূর্ব্বকায়, (পূর্ব্বকায়—নাভি হইতে পদতল) সপ্ত স্বর্গ ইহাদের ঊর্দ্ধকায়, উন্নত স্থান সকল নিতম্ব, ব্রহ্মাদি বাহু, সত্বগুণ কঞ্চুক, বিবেক ও বৈরাগ্য কুচ অর্থাৎ স্তনমণ্ডল, মহীতল ইহাদের পদ্মাসন অর্থাৎ উপবেশন পীঠ। নানাবিধ পর্ব্বতমালা ইহাদের পত্ররচনা (শরীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে তিলক রচনার নাম পত্ররচনা ও পত্রভঙ্গ) এবং মধ্য-

---

* স্বর্গ ১ মর্ত্ত্য ১ পাতাল ১। এই তিন্ নর্ত্তকী তুল্য অর্থাৎ নর্ত্তকীরা যেমন মনোরঞ্জন করে, স্বর্গাদি লোকও তদ্রূপ মনোরঞ্জন করে। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল ও রসাতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল যথাক্রমে পদতল, পদপৃষ্ঠ, গুল্‌ফ, জানু জঙ্ঘা প্রভৃতি রূপকে বর্ণিত হইতে পারে। এইরূপ উপর্য্যুপরি বিদ্যমান জনলোক তপোলোক ও সত্য-প্রভৃতি নাভি, বক্ষঃ, কণ্ঠ, চিবুক, প্রভৃতির উপমিত হইতে পারে। সুবর্ণ বর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এই কথায় জগতের আদিম অবস্থা বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় অণ্ড। যাহা ব্রহ্মা হইতে প্রথম উৎপন্ন। ইহা তেজোময় বলিয়া সুবর্ণ বর্ণ বলা হইয়াছে। মৃত্তিকা প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে সুবর্ণ বর্ণই ছিল। মনুর বর্ণিত, "তদণ্ডমভব্দ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং" এই বচনেও সৃষ্টির প্রথমে অণ্ডোৎপত্তি ও সে অণ্ড সহস্র সূর্য্যসম প্রভান্বিত ও তেজোরূপী বলিয়া সুবর্ণ বর্ণ, এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব, ব্রহ্মাণ্ড এখন সুবর্ণ বর্ণ না হইলেও উৎপত্তি কালে সুবর্ণ বর্ণ ছিল। তাই বশিষ্ঠ ঋষির লক্ষ্য; এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক ইহাদের উদর[৩৪।৩৫]। চন্দ্র সূর্য্যের মেরু প্রদক্ষিণ জনিত দিবা রাত্র ইহাদের ব্যাবর্ত্তন, বিদ্যুৎ ইহাদের দন্তপংক্তি, চতুর্দ্দশ ভুবন ও তত্রস্থ ভূতনিচয় ইহাদের রোমাঞ্চ, বৈরাগ্য ও সদ্বাসনা প্রভৃতি ইহাদের আপাদলম্বা কদম্বমালা। ইহারা ব্যষ্টিসমষ্টি জীবে পরিবেষ্টিত[৩৬]।

এই চিত্র রচনার উপকরণ বিচিত্র কাম কর্ম্ম ও বাসনা ও চিত্রকর চিত্ত। চিত্তই বিচিত্র কাম কর্ম্ম বাসনা উপকরণ লইয়া এই ত্রিলোক-পুত্তলিকার চিত্র আপনার আশ্রয়ীভূত আত্মাকাশে অতিআশ্চর্য্য কৌশলে রচনা করিয়াছে[৩৭]।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

—○()•()○—

ভগবান্ বলিলেন, অর্জ্জুন! আগে চিত্র, পরে ভিত্তি, এতদপেক্ষা মহদাশ্চর্য্য আর কি আছে! দেখা যায়, আগে ভিত্তিশূন্য চিত্রের উদয় হইয়াছে, পরে তাহার ভিত্তি অর্থাৎ আধারপট বিস্তৃত হইয়াছে। অহো! মায়া কি অদ্ভুত! তুম্বীফল জলমগ্ন, আর শিলাখণ্ড প্লবমান[১।২]। হউক, জগচ্চিত্র আশ্চর্য্য, পরন্তু শূন্যরূপ আত্মায় অহন্তার উদয় আরও অধিক আশ্চর্য্য। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, সমস্তই ব্যোম অর্থাৎ শূন্যরূপী? শূন্য, শূন্যের দ্বারা কৃত, শূন্যে শূন্যেরই উদয়, শূন্যে শূন্যেরই লয়, শূন্যই শূন্য ভোগ করে, ভোগও শূন্য, এবং শূন্যে শূন্যেরই বিস্তৃতি[৩।৪]। হে অর্জ্জুন! এই যে জগচ্চিত্র, ইহাতেই অতিদীর্ঘ সংসারভ্রমণ বিদ্যমান এবং ইহা পশুবন্ধন রজ্জুর ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। আর সেই চিদাকাশ (ব্রহ্ম), তাহাও ইহাতে বাসনারজ্জুবিজড়িত[৫]। আদর্শে প্রতিবিম্বের স্থিতি যেরূপ, ব্রহ্মে জগচ্চিত্রের অবস্থান সেইরূপ। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে ইহার ছেদভেদাদি সম্ভবে না। অপিচ,

যখন ব্রহ্মই ব্রহ্মে, ব্রহ্মে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই, তখন আর কে কাহাকে ছেদন করে[৬,৭]? যখন ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনের বলে ছেদভেদাদি ব্যবহার লুপ্ত ও বাসনাপুঞ্জ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং তখন ছেদ্য ছেদক ও ভেদ্য ভেদক ভাব থাকে না। ঐ জ্ঞান যাহাদের নাই বা হয় নাই, অর্থাৎ বাসনাও ব্রহ্ম, এ বোধ যাহাদের জন্মে নাই, তাহারা ধার্ম্মিক হইলেও পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বদ্ধ। বাসনাবীজ অতি অল্প থাকিলেও তাহা অতি বিস্তৃত সংসার কানন জন্মায়। সেইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন; অভ্যাস দার্ঢ্যের দ্বারা হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বাসনা-বীজ নিরবশেষে দগ্ধ করিবেক। বীজ দগ্ধ হইলে সে বীজ আর প্ররোহ (অঙ্কুর) জন্মাইবে না[৮,১০]। যে মনে বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়াছে সে মন সুখ দুঃখে ব্যাসক্ত হয় না, পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকে[১১]। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি শান্ত হইয়া অতি পবিত্র ভগবদ্গীতা শ্রবণ করিলে, তোমার মোহও বিগলিত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি কেবল শান্তি পদে স্থিত হও[১২]।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

—০()*()০—

অর্জ্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত! আপনার প্রসাদে মায়া মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি কি তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখন আমি আপনার বাক্য পালন করিতে সন্দিগ্ধ নহি[১]।

ভগবান্ বলিলেন, যদি এমন ভাব যে, তত্ত্ববোধের দ্বারা রাগাদিবৃত্তি পরিষ্কাররূপে উপশান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে জানিবে, তোমার চিত্ত সত্য সত্যই বাসনাবীজ বর্জ্জিত হইয়াছে[২]। অপিচ, ইহাও জানিবে যে, ঐ অবস্থায় প্রত্যক্‌চেতন অর্থাৎ শরীরোপহিত আত্মা তখন সর্ব্বথা মালিন্যমুক্ত হয়, যে প্রত্যক্‌চেতন ব্যবহারে সর্ব্বময় ও ব্যবহারাতীতে

এক। এই অবস্থা চক্ষুরাদির ও অজ্ঞজনের অবেদ্য[৩।৪]। যাঁহারা অতি দূরদর্শী তাঁহাদেরও এই সঙ্কল্প বর্জ্জিত সুতরাং বিশুদ্ধ প্রত্যক্ চেতন অবোধ্য। যেমন মনুষ্যের দৃষ্টি পরমাণু দেখিতে পায় না, সেইরূপ, এই বিশুদ্ধ চেতনকেও কেহ দেখিতে পায় না[৫।৬]। যে অবস্থা পাইলে ঘটপটাদি স্থূল দৃশ্যও ক্ষীণ হইয়া যায়, সে অবস্থায় বাসনা ক্ষয়ের কথা বলাই বাহুল্য[৭]। বহ্নিপর্ব্বতসম্পর্কে হিমরাশি বিদ্রবিত হওয়ার ন্যায় বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে অবিদ্যার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। কোথায় তুচ্ছ বাসনা, আর কোথায় বিপুল চিত্তত্ত্ব? হে অর্জ্জুন! তাবৎ অবিদ্যার স্ফূর্ত্তি—যাবৎ বিশুদ্ধ আত্মার দর্শন লাভ না হয়[৮।১০]। যে আত্মার উদরে অখিল ব্রহ্মাণ্ড, সে আত্মার সাক্ষাৎকারে দৃশ্য মণ্ডল দৃষ্ট হইতে পারে না। যত আকার সমস্তই সেই আত্মার আকার অথচ তিনি নিরাকার। বাক্পথের অতীত তাদৃশ পরম বস্তু কোন্ তুচ্ছ বস্তুর দ্বারা উপমিত হইতে পারে[১১।১২]? তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বিষয় বিষূচিকা দূরীভূত কর, বাসনা পরিত্যাগ কর, করিয়া নির্ভয় ও নিষ্কাম হও[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ত্রিলোকনাথ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন ক্ষণকালের নিমিত্ত মৌন রহিলেন। পরে পদ্মের নিকট ভ্রমরের ন্যায় ভগবানের নিকট পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন[১৪]।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে ভগবন্! আমার সমুদায় শোক বিগলিত হইয়াছে এবং আমার মতি আপনার উপদেশে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছে[১৫]। গাণ্ডীবধন্বা হরিসারথি অর্জ্জুন ঐরূপ বলিয়া গুরুজন বধে দোষাদোষ বিষয়ের সন্দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণলীলা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। অতঃপর হয় হস্তী সারথি প্রভৃতি বিনাশ দ্বারা পৃথিবীকে রুধির প্লাবিতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৬।১৭]।

অর্জ্জুনোপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ! তুমিও ঐ দৃষ্টি অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া স্থিত হও ও সঙ্গপরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসময় হও[১]। যে আত্মায় ও যে আত্মা হইতে এই বিশ্ব, যিনিই সমস্ত ও যিনি সর্ব্বময়, তাঁহাকেই তুমি পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও[২]। ইনি দূরস্থ ও অদূরস্থ, সর্ব্বগত ও প্রত্যেকগত, তাঁহারই সত্তায় তোমার সত্তা, সুতরাং তিনিই তুমি[৩]। যিনি বেদ্যনির্ম্মুক্ত, বেদনরূপী, অনির্ম্মিত ও চিদাভাস, তিনিই তুমি ও তিনিই তৎপদবাচ্য[৪]। তাহা সীমারও সীমা, দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, মহিমারও মহিমা ও গুরুরও গুরু[৫]। আত্মা, বিজ্ঞান, শূন্য, ব্রহ্ম, তৎপদ, শ্রেষ্ঠ, মঙ্গল, পরম মঙ্গল, শান্তি, বিদ্যা, স্থিতি, এ সমস্তই তিনি[৬]। ইনিই বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্বের বিম্ব, সুতরাং অনুভবরূপী এবং সর্ব্ব দ্রব্যের সত্তা ইঁহারই সত্তা[৭]। তিলে তৈলের ন্যায় জগৎ তাঁহাতেই স্থিত এবং তিনিই এই জগদ্রূপ গৃহের দীপ। ইনি এই জগদ্বৃক্ষের রস ও জগৎরূপ পশুর পালক[৮]। ইনিই প্রাণিরূপ মুক্তার সূত্র ও হৃদয়াকাশের সার। প্রাণিরূপ মরিচের তীক্ষ্ণতা, অর্থাৎ শক্তি, পদার্থের পদার্থতা, সত্যের সত্য, সমস্তই তিনি। সতের সত্ত্ব ও অসতের অসত্ত্বও তিনি[৯।১০]। এই আত্মা আপনিই আপনার বিচিত্র বা বিশেষ স্ফূর্ত্তির দ্বারা লব্ধ। এই যে জগদ্ভাব, এ ভাব অবিচার দশায় মনোহর কিন্তু বিচারে ইহার অসত্তা। এই জগজ্জালের প্রথমাঙ্কুর অহং অর্থাৎ আমি ইত্যাকারা বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি শুদ্ধস্বভাব আত্মাকে কি বন্ধন করিতে পারে? তাহা পারে না। আমার আদ্যন্ত মধ্য নাই, আমি অনন্ত অসীম, সুতরাং সাঙ্কল্পিক কার্য্য সমূহও আমি, আমার অতিরিক্ত কিছু নাই[১১।১২]। যাহার মন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, উদয় ও অস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, বাহিরে তাহার ব্যবহার দৃষ্ট হইলেও সে ব্যবহারের অতীত[১৩।১৪]। যে ব্যক্তি ভাবনার দ্বারা অন্তরে অদ্বৈতসম্পন্ন, বাহিরে তাহার ব্যবহার আদর্শ-প্রতিবিম্বিত মনুষ্যের ব্যবহারের অনুরূপ। অর্থাৎ আদর্শপ্রতিবিম্বিত

মনুষ্য হস্তপদাদি সঞ্চালন করে না, অথচ দর্শকের দৃষ্টিতে তাহার মিথ্যা সঞ্চলন দৃষ্ট হয়[১৩,১৭]। তাদৃশ নর মানাপমানাদি জনিত দুঃখভাগী ও সুখভাগী নহে, সেইজন্য সে মুক্ত[১৮]। যেমন প্রতিবিম্বিত মনুষ্যের ব্যবহারে আদর্শ অলিপ্ত, সেইরূপ, চিদাত্মাও এই জগতের অবভাসে অলিপ্ত[১৯]। একত্ব, দ্বিত্ব, এ সকল উপদেশ ও গুরু, শিষ্য, বাচ্য, বাচক, এ সকলের কোন কিছু নিতান্ত নির্ম্মল চিদ্বস্তুতে লিপ্ত হয় না। (চিদাত্মায় কোনও কিছুর দাগ বা চিহ্ন সংলগ্ন হয় না)[২০।২১]। চিদ্বস্তুর কেবলীভাব অসংসার, তাহার বিপরীত ভাব সংসার, সুতরাং কেবলী ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে সংসারও বিনিবৃত্ত হয়[২২,২৩]। সুবর্ণ, হার ও বলয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্ থাকে না। সেইরূপ, চিদাত্মায় প্রমাণ প্রমেয়াদিও পৃথক্ থাকে না। চিত্তই চিদাত্মার প্রথম প্রস্পন্দ, তাহাই সংসার তথা তাহাই তাহার অবুদ্ধতা[২৬,২৭]। হে রামচন্দ্র! সংসারনামধেয় ঐ সকল ভাব বোধ কালে থাকে না, বোধ কালে কেবলা ও শুদ্ধা চিৎ অবশেষিত হয়, সুতরাং ভোগ বাসনারও অভাব সংঘটন হয়[২৮]। সহজসিদ্ধ ভোগের অভাবনাই জ্ঞানীর ও মোক্ষের লক্ষণ। অতিতৃপ্ত ব্যক্তির কি কখন কদন্নে স্পৃহা হয়? তাহা হয় না। ভোগবিষয়ে সেরূপ অতিতৃপ্ততাও তত্ত্বজ্ঞানের অপর লক্ষণ[২৯।৩০]। আমার স্বাত্মচৈতন্যই ভোগ, ভোগ্য ও ভোক্তা, এতদ্রূপে প্রথমান হইতেছে। এ সমস্তই স্বাত্মচৈতন্যের রূপান্তর, এ নিশ্চয় অত্যন্ত অভ্যস্ত হওয়াও স্বাত্মতত্ত্বজ্ঞানের অপর লক্ষণ। অতএব, যে ব্যক্তি ভোগ্য ভোগ করে অথচ ব্যাসক্ত নহে, সেই ব্যক্তিকেই তুমি উত্তম বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানী বলিয়া জানিবে[৩১,৩২]। সার্ব্বাত্ম্য দর্শন কৃত্রিম অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা কৃত হইলেও উহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মদৃষ্টি দূরীভূত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। আকাশ লগুড়ে আহত হয় না, তথাপি কখন কখন কোন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আকাশে লগুড় প্রহার আবশ্যক হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, কৃত্রিম বুদ্ধি যোগ ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না। দেহাত্মজ্ঞান নিরস্ত করাই তত্ত্বজ্ঞানের অন্যতম সহায়, তাই বলিয়া দেহ দলন (বিধ্বস্ত) করা তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ নহে[৩৩।৩৪]। বলা বাহুল্য যে, যাবৎ না অন্তরে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে তাবৎ সংসার নামক স্পন্দাস্পন্দ দশা বিদ্যমান থাকে, পরন্তু যখন সম্যক্ জ্ঞান জন্মে ও তাহা স্থিতি লাভ

করে, তখন এ সকল দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া কোথায় কি হইয়া যায় তাহা বলিবার যোগ্য নহে[৩৫।৩৬]। এই আত্মায় কোন প্রকার প্রাণচেষ্টার কথা ও সৎ অসৎ অনির্ব্বাচ্য এ সকল কথা প্রসক্ত হয় না। শান্তিস্থিতিই চিদাত্মার স্বরূপ, অশান্তি ভাবই তাহার স্বরূপচ্যুতি। তিনি বন্ধ ও মোক্ষ এতদুভয়ের অতীত, তাঁহাতে বাস্তবতঃ বন্ধ মোক্ষের নাম গন্ধও নাই। আমি বদ্ধ আছি, মুক্ত হইব, এ বোধও আত্মার পূর্ণতা প্রতিবন্ধক[৩৭।৪০]। মোক্ষেচ্ছার কথা দূরে থাকুক, চিৎপদার্থ বিক্ষেপ বা প্রচ্ছাদন বর্জ্জিত হউক, এ ভাবটীও, বন্ধজনক। অতএব, সর্ব্বপ্রকার সম্বেদন রাহিত্যকেই তুমি পরম পদ বলিয়া স্থির করিবে। যাহা সঙ্কল্প, সঙ্কল্পন ও সঙ্কল্পক শব্দের বোধ্য, তাহা বন্ধের ও মোক্ষের যোগ্য। তাহা বিবেক দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলেই প্রণষ্ট হয়। অহং যদি আস্পদশূন্য অর্থাৎ প্রতিষ্ঠারহিত হয়, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষ এ দুই ব্যবহার কোথায় বা কাহার উপর হইবে? জ্ঞানী যদি স্বকৃত সঙ্কল্পের বিচার করে, পূর্ব্বাপর তথ্য অনুসন্ধান করে, বিবেক দ্বারা তাহার পরিহার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সঙ্কল্পের বিরামে চিত্তের অস্পন্দতা ব্যবস্থিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। সুতরাং তখন সঙ্কল্প-মূলক সংসারও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অথবা চিৎস্পন্দও চিত্তের অন্যবিধ প্রকাশ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ অবধারণ হইলেও সংসার ক্ষয় সম্ভাবিত হয়[৪১।৪৫]। অতএব, ইহা এক বিবিধ দৃশ্যময় দীর্ঘ স্বপ্ন, এ দীর্ঘ স্বপ্নে জ্ঞানিলোক মুগ্ধ হন না[৪৬।৪৭]।

যাহাতে এই জগদাকার উপলব্ধ হইতেছে, যাহাতে এতদুপলক্ষিত আনন্দের স্বাদ প্রকট প্রাপ্ত হইতেছে, যাহাতে এ সকলের সত্তা উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, তুমি সেই প্রত্যগাত্মাকে ধ্যানযোগে বিদিত হও[৪৮]।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহা আদ্য পরম পদ তাহা কেবলা চিৎ, তাহাতেই হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি মহারূপ অবস্থিত[১]। তাঁহারা অতিউচ্চ বিভূতির দ্বারা প্রস্ফুরিত ও নৃপতির ন্যায় হৃষ্ট তুষ্ট। আকাশগমনাদি ইঁহাদের ক্রীড়া[৬]। হে রামচন্দ্র! তাঁহারই প্রাপ্তিতে অমরত্ব ও তাঁহারই প্রাপ্তিতে শোকরাহিত্য জন্মে। তাঁহাকে পাইলে জীব ক্ষুধাতৃষ্ণাদি জীবধর্ম্মের দ্বারা উৎপীড়িত হয় না, অপিচ কোনও কিছুতে নিরুদ্ধ হয় না। জীব যদি সেই অপার পরমাকাশ স্বরূপ পরমাত্মার সত্তাসামান্য অর্থাৎ সর্ব্বানুস্যূতা স্থিতি ক্ষণমাত্রও বোধগম্য করিতে পারে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত ও মুনি হয়। সে সংসার কার্য্য করিলেও পরিতাপ প্রাপ্ত হয় না।

রঘুনাথ বলিলেন, প্রভো! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত, যাহাতে কেবলী সত্তা প্রতিষ্ঠিত, তাহা কি ঈশ্বর? কি অন্য কিছু[৭।৮]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহা ব্রহ্ম, তাহাই সর্ব্বদেহস্থ। সেই দেহস্থ ব্রহ্মই পান, ভোজন, আদান, প্রদান, সমস্তই করেন। এই দেহে তিনি সংবিত্তি অর্থাৎ চেতনারূপী ও সর্ব্বপ্রকার বেদ্যের বেদয়িতা[৭]। তাহা সর্ব্বগামী, আদ্যন্তরহিত ও সর্ব্বসত্তার একতা[৮]। তাহাই ব্যোমের ব্যোমত্ব, শব্দের শব্দত্ব, স্পর্শের স্পর্শত্ব, ত্বকের ত্বকৃত্ব, ভূমির ভূমিত্ব, রসের রসত্ব, রসনার রসনাত্ব, রূপের রূপত্ব, নেত্রের নেত্রত্ব, দৃষ্টির দৃষ্টিত্ব, ঘ্রাণের ঘ্রাণত্ব, গন্ধের গন্ধত্ব, জলের জলত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, তেজের তেজত্ব, বুদ্ধির বুদ্ধিত্ব, মনের মনত্ব, অহঙ্কারের অহঙ্কারত্ব, চিত্তের চিত্তত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, পটের পটত্ব, ঘটের ঘটত্ব ও বটের বটত্ব[৯।১০]। হে রঘুনাথ! সেই পদার্থই স্থাবরে স্থাবরত্বরূপে, জঙ্গমে জঙ্গমত্বরূপে, পাষাণে পাষাণত্বরূপে, চেতনে চেতনত্বরূপে, অমরে অমরত্বরূপে, নরে নরত্বরূপে,

তির্য্যকে তির্য্যক্ত্বরূপে ও কৃমিতে কৃমিত্বরূপে স্থিতি করিতেছে[১৫।১৬]। কালত্ব, ঋতুত্ব, ত্রুটিত্ব, ক্ষণত্ব, নিমেষত্ব, এ সকল সত্তাও সেই সত্তার অধীন, অথবা এক বা অভিন্ন[১৭]। সেই বিভু সত্তাই শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল, পীত ও ক্রিয়া প্রভৃতিতে বিদ্যমান এবং তিনিই স্পন্দরূপে ক্রিয়ায়, নিয়মরূপে নিয়তিতে, স্থিতিরূপে স্থিতিতে, নাশরূপে নাশে, উৎপত্তিরূপে উৎপত্তিতে অবস্থিত[১৮,১৯]। বালকের বাল্য, যুবার যৌবন, বৃদ্ধের বার্দ্ধক্য, মৃতের মরণ, এ সমস্তই তিনি[২০]। হে রঘুনাথ! সেই পরমেশ্বর এবম্প্রকারে সর্ব্বপদার্থ-অভেদে বিদ্যমান। যথা সমুদ্রের কল্লোল, শীকর, ফেণ, আবর্ত্ত, তরঙ্গ ও স্রোত, তথা পরমেশ্বরের এই সকল। শিশুর কল্পিত যক্ষের ন্যায় এ সকল সেই চেতনের প্রকল্পিত[২১।২২]।

হে মহাত্মন্! সর্ব্বত্রাবস্থিত নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম নিরাবাধ চিৎস্বরূপ আমিই বিবিধ বিলাসে বা বিবিধরূপে স্থিত আছি, ইহাই মনন কর, করিয়া শান্তমতি হও[২৩]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

——()*()——

রঘুনাথ বলিলেন, মুনিবর! আপনি বলিলেন, এ সকল পরমাত্মার ভ্রান্তির দ্বারা কল্পিত ও অস্মদাদির স্বপ্ন সদৃশী বিভূতি, পরন্তু আমরা এ সকলকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া বুঝি না, অধিকন্তু সত্য বলিয়াই বুঝি। এরূপ কেন বুঝি তাহা আমাকে বলুন[১।২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমরা এ সকলকে সত্য ভাবি, কিন্তু ব্রহ্মাদি মুক্ত জীবেরা এ সকলকে সত্য ভাবেন না। এই দৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাদের সত্যতা প্রতীতি হয় না। কিন্তু ব্রহ্মা যখন পূর্ব্বকল্পে উপাসকাবস্থায় ছিলেন তখন তাৎকালিক সৃষ্টিকে তাঁহার সত্য মনে হইত, পরন্তু এতৎকল্পে তাঁহার সেই তৎকল্পীয় মিথ্যা জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা

বাধ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিতে এ সকল এখন অবাস্তব। ব্রহ্মাও পূর্ব্বকল্পে অস্মদাদির ন্যায় অমুক্ত জীব ছিলেন, এতৎকল্পে তিনি মুক্ত জীব[৩]। যাবৎ অজ্ঞানের অনুবৃত্তি, তাবৎ সত্যতা বোধ ও সংসার, সম্যক্‌জ্ঞানে অজ্ঞানের অভাবে ভ্রান্তির নিবৃত্তি ও অসংসার[৪]। প্রজাপতির তত্ত্বজ্ঞানবাধিত এই স্বপ্নতুল্য প্রতিভাস অজ্ঞ অস্মদাদির অহং জ্ঞানে একীভূত ও ভাসমান হইতেছে, তাই আমরা বুঝি, এ সকল সত্য[৫]। স্বপ্ন মিথ্যা, পরন্তু সুপ্ত পুরুষ সুপ্তি অবস্থায় তাহা অনুভব করে না। সেইরূপ ব্রহ্মাও কিঞ্চিৎকাল এ সকলের মিথ্যাত্ব বুঝিয়াও বুঝেন না। অর্থাৎ আধিকারিক প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারও তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত কার্য্যকারী হয় না। স্বাপ্ন পুরুষ যাহা করে তাহাও স্বপ্নের অনুরূপ অর্থাৎ তুমি এ সকলকে প্রজাপতির স্বাপ্নসৃষ্টি বুঝিয়া অস্মদাদির স্বাপ্নসৃষ্টির সমান মিথ্যা বলিয়া স্থির করিবে। প্রজাপতির এই জগৎ স্বপ্নও বাস্তবিক দীর্ঘ অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী নহে অর্থাৎ ইহার দীর্ঘতাও প্রাগুক্ত হরিশ্চন্দ্রাদি স্বপ্নের ভ্রান্তিকল্পিত দীর্ঘতার অনুরূপ[৬।১২]। দৃশ্যতা মাত্রেই চিত্তত্বের অধীন, সুতরাং দৃশ্যতা বোধ প্রজাপতির ও অস্মদাদির একই বিধ। জল প্রবাহাদি নানা আকারে দৃষ্ট হইলেও দৃশ্যভাগ মিথ্যা, জল ভাগই সত্য। এইরূপ স্বাপ্নময় জগৎও বিবিধ বিধানে দৃষ্ট হইলেও দৃশ্যভাগ মিথ্যা দৃষ্টিভাগ সত্য[১৩।১৪]। প্রজাপতির সৃষ্টির মিথ্যাত্বে প্রমাণ মহাপ্রলয়। অঘটনঘটনসমর্থা ভ্রান্তির মহিমা অনির্ব্বাচ্য। ভ্রান্তির সৃষ্টিতে কোনও প্রকার পূর্ব্ব পক্ষ চলে না। সম্ভব অসম্ভব সমস্তই ভ্রান্তির ভ্রান্তিসৃষ্টিতে নির্ব্বাহিত হয়। জলেও অগ্নি জলে, আকাশেও গ্রাম নগরাদি দৃষ্ট হয়, প্রস্তরেও জলজ পদার্থ জন্মে, একই বৃক্ষে নানা পুষ্প ফুটে, শিলাও ফল প্রসব করে, প্রস্তর মধ্যেও ভেক জন্মে ও বাস করে, শিলা হইতেও জল জন্মে, ক্ষণমধ্যে ঘটও পট হয়, আবার পটও ঘট হয় এবং স্বপ্নে আত্মমরণও অনুভূত হয়[১৫-২১]। শাম্বরী মায়ায় ও গান্ধর্ব্বী মায়ায় যে সকল অদ্ভুত প্রদর্শিত হয় তাহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ। দূরত্বাদি দেশকৃত ভ্রান্তি ও ক্ষণিক উৎপাত জনিত ভ্রান্তি। মন্ত্র প্রয়োগে দ্রব্যবিশেষের সামর্থ্যে, মত্ততায় ও ভূতাবেশে বহু অসম্ভব দর্শন হইয়া থাকে[২২।২৩]। ব্রহ্মাও নাশ আপাততঃ অসম্ভব হইলেও যথাকালে তাহাও সম্ভাবিত হইবে। অতএব, এমন

কিছুই নাই যাহা সত্য নহে এবং এমন কিছুই নাই যাহা অসত্য নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমস্তই সত্য, আর জগৎ ভাবে দেখিলে সমস্তই অসত্য। যেমন স্বাপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাপ্নপদার্থের স্থিরতা দর্শন করে, সেইরূপ, জীবও সংসারকালে এ সকলের স্থৈর্য্য চিন্তা করে[২৭,৩০]।

যেমন গর্ত্তনিপতিত অবোধ মৃগেরা গর্ত্ত নিপতনের দোষে অধিক বিভ্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ গর্ত্তনিপতিত হয়, এক গর্ত্ত হইতে গর্ত্তান্তরে প্রবিষ্ট হয়, উদ্ধার লাভে সমর্থ হয় না, এবং সুপ্ত ব্যক্তি সুপ্তির দোষে এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্ন দর্শন করে, সেইরূপ, মুগ্ধ জীবেরাও মোহের দোষে পুনঃ পুনঃ সংসারসমুদ্রে নিপতিত হয়, উদ্ধার লাভে শক্ত হয় না[৩১]।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! অভিহিত বিষয় বুঝিবার উপযুক্ত একটী ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর। ইতিহাসটী কোন এক অল্প মননশীল ভিক্ষুর অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত ঘটিত[১]।

কোন এক প্রদেশে এক মহাভিক্ষু (সন্ন্যাসী) বাস করিতেন। তিনি নিত্য সমাধি অভ্যাস করিতেন ও তদনুকূল কার্য্যে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিতেন[২]। ক্রমে সমাধ্যভ্যাস দৃঢ় হওয়ায় তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিল অর্থাৎ পূর্ব্ববাসনা সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। লহরী যেমন জলে লয় প্রাপ্ত হয়, জলাকার ধারণ করে, তাহার ন্যায় তদীয় মনের বৃত্তি সকল ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ তাঁহার চিত্তে ধ্যেয় বস্তুর সংস্কার ব্যতীত অন্য বস্তুর সংস্কার রহিল না, লুপ্ত হইয়া গেল[৩]। এই মহাভিক্ষু একদা সমাধি ত্যাগ করিয়া একাগ্র চিত্তে আপনার ধ্যান ক্রিয়ার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন[৪]। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে

হইল, সামান্য নরেরা যেরূপ কার্য্য করে, আমি একবার সেইরূপ কার্য্য করিয়া কৌতুক করিব৫। জলস্রোত এক ভাবে চলিতেছে, এমন সময়ে যদি সে স্রোতের বৈপরীত্য জন্মে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে আবর্ত্ত জন্মে। চিন্তার প্রভাবে ভিক্ষুর চিত্তের গতি ক্ষণমধ্যে ফিরিয়া গেল, তাহাতে তাঁহার চিত্ত তন্মুহূর্ত্তে এক সাধারণ নরের আকৃতি কল্পনা করিয়া লইল। পূর্ব্বধ্যেয় উড়িয়া গেল, সে তখন ভাবিল, আমি জীবট-নামা ব্যক্তি৬,৭। স্বাপ্নপুরুষের ন্যায় সমুৎপন্ন এই জীবট তখন স্বপ্ননির্ম্মিত নগরের ন্যায় কোন সঙ্কল্পিত নগরে আহার বিহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধারণ লোকের ন্যায় স্নান, পান, আহার, নিদ্রা ও স্ত্রীসঙ্গাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। (সমস্তই ভাবনার দ্বারা) এই জীবট এক দিন স্বপ্নে দেখিতেছেন, আমি বেদপাঠী ব্রাহ্মণ হইয়া দেশান্তরে অবস্থান করিতেছি। অবস্থান করিতে করিতে এই দ্বিজ এক দিন নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন এক সামন্ত রাজা হইয়াছেন। এই সামন্ত আবার একদিন আহারান্তে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি প্রধান রাজা হইয়াছেন। এই রাজা আবার একদিন স্বপ্ন দেখি-লেন, তিনি এক অপূর্ব্বদর্শনা দেবাঙ্গনা হইয়াছেন এবং এই সুরাঙ্গনা এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন এক মৃগী হইয়া বনে বিচরণ করিতেছেন৮।১৩। এই মৃগী আবার এক দিন নিদ্রায় দেখিল, সে এক বল্লী (লতা) হইয়াছে। এবংক্রমে সেই বল্লী আপনাকে লতা পুষ্প ফলসমন্বিত বনদেবী, বনদেবী আবার আপনাকে ভ্রমর, ভ্রমর আবার আপনাকে হস্তী, হস্তী আবার আপনাকে রাজবল্লভ, রাজবল্লভ আপনাকে নিশাচর, এই নিশাচর আবার আপনাকে পুনর্ব্বার ভ্রমর, এই ভ্রমর আবার আপনাকে হংস এবং এই হংস আবার আপনাকে ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মার বাহন হংস হইতে দেখিল১৭,৩৬। এই রাজহংস সেই ব্রহ্ম সদনে দীর্ঘকাল জ্ঞানবিজ্ঞানাদি সম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিল, তৎপরে যেন সে কল্প শেষে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইল৩৭।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই ব্রহ্মবাহন হংস একদা ব্রহ্মার সহিত রুদ্রভবনে গমন করিল। সে স্থানে রুদ্রের ঐশ্বর্য্যোৎকর্ষ দর্শনে সহসা তাহার চিত্তে রুদ্রভাব উপস্থিত হইল। তৎপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সে রুদ্রসারূপ্য প্রাপ্ত হইল এবং হংসদেহ ও হংসাভিমান পরিত্যাগ করতঃ রুদ্রানুচর রুদ্র হইয়া থাকিল১।৩। এই রুদ্র রুদ্রভবনে কিছু কাল মুখ্য রুদ্রের ন্যায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করিল এবং কিছু কাল পরে বুদ্ধি-যোগে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃত্যারূঢ় হওয়ায় মনে মনে বলিতে লাগিল। অহো! মায়ার কি অদ্ভুত প্রভাব! বিশ্ববিমোহিনী মায়া মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মানা হয়। মরুভূমিতে জল অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীভাত হয়৩।৭। আমার প্রাক্তন স্থিতি কেবলা চিৎ অর্থাৎ আমি প্রথমে চিন্মাত্র ছিলাম, পরে কোথা হইতে এক মিথ্যা মায়া আমাকে বিষয় ও আশ্রয় করিয়া চিত্ত করিয়া তুলিল; অর্থাৎ কল্পনা শক্তির আধার করিয়া তুলিল, তখন আমি একাংশে সর্ব্বজ্ঞ ও অপরাংশে আকাশাদি ভূতবৃন্দ কল্পনা করিয়া লইলাম। তৎ-পরে ক্রমে ব্যষ্টিসমষ্টি লিঙ্গ ও স্থূল দেহের দেহী জীব হইয়া পড়িলাম। জীব হইয়া আমি অসংখ্য জন্মপরম্পরা অনুভব করিতে থাকিলাম এবং তন্মধ্যগত কোন এক জন্মে আমি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিতৎপর ভিক্ষু অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম৮।৯। সন্ন্যাসী হইয়া যোগ-শাস্ত্রোপদিষ্ট আসন বন্ধনের দ্বারা স্থূল শরীর সংযত ও প্রাণ নিরোধ করতঃ লিঙ্গদেহ সংযত করিয়া দেবতাধ্যানাদিতৎপর হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলাম। ইহার দ্বারা সর্ব্ববিধ মনোভাব বা মনোবৃত্তি বিলীন হইয়া গেল, সমাধিই সম্যক্ অভ্যস্ত হইয়া পড়িল১০।১১। সমাধিসিদ্ধ হওয়ায় চিত্ত পূর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগে ক্ষমবান্ হইল। এই ভিক্ষু একদা সমাধি ভঙ্গের পর আসনে স্থিত থাকিয়াই এক মনে আপনার ক্রিয়া ক্রমের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। চিত্তের স্বভাব এই যে

ভবিষ্যৎ আশ্চর্য্যের দ্বারা পুর্ব্বজাত আশ্চর্য্যবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। যোগ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিলেও তীব্রভাবে অশান্তির চিন্তায় রত হওয়ায় ভিক্ষুর ভিক্ষুত্ব লোপ হইয়া গেল। অবশেষে জীবট-নামধেয় সাধারণ জীব হইলাম[১,২]। পিপীলিকা যেমন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ্রমণ করে, সেইরূপ আমিও জীবট হইয়া বাসনানুসারী দেহে দেহে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে ঐরূপে ব্রাহ্মণ, পরে সামন্ত রাজা, পরে রাজা, তৎপরে বাসনার প্রাবল্যে সুরসুন্দরী অপ্সরী হইলাম। অপ্সরাত্ব অনুভবের পর মৃগীত্ব প্রাপ্ত হইলাম। পরে সে মৃগীত্বও থাকিল না, বাসনামোহের প্রভাবে লতাদেহী হইলাম। অহো! বাসনামোহ জীবের পক্ষে কেবল দুঃখপ্রদই হয়, সুখপ্রদ হয় না[১৩,১৭]। লতা হইয়া বনমধ্যে কিছু কাল সংজ্ঞা শূন্যের ন্যায় অতিবাহিত করা হইল, তৎপরে ভ্রমর জন্ম সংঘটন হইল। এই ভ্রমর পদ্মনালের সহিত হস্তিপদদলনে দলিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। যে আমি প্রথমে নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্র ব্রহ্ম ছিলাম, সেই আমি এবম্প্রকার মহাসংসারবিভ্রম প্রাপ্তে পুনঃ পুনঃ এক ভ্রম হইতে অন্য ভ্রম, সে ভ্রম হইতে অন্য ভ্রম অনুভব করিয়াছি। প্রোক্ত শত সংসার ভোগের পর সেই আমি এক্ষণে রুদ্র হইয়াছি। এই যে সংসার শত ভোগ, এ সমস্তই মনের বিভ্রম, অন্য কিছু নহে[১৮,২১]। যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যভূত এই সংসাররূপ অরণ্য অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীতিগোচর করিয়া বার বার ইহাতে ভ্রমণ করিয়াছি[২২]। এক সৃষ্টিতে জীবট নামধারী ব্রাহ্মণ, অন্য সৃষ্টিতে রাজা, অপর সৃষ্টিতে হংস, অপর সৃষ্টিতে হরিণ হইয়াছি। চিন্মাত্রাত্মক পরম পদ হইতে চ্যুত হওয়ার পর এ যাবৎ অসংখ্য সহস্র বৎসর, অনন্ত চতুর্যুগশত, অপরিমেয় দিন মাস ঋতু ঐরূপে অতীত হইয়া গিয়াছে[২৩,২৫]। প্রথমে তত্ত্বজ্ঞানযোগ্য ভিক্ষু হইয়াছিলাম, তাহারই ফলে বহুজন্ম ব্যবধানের পর ব্রহ্মার হংস হইয়াছিলাম[২৬,২৭]। জীবের যে অভ্যাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়, সহস্র জন্ম ব্যবধান হউক না কেন, সে অভ্যাসের ফল হইবেই হইবে[২৮]। কখন কখন এমন হয় যে, সাধুসঙ্গাদির প্রাবল্যে জীবের কদাচিৎ কাকতালীয় ন্যায়ে অশুভ বাসনার ধ্বংস হইয়া থাকে[২৯]। অতএব, যে পুরুষ দুর্ব্বাসনা নাশের ইচ্ছা করিবে, সে পুরুষের জন্মজন্মান্তরব্যাপী সদ্বাসনাভ্যাস দৃঢ় হওয়া আবশ্যক[৩০]। এতদ্দেহে যাহা অজস্র অভ্যস্ত হয়। অথবা দেহা-

ন্তরে যাহা অজস্র অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় অনুভূত হইবেই হইবে। অতএব, যখন অভ্যাসের প্রভাবে মিথ্যাভূত পদার্থও সত্যবৎ হয়, তখন যে সত্য বস্তুর অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদি শাস্ত্রীয় প্রযত্ন দ্বারা সত্য বস্তুর প্রাপ্তি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। অতএব, ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, অনাত্মবিষয়ক যাদৃচ্ছিক ভাবনার অভ্যাস দুঃখোদয়ের হেতু, তথা অনাত্মবিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রযত্নের অভ্যাস (পূজাধ্যানাদি) দুঃখ মিশ্রিত সুখের হেতু। যদি কোন প্রকার ভাবনা না থাকে, সর্ব্বপ্রকার ভাবনার উচ্ছেদ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অনর্থের জয় সুসম্পন্ন হয়[৩১।৩২]। ভাবনার উচ্ছেদ নিতান্ত দুষ্কর নহে, কেননা তত্ত্বদর্শন মাত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। পূর্ব্ব সংস্কারের নাম ভাবনা, তাহারই প্রভাবে আত্মা "এই আমি, এই আমার দেহ" এ সকল দর্শন করে বা অনুভব করে। অতএব, দেহাদি-বিভ্রম কেবল মিথ্যারই বিভূতি, অন্য কিছু নহে[৩৩]। ভাবনা কি? এই প্রশ্নের পর যদি উহার তত্ত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তখন দেখা যায় যে, এ সকলের কিছুই নাই। ভাবনাও অসৎ, সুতরাং কার্য্যও অসৎ। ভাবনার নিরোধ কেবল মাত্র অসম্বেদন দ্বারা অর্থাৎ উহার অস্তিতা-জ্ঞানের অভাব দ্বারা সম্পন্ন হয়। অতএব, এই যে জগৎ-ভ্রম জন্মিয়াছে ইহা আকাশ-বর্ণের ন্যায় মিথ্যা—ভ্রান্তি মাত্র। ইহার বর্জ্জনও অসম্বেদন বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যদিও তাদৃশী অসন্ময়ী মায়া তত্ত্ব-জ্ঞানীর কৌতুকদাত্রী হইয়া থাকে, থাকুক, উহাতে তত্ত্বজ্ঞের কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই[৩৪।৩৬]।

রুদ্র এইরূপ ভাবিয়া ও স্থির করিয়া কৌতুক বশতঃ অবশেষে ভাবিলেন, আমার সেই সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংসার দেখিব ও সে সকলকে প্রবুদ্ধ করিয়া একাত্মায় পর্য্যবসিত করিব[৩৭]।

রুদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সৃষ্টিতে গমন করিলেন, যে সৃষ্টিতে ভিক্ষুত্ব অনুভূত হইয়াছিল। রুদ্র সেই ভিক্ষু সকাশে গিয়া দেখিলেন, ভিক্ষু স্বকীয় মঠে শবীভূত হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন[৩৮]। পরে তাহাকে জাগ্রৎ করিয়া তাহার চিত্ত ও চেতনাংশকে তত্ত্বজ্ঞ রুদ্রচেতনের সহিত ঐক্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ভিক্ষু এখন আপনার ভ্রান্তি স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন[৩৯]। রুদ্র আপনাকেই সেই সেই জীবটাদিময় দেখিতে

ছিলেন, সেজন্ত তাঁহার বিস্ময় না থাকিলেও ভিক্ষুর বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর, রুদ্র ও ভিক্ষু উভয়ে সেই জীবট সংসারে গমন করিলেন। জীবটের বাসস্থান দ্বীপ, জনপদ, গ্রাম, পুরী, এ সমস্তই চিদাকাশের কোন এক উপাধি-কল্পিত অংশে কল্পিত হইয়াছিল, সুতরাং তদভিজ্ঞ রুদ্র ও ভিক্ষু উভয়ে সহসা জীবটের সেই সেই দ্বীপাদিতে গমন করিলেন অর্থাৎ স্বমনোমধ্যে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, জীবট জ্ঞানশূন্য ও অচেতনকল্প হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জাগরুক তত্ত্বজ্ঞচেতনে সংযোজিত করিলেন এবং একরূপ বা একাত্ম হইয়া সংসারান্তর দর্শনে উৎসুক হইলেন। ইহারা অবিস্মিত-স্বভাব ও প্রবুদ্ধ হইলেও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মিতের ন্যায় ও অপ্রবুদ্ধের ন্যায় স্তব্ধীভূত হইয়াছিলেন[৪০,৪১]। অনন্তর চিদাকাশেরই একাংশে যে বিপ্রসংসার স্থিত ছিল, সেই বিপ্রসংসারে গমন করিলেন। বিপ্রসংসারের কল্পনাস্থান চিদাকাশে এবং পৃথগ্‌ভূত ভুবন, দ্বীপ, জনপদ, গ্রাম ও তাহার বাসগৃহ, এ সমস্তই যেন পৃথগ্‌ভূত দেখিলেন। বিপ্র স্বগৃহে ব্রাহ্মণীর সহিত নিদ্রায় অচেতন[৪৩।৪৮]। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইহাকেও প্রবুদ্ধ ও একাত্ময় তত্ত্বজ্ঞচেতনে মিলাইয়া লইলেন[৪৯]। অনন্তর ঐকাত্ম্য প্রাপ্ত জীবটাদি ব্রাহ্মণান্ত জীব সেই পূর্ব্বোক্ত সামন্ত রাজার সংসারে গমন করিলেন। সে ভুবন, সে দ্বীপ, সে রাজ্য, সে পুরী ও সেই সামন্ত রাজাকে গিয়া দেখিলেন, সামন্ত তাহার সুন্দরী রমণীর ক্রোড়ে সুষুপ্ত। অতঃপর ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবুদ্ধ ও রুদ্র করিয়া লওয়া হইল। এ স্থলেও তাঁহারা এক ভাবে বিস্মিত ও অন্য ভাবে অবিস্মিত হইয়াছিলেন[৫০,৫১]। অতঃপর ইহারা সেই পূর্ব্বোক্ত রাজসংসার দেখিতে উৎসুক হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সে রাজাকেও প্রবুদ্ধ ও রুদ্রভূত করিয়া লইলেন। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, এই সকল ও অন্যান্য সংসার সকল তাঁহারা চিত্তের দ্বারা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সমস্তই যে চিত্তেরই পরিণতি বিশেষ, ইহা বিদিত হইয়াছিলেন[৫২]। অবশেষে ব্রহ্মহংসরূপা চিত্তপরিণতি ও সর্ব্বশেষে রুদ্ররূপা চিত্তপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বিরাজমান রহিলেন। প্রোক্ত কারণে এই সকল রুদ্রের সংখ্যা এক শত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ উক্ত প্রকারের এক শত জীব উক্ত প্রকারে রুদ্রভাব প্রাপ্ত হওয়ায় এক শত

বলিয়া গণ্য[৫৬]। সেই সকল প্রাতিভাসিক অর্থাৎ কল্পিত দেহ সমুদায় রুদ্র ও সে সকলের সংখ্যা এক শত বলিয়া উদাহৃত। মুক্তচেতন রুদ্র একই অর্থাৎ সংবিৎ অংশে একরূপা বা অভিন্না, পরন্তু শরীর বিভিন্ন। পরমেশ্বরের স্বরূপও এই প্রকার অর্থাৎ তত্ত্বতঃ এক, পরন্তু কল্পনায় বহু। ফলিতার্থে ইহাই বুঝিবে, এই সমুদায় দৃশ্যই পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ[৫৭]। শ্রুতিতে এই রুদ্রশতকের কথা আছে, তাহারা সকলেই চিন্ময়; অব্যাহতজ্ঞানী=(যাহাদের জ্ঞান কোন বিষয়েই বাধা প্রাপ্ত হয় না) ও সংসার স্থিতির নেতা। হে রামচন্দ্র! ভিক্ষু-রুদ্রের কল্পিত জগৎ-শতকের মধ্যে বর্ত্তমান, এই জগৎ অর্থাৎ যাহা এক্ষণে তোমার ও আমার অনুভবে স্থিত রহিয়াছে, এ জগৎ একাদশ অর্থাৎ ইহা ভ্রামর-রুদ্রের সংসার। ভ্রামর অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যে সংসার অনুভবীকৃত হইয়াছে, এ সংসার সেই সংসার[৫৮।৫৯]। * যে জীবের আভিমুখ্যে যে সংসারের উদয় হয়, সে জীব সেই সেই সংসারই অনুভব করে, পরন্তু তন্মধ্যগত অজ্ঞ জীবেরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না[৬০]। যাহাদের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ হইয়াছে, তাহারা সকলেই ঐক্য বা মেলন প্রাপ্ত হয়। যেমন তরঙ্গে তরঙ্গের মেলন জন্মে, সেইরূপ তাহাদেরও ঐক্য বা মেলন জন্মে, পরন্তু তন্মধ্যগত অপ্রবুদ্ধ জীবেরা তাহাদের হইতে পৃথক্ থাকে[৬১]। জল লহরী যেমন দ্রবত্ব-কারণে পরস্পর মিলিত হয় সেইরূপ প্রবুদ্ধ জীবেরাও পরস্পর একীভূত হয়, তাহার অন্যথা হয় না[৬২]। কারণ এই যে, ব্রহ্মই জীব জগতের তত্ত্ব, ব্রহ্মেরই কল্পিত রূপ জীব, সে কল্পিত রূপ অন্তর্হিত হইলে সুতরাং জীবব্রহ্মৈক্যরূপের মেলন সুসম্পন্ন হয়। চিৎব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত কল্পনার আশ্রয় ও বিষয়, সেজন্য কল্পনাভাগ অসত্য হইলেও চিৎসংসর্গে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ভূমির যে স্থান খনন করা যায়, সেই স্থানেই আকাশ পাওয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বগামী চিতেরও

---

* পূর্ব্বে (৬২ সর্গে) মহাভিক্ষুর কথা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সেই মহাভিক্ষু একদা প্রবৃত্তধ্যান ত্যাগ পূর্ব্বক কল্পনারাজ্যে উপস্থিত হইলেন; তখন কল্পনাবলে স্বপ্নাবেশের ন্যায় দেখিলেন; তিনি যেন রুদ্রলোকে গমন করিয়াছেন এবং নিজেও রুদ্ররূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবংক্রমে হরিণ, হংস, বৃক্ষ, লতা ও ভ্রমর প্রভৃতি বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া সংসার ভোগ করিতেছেন। ইহাকেই শতরুদ্রী কহে।

সর্ব্বত্র চিৎসত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়[৩৩,৩৪]। তুমি যে জগৎপ্রপঞ্চ অনুভব করিতেছ, ইহারই অন্তরালে চিৎব্রহ্মের অবস্থিতি। যেমন সর্ব্বভূত অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বভূত আত্মা চিৎ-তত্ত্বের অনুভব হয়। যেমন কোন এক বৃক্ষে অথবা প্রস্তরে বিবিধ শালভঞ্জিকা (ছবি) দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, চিদাত্মাতেই এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে[৩৫,৩৬]। ব্রহ্মচিৎ দৃশ্য বা জ্ঞেয় না হইলেও যে, প্রকারান্তরে দৃশ্য বা জ্ঞেয় করা হয়, সেই অন্যথাভাবই এই জগৎ স্থিতির কারণ[৩৭]। হে রঘুনাথ! বিশ্ব আছে ও তাহা সত্য, এতদাকারের জ্ঞানই বন্ধন, বিশ্ব নাই ও তাহা মিথ্যা, এতদাকারের জ্ঞানই মোক্ষ। উভয়ের মধ্যে যাহাতে তোমার রুচি, তাহাকেই তুমি দৃঢ় বা অবিচাল্য কর[৩৮]। ঐরূপ জানা ও না জানার নাম সৃষ্টি ও প্রলয়, তথা বন্ধ ও মোক্ষ, যাহা তদুভয়ের সাক্ষী, তাহা অভিন্ন অর্থাৎ এক ও একরস[৩৯]। অসম্বেদন মাত্রে যাহা থাকে না, তাহার নাশে আবার দুঃখ কি? যাহা কেবল মাত্র তুষ্ণীম্ভাবের প্রাপ্য, তাহার প্রাপ্তিতে বিলম্ব কি[৭০]। যে এই জগৎকে আত্মা বলিয়া জানিতেছে, তাহার সেই জগৎজ্ঞান অবেদন অর্থাৎ না জানা বলিয়া গণ্য[৭১]। জলে যেমন ক্ষুদ্র লহরীর দর্শন, সেইরূপ চিৎ-তত্ত্বে এই জগতের দর্শন। হে রঘুনন্দন! দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের ভেদ এই যে, ক্ষুদ্র লহরীতে ও জলে দেশ, কাল, ক্রিয়া প্রভৃতির একতা আছে, চিৎ-তত্ত্বে সে সকল নাই। অর্থাৎ জগৎ নাই ভাবিলেই জগৎ থাকে না, রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়। যাহা স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য, যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছা অবিদ্যার আবরণে তাহার সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপের অন্যথাত্ব ঘটনা হয়, সেই অন্যথা ভাবই এই ত্রিজগৎ। স্বাধীন স্বপ্রকাশ এক অখণ্ড চৈতন্যই চিতের পারমার্থিক রূপ, জগতের স্বরূপ তাহার বিপরীত অর্থাৎ এই জগৎ নানা ভেদে ক্লিষ্ট। সেইজন্য জগৎ কথায় আছে বটে, কিন্তু পারমার্থিক রূপে নাই। সুতরাং বাক্যের বিরামে জগতের বিরাম, ইহা সিদ্ধ হয়। বাক্যের অতীত স্থানই পরমাত্মা বা শিব। শব্দ ও অর্থ বস্তুতঃ ভেদ শূন্য। ক্ষুদ্র লহরী একটা শব্দ এবং জল আর একটা শব্দ। এই দুই বিভিন্ন শব্দের অর্থ বস্তুতঃ ভেদশূন্য। অর্থাৎ জলই লহরী রূপে দৃষ্ট হয়, সুতরাং লহরী জল হইতে পৃথগ্‌বস্তু নহে[৭২,৭৩]।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

—()○()—

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনীশ্বর! ভিক্ষুর সেই সকল স্বাপ্ন শরীর অর্থাৎ জীবট ও হংস প্রভৃতির শরীর অবশেষে কি হইয়াছিল? স্বাপ্ন শরীর থাকে না—মিথ্যা হইয়া যায়, ইহা সর্ব্ববিদিত। ভিক্ষুর সেই সেই স্বাপ্ন শরীর কি সাধারণ স্বাপ্ন শরীরের ন্যায় মিথ্যাভূত হইয়াছিল? কি ব্যবহার যোগ্য ছিল[১]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাহারা সকলেই প্রবোধ প্রাপ্তে রুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল। পরে কৌতুক বশতঃ সেই সকল রুদ্রাংশ রুদ্র-কর্তৃক প্রেষিত হইয়া আপন আপন মায়াময় পূর্ব্বাপর সংসার সন্দর্শন-পূর্ব্বক কৃতকৃত্য ও সুখী হইয়াছিল[২।৩]। রুদ্র সেই সকল স্বাংশভূত রুদ্রদিগকে বলিলেন, তোমরা এখন আপন আপন স্থানে যাও, প্রারব্ধ ভোগ সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার মৎসকাশে আসিবে। আমার এই পুরের ভূষণ হইয়া থাকিবে, পরে আমরা সকলেই মহাপ্রলয়ে স্বাধিকার বিনি-বৃত্তির পর পরম পদে স্থিত হইব[৪।৫]।

বশিষ্ট বলিলেন, ভগবান্ রুদ্র এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলে সেই জীবট ব্রাহ্মণাদি স্ব স্ব স্থানে আগমন করিলেন। ইহারা জীবন্মুক্ত অবস্থায় কিছু কাল কর্ত্তন করিয়া যথা সময়ে রুদ্রলোকগত হইবেন[৬।৮]।

রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! জীবটব্রাহ্মণাদি সেই ভিক্ষুর সঙ্কল্পকল্পিত। যাহাদের রচনা বা সৃষ্টি কেবল সঙ্কল্প মাত্র, তাহাদের আবার সত্যতা কি? স্বপ্নের ন্যায় সঙ্কল্পেরও অসত্যতা দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি সত্যতা দৃষ্ট হয় না[৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সঙ্কল্পেরও আংশিক সত্যতা আছে, অর্থাৎ কল্পনাংশে সত্যতা না থাকিলেও তাহার আশ্রয়ের সত্যতা আছে। সঙ্কল্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় চিদাত্মা, ইহা তুমি বিবেক দ্বারা বিদিত হও। উক্ত অধিষ্ঠান চৈতন্যই তৎপদবাচ্য, তাহা সর্ব্বময়, সুতরাং তাহারই সামর্থ্যে সাঙ্কল্পিক পদার্থ ব্যবহার যোগ্য হয়[১০]। সেই সর্ব্বাত্মক

চিদাত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সর্ব্বত্র সঙ্কল্পের দ্বারা সেই সেই আকারে বিরাজ করেন, সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট ও সঙ্কল্পদৃষ্ট পদার্থ "আছে" (অস্তি) বলিয়া ব্যবহার-গম্য হয়। আত্মাও সর্ব্বদেশব্যাপী, মনও সর্ব্বগামী, এরূপ হইলেও যেমন উপদেশকাদি কারণ কলাপ ব্যতীত একদেশবাসীরা অন্য দেশ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, স্বপ্নও জাগ্রৎ-সুষুপ্তির অন্তরাল ব্যতীত অন্যাবস্থায় লব্ধ হয় না। * ফল কথা, চিৎকোষে সকল পদার্থ থাকিলেও দর্শনের উদ্বোধ ব্যতীত দৃষ্ট হয় না, যখন তাহার উদ্বোধ হয়, তখন তাহাই দৃষ্ট হয়[১১]।

হে রঘুনাথ! চিত্তের কোষ কি? না মায়া। তাহাতে সকল বাসনাই আছে, সেই জন্যই যখন যে বাসনার উদয়, তখন চিৎ সেই বাসনার পুষ্টিতে সেই পদার্থ দর্শন করে, পরন্তু তাহাও অভ্যাসযোগ সাপেক্ষ বা অভ্যাসযোগের ফল। যাঁহারা ঈশ্বর, যাঁহাদের যোগ-বিজ্ঞানের ফল স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহাদের সঙ্কল্পিতার্থ লাভ তাৎকালিক অভ্যাসযোগ সাপেক্ষ নহে[১২,১৩]। মায়াপটে যে সব আছে, তাহা শঙ্কর প্রভৃতি ঈশ্বরেরাই দেখিতে পান, অন্যে নহে। কারণ এই যে, একাগ্রতার নাম যোগ, তাহার বলবৎ অভ্যাস অর্থাৎ সিদ্ধি ব্যতীত সত্যসঙ্কল্প হওয়া যায় না। আমাদের সম্মুখে শত শত বস্তু রহিয়াছে, অথচ আমরা সে সকল দেখিতে পাই না। মন যেটীতে ব্যাসক্ত হয়, সেইটীই আমরা দেখি, অন্যটী দেখি না। সঙ্কল্প সিদ্ধি পক্ষে এই দৃষ্টান্ত বিশেষ অনুকূল। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, চিত্তকে একাগ্র বা তন্নিষ্ঠ করিতে পারিলে সমুদায় অভিমত সিদ্ধ করা যায়[১৬,১৭]। দক্ষিণ দিকে যাইবার ইচ্ছায় বহির্গত হইলে দক্ষিণ দিকেই যাওয়া যায়, উত্তর দিকে যাওয়া যায় না। সঙ্কল্পিত পদার্থের অভ্যাসের দ্বারা সঙ্কল্পিত পদার্থই লব্ধ হয়, অসঙ্কল্পিত পদার্থ লব্ধ হয় না। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিবে যে, যাহারা আমি অমুক হইব বা অমুক পাইব, বা অমুক সিদ্ধ করিব,

---

* কোন ব্যক্তিকে স্বস্থান হইতে অপরিচিত স্থানান্তরে যাইতে হইলে যেরূপ, একজন পথোপদেষ্টা, মনের স্থিরতা ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা বা কার্য্যক্ষমতা অপেক্ষা করে, জীবের স্বপ্নাবস্থা লাভ করিতে হইলেও ঠিক্ সেইরূপ জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থা না থাকিলে কস্মিন্ কালেও জীবের স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে না।

এইরূপে তদেকাগ্রতা আশ্রয় করে, ভবিষ্যতে তাহারা তাহাই হয়, তাহাই পায়, তাহাই সিদ্ধ করে। যাহারা সেরূপ একাগ্র হইতে পারে না, তাহারা কিছুই লাভ করে না। ভিক্ষুজীব ঐরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হইয়াই রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা অহং সর্ব্বাত্মা, এইরূপে একাগ্র হয়, তাহারা সর্ব্বাত্মাই হয়, তাহার অন্যথা হয় না। ভিক্ষুসঙ্কল্পপ্রভব জীবেরা প্রত্যেকে যে যে সঙ্কল্পে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে সেই সেই জগতে স্থিত হইয়াছে। যাহারা প্রত্যেকে রুদ্রভাবনায় সিদ্ধ হয় নাই, সেইজন্য তাহারা প্রত্যেকে সেই সেই জগতে স্থিতি কালে রুদ্রতা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথমে যে সকল অপ্রবুদ্ধ জীব জন্মে, তাহারা প্রবুদ্ধ জীবের ইচ্ছার দ্বারা বা সঙ্কল্পের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়। একরূপ, বহুরূপ, দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পণ্ডিত, এ সমস্তই ধ্যানের ফল। ধ্যান-ধারণাদিরূপ প্রযত্নের দ্বারা এক, বহু, পণ্ডিত, মূর্খ, দেব ও মনুষ্য উৎপন্ন হয়[১৮।২০]। জীবের যে সর্ব্বগমন শক্তি আছে, তাহার সার্থক্যাদি প্রযত্নসাপেক্ষ। জীব উৎকট প্রবাহবতী ইচ্ছার প্রভাবে না হইতে পারে, এমন কিছুই নাই, অর্থাৎ সব হইতে পারে[২১।২৭]। যোগী ও যোগিনীগণ অভিহিত দেশ কাল ক্রিয়া ও সে সকলের ক্রম দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যে—সে স্থানে স্থিতি করিয়া থাকেন। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে, সিদ্ধি লাভান্তে তদ্দেহে ও অন্য দেহে ভোগানুভব করিবার বাধা হয় না। রাজর্ষি কার্ত্তবীর্য্য গৃহে থাকিয়াই সর্ব্বশাস্তা, ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে থাকেন, আবার পৃথিবীতেও পুরুষ রূপে দৃষ্ট হন। দেবী ও দেব স্বর্গলোকে যোগিনীগণ মধ্যে থাকেন, অথচ বলি গ্রহণার্থ পৃথিবীতেও গমন করেন[২৮।৩০]। ইন্দ্রও স্বর্গীয় আসনে স্থিত থাকেন, পরন্তু তৎসমকালে পৃথিবীতেও পূজা গ্রহণার্থ অবতীর্ণ হন। জনার্দ্দন এক, অথচ সহস্র হন। অর্থাৎ একই সময়ে শত শত ভক্ত মনুষ্যের নিকট আবির্ভূত হন, সুতরাং শত বা সহস্র হন। একই জনার্দ্দন শত শত অংশাবতার লীলার দ্বারা জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন এবং একই ভগবান্ একই সময়ে সহস্র কান্তার কান্ত রূপে আবির্ভূত হন[৩১।৩৩]। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তুমি বিদিত হইবে যে, জীবট ব্রাহ্মণাদি জীব সেই একই ভিক্ষু-সঙ্কল্পের প্রভাব বা মহিমা। সেই সকল জীব রুদ্রবিজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া আপন আপন সঙ্কল্পজগতে স্থিত ছিলেন, ভোগান্তে রুদ্র-

পুরে গমন করতঃ রুদ্রানুচর হইয়া বিবিধ ভোগ অনুভব করতঃ অবশেষে রুদ্রের সহিত পরম পদে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন৩১।৩৩।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভিক্ষুর চিত্তে বর্ণিত প্রকারের ভ্রম উদ্রিক্ত হইয়াছিল, সেই ভ্রমকেই সে প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ পরিপুষ্ট ও পর পর পৃথক্ ভাবে দর্শন বা অনুভব করিয়া ছিলেন১। প্রত্যেক জীব উপাধি পরিচ্ছিন্ন চিদাভাস, ইহাদের সকলেরই স্থিতি মৃতি জন্মময়ী অর্থাৎ মরণকালে ইহাদের যেরূপ জগৎ স্বপ্নের ন্যায় দৃষ্ট হয়, জন্মগ্রহণ করিয়া সেইরূপ জগৎই ইহারা মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ অনুভব করে২। আত্মা অপরিচ্ছিন্নস্বভাব হইলেও দেহ-পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হইয়া ঐ সকল অনুভব করে। যাবৎ না মোক্ষ হয়, তাবৎ জীবমাত্রেই ঐরূপ মরণ ও স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় সংসার দর্শন করে। ভিক্ষুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জীব কি ও তাহাদের গতি কি? তাহা তোমার বোধগম্য হউক। জীব মাত্রেরই ঐরূপ দশা ভোগ করিতে হয়। মোক্ষ হইলে জীবত্ব গিয়া ব্রহ্মত্ব হয়, তখন ঐ দশার অতিক্রম করে৩।৫। হে রামচন্দ্র! কেবল ভিক্ষুই যে পরম পদ হইতে স্খলিত হইয়া মোহ হইতে মোহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। জীব মাত্রেই পরমপদ-স্খলিত ও মোহ হইতে মোহান্তর প্রাপ্ত৬। যেমন পাষাণ খণ্ড পর্ব্বতাগ্র পরিভ্রষ্ট ও নীচ হইতে নীচতরে নিপতিত হয়, সেইরূপ, পরমাত্মপরিভ্রষ্ট জীবও স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর অনুভবের ন্যায় মিথ্যাভূত সংসার অনুভব করে। প্রভেদ এই যে, ইহা স্বপ্ন অপেক্ষা দৃঢ়৮।৯। মায়াজর্জ্জরিত জীব মায়ার দ্বারা স্বান্তরে অর্থাৎ মনোমধ্যে বর্ণিতবিধ অন্তর্ব্বাহ্য দ্বিবিধ জগৎ দেখিতে থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই জন্মাদি দুঃখ, নিতান্ত নির্দি-

মিত্তক নহে। নিষ্কর্ষ এই যে, অহং দেহী ইত্যাকার অভিমানই বন্ধন, এবং আত্ম লাভই মোক্ষ।

রামচন্দ্র বলিলেন, অহো! মায়া কি বিষম! অহো! জীবের কি বিষম মোহ[৯]! অত্যল্প মত্ত বা ভ্রান্ত পুরুষেরা সুপ্ত হইয়া স্বাপ্ন মায়ার দ্বারা নানা বিষম বিকার ও সঙ্কট অনুভব করে ও সে সকলকে সত্য মনে করে, ইহা যেরূপ আশ্চর্য্য, জীবের সংসার তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য। হে ভগবন্! আপনি যে বলিয়াছেন, সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিষয় সদা সম্ভব, তাহাও আমি দেখিতেছি ও বুঝিতেছি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য,—তাদৃশ গুণাদিযুক্ত ভিক্ষুনামা জীব আছে, তাই আমার নিকট তাহার কথা বর্ণন করিলেন? অথবা আমার বোধ উৎপাদনার্থ নিজে ঐরূপ একটা জীব কল্পনা করিয়া তাহার চরিত্রাদি আমার নিকট বর্ণন করিলেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন, আজ্ রাত্রে আমি সমাধিস্থ হইয়া এই লোকত্রয় অনুসন্ধান করিব। কল্য প্রাতে ঐরূপ কোন ভিক্ষু আছে কি না, তাহা বলিব।

বাল্মীকী বলিলেন, মুনিবর বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলে, সভার বাহিরে মধ্যাহ্নসূচক বাদ্য বিশেষ শ্রুতিগোচর হইল। তৎশ্রবণে সভাস্থ জনবৃন্দ মুনিবরের পদ প্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও প্রণামাদি কার্য্য করিয়া মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ সভা ত্যাগের উদ্যোগ করিল[১০,১৬]। সভা ভঙ্গ হইলে পরস্পর যথাযোগ্য প্রণামাদি করণানন্তর স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। দৈবনিক কার্য্য নির্ব্বাহের পর মুনিবরের উপদিষ্ট কথা সকল চিন্তা করতঃ রাত্রি যাপন অন্তে পুনঃ প্রাতঃকাল আগতে পুনঃ সভামণ্ডপে সমাগত হইল[১৭,২০]।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

—০()•()০—

বাল্মীকি বলিলেন, বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিবৃন্দের সহিত ও সিদ্ধগণ পরিবৃত রাজগণ পুনর্ব্বার সভায় সমাবেত হইলেন এবং তন্মধ্যে রাম লক্ষণও শোভা পাইতে লাগিলেন। সভা পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণভাব ধারণ করিল[1,2]। বশিষ্ঠ মুনি কাহারও কোন প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়া, পূর্ব্বদিবসের প্রশ্নানুসারী প্রত্যুত্তর বাক্য উচ্চারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন[3]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলাকাশের পূর্ণচন্দ্র রাম! আমি গত রাত্রে জ্ঞান নেত্রের দ্বারা সেই ভিক্ষুকে দেখিয়াছি[4]। আমি সেই ভিক্ষুকে দেখিবার জন্য ধ্যানযোগে এই সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা ও সকাননা পৃথিবী পরিভ্রমন করিয়াছি। প্রথমে আমি কুত্রাপি তাদৃশ ভিক্ষু দেখিলাম না, পরে রাত্রিশেষে পুনর্ধ্যানযোগে অন্বেষণ আরম্ভ করিলে দেখিলাম, উত্তর দিকের এক প্রান্তে বল্মীকনামক জনপদের পর জিন নামে এক দেশ আছে, সেই দেশে এক বিহার, তন্মধ্যে এক কুটীর, সেই কুটীর মধ্যে দীর্ঘদৃক্ নামে এক ভিক্ষু সমাধির নিমিত্ত স্থিত রহিয়াছে[5,9]। ভিক্ষু একবিংশতি রাত্র ধ্যানস্থ থাকিবেন, পাছে কেহ তাঁহার ধ্যান বিঘ্ন করে, সেই ভয়ে তিনি কুটীর দ্বার সুদৃঢ় অর্গল দ্বারা বদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে স্থিত থাকিলেন। আজ্ তাঁহার পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারের অর্থাৎ বিদেহ কৈবল্য লাভের দিন। তিনি ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অবশেষে বর্ণিত প্রকারে তিনি একবিংশতি রাত্র সমাধিস্থ ছিলেন। পূর্ব্বকল্পে এরূপ আর একটী ভিক্ষু ছিলেন, এতৎকল্পে এইটী দ্বিতীয়। এরূপ তৃতীয় ভিক্ষু আছে কি না, তাহা আমার তৎকালে জ্ঞানগোচর হয় নাই[10,13]। অলি যেমন পদ্মে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ আমি পুনর্ব্বার জগৎপদ্মে ধ্যানযোগে পরিভ্রমণ ও অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম, অন্য সৃষ্টিতে এরূপ আর একটী ভিক্ষু আছে। তৎপরে পুনর্ব্বার সৃষ্ট্যন্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সে সৃষ্টিতেও

এতদ্রূপ অপর এক ভিক্ষু আছে[১০।১৩]। ব্রহ্ম নির্ম্মিত সৃষ্টি বা ভুবন-কোষ অনন্ত, এবং সমুদায় সৃষ্টি চিদাকাশের এক কোণে স্থিত। হে রঘুনাথ! এই সভায় যে সকল মুনি, ঋষি ও ব্রাহ্মণ আছেন, ইহারাও পুনঃ পুনঃ এতদ্রূপ সমাচার বিশিষ্ট হন ও হইবেন। ইহাদেরই অনুরূপ আরও অনেক মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণ আছেন[১৭।১৮]। এই নারদ পুনঃ অন্য নারদ হইবেন, ব্যাস ও শুকও পুনঃ অন্য ব্যাস ও শুক হইবেন, ইহাদের জন্ম কর্ম্মাদিও ইহাদের জন্ম কর্ম্মাদির তুল্য। এইরূপ শৌনকও আবার শৌনক, ক্রতু ও পুলস্থ পুনঃ ক্রতু ও পুলস্থ, অগস্ত্যও পুনঃ অন্য অগস্ত্য, ভৃগুও পুনঃ অন্য ভৃগু, অঙ্গিরাও পুনঃ অন্য অঙ্গিরা হইয়াছিলেন ও হইবেন। মায়ার বিস্তৃতি এইরূপ। দীর্ঘকাল সমান আচারের ও সমান্ জন্মের জীব জন্ম গ্রহণ করে। জলে যেমন অবিশ্রান্ত ও অসংখ্য ক্ষুদ্র লহরী জন্মে, সেইরূপ, ব্রহ্মাকাশেও অবিশ্রান্ত ও অসংখ্য সৃষ্টি উদ্ভূত হইতেছে। কোন কোন সৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সমান, কোন কোন সৃষ্টি অর্দ্ধসমান, কোন কোন সৃষ্টি কোন কোন অংশে সমান, আবার কোন সৃষ্টি সম্পূর্ণ অভিনব। মায়ার এই বিস্তৃতি মহানুদিগেরও মোহজনক[১৯।২০]। ক্ষণনিরবয়ব কালাত্মক, তাহাতে দেহাদি চেষ্টার কথা দূরে থাকুক, মানসী চেষ্টাও সম্ভবে না, সুতরাং ঐ সকল ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ভাবিয়া দেখ, কোথায় এক-বিংশতি রাত্র, আর কোথায় জীবটাদি ঘটিত অনন্ত সৃষ্টি। ভিক্ষুর চরিত্রে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এ সমস্তই প্রতিভার (ভ্রান্তির) বিকাস[২৩]। যেমন প্রভাত হইবামাত্র পদ্মের বিকাশ জন্মে, বহু ভ্রমরের কলহ উপস্থিত হয়, সেইরূপ, শুদ্ধ ব্রহ্মে সংবেদনের দোষে এই অশুদ্ধ সংসার প্রতিভাত হয়[২৭]। ভিক্ষুর মনের ন্যায় সমুদায় জীবের মনে জগৎ-প্রতিভাস, তদন্তর্গত জীবের বিচিত্র চরিত্রাদি, উদিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। যে যাহা দেখিতেছে, সে সে—সমুদায়কে সত্যই ভাবিতেছে, মিথ্যা বলিয়া জানিতেছে না। চিদাত্মা সর্ব্বাত্মক, সমস্তই তদৈক্যে প্রস্ফুরিত হয়, সেই জন্যই জীব সত্য বলিয়া জানে। অর্থাৎ চিদাত্মার সত্যতাই অধ্যস্তভূত সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়, অবিবেক বশতঃ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। জীবের যখন বিবেক ও যাথা-তত্ত্ববোধ জন্মে, তখন এ সমুদায়ের মিথ্যাত্ব সুস্থির হয়, তৎপূর্ব্বে হয়

না। যাবৎ রজ্জু ও সর্প উভয়ের অবিবেক থাকে, তাবৎ সর্পের অস-ত্যতা উপলব্ধ হয় না[২৮]।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

—*—

দশরথ বলিলেন, হে মুনিবর! সেই ভিক্ষু যে স্থানে ও যে কুটী-মধ্যে সমাহিত আছে, আমার এই সকল সেই স্থানে যাউক, তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া মৎসকাশে আনয়ন করুক। আমি তাহাকে দেখিব[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! ভিক্ষুর সেই বিদ্যমান দেহ এক্ষণে প্রাণবর্জ্জিত। তিনি এক্ষণে গতপ্রাণ অর্থাৎ জীবিত নহেন। ভিক্ষুর সেই জীব এক্ষণে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবাহন হংস ও জীবন্মুক্ত[২,৩]। ভিক্ষু কুটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমাহিত হইয়া একবিংশতি দিবসের পর দেহ বর্জ্জন করিল, তদীয় ভৃত্যেরা বলপূর্ব্বক দ্বার ভঙ্গ করিয়া ভিক্ষুশরীর নিকাশিত করিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদীয় পোষ্যগণ সক-লেই সমবেত হইয়াছিল[৪]। তাহারা ভিক্ষুশরীর গতপ্রাণ দেখিয়া জল-মগ্ন করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা ভক্তি পূজাদি ব্যবহার প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত সেই কুটীরে তদীয় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ভিক্ষু সেই প্রকারে অদেহ ও মুক্তাবস্থ হইয়াছে। যে শরীর জীবিত নহে—সে শরীরে কি প্রবোধ জন্মে? তাহা জন্মে না[৫,৬]। (রাম প্রশ্নের এইরূপ প্রত্যুত্তর দিয়া পুনঃ প্রস্তাবিত কথা উত্থাপিত করিলেন) বশিষ্ঠ বলিলেন, গুণ ময়ী মায়া দুর্ব্বোধ্য ও দুরপনেয়। অসত্য হইলেও সে সত্যের ন্যায় প্রতীতা হয়। সুবর্ণ যেমন হার কেয়ূরাদিভাবে প্রতিভাসিত হয়, সেইরূপ, আত্মসংবোধের যৎকিঞ্চিৎ অন্যথা হইবামাত্র আত্মাতেই এই সকল প্রতিভাস উদিত হয়[৭,৮]। জলে যেমন তরঙ্গ, তদ্রূপ পরমাত্মায় বিশ্ব। পরমাত্মাই স্বাবিবেক বশতঃ জীব, আবার বিবেক বশতঃ পর-

মাত্মা। শ্রুতিতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, স্বাত্মসম্বোধে পরমাত্মা ও অবোধে সংসার[৭।১১]। প্রত্যেক প্রাণির সংসারকে তুমি ভিক্ষুস্বপ্নের ন্যায় ভ্রান্তিকৃত বলিয়া স্থির করিবে[১২]। আদি শরীরী পদ্মযোনি হইতেই প্রথমে জগৎ-স্বপ্ন সৃষ্ট হয়, পশ্চাৎ তাহাই ব্যষ্টি ক্রমে অর্থাৎ তদন্তর্গত প্রত্যেক ভূতে নিরূঢ় হইতে থাকে। জীব যখন চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, তখন সে দেখে, সমস্তই ভ্রমের বা স্বপ্নের অনুরূপ। এই যে জীব-জগদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ ব্যবহার, ইহা যাহাই হউক, ফলতঃ আন্তরস্থ দীর্ঘ স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৩।১৫]। কেবল মাত্র চিৎসত্তা অর্থাৎ আত্মার অস্তিতা মাত্র আশ্রয় করিয়া স্বরূপ প্রতীতির অন্যথা হইতে এই জরামরণাদি দুঃখের উদয় হইতেছে[১৬]। বিচিত্র সুকৃতশালিনী জীব চিৎ চিত্তের দ্বারাই এ দিকে পাতাল ওদিকে ব্রহ্মলোক রচনা করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। সেই যে প্রাগুক্ত পরমাত্মচিৎ, সে প্রাণ কল্পনা করতঃ তদধীনে লুঠিত হইতেছে[১৭।১৮]। ইহা জীব, উহা দেহ, এ সকল কল্পিত হইলেও মূলতঃ পরমাত্মাই, বস্তুন্তর নহে। সর্প কল্পিত হইলেও তাহা রজ্জুর অনতিরিক্ত। প্রতিবিম্ব কল্পিত হইলেও তাহা বিম্বের অনতিরিক্ত[১৯]। তখন পরমার্থ পক্ষ দূরে থাকুক। যখন তদ্রূপ ঐক্য প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্যবহার দৃষ্টিতেও ব্রহ্মেই ব্রহ্মের অবস্থান—জগৎ নহে, ইহা স্থির করা উচিত। যেমন আকাশে শুদ্ধাকাশ, জলে নির্ম্মল জল, সেইরূপ[২০]। বালকেরা যেমন প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভয় পায়, সেইরূপ, অজ্ঞ জীবেরাও ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ দেখিয়া ভয়ত্রাসাদি অনুভব করে[২১]। ভিন্নতা-বোধ বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ—পরিণাম বিশেষ, সুতরাং শুদ্ধতার কোনও ভেদ থাকে না, সমস্তই অগ্নিসংযোগে ঘৃতের ন্যায় গলিত হইয়া যায়[২২]। সর্ব্বাত্মা চিৎ-পদার্থে বিশ্ব দর্শনকে তত্ত্বজ্ঞ নরেরা মিথ্যা বলিয়া বর্ণন করেন[২৩]। বস্তুতঃই চিতের স্পন্দ ও অস্পন্দ দুএর কিছুই নাই। একত্ব, দ্বিত্ব ও নাই। কেননা, ভেদ মাত্রেই কল্পনা-প্রসূত, কল্পনার মিথ্যাত্ব সর্ব্ববিদিত। অতএব, বিশুদ্ধ কেবল চৈতন্যই এ সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব। বিচারের দ্বারাই হউক, আর বস্তু-স্বভাব বশতঃই হউক, সমস্তই চিৎ, এরূপ স্থিরীকৃত হইলে দৃশ্যপ্রপঞ্চ অভাবগ্রস্ত হয় অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিহত হয়[২৪।২৫]। ভেদ জ্ঞানের দ্বারাই এ সকলের উদয়, পরন্তু ভেদ প্রকৃতির বা মায়ার

চিহ্ন, সুতরাং অভেদ বোধের দ্বারা ভেদ তিরোহিত হইলে তখন কেবল পরমাত্ম-চিৎই অবশেষিত হয়, আর সব মিথ্যা হইয়া যায়[২৬]। তুমিই অবোধ দ্বারা নানা হইয়াছ ও অবোধ কেবল আত্ম-অনবেক্ষণ বশতঃ। তুমি যদি ভাল করিয়া দেখ,—বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে তোমার আর শঙ্কা থাকিবে না[২৭]। সেই যে নিঃশঙ্কাবস্থা, সে অবস্থা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির ও তুর্য্যতার অতীত। তাহা বন্ধনও নহে, মোক্ষও নহে, কিন্তু স্বরূপস্থিতি[২৮]। যে হেতু দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি ভাবান্বিত জগৎ অবোধমূলক ও অবোধ অসত্য, সেই হেতু, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, এ সকল পরমার্থতঃ নহে। তুমি যদি নিঃসঙ্কল্প হও, তোমার এই স্পন্দও নিস্পন্দ হইবে। স্পন্দ অর্থাৎ মনের ভিন্ন ভিন্ন কল্পনাময় গতি বা প্রচলন। কেননা কেবলা চিৎ স্পন্দাস্পন্দের অতীত। দ্বৈত বা ঐক্য, কল্পনারই মধ্যপাতী। কল্পনা ত্যাগ হইলে ব্রহ্মই অবশেষিত হয়[২৯।৩১]। চিদ্রূপ চন্দ্রে যে সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক, এ কলঙ্ককে তুমি মিথ্যা বলিয়া জানিবে। যে আত্মা কেবলা চিৎ, তাহাতে আবার কলঙ্ক কি? তাহা সৎ অসৎ উভয় বাক্যের অতীত মঙ্গলময়, তুমি সেই বিস্তৃত চিদ্‌ঘন-পদে স্থিতি কর। হে চিচ্চন্দ্র! হে অসঙ্কল্পকলঙ্ক! ভাব ও অভাব তোমাতে ক্ষয় প্রাপ্ত, তুমি অম্লান-ধর্ম্মা, তুমি চিন্ময়, এই ভাবে তুমি আস্থা স্থাপন কর এবং সুখে স্থিতি কর[৩২।৩৫]।

কল্পনা বল, অকল্পনা বল, অথবা স্পন্দাস্পন্দ বল, এ সকল কেবল নাম মাত্র। তুমি আনন্দের সমুদ্র, আর সব চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন ভ্রান্তি। যে হেতু ভ্রান্তি, সেই হেতু তুমি পূর্ণাপূর্ণ দশাকে এক বলিয়া জানিবে[৩৬]।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি সুষুপ্তমৌনী হও, চিত্তের বিলাস পরিত্যাগ কর, করিয়া তৎপদে অবস্থান কর[১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! বাক্যমৌন, ইন্দ্রিয়মৌন, ও কাষ্ঠমৌন, এই তিন্ মৌন জানি। সুষুপ্তমৌন কি? তাহা জানি না। অতএব, সুষুপ্তমৌন কি তাহা আমাকে বলুন[২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিরা দ্বিবিধ মৌনের উপদেশ করেন। এক কাষ্ঠ-মৌন, অপর জীবন্মুক্ত মৌন। আত্মতত্ত্বপর্য্যালোচন বর্জ্জিত, সুতরাং শুষ্ক বা নীরস যে মৌন, যে মৌন কেবল ইন্দ্রিয়-নিরোধ দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে মৌনকে মুনিরা কাষ্ঠমৌন ও কাষ্ঠতপস্যা বলেন[৩।৪]। আর যাঁহারা যথাযথ আত্মরূপ বোধগম্য করিয়া আত্মাতেই স্থিত হন, অন্তরে নিত্য-তৃপ্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন, বাহিরে অন্যান্য লোকের ন্যায় স্থিত হন, তাঁহারা মুক্ত মুনি[৫]। উক্ত মুনি দ্বয়ের যে চিত্তনিশ্চয়াত্মক ভাব, সেই ভাবকে লোকে ও শাস্ত্রে মৌন বলে[৬]। মৌনজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ মৌনকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাক্যমৌন, অক্ষমৌন, কাষ্ঠমৌন, আর সুষুপ্তমৌন[৭]। বলপূর্ব্বক বাক্য নিরোধ করিলে তাহাকে বাক্য-মৌন, ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলে তাহাকে অক্ষমৌন, চেষ্টাবিবর্জ্জিত হইলে তাহাকে কাষ্ঠমৌন বলা যায়। এইরূপ বিভাগ পক্ষে মনোনিগ্রহকেও মনোমৌন বলা যাইতে পারে। আর জীবন্মুক্ত লক্ষণ অবস্থাকে পণ্ডিত-গণ সুষুপ্তমৌন বলেন[৮।৯]। যাহারা কাষ্ঠতপস্বী উক্ত ত্রিবিধ মৌন তাহাদেরই সেব্য। যাহাদের বুদ্ধি জীবন্মুক্ত পদে স্থিতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের সেই মৌন চতুর্থ অর্থাৎ সুষুপ্তমৌন বলিয়া গণ্য[১০]। কাষ্ঠতপস্বী দিগের বাক্যমৌন প্রভৃতি মৌনে বন্ধন ছেদ হয় না। কাষ্ঠমৌনীরা আপনাকে স্মরণ করিতে পারে না, কেবল দৃশ্য স্মরণ ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে। আত্মার বিস্মরণই তাহাদের বন্ধনের কারণ[১১।১২]। যখন তাহারা ব্যুত্থান লাভ করে, অর্থাৎ মৌনতা ত্যাগ করে, তখন

তাহাদের চিত্ত পূর্ব্ববৎ চঞ্চল হয়[১৩]। সেইজন্য পণ্ডিতেরা ত্রিবিধ কাষ্ঠ-মৌনকে ভাল মনে করেন না। রাম! আমি তোমাকে পূর্ণ স্থিতি-প্রসঙ্গে মৌনীদিগের মৌনাবস্থার লক্ষণ ও ফলাফল বর্ণন করিলাম, ইহাতে সেই সেই মৌনীরা সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হন, হইবেন[১৪]। এক্ষণে জীবন্মুক্ত-লক্ষণ সুষুপ্তমৌন বলি, শ্রবণ কর। এই মৌন যথার্থ শুনিবার যোগ্য ও জীবের পুনর্জ্জন্ম নিবারক[১৫]। এ মৌনে প্রাণ-সংযম আবশ্যক হয় না, ইহার ঐ প্রকার বিভাগ বা ভেদ নাই এবং ইহাতে উল্লাস ও গ্লানি প্রভৃতি কিছুই নাই[১৬]। ইহা নানাত্ব কল্পনার উপশম স্থান, চিত্ত অচিত্ত এবং সৎ ও অসৎ বিভাগের অতীত, অযত্ন-সিদ্ধ বা স্বরূপাবস্থা মাত্র। ধ্যান করুক বা না করুক, ইহা অপরিচ্ছিন্ন আত্মরূপ আদ্যন্তাদি শূন্য[১৭।১৮]। যে মহাপুরুষ এই নানাত্বভাবান্বিত জগৎকে ভ্রম বলিয়া জানিয়া সন্দেহাদির অতীত হয়, সেই মহাপুরুষের সেই স্থিতিকে সুষুপ্তমৌন বলা যায়[১৯]। শিবই এই অনেক রূপে আতত, ইহা যে স্থির করিয়া স্থিত হয়, তাঁহারও তাদৃশী স্থিতি সুষুপ্ত মৌন। আকাশ বা আকাশ নহে অর্থাৎ শূন্য নহে, কিন্তু পূর্ণ, সমস্তই আছে, অথচ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে আছে; তদতিরিক্তরূপে নাই, এই ভাবে যাহার চিত্ত উপশান্ত হইয়াছে, তাহাকে আমরা সুষুপ্তমৌনী বলি। যে সমস্তই শূন্য, নিরালম্ব, শান্তিময় ও কেবল জ্ঞপ্তি, সদসৎ বিভাগের অতীত হয়, তাহাকেই আমরা উত্তম মৌনী বলি[২০।২২]। যাহার সম্বিৎ ভাব অভাব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্থিতি করে ও ভ্রম-শূন্যা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে উত্তম মৌনী বলেন[২৩]। যাহার অন্তর অত্যন্ত সাম্য লাভ করে, অর্থাৎ যাহার চিত্ত ভেদবৃত্তি বর্জ্জিত হয়, তাহার সেই মৌন অক্ষয়[২৪]। আমি নহি, অন্য কিছুও নাই, মন ও মানস মিথ্যা, এক জ্ঞানরূপী আত্মা আছে ও সত্য, এইরূপ সম্বে-দনও উত্তম মৌন[২৫]। এই জগতে একমাত্র আমিই আছি, অর্থাৎ অহং এই মনোবৃত্তিতে চৈতন্যের প্রকাশ, সেই চৈতন্যই আমি, অহং এই বৃত্তিটা আমি নহি, এইরূপ যে নির্ব্বিশেষ অস্তিতা, সেই নির্ব্বি-শেষ অস্তিতাই উত্তম মৌন[২৬]। যে হেতু স্ব-পর-অন্য প্রভৃতি ভেদ নিরস্ত হয়, সেই হেতু এই সুষুপ্তমৌন শ্রেষ্ঠ[২৭]। এই সুষুপ্তমৌন অনন্ত ও তুর্য্যাতীত। অর্থাৎ প্রবোধে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বাধিত হইয়া যায়,

পরন্তু তৎকালেও ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি থাকে, সেজন্য সে অবস্থা তুর্য্য, তৎপরে সে বৃত্তিও থাকে না, সুতরাং তাহা তুর্য্যাতীত। যে সমাধি সুষুপ্ততুল্য, যে সমাধি তুর্য্যপদবাচ্য ও যাহা তুর্য্যাতীত, এ সমস্তই জ্ঞানীর জাগ্রৎ কালেও হয়[২৮।২৯]। হে সাধো! নির্ম্মলবৃত্তি, ও শাস্ত্র ও তুর্য্যত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি জাগ্রৎ কালে ব্যবহার নির্ব্বাহ করিলেও এবং সদেহ অথবা বিদেহ হইলেও তাহার ঐ অবস্থা আকাশের সহিত: কথঞ্চিৎ তুলিত হইতে পারে।

তুমি ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করতঃ নির্ব্বাসনত্ব লাভ কর, আমি, এ, সে, তাহা, ইহা, এ সকল ভেদ তোমার অসত্য হইয়া যাউক, তুমি কেবল মাত্র একাদ্বয় চিদাকাশময় হও[৩০।৩১]।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

—*—

রাম বলিলেন, হে মুনিনায়ক! কি কারণে আপনি রুদ্রের শত সংখ্যা বর্ণন করিলেন? যাহারা গণ বা অনুচর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা কি রুদ্র নহে?

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভিক্ষু এক শত স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন, প্রত্যেক স্বপ্নের স্বাপ্নশরীর বিভিন্ন, এ কথার তাৎপর্য্যে তুমি ঐ রহস্য বোধগম্য করিয়াছ, সেজন্য আমি তোমার নিকট প্রত্যেক রুদ্রের নাম উল্লেখ করি নাই। ভিক্ষুর স্বপ্নে যে জীবটাদি আকার প্রথিত হইয়াছিল, সেই সকল আকার সামান্যতঃ গণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। তাহারাই রুদ্রশতক ও রুদ্র ও গণশতক। অভিপ্রেতার্থ এই যে, সকলেই ভোগে ও ঐশ্বর্য্যে সমান ও রুদ্রের অংশ। যে হেতু অংশ, সেই হেতু রুদ্র[১।৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিক্ষুর চিত্ত এক, তাহা হইতে কিরূপে

এক শত চিত্ত সমুৎপন্ন হইল? ভিক্ষু-স্বপ্নকৃত রুদ্র হইতে শততম রুদ্র কিরূপে উৎপন্ন হইল[৪]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা অনীশ্বর বা অজ্ঞ, তাহাদের চিত্ত হইতে চিত্তান্তর সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহারা যোগ ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সত্যসঙ্কল্প, তাহারা কল্পনারূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। আমার আত্মা সর্ব্বগামী, সর্ব্বব্যাপী, এ জ্ঞান যাহাদের দৃঢ় ও সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বাত্মা। ইহাদেরও ভাবিত পদার্থ ভাবনামাত্রে প্রথা প্রাপ্ত হয়[৫।৬]।

রঘুনাথ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি ঈশ্বর, যাঁহার আভরণ ভস্ম, যাঁহার নিলয় শ্মশান, তাঁহার আবার কামনা বা ইচ্ছা কি[৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহারা জীবন্মুক্ত, সিদ্ধ ও মহেশ্বর, তাঁহাদের কোন রূপ ক্রিয়া নিয়ত নাই। ঐ সকল ক্রিয়া-নিয়ম অজ্ঞের অর্থাৎ অজ্ঞেরা ঐ সকল কল্পনা করিয়া লয়। অজ্ঞদিগের চিত্ত রাগ দ্বেশ প্রভৃতি বিবিধ বিকার দ্বারা খণ্ডিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, তাহারা ক্রিয়া-নিয়মের অধীন হইয়া অর্থাৎ বিধিনিষেধের বশ্য হইয়া সুখ দুঃখ পর-ম্পরা প্রাপ্ত হয়[৮।৯]। যাহারা অজ্ঞবিপরীত অর্থাৎ জ্ঞানী, তাহাদের নিকট ইষ্টও নাই, অনিষ্টও নাই। তাহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, বাসনাও ক্ষয় প্রাপ্ত, সেইজন্য তাঁহারা কোনও কিছুতে নিমগ্ন বা ব্যাসক্ত নহেন[১০]। তাঁহারা যে কার্য্য করেন, কামনা পূর্ব্বক নহে। তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ কাকতালীয় ন্যায়ে সম্পন্ন হয়। সুতরাং অজ্ঞেরা তাঁহাদের কার্য্য বা ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা করেন না। বিষ্ণু যাহা করেন, তাহাও কাকতালীয় ন্যায়ের সহিত তুলিত হয়, ত্রিনয়ন দেব শিবের কার্য্যও সেইরূপ, ব্রহ্মার কার্য্যও সেইরূপ[১১।১২]। তাঁহাদের নিকট কোনও কিছু নিন্দিত, অনিন্দিত ও হেয় বা উপাদেয় নহে। তাঁহাদের আত্মীয়ও নাই, পরও নাই, এবং কোনও কিছু তাঁহাদের বন্ধনজনক নহে[১৩]। যেমন প্রথম সৃষ্টিতে অগ্নিতেই উষ্ণতা স্বভাবতঃ রূঢ় হইয়াছে, সেইরূপ, ভস্মকপালাদি ধারণা ক্রিয়াও হর প্রভৃতিতে স্বতই রূঢ় হইয়াছে[১৪]। যাহারা অজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া তাহাদের ঐরূপ রূঢ় নহে, অর্থাৎ অজ্ঞেরা বিধির বশ্য হইয়া ঐ সকল ক্রিয়া পশ্চাৎ গ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ সকল ক্রিয়া ফলও তাহারা স্বস্ব কল্পনানুসারে পশ্চাৎ

অনুভব বা ভোগ করে[১৫]। রঘুনাথ! সদেহ-প্রসিদ্ধ চার প্রকার মৌনের কথা বলা হইয়াছে, পরন্তু বিদেহপ্রসিদ্ধ মৌনের কথা বলা হয় নাই, সেই অবশিষ্ট অংশ বলি, শ্রবণ কর[১৬]। হে রামচন্দ্র! আত্মাকাশনামধেয় চিদাকাশ এই ভূতাকাশ অপেক্ষা অতিশয়িত নির্ম্মল। তদ্ভাব প্রাপ্তি যেরূপে হয় তাহা বলি, শ্রবণ কর[১৭]। সংখ্যা অর্থাৎ বিবেক বিচারাদি প্রভব জ্ঞানের দ্বারা যাহারা সম্যক্ অববুদ্ধ হন, তাঁহারা সাংখ্য যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা অব্যয়মতি হইয়া সমাধি সাধন করিয়া ঐ সিদ্ধি লাভ করেন। আর যাঁহারা যুক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণবায়ুর নিরোধ প্রভৃতির দ্বারা উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, শাস্ত্রে তাঁহারা যোগযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই অকৃত্রিম শান্ত পদ সকলেরই উপাদেয়, পরন্তু তাহা কেহ সাংখ্যের দ্বারা লাভ করেন, কেহ বা যোগের দ্বারা লাভ করেন[১৮।২০]। যে পুরুষ সাংখ্য ও যোগ উভয় পথকে তুল্য বলিয়া জানে, সে পুরুষই যথার্থ জ্ঞানী। যে স্থান বা যে পদ সাংখ্যের প্রাপ্য, সেই স্থান বা সেই পদ যোগীরও প্রাপ্য, সুতরাং সাংখ্য ও যোগ উভয়ই প্রাপ্য বিষয়ে এক[২১]। বৎস রঘুনাথ! প্রাণের ও মনের বৃত্তি যে স্থান স্পর্শ করিতেও পারে না ও বাসনারূপ রজ্জু অতিক্রান্ত, সেই পদকে তুমি পরম পদ বলিয়া জানিবে[২২]। বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতির চেষ্টা ও সে সকলের পুঞ্জীভূত সংস্কার ও তদাত্মক চিত্ত, এই সমস্তই সংসারের কারণ। সাঙ্খ্যের অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অথবা যোগের দ্বারা ঐ সকলের একতর বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ নির্ব্ব্যাপার হইলে সংসারও বিলয়গামী হয়[২৩]। মন বালকের ভূত-প্রেত দর্শনের ন্যায় দেহ দর্শন করে, সে যদি লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আর কে আছে? যে দেহ দর্শন করিবে[২৪]। ফলতঃ মন অসৎ, তাহার সত্তা নাই, তাহার উদয় কেবলমাত্র মোহ। যেমন স্বপ্নে আত্মমরণ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মনও মোহাবস্থায় দৃষ্ট হয়[২৫]। এই সংসার মনঃপ্রভব, যে হেতু মনঃপ্রভব ও মিথ্যা—মনের কল্পিত, সেই হেতু অহং মমাত্মক সংস্কারও কল্পিত। অমুক উপদেশ্য, অমুক উপদেষ্টা, আমার বন্ধন, আমার মোক্ষ, এ সমস্তই মনের কল্পনা, সুতরাং অবাস্তব[২৬]। দৃঢ়তর অদ্বৈত জ্ঞান, প্রাণাদির বিলয় ও মনের নিগ্রহ, ইহাই মোক্ষ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ঐ তিন্ প্রকার মোক্ষের কারণ[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, যদি প্রাণের বিলয় মোক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয়, মৃত্যুতেই সর্ব্ব জীবের মুক্তি[২৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মৃত্যুতে প্রাণের বিলয় হয় না। যাহাতে তাহা হয়, তাহা পরে বলিব। তত্ত্বজ্ঞান, প্রাণবিলয়, মনের উপশম, এই তিনই মোক্ষ কারণ সত্য; পরন্তু মনের উপশমরূপ কারণটী সুসাধ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠ[২৯]। মৃত্যুতে প্রাণের বিলয় হয় না, প্রাণ তখন এই কুৎসিত শরীর পরিত্যাগ করতঃ ভাবনাময় দেহ আশ্রয় করিয়া বাহ্য বায়ুর সহিত আকাশে অবস্থান করে—[৩০]। একক অবস্থান করে না, বাসনাময় মনের সহিত একলোল হইয়া অবস্থান করে। প্রত্যেক জীবের বাসনা ও তদাত্মক মন ভিন্ন, সেজন্য এক জীবের প্রাণ অন্য জীবের সহিত মিশ্রণ প্রাপ্ত হয় না[৩১]। দেহান্তরেও প্রাণ বাসনাযুক্ত অবস্থায় উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তদ্দেহস্থ হৃদয়াকাশে তিলে কুসুম গন্ধের ন্যায় প্রবিষ্ট ও সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয়[৩২]। জলপূর্ণ কলস মাত্র জলমগ্নই হয়, বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ, বাসনাবেষ্টিত মনও মৃত্যুর দ্বারা বিনষ্ট হয় না, দর্শক দিগের বোধ-হয় বহির্ভূত মাত্র। ঐরূপ প্রাণও বিনষ্ট হয় না, কারণ এই যে, মনঃ ও প্রাণ সমনিয়তস্বভাব, মন প্রাণসঙ্গ ও প্রাণ মনঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে না[৩৩]। যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাবৎ মন ও প্রাণ সহস্থিতি লাভ করে, কিন্তু যখন জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান মনের বাসনা সকল দগ্ধ করে, দগ্ধবাসন মন তখন প্রাণসঙ্গ পরিত্যাগ করে[৩৪,৩৫]। জ্ঞানের প্রভাবে সকল পদার্থ নাই বলিয়া স্থির হয়। তৎক্রমে বাসনাও নষ্ট হয়, এবং বাসনার অভাবে মন প্রাণপরিত্যাগী হয়, তাহাতেই মন তখন দেহদর্শনবর্জ্জিত হয়। অতএব, বাসনাই মন, এইরূপ অবধারণ করিবে[৩৬,৩৭]। মন বাসনাত্মক, তাহারই অভাবে পরম পদ, পরম পদই তত্ত্ব ও জ্ঞান, অথবা তত্ত্বজ্ঞান, তৎপর্য্যন্তই সংসার। হে রামচন্দ্র! তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী সংসার বিবেক জ্ঞানের দ্বারা রজ্জুসর্পভ্রম বিদূরিত হওয়ার ন্যায় বিদূরিত হইয়া যায়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পর সংসারভ্রম থাকে না[৩৮,৩৯]। অদ্বৈতজ্ঞান, প্রাণনিরোধ ও মনোনাশ, এই তিনের একটীর অভাবে অন্যটী সিদ্ধ বা আয়ত্ত হয়। যেমন তালবৃন্তের প্রচলন নিবৃত্ত হইলে বায়ু সঞ্চলনও উপশান্ত হয়, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন উপশান্ত হইলে মনও উপশম প্রাপ্ত হয়[৪০,৪১]। মৃত্যুতে

মন ও প্রাণ বিনষ্ট হয় না, দেহ হইতে বহিরাগত হইয়া ব্যোমবায়ু আশ্রয় করে এবং তথায় স্থিত হইয়া বাসনানুরূপ দেহাদি অনুভব করে। যেমন বায়ু-গতির অভাবে গন্ধ বিস্তারের অভাব, সেইরূপ, মনশ্চাঞ্চল্যের উপশমেও প্রাণস্পন্দের উপশম সুসম্পন্ন হয়[৪৪]। জন্তুদিগের প্রাণ ও চিত্ত নিত্য অবিনাভূত, অর্থাৎ একটা থাকিলে অন্যটা থাকিবেই, একটী না থাকিলে অন্যটীও থাকিবে না, এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত। যেমন পুষ্প ও গন্ধ, সেইরূপ। মনের স্পন্দন প্রাণ ও প্রাণের স্পন্দন মন। এই দুই পদার্থ রথী সারথী অথবা আধারাধেয়ভাবে স্থিতি করিতেছে। সুতরাং একতরের বিনাশে অন্যতরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং উহাদের বিনাশের পর মোক্ষও করতলস্থ[৪৫,৪৭]। অদ্বৈত জ্ঞান অভ্যস্ত ও গাঢ় হইলে প্রাণচেষ্টা থাকিবে না, এইরূপ অবধারণ করতঃ একাদ্বয় আত্মতত্ত্বে মন নিমগ্ন করিবে[৪৮,৪৯]। মন উক্ত আত্মতত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইলেই উক্ত আত্মতত্ত্ব সুস্থিরত্ব প্রাপ্ত হইবে। অজ্ঞানময় সংসার আর জ্ঞানময় ব্রহ্ম, এই দু-এর মধ্যে যাহা অত্যন্ত শ্রেয়, তাহাতেই তোমার স্থৈর্য্য হউক[৫০]। উক্ত একাদ্বয় তত্ত্ব দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত অভ্যাস করা বিধেয়। ভাবনার এমনিই প্রভাব যে, তাহার তীব্রতায় ভাবও অভাব এবং অভাবও ভাব হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া বিশ্বাস, তাহা নাই এবং যাহা নাই বলিয়া বিশ্বাস, তাহা আছে, এইরূপ অবধৃত হয়[৫১]। যাহারা সর্ব্বদা প্রত্যাহাররত তাহাদের চিত্ত উপযুক্ত কালে প্রাণের সহিত লয় প্রাপ্ত ও পরমাত্মায় শেষ হয়। ইহাই চিত্তের স্বভাব যে, যাহাতে একতান হইবে, সে তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইবে। এ সমস্তই অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞানের বিস্তৃতি, এইরূপ যুক্তিসংস্কৃত বুদ্ধির নাম জ্ঞান, তদ্দ্বারা পরমত্ব প্রাপ্ত অনিবার্য্য[৫২,৫৩]। যে প্রকারেই হউক, চিত্তের উপশম হইলেই এই সংসাররূপ মৃগতৃষ্ণিকা উপশান্ত হইবে[৫৪]। হে রাম! অবিদ্যা চিত্তের কল্পিত হউক, আর চিত্তই বা অবিদ্যার কল্পিত হউক, চিত্তের ক্ষয় আবশ্যক। চিত্তের পরিক্ষয়ে তদাধার আত্মার নির্ব্বিশেষ স্থিতি এবং তাহারই নাম পরম পদ, নাশ পদার্থটা পরম পদ নহে[৫৬]। মুহূর্ত্তমাত্রব্যাপী চিত্তের পরম পদ-বিশ্রান্তি নির্ব্বাণ পদবাচ্য[৫৭]। জ্ঞানের দ্বারা হউক, আর যোগের দ্বারা হউক, যাহার চিত্তবিশ্রান্তি জন্মে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়

না[৫৮]। অবিদ্যাশূন্য চিত্তের নাম সত্ত্ব এবং তাহাই এই সংসারের দগ্ধ বীজ। দগ্ধ বীজে অঙ্কুর জন্মে না, ইহা তুমি বিদিত আছ[৫৯]। যাহার অবিদ্যা লয় প্রাপ্ত ও বাসনা বিনষ্ট, সে সত্ত্বস্থ, সত্ত্বস্থ ব্যক্তি পরমাকাশের সহিত তুলিত হন, তথা পরজ্যোতি সাক্ষাৎকারে উপশান্ত অর্থাৎ নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হন।

হে সর্ব্বসুন্দর রাম! বর্ণিত ত্রিবিধ উপায়ে যাহার আত্মপদ গলিত হইয়াছে অর্থাৎ সংসার ভ্রান্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ইহ সংসারে জীবন্মুক্ত ও সত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবন্মুক্ত নর অতঃপর আর সংসারমালিন্যে অভিভূত হন না[৬০।৬১]।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ।

——()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিচারে অর্থাৎ প্রাগুক্ত উপায়ে অবিদ্যা নাশ হইলে জীব অজীব হয়, চিত্তও অচিত্ত হয়, সুতরাং সে অবস্থাকে মোক্ষ এই নাম অর্পণ করা হয়[১]। মনই মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় নাশ্য-নাশকাদি ভেদ দর্শন করে, সে দর্শন বিচারে বিলীন হয়[২]। এই সংসাররূপ স্বপ্নভ্রান্তি বিষয়ে এক বেতালের প্রশ্ন স্মরণ হইল, সেই প্রশ্নগুলি বলি, শ্রবণ কর[৩]।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের মহাবনে এক বিপুলাকৃতি বেতাল বাস করিত। এক সময়ে এই বেতাল কোন এক রাজার রাজ্যে বধ-যোগ্য প্রাণী বিনাশার্থ আগমন করিল[৪]। পূর্ব্বে এই বেতাল অন্য এক সজ্জন রাজার রাজ্যে থাকিত। সেই রাজা ইহার ভক্ষ্য আহরণ করিত। তৎকালে এ ক্ষুধাকাতর হইলেও সম্মুখাগত নিরপরাধ ব্যক্তির হিংসা করিত না[৫।৬]। ক্রমে ভক্ষ্যের অভাব হওয়ায় এই বেতাল পুনঃ স্ব-স্বাসস্থান বিন্ধ্যারণ্যে আগমন করিল এবং ক্ষুধাকাতর হইয়া এক নগরে

প্রবেশ পূর্ব্বক উচিত নিয়মে মনুষ্য ভক্ষণের চেষ্টা আরম্ভ করিল[৭]। অনন্তর, নিশীথ সময়ে রাত্রিচর্য্যায় বিনির্গত সেই স্থানের রাজার সহিত বেতালের সাক্ষাৎ ঘটনা হইল। বেতাল মেঘগম্ভীর নিস্বনে রাজাকে বলিতে লাগিল[৮]।

বেতাল বলিল, ওহে রাজন্! তুমি কোথায় যাইবে? আজ্ এই ভয়ানক বেতাল তোমাকে পাইয়াছে, এ আজ্ তোমাকে ভক্ষণ করিবে[৯]।

রাজা বলিলেন, অরে নিশাচর! তুমি যদি আমাকে অন্যায়ে ভক্ষণ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক সহস্রখণ্ড হইয়া পড়িবে[১০]।

বেতাল বলিল, আমি তোমাকে অন্যায়ে ভক্ষণ করিব না। তুমি রাজা, সকলেরই আশা পূর্ণ করিবার পাত্র। আমি কয়েকটী ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন করিব, তোমাকে সে সকলের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে হইবে[১১।১২]। প্রশ্নগুলি শ্রবণ কর—

১। অনেক শত ব্রহ্মাণ্ড কোন্ সূর্য্যরশ্মির ক্ষুদ্র ও কৃশ ত্রসরেণু?

২। কোন্ পবনের নিকট মহা-গগণও রেণু বালুকাকণা?

৩। এক স্বপ্নের পর অন্য স্বপ্ন, এই নিয়মে শত শত স্বপ্ন হইতেছে ও যাইতেছে, পরন্তু যে সে সকলের প্রকাশক, সে আপনার স্বচ্ছতা ও সত্যতা পরিত্যাগ করে না, সে কে?[১৩।১৪]।

৪। কদলীকাণ্ডের ন্যায় সারশূন্য পদার্থের মধ্যগত সার কি?

৫। ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যগত আকাশ, চতুর্দ্দশ ভুবন, সূর্য্যমণ্ডল, সুমেরু, এ সকল কোন্ অণুর পরমাণু? অথবা কোন্ অণু ঐ সকল হইয়াও আপনার অণুত্ব পরিত্যাগ করে না[১৫।১৬]?

৬। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, এই তিন্ জগৎ কোন্ নিরবয়ব ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অথচ মহাগিরিতুল্য পদার্থের মজ্জা?[১৭]

যদি তুমি আমার এই ছয় প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমার ভক্ষ্য হইবে না। নচেৎ তুমি অজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী বলিয়া আমার ভক্ষ্য হইবে। কেবল তুমি নহ, তোমার রাজ্যবাসী সমগ্র মানব আমার ভক্ষ্য হইবে। আমি বল পূর্ব্বক ফলভক্ষণের ন্যায় তোমার রাজ্য ভক্ষণ করিব[১৮]।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ।

—()০()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বেতাল ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া সে সকলের সদুত্তর দিবার কথা বলিলে রাজা সহাস্য আস্যে বলিতে লাগিলেন[১]।

রাজা বলিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা ফল, ইহা (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে) অন্তর ও পর পর দশগুণ অধিক ভু, জল, তেজ ও বায়ু প্রভৃতি ত্বকে অর্থাৎ আবরণে আবৃত[২]। ঈদৃশ সহস্র সহস্র ফল যাহাতে পর্য্যাপ্ত তাদৃশী সুবিস্তীর্ণা শাখা এবং তাদৃশ সহস্র সহস্র শাখা যুক্ত এক দুর্লক্ষ্য মহাবৃক্ষ[৩।৪]। তাদৃশ বৃক্ষের একটী মহাবন, সহস্রাধিক তাদৃশ মহাবন যাহাতে, তাদৃশ এক বৃহৎ শৃঙ্গ, তাদৃশ সহস্রাধিক শৃঙ্গ যাহাতে আছে, এরূপ এক বৃহৎ প্রদেশ, তাদৃশ সহস্র বৃহৎ প্রদেশ যাহাতে, তাদৃশ এক বৃহৎ দ্বীপ, তাদৃশ সহস্র বৃহদ্দ্বীপ যাহাতে, এরূপ এক মহীপীঠ, এই মহীপীঠের রচনা অতীব মনোরম, ঈদৃশ মহীপীঠের সহস্রে এক পৃথিবী, ইহারও সহস্রে এক মহাভুবন[৫।১০], এরূপ সহস্র মহাভুবন যাহাতে সন্নিবিষ্ট, তাদৃশ এক অণ্ড, তাদৃশ সহস্র অণ্ড ভাসমান যাহাতে, তাদৃশ এক মহাসমুদ্র[১১।১২], এরূপ লক্ষ লক্ষ সমুদ্র, সে সকলের সমাহারে এক মহার্ণব[১৩], তাদৃশ মহার্ণবের গর্ত্তে তদনুরূপ জল, এ সমুদায়ের তুল্যরূপী এক বৃহৎ পুরুষ, তাদৃশ বৃহৎ পুরুষ সহস্রের মালা যাহার বক্ষে বিরাজিত, এরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষ রহিয়াছেন[১৪।১৫]। এইরূপ সহস্র সহস্র পুরুষ যাহার লোমরাজি[১৬], এক মহাদিত্যই নিত্যোদিত, নিত্য বিরাজিত ও নিত্যপ্রতিষ্ঠ। এই সূর্য্য এক হইলেও সাধারণের দৃষ্টিতে (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে) বহু ও অধিক কি বলিব, উক্ত অনুক্ত যে কোন কল্পনা, সমস্তই বর্ণিত সূর্য্যের দীপ্তি বা প্রভা[১৭]। ইহারই কিরণ ত্রসরেণু ব্রহ্মাণ্ড। আমি এই চিৎসূর্য্যের কথাই বলিতেছি, এই চিৎসূর্য্যই এ সমুদায়ে তাপ প্রদান করিতেছে[১৮]। ইনিই বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীব, ইনিই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম। এই সকল ভুবন সেই চিৎসূর্য্যের ত্রস-

রেণু[১৯]। এই পরম বিজ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশে সমস্ত ভুবনের প্রকাশ। এই জগৎ-শোভাও সেই বিজ্ঞানরবির শোভা[২০]।

হে বেতাল! মায়াশবল ব্রহ্মই এই ত্রৈলোক্যরূপ গৃহ, ইহারই প্রকাশক সেই পরম সূর্য্য। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্যাধিকারী, সেই ব্যক্তির নিকট ইনি শাস্ত্রচর্চ্চাজনিত সাক্ষাৎকারবিশেষ দ্বারা আত্মারূপে প্রথমান হন, অন্য অনধিকারী জন্তুর নিকট অপ্রকটিত রহিয়াছেন। এই সকল অজ্ঞ লোক জীব ও জগৎ উভয়ের পার্থক্য ভ্রমে ভ্রান্ত, পরন্তু যাহাদের ভ্রম নাই তাহারা দেখে, এক পরমাত্মা ব্যতীত পরমার্থতঃ অন্য কিছু নাই। অতএব হে বেতাল! তুমি প্রশ্নের আড়ম্বর পরিত্যাগ কর, ও শান্ত হও[২১]।

প্রথম প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

——()——

রাজা বলিলেন, কাল, আকাশ ও স্পন্দ এই তিন্ সত্তাই চিন্ময়ী। চিন্ময়ী হইলেও বিশুদ্ধা নহে অর্থাৎ মায়া সহায়। মায়া-সহায় বলিয়া শুদ্ধা নহে। যাহা কেবল চেতন তাহাই শুদ্ধসত্তা এবং তাহাই পরম পাবন। (কাল অর্থাৎ মহাকালরূপা চিৎ। আকাশ অর্থাৎ চিৎসম্বলিত মায়াকাশ। স্পন্দ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সূত্রাত্মা)[১]। ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সূত্রাত্মাতেই অর্থাৎ মূল প্রাণাত্মাতেই এই সকল চলনশীল রজঃ অর্থাৎ নানা বিকার স্ফুরিত হইতেছে। যেমন কুসুমের অঙ্গে আমোদ অর্থাৎ সৌগন্ধ স্ফুরিত হয়, সেইরূপ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

এই জগৎই মহাস্বপ্ন। ব্রহ্ম এতদ্রূপ মহাস্বপ্ন হইতে অন্য মহাস্বপ্নে অনুবৃত্ত অথচ তিনি শান্ত অর্থাৎ অসঙ্গস্বভাব জ্যোতিরূপ, ব্রহ্ম সেই সেই স্বপ্নে পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত[২।৩]।

তৃতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

রম্ভাস্তম্ভের উপরের স্তর অসার, তন্নিম্নের স্তরও অসার ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, এবংক্রমে যাহা সর্ব্বান্তর ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম, তাহাই সার বলিয়া গণ্য। উক্ত রীতিতে ব্রহ্ম-বিবর্ত্ত বিশ্বের ও পরিণামশীল শরীরাবয়বে পঞ্চ কোষের মধ্যে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠান ও সর্ব্বান্তর বলিয়া সিদ্ধ। এই ব্রহ্মকে সৎ, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা লক্ষ্যরূপে বুঝান হয়, বাচ্যরূপে নহে। বিষয়োপলক্ষিত প্রত্যেক সত্তাই অনুভবমূলক, সুতরাং এক মূলসত্তার অধীন। যেমন পটসত্তা বস্তুসত্তার ও তন্তুসত্তা কার্পাসসত্তার, তাহা আবার ফলসত্তার, তাহা আবার বৃক্ষসত্তার, তাহা আবার বীজসত্তার, তাহা আবার মৃত্তিকাদি সত্তার অধীন, এবংক্রমে সমুদায় সত্তা যে এক মহাসত্তায় গিয়া সমাপ্ত হয়, সেই মহাসত্তাই শাস্ত্রগোচরে চিৎ ও ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। অতএব চিৎ-ই সর্ব্ব সার। আর সব রম্ভাত্বকের ন্যায় অসার[৫।৬]। এই ব্রহ্মপদার্থ দুর্লক্ষ্য ও দুর্লভ বলিয়া অণু, এবং অসীম বলিয়া সুমেরু প্রভৃতির আধার, সুতরাং তদপেক্ষাও বৃহৎ। সুমেরু কেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই উক্ত ব্রহ্মপরমাণুর ব্যাপ্য[৭।৮]।

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

পরমাণু যেমন দুর্লক্ষ্য, সেইরূপ দুর্লক্ষ্য বলিয়া উক্ত পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা অণু পরমাণু সূক্ষ্ম প্রভৃতি শব্দের বোধ্য হন। এবং সমস্ত বিশ্বের পূরক বলিয়া মহাগিরি নামে অভিহিত হন। ইনি সকল অবয়বের অবয়বী অথচ স্বয়ং নিরবয়ব[৯]। স্বর্গাদি জগৎত্রিতয় এই জ্ঞপ্তিরূপ পরমাত্মার মজ্জা।

অহে বেতাল! এই ভূলোক দ্যুলোক সমস্তই উক্ত জ্ঞপ্তি পুরুষের অন্তরে সমাহিত। মজ্জা মধ্যে থাকাই প্রসিদ্ধ, সুতরাং জগত্রয় যখন বর্ণিত জ্ঞপ্তি পুরুষের মধ্যে বা অন্তরে অবস্থিত, তখন অবশ্যই প্রসিদ্ধ ত্রিজগৎ মজ্জা আখ্যা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অহে বালক! অর্থাৎ অবোধ বেতাল! এ সমস্তই যে বিজ্ঞানের লীলা-কৌশল, এবং যে বিজ্ঞানের অধীনে এ সকলের প্রকাশ, সে বিজ্ঞান তোমার অলঙ্ঘনীয়, ইহা জানিয়া এবং আমার এই উক্তি শুনিয়া আপনার স্বরূপ অনুভব ও দর্প পরিহার পূর্ব্বক শান্ত হও[১০।১১]।

ষষ্ঠ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, বেতাল রাজার প্রমুখাৎ ঐ সকল তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি লাভ করিল, এবং ক্ষুধা ভুলিয়া গিয়া শ্রুত আত্মতত্ত্বে সমাধিমান্ হইল[১,২]। হে রামচন্দ্র! বেতালের প্রশ্ন ও তদুত্তরে রাজার উক্তি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। বর্ণিত ক্রমে সেই সুসূক্ষ্ম চিৎ-তত্ত্বে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি করিতেছে[৩]। সেই চিৎ-পরমাণুর একাংশে এই বিশ্ব বিবর্ত্ত নিয়মে অর্থাৎ মিথ্যারূপে স্থিতি করিতেছে, বিচারে ইহার স্থিতি থাকে না। বালকেরা ভ্রান্তির বশে অতি ভীষণ বেতাল-শরীর কল্পনা করে, ভ্রান্তির অপগমে তাহা থাকে না, কোথায় লীন হইয়া যায়। যাহাতে লীন হয়, তাহাকেই তুমি তৎপদ বলিয়া বিদিত হও[৪]। সমুদায় বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ কর, নিশ্চল অন্তরাত্মায় অবস্থান কর, আর অব্যাসক্তভাবে যথোপস্থিত কার্য্য করতঃ শান্তি লাভ কর[৫]। মনের দ্বারাই মনকে আকাশের ন্যায় বিশদ কর, শান্ত সমদর্শী স্থিরবুদ্ধি, মোহের অতীত ও প্রাপ্তানুবর্ত্তী হও। তাহা হইলে তুমি ভগীরথের ন্যায় দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসিদ্ধ করিতে পারিবে[৬,৭]।

তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে শান্তচিত্ত, পরিতৃপ্ত ও সমসুখে স্থিত হও, তাহা হইলে তুমি ভগীরথের ন্যায় দুর্লভ লাভে সমর্থ হইবে। যে কার্য্য সগর, অংশুমান্ ও দিলীপাদি রাজারা করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ উঁহারা গঙ্গাবতারণরূপ কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলেন, পরন্তু শান্তি তৃপ্তি সমদর্শিত্বাদি গুণ বিশিষ্ট ভগীরথ সেই দুঃসাধ্য গঙ্গার তারণরূপ কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ করিয়াছিলেন[৮]।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

——()•()——

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! ভগীরথের গঙ্গাবতারণ-কথা অতিশয় চিত্ত-চমৎকারকারক। যেরূপে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুরাকালে ভগীরথ নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। এই রাজা সসাগরা ধরার অধিপতি। প্রার্থীরা প্রার্থনা মাত্রেই এই রাজার নিকট প্রার্থ্যমান পদার্থ পাইতেন। ইহার মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় হ্লাদজনক[২।৩]। ইনি দীন দুঃখী অনাথ সাধু সচ্চরিত্র দিগের জন্য অবিরত ধনব্যয় করিতেন এবং স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্য তৃণ পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেন[৪]। যেমন হীরক-বেধের যন্ত্র অতি দুর্ভেদ্য হীরককেও ছিদ্রিত করে, তেমনি ভগীরথও যৎপরোনাস্তি বলবান্ শত্রুকে ও তাহা-দের চেষ্টাকে ছিদ্রিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বশ্য করিয়াছিলেন[৫]। ইহার দৈহিক কান্তি নির্ধূম পাবকের ন্যায় ছিল এবং শ্রান্ত হইলেও ইনি দীনের ন্যায় ম্লান হইতেন না। চন্দ্র যেমন নৈশ অন্ধকার হরণ করেন, তেমনি ইনিও প্রজাদিগের মানস অন্ধকার বিনষ্ট করিতেন[৬]। ইনি প্রতাপাগ্নি নিক্ষেপ করতঃ শত্রুদিগের সম্বন্ধে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় প্রজ্বলিত থাকিতেন[৭]। ইনি তত্ত্বজ্ঞদিগের হ্লাদজনক ছিলেন এবং চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় তাঁহাদের চিত্তকে মৃদু ও শীতল জ্যোৎস্নায় দ্রব তুল্য করিতেন[৮]। যে প্রবাহ এই জগতের যজ্ঞোপবীত স্বরূপ স্বর্গ ও পাতালবাহী, সেই গঙ্গাপ্রবাহ ইহারই দ্বারা তৃতীয় গুণরূপে পরিণত হইয়াছে। (যজ্ঞোপবীতে তিন্‌টী গ্রন্থি থাকে। গঙ্গাও স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন্ প্রবাহে প্রবাহিত হওয়ায় যজ্ঞোপবীত তুল্য হই-য়াছেন, তন্মধ্যে মর্ত্ত্যপ্রবাহরূপ গুণটী ভগীরথ দ্বারা কৃত)[৯]। অগস্ত্য মুনি সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়াছিলেন, ভগীরথ গঙ্গাপ্রবাহের দ্বারা তাহাকে পুনঃ পূর্ণ করিয়াছিলেন[১০]। এই ভগীরথই পাতালস্থ আপন পূর্ব্বপুরুষ দিগকে গঙ্গারূপ সোপানের দ্বারা স্বর্গগামী করিয়াছিলেন[১১]। যিনি

গঙ্গা আনয়নের জন্য ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ভূমিপতি ভগীরথের যৌবন কালে এই লোকযাত্রাবিষয়ক বিচার-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। যেমন দৈবাৎ কখন মরুভূমিতেও বল্লী জন্মে, তেমনি, তারুণ্যেও কাহার কাহার বৈরাগ্যজনক বিচার জন্মিয়া থাকে[১২,১৪]। এই মহীপতি একদা ব্যাকুল হইয়া জগদ্‌যাত্রার বিষয় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৫]।

পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ দিন ও রাত্রি যাইতেছে ও আসিতেছে, এবং তৎসঙ্গে পুনঃ পুনঃ দান ও আদান এতদ্রূপ করা হইতেছে। কাল, যে ভোগ ভুক্ত হইয়াছে, আজ্ আবার সেই ভোগই ভোগ করিতেছি। কেবল পুনঃ পুনঃ পর্য্যুষিত ও ভুক্তবিরস ভোগে কাল কর্ত্তন করা হইতেছে মাত্র। এমন কোনও কার্য্য করা হইতেছে না, যাহার ফল অপূর্ব্ব বা অপ্রাপ্ত। যে কার্য্যে সেরূপ পর্য্যাপ্ত সুফল পাওয়া যায়, সেই কার্য্যই কার্য্য, অবশিষ্ট কার্য্য রোগ বিশেষ[১৬,১৭]। অবোধ লোকেরা বার বার পর্য্যুষিত কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করে না। রাজা ভগীরথ সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদা ইনি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া ত্রিতল নামধেয় নিজ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন[১৮,১৯]।

ভগীরথ বলিলেন, প্রভো! এই অন্তঃসারশূন্য সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিয়া আমি অতিশয় খিন্ন হইয়াছি। ভগবন্! যাহাতে এই জন্মমরণ মোহাদি দুঃখের অন্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন[২০,২১]।

ত্রিতল বলিলেন, শ্রবণ মননাদি উপায় অভ্যস্ত হইলে অখণ্ড ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি উদিত হয়, তাহারই প্রভাবে সর্ব্বদুঃখের অবসান হইয়া থাকে। তখন আর হৃদ্‌গ্রন্থি থাকে না, সংসার থাকে না ও কর্ম্মও তখন সমাপ্ত হইয়া যায়। আত্মাই প্রকৃত জ্ঞেয়। তাহা বিশুদ্ধ চিন্মাত্র, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্যপদার্থ। তাহার উদয়ও নাই অস্তও নাই[২২,২৩]।

ভগীরথ বলিলেন, হে মুনীশ্বর! আমি বুঝিয়াছি, তিনি চিন্মাত্র, নির্গুণ, শান্ত, নির্ম্মল, অচ্যুত ও দেহাদি পদার্থের অতীত[২৪]। কিন্তু ঐ তত্ত্বে আমার স্থিরতর প্রতিপত্তি জন্মিতেছে না। যাহাতে আমি ঐ বিষয়ে অবিক্ষিপ্ত হইতে পারি তাহা আমাকে উপদেশ করুন[২৫]।

ত্রিতল বলিলেন, অমানিত্ব ও অদম্ভিত্ব প্রভৃতি সাধনসাধ্য জ্ঞানে

নিয়ত অবস্থান করিতে পারিলে তৎপরিপাক দশায় জীব অজীব ও সর্ব্বময় হইয়া যায়[২৭]। গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সমচিত্ততা, নিরন্তর আত্মদর্শনে রতি, বিবিক্ত স্থানে অবস্থিতি, আত্মতত্ত্বজ্ঞানোপযোগী জ্ঞান, এই সকল জ্ঞান পদবাচ্য [২৮।৩০]। হে রাজন্! অহম্ভাবই শত্রু। তাদৃশ অহম্ভাব বিনষ্ট হইলেই রাগদ্বেষাদির নাশক ও সংসার ব্যাধির মহৌষধ স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়[৩১]।

ভগীরথ বলিলেন, হে মহাভাগ! দীর্ঘকাল এই শরীররূপ পর্ব্বতে অহম্ভাবরূপ বৃক্ষ রূঢ় রহিয়াছে। এ অহম্ভাব যাহাতে নষ্ট হয়, তাহা আমাকে বলুন[৩২]।

ত্রিতল বলিলেন, ভোগভাবনা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রযত্নের অবলম্বন করিলে অহম্ভাবের বিলয় হইতে পারে[৩৩]। যাবৎ না মনে অপমান লজ্জা ভয়াদি পরিত্যাগ দ্বারা অকিঞ্চন হওয়া যায়, তাবৎ যন্ত্রণা-পঞ্জরস্থ অহম্ভাব নৃত্য করিবে। অতএব, যদি তুমি জ্ঞান-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পার, নিশ্চল নিষ্কম্প অর্থাৎ স্থৈর্য্যে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অহম্ভাব নষ্ট ও পরম পদ লাভ হইবে[৩৪।৩৫]।

কোনও প্রকার বিশেষণ থাকিবে না, ভয় থাকিবে না, এষণা অর্থাৎ কোনও প্রকার বাঞ্ছা থাকিবে না, শ্রী সম্পদ সমস্তই শত্রুসাৎ হইবে, এরূপ অবস্থা যদি প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তুমি অহম্ভাবের শান্তিতে অকিঞ্চন হইবে। কেবল মাত্র শরীরধারণোপযোগী এক ভিক্ষা তোমার বিদ্যমান থাকিবে, এরূপ অকিঞ্চন অবস্থায় যদি স্থিত হইতে পার, তাহা হইলে মহান্ হইতেও মহান্ হইবে[৩৬]।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন; ভগীরথ গুরুসকাশে ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠানে রত হইলেন[১]। পরে সর্ব্বত্যাগী হওয়ার উদ্দেশে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের আয়োজন করিলেন[২]। মহীপতি ভগীরথ এই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ সজ্জন বন্ধু বান্ধব ও প্রার্থীদিগকে গো ভূমি হিরণ্য অশ্ব প্রভৃতি দান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভগীরথ তিন্ দিবসের মধ্যে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইলেন[৩।৪]। পরে সীমান্তবাসী কোন পূর্ব্বশত্রু রাজাকে রাজ্য প্রদান করিয়া একবস্ত্র দেহে বহির্গত হইলেন। যে স্থানে গেলে কেহ জানিতে পারিবে না, কাহারও প্রমুখাৎ কোন কিছু শুনিতে হইবে না, যে স্থানের লোক ভগীরথ এই নাম পর্য্যন্ত বিদিত নহে, তাদৃশ অরণ্যে ও গ্রামে গিয়া ধীর হইয়া বাস করিতে লাগিলেন [৫।৭]। এইরূপ বাস অধিক কাল করিতে হয় নাই, অল্পকাল পরেই সমুদায় এষণা পরিত্যাগ হইল, তিনি আত্মবিশ্রান্তি লাভ করিলেন[৮]। পরে যাদৃচ্ছিক বাসে প্রবৃত্ত হইয়া পৃথিবীস্থ নানা স্থান পর্য্যটন করিলেন। এই যাদৃচ্ছিক ভ্রমণ কালে তিনি এমন স্থানে আসিয়া পড়িলেন, যে স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব শত্রুরা প্রভুত্ব করিতে ছিল, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা তাঁহার পূর্ব্বরাজ্য ছিল। এই স্থানে নগরস্থ নানা গৃহাদি দেখিলেন, যে সমুদায় তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট। যে সকল পুরবাসী ও মন্ত্রি তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট, এক্ষণে তাহাদিগকেও দেখিলেন। অনন্তর ভিক্ষাকাল আগতে সেই সকল পূর্ব্বদৃষ্ট পুরবাসীদিগের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন[৯।১০]। পুরবাসীরা জানিল, তাঁহাদের পূর্ব্বরাজা এক্ষণে ভিক্ষা-প্রার্থী। সকলেই সাদরে ও দুঃখকাতরে তাঁহার সপর্য্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণের অনুরোধ করিল, পরন্তু ভগীরথ প্রদত্ত ভোজন ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিলেন না। ধন বস্ত্র রাজ্যাদি তুচ্ছাৎতুচ্ছতর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেন এবং কতিপয় দিবস তথায় বাস করিয়া পুনঃ স্থানান্তরে গমন

করিলেন। ভগীরথের গমনে পুরবাসীরা সকলেই হাহারবে রোদন করিল[১১,১৩]। এই আত্মারাম ভগীরথও পর্য্যটন করিতে করিতে একদা আপনার সেই ত্রিতল নামধেয় গুরুর সহিত মিলিত হইলেন এবং গুরু শিষ্য উভয়ে এক সঙ্গে কিছুকাল নানা গ্রামে ও নানা অরণ্যে বাস করিলেন। ইঁহারা উভয়েই দেহ ধারণকে বিনোদ মাত্র মনে করিতেন। ভাবিতেন, দেহ থাকে থাকুক, যায় যাউক, ইহা থাকা ও যাওয়া দু-ই সমান। এইরূপ কৃতনিশ্চয় গুরু ও শিষ্য এক বন হইতে অন্য বনে, আবার সে বন হইতে অন্য বনে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন[১৪,১৮]। সিদ্ধগণ ইঁহাদের চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া অণিমাদি আট প্রকার সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেও ইঁহারা সে সকলকে জর্জ্জরিত তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[১৯]। ইঁহারা ভাবিতেন, স্বকৃত কর্ম্মের ফলে দেহ হইয়াছে, কর্ম্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা থাকিবেক, কর্ম্মের শেষ হইলে ইহা আপনিই বিনষ্ট হইবে[২০]।

এই দুই মননশীল মহাপুরুষ আপন আপন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বশে সমুপস্থিত সুখ ও দুঃখ উভয়কেই অভিনন্দন করিতেন। অর্থাৎ—সুখে উৎসাহিত ও দুঃখে উদ্বিগ্ন হইতেন না। সম ব্রহ্মে অবস্থিত পরমা- শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২১]।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, একদা—এক রাজ্যের রাজা অনপত্য অবস্থায় মৃত হইলে রাজামাত্যগণ বংশরোনাস্তি দুঃখ ও বিপদ বোধ করিতে লাগিল; অতঃপর তাহারা রাজাসনে বসাইবার জন্য রাজ্যপালনক্ষম ও গুণভূষিত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল[১,২]। ক্রমে তাহারা জানিল, রাজ্য পরিত্যাগী ভগীরথ এইরূপ ভিক্ষাবৃত্ত্যবলম্বী ও মুনি হইয়াছেন। জানিতে

পারিয়া সেই রাজ্যের রাজামাত্যেরা এই ভগীরথকে তদ্রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিল। ভগীরথ যদৃচ্ছাক্রমে গজারোহণ করিলে প্রজাগণের মধ্য হইতে "জয় মহারাজা ভগীরথের জয়" ইত্যাকারের মহান্ জয় শব্দ সমুত্থিত হইল। ভগীরথ মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া এইরূপে রাজ-সিংহাসনারূঢ় হইলে তাঁহার পূর্ব্ব মন্ত্রিরা ও পুরবাসীরা তথায় আগমন করিল এবং নিম্ন লিখিত প্রকার সানুনয় বাক্য সকল বলিতে লাগিল[৩,৬]।

অমাত্যেরা বলিল, মহারাজ! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ কালে সীমান্ত-বাসী যে শত্রু রাজাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন, এই অনপত্য ও মৃত রাজা সেই ব্যক্তি। সুতরাং ইহা আপনারই প্রাক্তন রাজ্য। অতএব, আপনি ইহা পালন এবং আমাদের প্রতি দয়া বিতরণ করুন। আমরা বিনা আহ্বানে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না[৭,৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা ভগীরথ প্রকৃতিবর্গের প্রার্থনায় সম্মতি দান করিলেন এবং পুনর্ব্বার সপ্তসাগরচিহ্নিত ভূমণ্ডলের প্রধান রাজা হই-লেন। ইনি রাগ দ্বেষ মাৎসর্য্যাদির অতীত, মৌনী ও শান্তচিত্ত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে রহিলেন[৯,১০]। এই সময়ে তিনি লোক পরম্পরায় শ্রুত হইলেন যে, এক মাত্র গঙ্গাজলই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাতালতলে কপিল-ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, গঙ্গাজলসেকে তাঁহাদের উদ্ধার হইতে পারে বটে, পরন্তু তাহা এক প্রকার অসম্ভবের ও অনাশ্বাসের বিষয়। কেননা তখন গঙ্গা পৃথিবীতে বহমানা নহেন। ভগীরথের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ন্যায় আরও অনেক লোকের পূর্ব্বপুরুষ গঙ্গাজল অপ্রাপ্তে দুর্গতি ভোগের অধিকারে রহিয়াছিল[১১,১২]। ভগীরথ যেদিন গঙ্গাজলের অভিহিত মহিমা শ্রবণ করিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে গঙ্গাবতারণের উদ্দেশে নিয়ম ধারণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার স্থাপন করিয়া পুনঃ অরণ্যবাসী হইলেন এবং উৎকটতর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। বর্ষসহস্র যাবৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পৃথিবীর সহিত গঙ্গার সংযোগ সাধন করিলেন[১৩,১৪]। সেই দিন হইতে জগৎপতি শঙ্করের অঙ্গসঙ্গিনী অমলতরঙ্গভঙ্গিনী নভস্তল হইতে পৃথিবীতে আপতিত হইয়া

ত্রিধারারূপে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্ফুরত্তরঙ্গভঙ্গিনী ও ফেনপুঞ্জহাসিনী গঙ্গা যেন ভগীরথের যশঃ প্রচারের জন্যই পৃথিবীতে ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন[১৬,১৭]।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি ভগীরথের দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া, ভগীরথের ন্যায় জ্ঞানী হইয়া, সমব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া, যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল বিভব ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ এ সকলের আসক্তি মন হইতে উন্মার্জ্জিত করিয়া শিখিধ্বজ রাজার ন্যায় আত্মারাম হইয়া স্থিতি কর[১,২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, শিখিধ্বজ কে? কিরূপে তিনি পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন? আমাকে বলুন[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পূর্ব্বকল্পে তোমাদের ন্যায় যে এক দম্পতী ছিলেন; অগ্রিম দ্বাপরে ঠিক্ সেই রূপের এক দম্পতী হইবে[৩]।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ভিন্ন অথচ আপনি বলিলেন, অতীতের সদৃশ ভবিষ্যৎ, এরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি, তাহাও আমাকে বলুন?[৫]

বশিষ্ঠ বলিলেন, জগন্নির্ম্মাতা ব্রহ্মাদি সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাদের সঙ্কল্প অন্যথা হইবার নহে। এবং সেই সঙ্কল্পের নামই নিয়তি অর্থাৎ সৃষ্টির নিয়ম। এই সৃষ্টিনিয়মই কারণ, অন্য কারণ নাই। সৃষ্টি নিয়তির ক্রম এই যে, কোন কোন বস্তু বহু ও বহুবার হয়, আবার কোন কোন বস্তু পূর্ব্বে হয় নাই, পরে হয়। আবার কোন সৃষ্টি এক বারই হয়, বহু ও বহুবার হয় না। একই আম্রবৃক্ষে পুনঃ পুনঃ বহু আম্রফল জন্মে ও সে সকল পূর্ব্বেরই সদৃশ হইয়া জন্মে। স্কন্ধবট এক বারই হয়, ছিন্ন

হইলে আর তাহাতে হয় না। মনুষ্যসংসারেও এইরূপ নিয়তি বা সৃষ্টি-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অতএব, শিখিধ্বজের ন্যায় ভবিষ্যতেও শিখিধ্বজ হইবে, সেই শিখিধ্বজও বর্ণ্যমান কথার নায়ক হইতেও পারেন[৮।৯]। অতএব, যে শিখিধ্বজ পূর্ব্ব দ্বাপরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেইরূপ এক শিখিধ্বজ ভবিষ্যৎ দ্বাপরেও হইবেন। তদ্দৃষ্টান্ত বলি, শ্রবণ কর[১০]।

এই জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী উজ্জয়িনী নগরে শিখিধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি কুরুবংশীয়। এই শিখিধ্বজ ধৈর্য্য ঔদার্য্য শম দম ক্ষমা, নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত[১১।১২]। ইনি শূর, সদাচারী, সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ও ধনুর্দ্ধরদিগের জেতা ছিলেন[১৩]। নানা প্রকার পূর্ত্ত কার্য্যের কর্ত্তা, পৃথিবীর ভর্ত্তা, পণ্ডিত, সুন্দর, শান্তস্বভাব, প্রতাপশালী ও ধার্ম্মিক ছিলেন, দাতা, ভোক্তা, সৎসঙ্গকারী ছিলেন এবং বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অথচ নিরভিমানী ছিলেন[১৪।১৬]। বালক কালে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহারই পরে ইনি ষোড়শ বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয় কার্য্যে লিপ্ত হন এবং ক্রমে সমুদায় শত্রুকে বশীভূত করেন[১৭]। সম্রাট হইয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। একদা বসন্ত সমাগমে শৈত্যমান্দ্য মলয়ানিল প্রবাহিত ও নানা প্রকার কুসুম বিকাশ প্রভৃতি হইতে দেখিয়া এই রাজাধিরাজের মনে কান্তা বিলাসের ইচ্ছা আবির্ভূত হইল। কুসুমসৌরভ মত্ত হওয়ায় তদীয় মন কান্তা ব্যতীত অন্য কোন পদা-র্থকে তৃপ্তিজনক বলিয়া বোধ করিল না[১৮।২০]। কবে আমি পদ্ম-কুট্মলস্তনী প্রণয়িনী ক্রোড়ে ধারণ করিব? কবে আমার অঙ্কে পুষ্পিত-লতাভিলাষিনী ভুবনমোহিনীর অবস্থান হইবে[২০।২১]? কবেই বা তাদৃশী ইন্দু সুন্দরী আমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলিতা হইবে? রাজা এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তার বশ্য হইয়া বন, উপবন, উদ্যান প্রভৃতি মনোরম স্থানে বিহরণ করিতে লাগিলেন এবং শৃঙ্গাররসোদ্দীপক কথায় মনোমগ্ন করিতে লাগিলেন[২৮।৩১]। তাহার হৃদয়ে সুন্দরী কুমারীই শ্রেষ্ঠ বস্তু, এইরূপ সঙ্কল্প উথিত হইতে লাগিল। অনন্তর মন্ত্রিবর্গ তাঁহার বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে আন্তরিক ভাব বুঝিলেন, পরে তাঁহার বিবাহের জন্য যত্নতৎপর হইলেন[৩২।৩৩]। সুরাষ্ট্র দেশের রাজার একটী যৌবনান্বিতা পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, রাজার বিবাহের জন্য তাহারা সেই কন্যা প্রার্থনা

করিলেন, অনন্তর সেই কন্যার সহিত রাজার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। রাজা শিখিধ্বজ এই চূড়ালা নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, কন্যা চূড়ালাও স্বানুরূপ ভর্ত্তা প্রাপ্তে নংপরোনাস্তি পরিতুষ্টা হইলেন। সূর্য্যদেব যেমন পদ্মিনীকে বিকশিত করে, রাজা শিখিধ্বজও সেইরূপ নবপত্নীর মুখপদ্ম বিকসিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রণয় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল[৩৪।৩৭]। রাজা শিখিধ্বজ মন্ত্রীর প্রতি সমুদায় রাজ্যভার অর্পণ করতঃ প্রিয়তমা পত্নীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কখন উদ্যানে, কখন বিহারে, কখন লতাগৃহে, কখন পুষ্পপূর্ণ প্রদেশে, কখন চন্দন বনে, কখন পুরমধ্যে, কখন সরোবরে, কখন বা বনান্তে ও দিগন্তে বাস করিতে লাগিলেন [৩৮।৪১]। জল, জঙ্গল ও বৃক্ষ, প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের আহ্লাদজনক হইয়াছিল। সর্ব্বদা অবিযুক্ত থাকায় ও পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হওয়ায় তাঁহারা উভয়েই শিল্পগীতাদিবিদ্যায় পণ্ডিত ও পণ্ডিতা হইলেন। পরস্পরের হৃদয় পরস্পরে অর্পিত হইয়াছিল, এবং রাজা শিখিধ্বজ অনুকূলা পত্নীর নিকট গান বাদ্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন[৪২।৪৭]। যেন শরীরমাত্র দুই, পরন্তু হৃদয় এক। যেমন অমাবস্থায় চন্দ্রসূর্য্যের একত্রাবস্থান এবং শিব ও শিবার একত্রাবস্থান, সেইরূপ, শিখিধ্বজ ও চূড়ালার একত্রাবস্থান দৃষ্ট হইয়াছিল। উভয়েই সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, যেন কমলা ও কমলাপতি এক কার্য্য সাধনার্থ পৃথিবীতে আসিয়াছেন, যেন তাঁহারা উভয়ে সমবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন[৪৮।৫০]। যেন একযোগে দুই শশধর উদিত হইয়াছে এবং যেন দুই রাজহংস ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের কুহরে বিরাজ করিতেছে[৫১।৫২]।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

——()•()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই দম্পতি যৌবনলীলায় বহুবর্ষ অতিবাহন করিলে, ক্রমে তাঁহাদের তারুণ্য বিগলিত হইল[১]। দেহ তরঙ্গের ন্যায় ভঙ্গুর-স্বভাব, ইহার পতন পক্ক ফলের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং মরণ অনি-বার্য্য[২।৩]। যেমন অম্ভোজে হিমপাত, তেমনি, যৌবত্ত দেহে জরার আবির্ভাব। জল যেমন অঙ্গুলির মধ্য দিয়া বিগলিত হয়, সেইরূপ, আয়ুও ক্রমে গলিত হয়। যৌবন গিরিনদীর ন্যায় বেগে চলিয়া যায়, কেবল বৃদ্ধি পায়—ভোগতৃষ্ণা[৪।৫]। ইন্দ্রজাল যেমন অসত্য, সেইরূপ, জীর্ণ দেহের অবস্থান অসত্য। সুখ দূরে পলায়ন করে, চিত্ত দুঃখে নিমগ্ন হয়। বর্ষার জলে বুদ্বুদ যেরূপ অস্থায়ী, এই শরীরও সেইরূপ অস্থায়ী[৬।৭]। কদলী বৃক্ষের অভ্যন্তর যেরূপ অসার, দেহব্যবহারের অভ্যন্তরও সেইরূপ অসার। যৌবন অধিক কাল থাকে না, শীঘ্র চলিয়া যায়[৮]। অরতি অর্থাৎ দুর্ম্মনস্তা আসিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে। এইরূপ বলিলে যথেষ্ট বলা হয় যে, এই সংসারে স্থির ও বাস্তব সু-শোভন কিছুই নাই। এমন কোন অবস্থা দেখা যায় না, যাহা পাইয়া জীব পুনর্দ্দুঃখের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে। উক্ত দম্পতি এই-রূপ বিবেচনা করিয়া সংসার ব্যাধির মহৌষধ যে বিচার, তৎপরায়ণ হইলেন[৯।১০]। দীর্ঘকাল অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলেন, এবং বুঝি-লেন, এক মাত্র আত্মজ্ঞানই সংসার ব্যাধির ঔষধ। ঐরূপ বোধসম্পন্ন হইয়া সেই দম্পতি সদা আত্মনিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাদের মন, প্রাণ, চিত্ত, সমস্তই আত্মনিষ্ঠ হইল। হে রামচন্দ্র! তাঁহারা ঐরূপ আত্ম-পূজায় ব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বোধ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত হইতে লাগিলেন। অনন্তর চূড়ালা আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের প্রমুখাৎ সর্ব্বদা মোক্ষোপযোগী বাক্য সমুদায় শ্রবণে অভ্যস্তা হইলেন এবং মনে মনে দিবা রাত্র আত্মবিচার করিতে লাগি-লেন[১১।১২]। কার্য্যব্যাপৃতা ও স্বার্থ্যপরিত্যক্তা, কোনও অবস্থায় তিনি

আত্মবিচার বর্জ্জিতা থাকিলেন না। সর্ব্বদাই আমি কি? কোথা হইতে ও কিরূপে এই ব্যামোহ-অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম? মোহ বস্তুতঃ কাহার? এ মোহ কোথা হইতে ও কিরূপে হইল? মোহ ধর্ম্মটী কাহার? আত্মা অসঙ্গস্বভাব, সুতরাং আত্মার নহে। আত্মায় যে মোহের উপলব্ধি, তাহা জড় দেহের সংসর্গে আরোপ মাত্র, বাস্তব নহে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দেহ ব্যতিরিক্ত নহে[১৬।১৮]। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও দেহের অংশ, সেজন্য তাহাও দেহের ন্যায় জড়। সঙ্কল্পশক্তিমৎ মনও পরাধীন বলিয়া জড়, তথা নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিও পরপ্রকাশ্য বলিয়া জড়া[১৯।২১]। অহঙ্কারও তাদৃশী বুদ্ধিতে বাহিত হয়, সেজন্য অহঙ্কার শবের ন্যায় অচেতন[২২]। জীবই তাহার জনক ও তাহা ভ্রমাত্মক। জীব চেতনাকাশ, প্রাণরূপ উপাধিতে প্রকাশমান[২৩]। এই জীব সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বচৈতন্যে পরিপূর্ণ, এবং বিষয় প্রকাশের সাক্ষী স্থানীয়[২৪]। এই জীবই উক্ত প্রকারে সেই পুরাতন—যৎপরোনাস্তি পুরাতন আত্মা ও চিদ্রূপী[২৫]। সুগন্ধ ও বায়ু যেমন এক বপু, সেইরূপ, জীবও মিথ্যা জড়ের ও চিতের অধ্যাসে এক বপু[২৬]। যেমন জলমধ্যগত অগ্নি আপনার রূপ পরিত্যাগ করে, তেমনি, একাদ্বয় মহাচিৎ স্বকল্পিত চেত্যের মধ্যপাতী হইয়া আপনার প্রকৃত রূপ পরিত্যাগ করিয়া এই জীবরূপে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে[২৭।২৮]। জড় মাত্রেই অসৎ, যে হেতু সে চৈতন্যের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়।

চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। এখন তাঁহার স্থির হইল যে, এত কাল পরে আমি আমার জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বুঝিয়াছি[২৯।৩০]। মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এ সমস্তই চিতের (আত্মচৈতন্যের) বিলাস, পৃথক্ পদার্থ নহে[৩১]। একমাত্র মহাচিৎই আছে, তাহা মহাসত্তা নামের নামী[৩২]। সেই মহাসত্তায় কলঙ্ক নাই, বৈষম্য নাই, সুতরাং তাহা শুদ্ধা ও অহং-বৃত্তির উপরে বিকাশমানা। তাহা, বিশুদ্ধ সম্বিৎ, কেবল সৎ, অচ্যুত ও পরম শিব[৩৩]। শাস্ত্রকারেরা এই মহাসত্তাকেই স্বপ্রকাশ, নির্ম্মল, নিত্যোদিত, পরব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি নামে গান করেন[৩৪]। চেত্য, চেতন, চিত্ত, এ সকল উক্ত মহাসত্তার অতিরিক্ত নহে। ইহাই মূল চিৎ এবং ইহারই দ্বারা আর সব চেতিত হইতেছে। (জীব পক্ষে চেতিত, অজীব পক্ষে প্রকাশিত)। এই

মহাসত্তা অচেত্য অর্থাৎ চিত্তের উপরে। পরন্তু চিত্ত ও চেত্য সমুদায় উক্ত মহাসত্তারই রূপ বিশেষ। এই মহাসত্তাই মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও সে সকলের বিষয় রূপে প্রকাশ পাইতেছে। জল যেমন তরঙ্গ, কণা ও কল্লোলাদিরূপে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ। এই যে জগৎ আছে বলিয়া ভাসমান হইতেছে, এ ভাসমানতা উক্ত মহাচিত্তের। যে হেতু জগৎসত্তা (জগতের অস্তিত্ব) এতদীয় আশ্রয় চিৎসত্তার অধীন বলিয়া অভিন্ন, সেই হেতু ইহা মায়ামাত্র[৩৫।৩৯]। যেমন নানা নাম-রূপাদি বিশিষ্ট অলঙ্কার সুবর্ণের অনতিরিক্ত, সে সকল সুবর্ণই, অন্য কিছু নহে, এবং সে সকল নাম রূপের লয় হইলে সুবর্ণ মাত্র অবশেষিত হয়, সেইরূপ, জগৎ প্রলয়ে সেই মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মাই অবশেষিত হন। স্বপ্নে চিত্তই দ্রবরূপী অর্থাৎ জলরূপী হইয়া সমুদ্রাদির আকারে প্রথা প্রাপ্ত হয়, তদ্‌দৃষ্টান্তে স্পষ্ট বুঝা যায়, মহাচিৎসত্তাই জগৎরূপে প্রথা প্রাপ্ত হন[৪০।৪১]। যেমন চিদ্রূপ আত্মাই স্বপ্নকালে জলরূপী হন, সেইরূপ অহঙ্কারাতীত চিৎ পদার্থই "অহং আমি" এতদাকারে স্ফুরিত হইতেছে[৪২]। সুতরাং জন্ম, মরণ, সদ্‌গতি, অসদ্‌গতি, নাশ, এ সকল প্রথা জগতে সত্যতঃ অসম্ভব[৪৩]। ইনি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, ও অদাহ্য। অহো! সেই আমি এতকাল পরে আজ্ চির-কালের নিমিত্ত শান্ত ও নির্ব্বাপিত হইলাম[৪৪]। মন্থন শেষে নির্ম্মন্দর সমুদ্র যদ্রূপ অচঞ্চল হইয়াছিল, ভ্রম মুক্ত হওয়ায় আজ্ আমি তদপেক্ষা অধিক নির্ব্বিক্ষেপ হইয়াছি[৪৫]। এই আত্মাকাশ অবাধ, অগাধ, অমল ও অনন্ত। সুরাসুরযুক্ত এই বিশ্বও উক্ত অকৃত্রিম আত্মার ভ্রমময় রূপ। যেমন প্রতিমূর্ত্তি পদার্থে স্ত্রী পুরুষ ভাব কল্পিত, সত্যতঃ সে সমস্তই মৃত্তিকা, তেমনি, এই বিশ্বও কল্পিত, সত্যতঃ এ সকল পর-মাত্মা[৪৬।৪৭]। দ্রষ্টৃসত্তা ও দৃশ্যসত্তা চিন্মাত্র মহাসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তাহা, দ্বিত্ব একত্ব, আমি ও আমি নহি, এ সকল ভাব সম্মোহ বা ভ্রম। ভ্রম বা মোহ বিনষ্ট হওয়ায় আমি এখন অনন্ত, অনায়াস, ও যৎপরোনাস্তি শান্ত। আমি নির্ব্বাণতা প্রাপ্ত ও গতজ্বর হইয়াছি। চেতন রূপেই হউক, অচেতন রূপেই বা হউক, ভোক্তৃ রূপে হউক, আর ভোগ্য রূপেই বা হউক, যাহা যাহা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে সে সমস্তই সদা স্বপ্রকাশ আত্মার অনতিরিক্ত। যাহা সদা স্বপ্রকাশ আত্মা তাহাই

ব্রহ্ম এবং তাহা চিদাকাশ আমি। রজ্জুতে যেমন সর্প নাই, তেমনি চিদাকাশে এ সকল নাই, আমিত্ব নাই, ভাব অভাব, কিছুই নাই। তাহা শান্ত, সর্ব্ব, নিরালম্ব, কেবল ও সর্ব্বমূল[৪৮।৫১]।

বিচারপরায়ণা চূড়ালার হৃদয়ে এইরূপ প্রবোধ উদিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় হইতে রাগ দ্বেষ ভয় মোহ ও তমোগুণের সমুদায় কার্য্য তিরোহিত হইল এবং শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও পরম শোভা ধারণ করিল[৫২]।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ।

——()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, চূড়ালা ঐরূপে অনুক্ষণ স্বাত্মারাম অবস্থায় অবস্থান করায় ক্রমে তাঁহার স্বভাবিকী আত্মপ্রতিষ্ঠা জন্মিল[১]। রাগ, আসক্তি, দ্বন্দ্ব ও চেষ্টা তাঁহা হইতে অপগত হইল। তিনি ত্যাগ ও গ্রহণ জন্য উদ্যুক্তা রহিলেন না[২]। তিনি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূরগত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরাত্মা পরমাত্ম-লাভে পূর্ণ হইয়াছে[৩]। তাঁহার দীর্ঘকালের ভ্রান্তি অপগত হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রান্তা। যত উপমা থাকুক, তিনি সে সমুদায়ের অতীত হইয়াছেন। বরবর্ণিনী চূড়ালা অতি স্বল্পকালেই বিদিত-বেদ্যা হইলেন[৪।৫]। তাঁহার জগদ্ভ্রম যে স্থান হইতে আসিয়াছিল সেই স্থানে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ণিত প্রকার বিশ্রান্তি পদে স্থিতি করায় চূড়ালার শোভা সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইল[৬।৭]। আত্মবিবেক অভ্যস্ত হইল, অব্যাকুলা স্থিতি উপস্থিত হইল এবং পুষ্পিত লতিকার অনুরূপ শোভায় সুশোভিতা হইলেন[৮।৯]। অনন্তর রাজা শিখিধ্বজ একদা চূড়ালার তাদৃশী অভূতপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন[১০]। তন্বি! তোমার যৌবন কি পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়াছে? তোমার শোভা

যে অনেক অধিক দেখিতেছি! হে প্রিয়ে! যে অমৃত পান করিয়াছে, যে অলভ্য লাভ করিয়াছে, সে যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তোমাকে আজ্ তদ্রূপ আনন্দপূর্ণ দেখিতেছি[১১,১২]! তুমি শান্তিযুক্ত অথচ কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ! হে কামিনি! তুমি শোভায় চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছ[১৩]! হে প্রিয়ে! আমি দেখিতেছি, তুমি ভোগরূপণ নহ, তোমার চিত্ত প্রশান্ত ও গম্ভীর[১৪]। আমি দেখিতেছি, তোমার মন জগৎকে তৃণ তুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে। হে মহাভাগে! ক্ষীর-সমুদ্রের সহিতও তোমার তুলনা হয় না[১৫,১৬]। তোমার সেই প্রাক্তন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়কে যেন আরও অধিক সুদৃশ্য বোধ করিতেছি[১৭]। সেই অঙ্গ, সেই প্রত্যঙ্গ, সেই হস্ত, সেই মুখ, তথাপি লতা যেমন ঋতুপরিবর্ত্তে অন্যাকার হয়, সেইরূপ তোমাকেও অন্যাকার দেখিতেছি[১৮]। তুমি কি অমৃত পান করিয়াছ? না সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছ? অথবা কোন যোগ শক্তিতে মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছ[১৯]? হে নীলোৎপল-লোচনে! বোধ হয়, তুমি এমন কিছু পাইয়াছ, যাহা রাজ্য, চিন্তামণি ও লোকত্রয়ের আধিপত্য অপেক্ষাও অধিক[২০]।

চূড়ালা বলিলেন, মূঢ়জনপ্রসিদ্ধ দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী। পরিচ্ছিন্ন ও তুচ্ছ এ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন আত্মা আশ্রয় করিয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী[২১,২২]। যাহা কিছু ও কিছু না, অর্থাৎ সৃষ্টি দর্শনে কিছু ও প্রলয় দর্শনে কিছু না, তাহা জানিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি শ্রীমতী। আমার রোষ তোষে ও ভোগ অভোগে সমান ভাব, তাই আমি শ্রীমতী[২৩,২৪]। আকাশের ন্যায় কেবল অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহে এক, এরূপ বুদ্ধিতে রমণ করি, রাজলীলায় রমণ করি না, তাই আমি শ্রীমতী[২৫]। আসন, উদ্যান, গৃহ, সর্ব্বত্রই আত্মনিষ্ঠ থাকি, এবং ভোগে ও লজ্জায় থাকি না, সেই কারণে আমি শ্রীমতী[২৬]। জগতের প্রভু অথচ কিছু নহি, এতদ্রূপ জ্ঞানে পরিতুষ্টা, তাই আমি শ্রীমতী। আমিই এ সমস্ত, পরন্তু এ সমস্ত আমি নহি এবং আমিই সত্য অথচ অহং আমি নহি। যে হেতু সমস্তই আমি, সেই হেতু আমি শ্রীমতী[২৭,২৮]। আমি সুখ চাহি না, অসুখ চাহি না, কিছুই চাহি না, যথোপস্থিত বিষয়ে দ্রষ্টা থাকি, তাই আমি শ্রীমতী[২৯]। যে প্রজ্ঞার দ্বারা রাগ ও বিদ্বেষাদি

কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টি এই দুই সখীর সঙ্গে ক্রীড়া করি, সেই কারণে আমি শ্রীমতী[৩০]। হে নাথ! নয়ন রশ্মির দ্বারা যাহা দেখি, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা দেখি, অধিক কি বলিব, চিত্তের দ্বারাও যাহা দেখি, সে সমস্তই মিথ্যা। ঐ সকলের অতীত ও ঐ সকলের অন্তরে নিষ্প্রপঞ্চ বস্তু সদা দর্শন করি, সেই কারণে আমি অত্যন্ত শ্রীমতী হইয়াছি[৩১]।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা শিখিধ্বজ চূড়ালার ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারিলেন না। না বুঝিয়া উপহাস সহকারে বলিতে লাগিলেন[১]। হে বরবর্ণিনি! তুমি প্রলাপ বলিতেছ ও অল্পবুদ্ধি হইয়াছ। আমি এ সকল আকার পরিত্যাগ করিয়া যাহার আকার নাই; তাহা পাইয়াছি বা হইয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী, এ কথা প্রলাপ। যাহার কোনও আকার নাই, সে ত শূন্য! শূন্যের আবার শোভা কি[২।৩]? ভোগ না করিয়া পরিতুষ্ট বলিয়া পরিচয় দেওয়া ও যান আসন শয্যাদি পরিত্যাগ করা ত ক্রোধের কথা। যে ক্রুদ্ধ, তাহার আবার শোভা কি[৪]? যে ব্যক্তি ভোগ অভোগ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইয়া একাকী আকাশে অবস্থান করে ও তাহাতেই সুখ বোধ করে, তাহার আবার শোভা কি? ঐরূপ স্থিতি পিশাচের[৫]। যাহাদের ধৈর্য্যবল অধিক থাকে, তাহারা বলপূর্ব্বক শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ধারণ (সহ্য) করিতে পারে বটে, পরন্তু তাহা শোভা বৃদ্ধির কারণ নহে। আমি দেহাদি নহি, দেহাদিও আমার নহে; এ কথা বিস্পষ্ট প্রলাপ[৬।৭]। যাহা দেখি তাহা কিছুই নহে, যাহা কিছুই নহে; তাহাই দেখি, এ উক্তি নিতান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ[৮]। তাই বলিতেছি, তুমি হয়

অপক্কবুদ্ধি ও চঞ্চলমতি, না হয় তোমার ঐ সকল কথা বিলাস ক্রীড়া। আমি জানি, সুন্দরীরা ক্রীড়া কৌতুকের জন্য নানা প্রকারের আলাপ প্রলাপ করিয়া থাকে! রাজা শিখিধ্বজ ঐরূপ বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাধ্যাহ্নিক কার্য্য করিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন[৯।১০]। রাজা আত্মায় বিশ্রান্ত হইতে পারেন নাই ও চূড়ালার বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, ইহাতে চূড়ালা কিছু খিন্না হইলেন, অনন্তর তিনিও স্বকার্য্য করণে প্রবৃত্তা হইলেন[১১]। ঐরূপে বহুবর্ষ অতীত হইলে একদা চূড়ালার মনে আকাশে গমনাগমন করিবার ইচ্ছা হইল[১২।১৩]। অনন্তর সেই রাজকন্যা খেচরত্ব সিদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিতে প্রবৃত্তা হইলেন[১৪।১৫]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! কি স্থাবর কি জঙ্গম, সমস্তই ক্রিয়া নিষ্পন্ন অর্থাৎ বিনা ক্রিয়ায় কোনও কিছু উৎপন্ন হয় না। পরন্তু কাহার ক্রিয়ায় ঐ সকল সিদ্ধি জন্মে? আত্মা ত নিষ্ক্রিয় স্বভাব[১৬।১৭]? আত্মজ্ঞ অনাত্মজ্ঞ উভয়বিধ লোককেই সিদ্ধ হইতে দেখা যায় এবং কেহ বা সিদ্ধির জন্য কেহ বা কেবল কৌতুকের জন্য সাধন অনুষ্ঠানে রত হয়। তাই আমার জিজ্ঞাসা—কি প্রকারের লোক সকল সিদ্ধি লাভ করে[১৮]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সাধ্য বা সাধনার বস্তু ত্রিবিধ। হেয়, উপাদেয় ও উপেক্ষ্য[১৯]। আত্মবিজ্ঞানের অনুকূল উপাদেয়, তাহার প্রতিকূল হেয়, এবং যাহা হেয়ও নহে, উপাদেয়ও নহে, তাহা উপেক্ষ্য। অপিচ, যাহা সুখের সাধন, তাহা উপাদেয়, যাহা সুখের বিরোধী তাহা হেয়, এবং যাহা হেয়ও নহে উপাদেয়ও নহে, তাহা উপেক্ষ্য। এই তিন্ বিভাগ অজ্ঞদিগের পক্ষে ব্যবস্থিত, পরন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। কেননা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্তই আত্মা, সেজন্য তাঁহাদের পক্ষে ঐ তিন্ বিভাগ অসম্ভব[২০।২২]। কদাচিৎ উপেক্ষা পক্ষ সম্ভবে ও জ্ঞানীরা কখন কখন লীলার জন্য তাদৃশ উপেক্ষা পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সিদ্ধি উপার্জ্জনের ক্রম বলি, শ্রবণ কর[২৩।২৪]। সিদ্ধি লাভের প্রতি দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য, এই চার প্রকার কারণ দেখা যায়। তন্মধ্যে ক্রিয়াই প্রধান, আর সব সহকারী। উক্ত কারণ চতুষ্টয়ের মেলনে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়। একতরাদির অভাবে বিলম্বে সিদ্ধি

লাভ হয়[২০,২৬]। উড্ডামর তন্ত্র ও যোগিনীসাধন প্রভৃতি গ্রন্থে নানা প্রকার সিদ্ধির উপায় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে আকাশগমনাগমনের জন্য গুটিকাসিদ্ধি, অঞ্জনসিদ্ধি, পাতুকাসিদ্ধি ও খড়্গসিদ্ধি প্রভৃতি উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। পরন্তু ঐ সকল সিদ্ধি অত্যন্ত দোষাবহ ও জ্ঞানীর পক্ষে বিঘ্নকর[২৭]। রত্ন, ওষধি, তপস্যা ও মন্ত্র, এ সকলের দ্বারাও সিদ্ধ হওয়া যায়, পরন্তু তাহাও তত্ত্বজ্ঞানের শত্রু। শ্রীপর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হইলেও তাহার জ্ঞানবিঘ্নকারিত্ব নিবারিত হয় না[২৮,২৯]। অতএব, আমি তোমাকে শিখিধ্বজ-কথা উপলক্ষ্যে পবনাভ্যাসরূপ উপায় বর্ণন করি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[৩০]।

পবনাভ্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে আগে যম নিয়মাদি নামক যোগাঙ্গ শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে অন্তঃস্থ বাসনানিচয় ত্যাগ করিতে হয়, তৎপরে স্থানকাদি আসন আয়ত্ত করিতে হয়, এবং হিত মিত মেধ্য ভক্ষ্য অবলম্বন, শুদ্ধাচারী ও সৎশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে হয়। শুদ্ধাচার, বিশুদ্ধ ভক্ষ্য ভক্ষণ, শাস্ত্রার্থ ধ্যান, সদাচারতৎপরতা, সাধুসংসর্গ, সর্ব্বত্যাগিতা ও আসন জয় সম্পন্ন হইলে ও প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হইলে যথাকালে কোপ, লোভ, ভোগ, বৈরাগ্য ও প্রাণবায়ুর রেচন পূরণ ও স্তম্ভন অত্যন্ত অভ্যস্ত হইলে, প্রাণের প্রতি যোগীর প্রভুত্ব জন্মে অর্থাৎ প্রাণ অপান সমানাদি সংজ্ঞক বায়ু ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত হয়[৩১,৩৪]। হে রঘুনাথ! রাজ্য হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যে কোন সম্পদ, সমস্তই প্রাণানিল জয়ের দ্বারা লাভ করা যায়[৩৫]। শত শত নাড়ীর আশ্রয় আন্ত্রবেষ্টনিকা নাম্নী নাড়ী মর্ম্মস্থানে পরিমণ্ডলাকারে স্থিত আছে। এই আন্ত্রবেষ্টনিকা বীণার মূল ভাগে যে তন্ত্রাবর্ত্তক রেখা থাকে, তাহার অথবা জলের আবর্ত্তনের অনুরূপ আকার বিশিষ্ট। ইহার গঠন প্রণবাক্ষরের অর্দ্ধ অঙ্কনের সদৃশ। এই আন্ত্রবেষ্টনিকা যে কেবল মনুষ্য প্রাণীর, তাহা নহে। দেব অসুর যক্ষ রাক্ষস ও পশু পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মূল মর্ম্মস্থানে বিরাজিত[৩৬,৩৮]। শীতকাতর সুপ্ত সর্পের ফণার অনুরূপে মণ্ডলীভূত ও শুভ্রবর্ণ এই আন্ত্রবেষ্টনিকা গুদদ্বার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মনোবৃত্তির দ্বারা অনুস্যূত এবং প্রাণ বৃত্তির দ্বারা চঞ্চলা[৩৯,৪০]। ইহারই অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী শক্তির স্থিতি। এই কুণ্ডলিনী শক্তির অন্য নাম পরা

শক্তি ও চিচ্ছক্তি। আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীণাতন্ত্রী যেমন অনবরত গতিযুক্তা হয়, এই চিৎশক্তি তদ্রূপ অনবরত উর্দ্ধাধোগতি যুক্তা। এই শক্তিই অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তির প্রাণ স্বরূপ[৪১।৪২]। এই শক্তিই প্রাণকে নিরন্তর অধঃ উর্দ্ধে প্রেরণ করিতেছে। প্রাণ হৃদয়াবচ্ছিন্ন কুণ্ডলিনী সংযোগে আন্তঃকরণিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, এবং ইহারই বিশেষ বিশেষ স্ফুরণে বিশেষ বিশেষ কার্য্য অর্থাৎ দর্শন স্পর্শনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়[৪৩।৪৬]। এই কুণ্ডলিনীর সহিত হৃৎকোষস্থ সমুদায় নাড়ীর সম্বন্ধ। এবং তদ্দ্বারাই তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন। প্রাণবায়ুর অন্তঃপ্রবেশ ও বহিরাগতি, এই দুই কার্য্যের দ্বারা সেই সেই নাড়ীর সঙ্কোচ বিকাশ হইয়া থাকে[৪৭।৪৮]।

রাম বলিলেন, চিৎপদার্থ সর্ব্বত্রাবস্থিতা, সেজন্য তাহার সর্ব্বত্র সমান প্রকাশ থাকাই উচিত। পরন্তু আপনি বলিলেন, নাড়ীমূলস্থ কুণ্ডলিনী পদার্থে তাহার উদয় দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? তাহা বলুন[৪৯]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, চেতনা বস্তু সকল সময়ে ও সর্ব্বত্র সংবিদিত হয় বটে; পরন্তু ভূততন্মাত্রার বশে অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ আধারে কিছু অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আতপ যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ভিত্তি প্রভৃতিতে অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় চিদ্বস্তুও কোন কোন দেহে অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়[৫০।৫১]। উপাধির মালিন্য অনুসারে চিতের প্রকাশ ও অপ্রকাশ সংঘটনা হয় এবং তদনুসারেই কোন কোন দেহে চৈতন্যের অদর্শন, কোন কোন দেহে চৈতন্যের অধিক স্ফূর্ত্তি ও কোন কোন দেহে তাহার উচ্ছেদ কল্পিত হইতেছে[৫২]। হে অনঘ! এই রহস্য তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, মনুষ্য দেহে সংবিদের ক্রম কিরূপ[৫৩]। একাদ্বয় চিদ্বস্তু আকাশের ন্যায় অসঙ্গ ও ব্যাপ্তিস্বভাব[৫৪]। তোমারও নিজ সম্বিদ্ সেই অনাময় পদার্থ, পরন্তু তন্মাত্রপঞ্চকে (লিঙ্গশরীরে) প্রতিবিম্বরূপে আবিষ্ট হওয়ায় পঞ্চ ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। সেই একই সম্বিৎ লিঙ্গশরীরে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেন দুই হইয়া পড়িয়াছে। (অর্থাৎ এরূপ ভ্রম হইতেছে যে, জীব যেন একটী স্বতন্ত্র পদার্থ)[৫৫।৫৬]। সঙ্কল্প মাত্র উপলক্ষ করিয়া তিনি আগে পাঁচ প্রকার তন্মাত্রারূপী হন, পরে সেই সকলের কিয়দংশে লিঙ্গশরীর ও কিয়দংশে বাহ্যব্রহ্মাণ্ডরূপী

হন। দেহ ও বিষয় প্রভৃতি বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের অন্তভূর্ক্ত[৫৭,৫৮]। অতএব, এই দৃশ্য জগৎ তন্মাত্রাপঞ্চকেরই প্রস্পন্দ অর্থাৎ কার্য্য এবং সেই জন্য চিৎসম্বিদ্ সর্ব্বত্র বা সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপে গণ্য হইতেছে[৫৯]। সেই কেবল বা একক চিৎপদার্থ তন্মাত্রাপঞ্চকের বশে দেহাদিতে চেতন ও স্থাবরাদিতে অচেতন বা জড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। জলে বীচি বা লহরী দৃষ্ট না হইলে সেই স্তব্ধীভূত জলকে যেমন স্থল বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেইরূপ, স্থাবরাদি পদার্থগত স্তব্ধীভূত চৈতন্যও জড় বলিয়া প্রখ্যাত হয়[৬০,৬১]। সমুদ্রের অচঞ্চল ভাব ও চঞ্চল ভাব যদ্রূপ, শরীরভেদে চেতনার ভাবও তদ্রূপ। অর্থাৎ স্থাবরাদিতে জড়ভাব ও মনুষ্যাদি শরীরে জীবভাব[৬২-৬৩]। এক বস্তু ঐরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয় কেন? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎ-কর। কেননা ভাব অভাব সমস্তই পূর্ব্ব বাসনার অনুগামী। বাসনার বিপর্য্যয় কেন? এ আপত্তিতেও ফলোদয় নাই। যে আপত্তিতে অনা-পত্তি ফল ফলে সেই আপত্তি উত্থাপ্য, নচেৎ বৃথা আপত্তি অনুত্থাপ্য। আকাশকে কি কেহ মুষ্টিক্ষেপ্য করিতে পারে[৬৪,৬৮]? অতএব, বাসনা সত্ত্বে সমস্তই সম্ভবে, বাসনাক্ষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বাত্মলাভ কালে প্রভেদ না থাকায় আপত্তি অনাপত্তি দুএর কিছুই থাকে না[৬৯]। স্থাবর জঙ্গমে বাসনা সুপ্তকল্প এবং দেব অসুর মনুষ্যে জাগ্রৎকল্প। স্থাবরাদি জীব মলিন বাসনা যুক্ত বলিয়া মলিন, অস্বস্থ, পরন্তু যাহারা বাসনা মুক্ত হইয়াছে তাহারাই মুক্ত সংজ্ঞার সংজ্ঞী। অতএব, বাসনামুক্তিই মুক্তি, আর বাসনার বেষ্টনই (বাসনার দ্বারা জড়িত হওয়াই) বন্ধন। দেহ, দেহের বাহ্য ও অভ্যন্তর, হস্ত পদ মস্তকাদি, সমস্তই তন্মাত্রাপঞ্চকের স্তূপ হইলেও বাসনা অনুসারে ঐ সকল নাম কল্পিত[৭০,৭২]। পশুতে পদচতুষ্টয়, শৃঙ্গ ও পুচ্ছ, পক্ষিতে চঞ্চু, চরণ, পদ ও পুচ্ছ, সর্পে ফণা ও পুচ্ছ, এবং কৃমি কীট পতঙ্গাদিতে বাসনানুরূপ ব্যবহার নিষ্পাদনার্থ অবয়ব সকল কল্পিত রহিয়াছে[৭৩]। হে সাধো! পাঁচ তন্মাত্রার রাশিই (পরমাণু রাশির) এবম্বিধ বিচিত্র আকারে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে। তন্মধ্যে যাহা ঐ সকলের আধার তাহা নির্ব্বিকার, অজড় ও সৎ, পরন্তু যাহা সেই আধারের আধেয়, তাহা সবিকার, জড় ও অসৎ[৭৪]। হে মহারাজ! অনন্ত ভেদ বিশিষ্ট এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বীজ একটী। সেই একই হইতে এই শূন্যকল্পা বিচিত্র বৃক্ষ জন্মিয়াছে। উক্ত বৃক্ষের

পুষ্প ইন্দ্রিয়, বিষয় সকল সৌগন্ধ, ইচ্ছা সকল ভ্রমরী, ক্রিয়া সকল মঞ্জরী, স্বর্গাদি লোক গুল্ম বা বিটপ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত মুল, মেঘ সকল পল্লব, দিক্ সকল লতা, প্রাণী সকল এই সৃষ্টিরূপ আকাশ বৃক্ষের ফল[৭৫,৭৮]। হে রামচন্দ্র! এই বৃক্ষ স্বয়ং যথাকালে জন্মে আবার যথাকালে বিনষ্ট হয়। স্বয়ংই নানাত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জড় ভাব ও বিবেক ভাব এই দুই ভাব স্বয়ং উৎপন্ন হয়[৭৯,৮১]।

হে রাঘব! তন্মাত্রাপঞ্চকের যে রাশি (অর্থাৎ দেহী) বিবেকের বশ্য হয় সেই রাশিই বিচিত্র মায়িক বিলাস হইতে উত্তীর্ণ হয় সুতরাং সে রাশি আর এরূপ সংসার স্থিতিতে থাকে না[৮২]।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ।

——()•()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই স্থূল পঞ্চকের (দেহের) অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী, ইহাতে সূক্ষ্ম পঞ্চকের (লিঙ্গ দেহের) বীজ ভূতসূক্ষ্ম প্রথমে প্রাণাদি পঞ্চকরূপে স্ফূরিত হয়। সেই কুণ্ডলিনী প্রাণাদি বায়ুধর্ম্মে ও নিজধর্ম্মে স্পন্দ, স্পর্শ, সম্বিৎ, এই ত্রিরূপিণী হইয়া চিৎকল্প ও জীব, মন, সঙ্কল্প, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পুর্য্যষ্টক, এই সকল নাম লাভ করে। এই কুণ্ডলিনী এই দেহে পশ্চাচ্চক্র নামে ও আকারে স্থিতি করিতেছে। যথা—কলনা বা কল্পনা কার্য্যের দ্বারা নাম কলা, চেতনা কার্য্যের দ্বারা চিৎ, জীবন কার্য্যের দ্বারা জীব, মনন ক্রিয়ার দ্বারা মন, সঙ্কল্প (ইচ্ছা) ক্রিয়ার দ্বারা সঙ্কল্প, বোধ কার্য্যের দ্বারা বুদ্ধি, অহং আমি এই অভিধান ধারণ দ্বারা অহঙ্কার। এইরূপে পুর্য্যষ্টক অভিধা প্রাপ্ত হইতেছে[১,৪]। কুণ্ডলিনীই অপান বৃত্তি অবলম্বনে অধোবাহিনী, উদান বৃত্তি অবলম্বনে ঊর্দ্ধবাহিনী ও সমান বৃত্তি অবলম্বনে দেহের মধ্য স্থানে স্থিতা। অপানের নিম্নাকর্ষণ ও উদানের ঊর্দ্ধাকর্ষণ এই দুএর দ্বারা মধ্যবর্ত্তী সমান

স্থির থাকে। অর্থাৎ লিঙ্গকে বহিষ্কাশিত হইতে দেয় না[৫,৬]। মধ্যাবস্থিত সমান অধঃ উর্দ্ধ গমনের সাম্য বিধান না করিলে মনুষ্যের মৃত্যু হয় ও নানা প্রকার আধি ব্যাধি জন্মে। তাই যোগী ঋষিরা বলেন, যদি প্রাণ ও অপানের গতি নিরোধ অভ্যস্ত করা যায় তাহা হইলে সমান বৃত্তির প্রাবল্য জন্মে এবং তদ্দ্বারা অন্যান্য বৃত্তি বশ্য হওয়ায় ব্যাধিক্ষয় ও মৃত্যু বিজয় নামক সিদ্ধি জন্মে[৭,৯]। শরীরে প্রধান নাড়ী এক শত, পরন্ত শাখা নাড়ী অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রধান নাড়ীর বৈষম্যে প্রধান রোগ ও শাখা নাড়ীর বৈধর্ম্ম্যে অল্প রোগ হইয়া থাকে[১০]।

রাম বলিলেন, হে মুনীশ্বর! আধি ও ব্যাধির উৎপত্তি ও বিনাশ যথাযথ বর্ণন করুন[১১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আধি ও ব্যাধি দু-ই দুঃখের কারণ এবং তদ্দ্বয়ের নিবৃত্তিই সুখ। উক্ত কারণ দ্বয়ের যে বিনাশ, আত্যন্তিকী নিবৃত্তি, তাহাকেই মোক্ষ বলিয়া জানিবে[১২]। এই কুৎসিত শরীরে কখন বা আধি ও ব্যাধি ক্রমসংলগ্ন হইয়া জন্মিতেছে, কখন বা একই সময়ে ও অক্রমে জন্মিতেছে, আবার কখন বা পর্য্যায় নিয়মে জন্মিতেছে[১৩]। দৈহিক দুঃখ ব্যাধি ও মানস দুঃখ আধি। এই আধি বাসনাময় ও অজ্ঞতামূলক সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানে তাহার বিধ্বংস সম্ভব হয়[১৪]। তত্ত্বজ্ঞান না থাকায় মূর্খেরা রাগ দ্বেষাদিতে রত হয়। ইহা পাইলাম, আমায় পাইতে হইবে, এইরূপ চেষ্টায় মুগ্ধ হয়। সেইজন্য নানা আধি (মানসী ব্যথা) জন্মে[১৫,১৬]। অদম্য ইচ্ছা, দোষ গুণ বোধের অভাব, কুভক্ষ ভক্ষণ, দুর্দ্দেশ বাস, অযোগ্য কালের ব্যবহার, দুষ্ক্রিয়ায় রতি, দুর্জ্জনের সংসর্গ, দুর্ভাবের উদ্ভাবন, এই সকল হইতে শরীরস্থ নাড়ীরন্ধ্রে অন্নরসের প্রপূরণ ও অপূরণ অথবা বাতাদি পদার্থের দ্বিগুণিত প্রবেশ ঘটে, তাহা ঘটিলে দেহ বিকলীকৃত ও ব্যাধিদুঃখে আক্রান্ত হয়। বর্ষা ও গ্রীষ্ম নিমিত্তক নদীর বৈপরীত্য হওয়ার ন্যায় দেহেরও ব্যাধি ও নির্ব্যাধি নিমিত্তক বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে[১৭,২০]। ব্যাধি জন্মের কারণ দুটী অর্থাৎ ঐহিক ও প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে উপস্থিত হয়। হে রাঘব! ভূতপঞ্চকময় দেহে এইরূপে আধি ব্যাধি জন্মে, এক্ষণে উহাদের প্রক্ষয় যাহাতে হয় তাহা বলি শ্রবণ কর[২১,২২]।

ব্যাধি দ্বিবিধ। সামান্য ও সুদৃঢ়। সামান্য ব্যাধি ব্যবহারমূলক, এবং সুদৃঢ় ব্যাধি জন্মাদি বিকার। যোগ্য অন্ন পান ও ঔষধাদির দ্বারা সামান্য ব্যাধি উপশান্ত হয়, পরন্তু জন্মরূপ সুদৃঢ় ব্যাধি আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না[২৩,২৫]। আধি ও ব্যাধি উভয়ের মধ্যে আধি বিনাশই সার, কেননা আধিই সকল দুঃখের মূল। সামান্য ব্যাধি, দ্রব্য মন্ত্র শুভানুষ্ঠান ও চিকিৎসক দিগের উপদিষ্ট প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়, এবং স্নানাদি উপায়েও বিনষ্ট হয়[২৬-২৮]।

রাম বলিলেন, ভগবন্! আধি হইতে ব্যাধি জন্মে কি প্রকারে এবং কি প্রকারেই বা মন্ত্রাদির দ্বারা তাহার বিনাশ হয়, তাহা আমাকে বলুন[২৯]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিত্ত আধির দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে দেহও সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তি সম্মুখে কি তাহা দেখে না, তাহা না দেখিয়া অপথে পদার্পণ করে। অর্থাৎ প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত পথে গমন করে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, সংক্ষোভ উপস্থিত হইলে প্রাণ বায়ুর সাম্য ভঙ্গ হয়, তাহাতে সে বৈষম্যবাহী হয়। প্রাণ বৈষম্যবাহী হইলেই নাড়ী সকল বিসংস্থিতি হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক সংস্থানে থাকে না। তাহাতে কোন নাড়ী পুর্ণ ও কোন নাড়ী রিক্ত হইয়া পড়ে। প্রাণ সঞ্চারের ঐরূপ বৈগুণ্যে কুজীর্ণ, অজীর্ণ ও অতিজীর্ণ প্রভৃতি দোষ ঘটে[৩০,৩৫]। সমানাখ্য প্রাণ বায়ু ভুক্তান্ন রসের সাম্য বিধান করে, পরন্তু সে বিধান ভঙ্গ হওয়ায় বৈষম্য হেতু ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এইরূপে আধি হইতে ব্যাধির সম্ভব হয় এবং আধির অভাবে ব্যাধিরও অভাব হয়। মন্ত্রের দ্বারা ব্যাধি বিনাশ কেন হয় ও কিরূপে হয় তাহা বলি, শ্রবণ কর[৩৬,৩৮]। যেমন হরীতকী স্ব স্বভাবে বিরেচন কার্য্য করে, তেমনি, য র ল ব প্রভৃতি মন্ত্র বর্ণও মন্ত্র প্রয়োক্তার ভাবনায় ব্যাধি বিনাশকারী হয়[৩৯]। হে সাধো! পবিত্রতা, পুণ্য কার্য্য ও সাধু সেবার দ্বারা মন নির্ম্মল হয়, মনের নৈর্ম্মল্যে আধিও বিনষ্ট ও আনন্দ বর্দ্ধিত হয়[৪০,৪১]। মনের শুদ্ধতায় এই শারীর বায়ু প্রাণও যথোচিত বহমান হয়, তাহাতেও পরিপাক ক্রিয়া উত্তমরূপ নির্ব্বাহিত হওয়ায় ব্যাধি বিনাশ হইয়া থাকে[৪২]। আধি ব্যাধির জন্ম ও বিনাশ যে ক্রমে হয় সে ক্রম বলিলাম, এক্ষণে প্রকৃত কথা

বলি, শ্রবণ কর[৪৩]। যাহার অন্য নাম পুর্য্যষ্টক ও লিঙ্গদেহ, সেই জীবের পরমাশ্রয় প্রাণনামিকা কুণ্ডলিনী, তিনি শক্তি নামে পরিচিতা। পুরক যোগে উক্ত প্রাণ যদি কুর্ম্ম নাড়ীতে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় (কণ্ঠ কূপের অধোভাগে বক্ষঃ প্রদেশস্থা কুর্ম্মাকারা নাড়ী কুর্ম্মনাড়ী), তাহা হইলে শরীর সুমেরুরন্যায় গুরুভার হয়। অর্থাৎ গরিমা-সিদ্ধি জন্মে। প্রাণ যদি পূরক যোগে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমায়াত হয় তাহা হইলে আকাশগতিরূপা সিদ্ধি জন্মে[৪৪,৪৮]। যোগীরা অভ্যাস পটুতার দ্বারা ঐরূপে অণিমা ও লঘিমা সিদ্ধি লাভ করেন[৪৯]। রেচক যোগে কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্নানাড়ীবাহিনী হইয়া মূর্দ্ধা প্রদেশে স্থিতি লাভ করিলে সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদি দিগের দর্শন লাভ হয়[৫০,৫১]।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিনা নেত্ররশ্মির দেখা কিরূপ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু রাম! ভূচর মনুষ্যেরা কেহই চক্ষুর দ্বারা আকাশচর সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি দর্শন করে না, করিতে পারেও না। ইহারা জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা সেই সকল দূরস্থ সিদ্ধাদি স্বপ্নের উপমানে দর্শন করিতে পারে[৫২,৫৪]। যেমন স্বপ্নে বিনা চক্ষুতে দর্শন সিদ্ধি হয়, সেইরূপ, জ্ঞান চক্ষুতেও দর্শন সিদ্ধি হয়। পরন্তু স্বপ্নের দেখা অস্থির ও মিথ্যা, আর জ্ঞান চক্ষুর দেখা স্থির ও সত্য[৫৫]। রেচক যোগের অভ্যস্ত হইলে যদি মুখ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দূরে প্রাণের স্থিতি দীর্ঘকাল ব্যাপিনী হয় তাহা হইলে পরশরীর প্রবেশ কারিণী সিদ্ধি জন্মে[৫৬]।

রাম বলিলেন, প্রভো! জগতের সমস্তই মায়াময় বলিয়া অস্থির। অস্থিরতাই জগতের স্বভাব, অথচ আপনি বলিলেন, জ্ঞান চক্ষের দৃষ্ট বস্তু স্থির। ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা আমাকে বলুন[৫৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, পরমাত্মার যে শক্তি স্বভাবনামিকা, সে শক্তি সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত ও প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। ঈশ্বরের সঙ্কল্প অমোঘ, সেইজন্য বস্তু স্বভাবের অবস্থান প্রলয়াবধি স্থায়ী[৫৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কাষ্ঠ ও ক্রকচ উভয়ের সংশ্লেষে ছেদন ক্রিয়া জন্মে। উহার ন্যায় প্রাণ অপান উভয়ের সংঘর্ষে স্বভাবের ব্যবস্থায় জঠর প্রদেশে বহ্নি (উষ্মা) আবির্ভূত হয়। এই কুৎসিত দেহ যন্ত্রের জঠরপ্রদেশে পরস্পর শ্লিষ্টমুখ ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ আশ্রয়ী ভস্ত্রাদ্বয়ের অনুরূপে পদ্মাকার

মাংসখণ্ড রহিয়াছে। তদ্দ্বয়ের মূলভাগে প্রাগুক্ত কুণ্ডলিনী নিজ স্থানে নিলীন আছেন[৬৯,৬৪]। সেই কুণ্ডলিনী অনুক্ষণ চলন দ্বারা সূক্ষ্ম শব্দযুক্তা এবং দণ্ডাহত ভুজগীর ন্যায় পরিবর্ত্তনবতী। রুদ্রাক্ষ মালা জপ কালে যেরূপ অস্পষ্ট সূক্ষ্ম শব্দ হয় কুণ্ডলিনী সেইরূপ শব্দকারিণী। ইনিই প্রাণী দিগের জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় শক্তির কারণ[৬৫,৬৭]। এই বাহ্য বায়ু যেমন এই বিশাল বহিরাকাশে তৃণ কাষ্ঠাদি সঞ্চালিত করে ও কাল প্রভাবে সে সকলকে জীর্ণ করে সেইরূপ, অন্তরাকাশেও প্রাণবায়ু ভুক্তান্ন পরিপাক করতঃ সে সকলের সার সর্ব্বশরীরগামী করে। প্রাগুক্ত হৃৎপদ্মনাড়ীরূপ ভস্ত্রা প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আহত অর্থাৎ সঞ্চালিত হয়, তাহাতেই ভুক্তান্ন দ্রব ভাব ধারণ করে। সেই দ্রবীভূত সার বা রস শিরা পথে হৃদয় (হৃদয়=হৃৎপিণ্ড) প্রবিষ্ট হইয়া রক্তাকার ধারণ করে, ক্রমে মাংসাদি রূপে দেহলগ্ন হয়। উক্ত প্রকারেই জঠ-রাগ্নির সর্ব্বদেহব্যাপিতা ও তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ঔষ্ণ্য অনুভূত হয়[৬৮,৭১]। যোগীরা হৃৎপদ্মে সেই তেজকে তারকাকৃতি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন এবং চিদ্রূপে চিন্ত্যমান সেই তেজো দ্বারা তাঁহারা দূর-ব্যবহিত পদার্থ নিচয় দর্শন করেন। লক্ষ্য যোজন দূরে থাকিলেও তাহা যোগীর তদ্রূপ দৃষ্টির দৃশ্য হয়[৭২,৭৩]। যেমন বাড়বাগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ) সমুদ্রজল, সেইরূপ, শরীরস্থ অন্ন রস হৃৎসরোবরস্থ জাঠরাগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ)[৭৪]। সেই স্বচ্ছ ও শীতল অন্নরসময় জল ইন্দুর অংশ। এই ইন্দু অংশই শরীরস্থ বাড়বাগ্নিতুল্য বহ্নির উত্থান স্থান। এইরূপে এই দেহ অগ্নিসোমাত্মক[৭৫]। যে কিছু উষ্ণা সে সমস্তই তেজ, অর্ক ও অগ্নি নামের নামী এবং যে কোন শৈত্য সে সমস্তই সোম নামের নামী[৭৬]। এই জগৎ ঐরূপে অগ্নিসোমাত্মক অর্থাৎ শৈত্যজাড্যসমন্বিত অথবা প্রকাশ ও উষ্ণ সম্মিলিত। যাহা হইতে এতাদৃশ জগৎ নিষ্পন্ন হইতেছে সেই মায়াশবল ব্রহ্মও সদসদাত্মক অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের অপার্থক্য বা একযোগ। তন্মধ্যে বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান) সূর্য্য ও অগ্নিস্থানীয় এবং অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান ও জড়তা প্রভৃতি সোম স্থানীয়[৭৭,৭৮]।

রাম বলিলেন, বায়ুরূপ সোম হইতে বহ্নির উদয় হয় ইহা বুঝি-য়াছি, পরন্তু সোমের উৎপত্তি প্রকার বুঝিতে পারি নাই[৭৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অগ্নি ও সোম পরস্পর কারণ কার্য্য রূপে ব্যবস্থিত। উহারা উভয়েই পরস্পর পরস্পরের পরাজয় চেষ্টা করে[৮০]। উহাদের জন্ম বীজাঙ্কুরের ও দিবা রাত্রির অনুরূপে ও উহাদের স্থিতি ছায়াতপের সদৃশী। যুগপৎ উপলব্ধি কালের স্থিতি ছায়াতপের সদৃশী ও ক্রমোপলব্ধি কালের স্থিতি দিন রাত্রির সদৃশী[৮১।৮২]। উহাদের কার্য্য কারণ ভাব দ্বিবিধ। এক ভাব ভাবপরিণাম জনিত ও অপর ভাব ধ্বংস অভাবপরিণাম জনিত[৮৩]। উক্ত পরিণাম ভাব ঘটিত কার্য্য কারণ বুঝিবার স্থল বীজ ও অঙ্কুর। উহাদের একটীর ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি হইলে তাহা হইতে অন্যটীর ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি হয়। আর বিনাশ পরিণাম বুঝিবার দৃষ্টান্ত দিবস ও রাত্রি। উহাদের অন্যতর বিনাশে অন্যতরের বিনাশ আপনা আপনি সম্পন্ন হয়[৮৪।৮৫]। মৃত্তিকা ও ঘট উভয়ের যদ্রূপ পরিণাম প্রত্যক্ষ ও দিন রাত্রি এতদুভয়ের বিনাশ পরিণামও তদ্রূপ অনুপলব্ধি প্রমাণ সিদ্ধ[৮৬।৮৭]। যাহারা কার্য্য কারণ ভাবে অনাস্থা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বভাবাতিরিক্ত জগৎ কর্ত্তা অস্বীকার করে, তাহারা স্বানুভব গোপন করে বা অনুভব বিরুদ্ধ কথা বলে বলিয়া তাহাদিগকে অনাদর পূর্ব্বক তর্ক স্থান হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত[৮৮]। হে রঘুনন্দন! প্রত্যক্ষ যেরূপ প্রমাণ, অভাব বা অনুপলব্ধিও তদ্রূপ প্রমাণ। অগ্নির অভাব যে, শীতের কারণ, প্রমাণ; তাহা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণের বিদিত। অগ্নি ধূমরূপে আকাশগত হইয়া মেঘাকার ধারণ করে, এস্থলে অগ্নি যদ্রূপ পরিণাম দ্বারা সোমের কারণ হয়, আবার বিনষ্ট অগ্নি যখন শৈত্য সমুৎপাদন করিয়া যে বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই অগ্নি বিনাশ পরিণাম সোমের কারণ হইয়া থাকে। বাড়বানল নিজেই ধুমোদ্গীরণ দ্বারা মেঘাকার ধারণ এবং সপ্ত সমুদ্রের জলরাশি উৎপাদন করে। সেইরূপ সূর্য্যদেবও কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যা পর্য্যন্ত নিশানাথ চন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া সারস যেমন ভুক্ত মৃণাল উদ্গীরণ করে, তেমনি শুক্লপক্ষে পুনর্ব্বার সোমকে উদ্গীরণ করেন[৮৯।৯৩]। চন্দ্রশোভাকর বসন্ত (উষ্ণযুক্ত) ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রাণবায়ু পৃথিবীস্থ অমৃতোপম রস গ্রহণ করে এবং বর্ষা সমাগমে পরিপুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার জল দ্বারা ধরাতল পরিপূর্ণ করে। অথবা, জল ও সূর্য্য সমাকৃষ্ট হইয়া তাহা রশ্মি ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা তাহার সদ্রূপ পরিণাম।

অতএব, এ স্থলে জলই তেজের কারণ। আর জল যে, স্বীয় শীতলতা ও দ্রবত্ব ত্যাগ করিয়া উষ্ণত্ব ও রূক্ষত্ব ধারণ করিয়া অগ্নি ভাব প্রাপ্ত হয়, এ অংশে অগ্নি সমুৎপাদন ও জলের বিনাশ পরিণাম বলিয়া গণ্য[৯৫।৯৬]। অগ্নি বিনাশ দশায় সদৃপ পরিণামে চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং চন্দ্রও বিনষ্ট হইয়া সদৃপ পরিণামে হুতাশনত্ব লাভ করে। হুতাশনও বিনাশাখ্য পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সোম হয়। যেমন, দিবসের বিগমে রাত্রি হয়, তদ্রূপ[৯৭,৯৮]। আলোক ও অন্ধকার, ছায়া ও প্রকাশ, এবং দিন ও রাত্রি, উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ সন্ধি বা সম্মীলন দশায় যে একটী বিশেষ রূপ আছে, তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও উপলব্ধি করিতে পারেন না। সান্ধ্য দশায় উক্ত তমঃপ্রকাশাদির নাশ হয় না। এই সন্ধি উহাদেরই আকৃতি বা অবস্থা বিশেষ। আলোক ও অন্ধকার যেমন স্বরূপতঃ নিরপেক্ষ ও ভাবরূপে এবং অভাবরূপেও স্থিত হয়, সন্ধি দশাতে তদ্রূপই থাকে[৯৯।১০০]। জগতে অন্ধকার ও প্রকাশ দ্বারা যেমন অহোরাত্র সম্পাদিত হয়, তেমনি চৈতন্য ও জাড্য উভয় যোগে সমস্ত ভূতগণ সব্যাপার হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলস্থ অমৃত (জলীয় পরমাণু) যেমন জলে প্রতিবিম্বন দ্বারা মিশ্রিত হইয়া শীতল চন্দ্রমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তেমনি, এই জগৎ চিৎ-ব্রহ্মে জড়মায়ার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে[১০১।১০২]। হে রঘুনন্দন! স্বতঃপ্রকাশ অনল ও সূর্য্যকে চিৎস্বরূপ এবং সোম শরীর-কে তমোময় জড় বলিয়া জানিও। যেমন গগনগত সূর্য্য দৃষ্ট হইবামাত্র নৈশ অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, বিমল চিৎসূর্য্য হৃদয়াকাশে দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ সংসার বিনিবৃত্ত হয়[১০৩।১০৪]। সূর্য্যপ্রভাময় অগ্নি চন্দ্রমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিবিম্বরূপী চন্দ্রকে প্রকাশিত করে, চৈতন্যও জীবরূপে দেহে আবিষ্ট থাকিয়া জীবিত কাল পর্য্যন্ত প্রভা (আমি, আমার ইত্যাদি ভাবনা) প্রকটিত করে। যেমন সূর্য্যপ্রভাই অবিবেক বশতঃ অস্মদাদির নিকট ইন্দুরূপ ধারণ করে, তেমনি, চিৎ ব্রহ্মও "আমি মনুষ্য" ইত্যাদি অধ্যাস দোষে দেহস্থ জীবভাব প্রাপ্ত হয়। আলোক যেমন দীপভাব প্রাপ্ত না হইলে উপলব্ধিযোগ্য হয় না; তেমনি, নিষ্ক্রিয় কেবল চৈতন্যও নাম অর্থাৎ দেহাদি উপাধি সম্বন্ধ ব্যতীত অনুভাব্য হয় না[১০৫।১০৭]। চিন্ময় আত্মার বিষয়াভিমুখতা বা বিষয় সংবেদনই সংসার, এবং তৎপরিত্যাগে অর্থাৎ বিষয় পরিত্যাগে যে কল্যাণ

প্রাপ্তি, তাহাই নির্ব্বাণ। কুড্য (ভিত্তি) ও আলোক যেমন পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া প্রতীতিগম্য হয়, তেমনি, দেহাভাবে আত্মার স্ফুরণ থাকে না, আত্মার অস্ফুরণেও দেহ থাকে না, এই কারণ, পরস্পর সাপেক্ষ-স্বভাব দেহদেহীকেও অগ্নিষোমময় (চিজ্জড়াত্মক) জানিবে। অগ্নির সম্পূর্ণভাবে কাষ্ঠাদি উপাধি রহিত হইলেই যথার্থ রূপ প্রকাশ পায়, জল শিলাদি ভাবে জাড্যাধিক্য হইলে সোমেরও (জড়ের) প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়[১০৮,১০৯]। উষ্ণাত্মক প্রাণই অগ্নি, এবং শীতল অপান বায়ু সোম স্বরূপ, ছায়া ও আলোকের মত বিপরীত স্বভাব এ উভয়, উভয় পথে প্রবাহিত হয়। প্রতিবিম্ব যেমন আদর্শে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ উষ্ণস্বভাব প্রাণাগ্নিও শীতল অপানে অধিষ্ঠান (আশ্রয়) লাভ করে। সূর্য্য যেরূপ স্বীয় প্রভা দ্বারা বাহিরে নিজ প্রতিবিম্বকে উদ্ভাসিত করে, মুখ্য প্রাণরূপ চিৎ অগ্নিও পদ্মাকার ষট্‌চক্র স্থিত বাক্যময় সোমকে স্বীয় অনুভূতি বা স্ফূর্ত্তি দ্বারা উদ্ভাবিত করে[১১০।১১৩]। সৃষ্টির প্রথমে যেরূপ মায়াসম্বলিত ব্রহ্ম সম্বিৎই শীত উষ্ণাদি বিবিধ ভাবে "অগ্নীষোম" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন ব্যষ্টি ভূত শরীর নির্ম্মাণেও সেই সম্বিৎই অগ্নীষোমরূপে বিরাজ করিতেছে[১১৪]। সূর্য্য অর্থাৎ প্রাণ-রূপ তেজ যে হৃদয়াকাশে চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা গ্রাস করিয়া ষোড়শী কলা অবশিষ্ট রাখে (এ স্থলে চন্দ্র শব্দের অর্থাৎ অপান বায়ু) এবং সেই ষোড়শী কলা মুখমার্গ হইতে প্রাদেশ মাত্র বিনিঃসৃত অবস্থায় থাকে, তুমি তাহাতে অবস্থিত হও অর্থাৎ যোগনিষ্ঠ হও। যে হৃদয়াকাশে সোমই সূর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ প্রকাশময় ভাবে বহিরবস্থান করে, তাহাতে সমাহিত হও। উষ্ণ স্বভাবকে অগ্নি ও চিৎসূর্য্য এবং শৈত্য স্বভাবকে সোম বলা হইয়াছে; যেখানে এই সোম সূর্য্য বা শৈত্য ঔষ্ণ্য পরস্পর প্রতিবিম্বিত আছে, তাহাতে স্থির চিত্ত হও অর্থাৎ প্রাত্মস্বরূপে স্থিত হও। হে রাঘব! দেহ মধ্যে সোম, সূর্য্য ও অগ্নির পরস্পর সংযোগ কিরূপে হয়, তাহা সম্যক্ অবগত হও, হইলে তখন বাহ্য জগতের সমস্ত বস্তু তৃণতুল্য হেয় হইয়া যাইবে[১১৫।১১৮]।

হে রামচন্দ্র! তুমি যদি প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস বলে প্রাগুক্ত সংক্রমণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাত্মক সংবৎসরকে বাহ্যানুভূত ঘটপটাদির ন্যায় অভ্যন্তরে ও যথাযথ রূপে সাক্ষাৎ করিতে পার, তবেই যোগ

মার্গে অধিকারী হইবে, কিন্তু সেরূপ না করিয়া বিষয়াসক্ত হইলে কখনও অধিকারী হইতে পারিবে না[১১]।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যোগিগণের দেহ যেরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাব প্রাপ্ত হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর[১]।

সন্ধ্যাকালীন মেঘমধ্যগত বিদ্যুতের ন্যায় হৃৎপদ্মের ঊর্দ্ধ কর্ণিকার অভ্যন্তরে যে স্বর্ণ ভ্রমরের মত বহ্নিকণা আছে, বাত্যার (বাত্যা=বায়ু সমূহ) ন্যায় বর্দ্ধনোপায় জ্ঞান দ্বারা সেই বহ্নি বৃদ্ধি পায়, এবং সূর্য্যের মত জ্ঞানরূপে দেহকে সমুদ্ভাসিত করে। অনন্তর, অগ্নি যেরূপ স্বর্ণকে দ্রবীভূত করে, তদ্রূপ সেই বর্দ্ধমান অগ্নিও হস্তপদাদি অঙ্গসমেত সমস্ত দেহকে দ্রবীভূত করে, সেই অগ্নির প্রভা প্রভাতগগণে উদীয়মান সূর্য্যের সদৃশ। সেই অগ্নি স্বকীয় স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা যোগে জলের বিমর্দ্দক হয় (বিমর্দ্দক=স্থূলতা নাশক অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণু ক্ষয় করে)। তাহাতে দেহস্থ জল শোসন করিয়া ও দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া মনে বা লিঙ্গশরীরে অবস্থান করে। বাত্যাস্পর্শে হিম যেমন অন্তর্হিত হয়, তেমনি, প্রাণের পরিস্পন্দ বশতঃ সেই অগ্নি দেহদ্বয় (স্থূল ও সূক্ষ্ম) পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়। তখন, অগ্নি হইতে বিনির্গত ধূম রেখার ন্যায় কুণ্ডলিণী শক্তি মূলাধার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আতিবাহিক দেহস্থ আকাশে অবস্থান করেন[২।৭]। সেই কুণ্ডলিনী শক্তি মনোবুদ্ধিময় সূক্ষ্ম শরীরে অহং ভাব স্থাপন করেন। ধূমের অভ্যন্তরে যেরূপ সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ প্রভা থাকে, সেইরূপ, তাঁহারও অভ্যন্তরে নিয়মিত জ্ঞান শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার ফলে সে আবশ্যকমতে মৃণাল, পর্ব্বত, তৃণ, ভিত্তি, পাষাণ, আকাশ ও ভূতল—যেখানে যেরূপে যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে অবাধে যাইতে পারে। চর্ম্ম

নির্ম্মিত ভস্ত্রা (কূপ হইতে জল তুলিবার এক প্রকার পাত্র) যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ, সেই কুণ্ডলিনী শক্তিই ক্রমশঃ রসাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। চিত্রকর যেমন প্রথমে মনে মনে রেখা কল্পনা করে, অনন্তর সেই রেখাই বাহিরে আকৃতি (ছবিরূপ) ধারণ করে; হে রামচন্দ্র! রসপূর্ণা সেই যোগিশক্তিও ভাবনার অনুরূপ বাহ্যরূপ ধারণ করে। দেহের বীজশক্তি মাতৃগর্ভে যেরূপ অস্থি প্রভৃতি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ, দৃঢ়তর ইচ্ছা বলে ভাবি শরীরের অস্থি প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। হে রাঘব! সেই জীবশক্তি যেরূপ আকার ও পরিমাণ চিন্তা করে, তদনুসারে মহৎ সুমেরু প্রভৃতি ও সূক্ষ্ম তৃণাদি রূপে পরিণত হইতে পারে৮।১৩।

হে রামচন্দ্র! যোগলভ্য অণিমাদি সিদ্ধির কথা শ্রবণ করিলে; এখন শ্রবণপ্রিয় জ্ঞানলভ্য বিষয় শ্রবণ কর।

এ সংসারে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর, অলক্ষ্য, নির্দ্দোষ ও প্রশান্তরূপ একমাত্র চিৎই সৎ। জগৎ বা জগতের পরিস্পন্দ কখনও সৎ নহে। সেই চিৎই যখন মায়ার আবেশে ("বহু হইব ও জন্মিব" ইত্যাদিরূপে) সঙ্কল্প দ্বারা আপনি আপনাকে অধ্যস্ত করে; তখনি মলিন ভাব প্রাপ্ত সেই চিৎ "জীব" সংজ্ঞা লাভ করে। বালক (অনভিজ্ঞ) যেমন ভ্রম বশতঃ অবিদ্যমান যক্ষকেও সম্মুখে দণ্ডায়মান দর্শন করে, তেমনি, সেই মোহগ্রস্ত জীবও ভ্রান্ত চিন্তার বলে শরীর সন্দর্শন করে। যখন জ্ঞানময় দীপের আলোক উপস্থিত হয়, তখন জীবের সঙ্কল্পভ্রম শরৎকালীন মেঘের মত বিলীন হইয়া যায়, হে রাঘব! তখন সমস্ত বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৈলাভাবে দীপের ন্যায় এই দেহও তখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। লোক যেমন নিদ্রার অপগমে আর স্বপ্ন দেখে না, তেমনি, "সত্য বস্তু" সম্যক্ অবগত হইলে জীবও আর দেহ দর্শন করে না১৪।২০। জীব মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করিয়া দেহসম্বদ্ধ হয় এবং একমাত্র তত্ত্বচিন্তাবলে বিদেহ হইয়া শান্তি সুখ লাভ করে। হে রামচন্দ্র! অনাত্মা দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাই জীবের হৃদয়স্থ তমঃ, ইহাকে সূর্য্যাদির আলোক অপনীত করিতে পারে না। কেবল "আমি সর্ব্বব্যাপী, নিরঞ্জন ও নির্ম্মল চিন্মাত্রস্বরূপ" এইরূপ প্রকৃত আত্মবুদ্ধিরূপ আদিত্যের উদয়ে উহা (তমঃ) বিনষ্ট হয়২১।২৫। আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ অপরেও যাহা যেরূপে

ভাবনা করে, দৃঢ়তর ভাবনার বলে তাহা তদ্রূপেই দর্শন করে। হে রাঘব! মূঢ়জনেরাও দৃঢ় ভাবনার বলে বিষকে অমৃত এবং অমৃতকেও বিষ করিতে পারে। এ জগতে এই প্রকারে অর্থাৎ যাহাকে যেরূপে ভাবনা করা যায়, সেই গাঢ়তর ভাবনার বলে তাহা অবিলম্বে তদ্রূপত্ব লাভ করে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এই দেহ সত্য বুদ্ধিতে দৃষ্ট হয় বলিয়াই দেহ, আবার অসত্য বা মিথ্যা ভাবে দৃষ্ট হইলে এই দেহই ব্রহ্মাকাশরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। হে সাধু রামচন্দ্র! তুমি অণিমাদি সিদ্ধির হেতুভূত জ্ঞানযোগ শ্রবণ করিয়াছ, এখন অপর যোগ শ্রবণ কর[২৬,২৮]।

জীব রেচক প্রাণায়ামাভ্যাস বশতঃ এই দেহ হইতে বহির্নিঃসৃত হইয়া পর দেহে স্থাপিত হইতে পারে। যেমন বায়ুমণ্ডল হইতে পুষ্পগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সংযোজিত হয় সেইরূপ। পরন্তু, সে সময় পূর্ব্ব দেহটী কাষ্ঠলোষ্টবৎ নিস্পন্দ অবস্থায় পরিত্যক্ত থাকে, বস্তুতঃ তখন তাহা পরকীয় দেহ। জীবাত্মারও তাহাতে কোনরূপ আদর থাকে না। অভিলাষানুসারে স্থাবর জঙ্গম যাহাই ভোগ করিতে ইচ্ছা করে; জীব তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট হয়। এইরূপে, সিদ্ধির ফল সম্পৎ ভোগ করার পর পূর্ব্ব দেহ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহাতে আইসে নতুবা অন্য দেহে ইচ্ছামত প্রবেশ করে[২৯,৩২]। অনন্তর সে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্ব জগতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে অবস্থান করে। হে রামচন্দ্র! তখন যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন সেই ব্যক্তি নিত্য নির্দ্দোষ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তৎসমস্তই তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞগণ নিরতিশয় আনন্দকেই যথার্থ অবলম্বনীয় বলিয়া জানেন[৩৩,৩৪]।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

——()•()——

রাজকামিনী সেই চূড়ালা উক্ত প্রকার দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা যোগশক্তি লাভ করিয়া ছিলেন এবং তদ্বলে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্না হইয়াছিলেন। কখনও আকাশ পথে গমন করিতেন, কখনও সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেন, কখন বা পৃথিবীমণ্ডল পর্য্যটন করিতেন, (তথাপি) গঙ্গাপ্রবাহের মত নির্লিপ্তা ছিলেন। যোগ বিশেষের দ্বারা ক্ষণকালও পতির বক্ষঃ ও হৃদয় বিযুক্তা হইতেন না, লক্ষ্মীর ন্যায় সমস্ত রাজ্যে ও জগতে বাস করিতেন। কখন বা বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় উজ্জ্বল ভূষণা হইয়া মেঘ মালার ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করিতেন, কখন বা গীরিরাজির মত ভূতলে অবস্থান করিতেন। মুক্তার অভ্যন্তরে সূত্রের ন্যায় তিনি কাষ্ঠ, তৃণ, পাষাণ এবং ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতে অবাধে প্রবেশ করিতেন। সুমেরু শৃঙ্গে, ইন্দ্রাদি লোকপাল পুরে স্বর্গে ও ভূমির অভ্যন্তরে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেন। পশু, পক্ষী, পিশাচ, সর্প, দেবতা, বিদ্যাধর, অপ্সরা ও সিদ্ধগণের সহিত তিনি ব্যবহার করিতেন[১।৭]। জ্ঞানামৃত লাভের জন্য বহুবিধ যত্ন সহকারে স্বামীকে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতেন না। নৃত্যগীতাদি বিদ্যা নিপুণা মনোরমা চূড়ালা আমার গৃহিণী, রাজা চূড়ালাকে কেবল এইরূপেই জানিতেন। বালক যেরূপ বিদ্যার মহিমা বুঝে না, তদ্রূপ, রাজা তত কালেও তাদৃশ গুণশালিনী চূড়ালাকে বুঝিতে পারিলেন না। শূদ্রকে যেরূপ যাগ ক্রিয়া দেখাইতে নাই, তদ্রূপ, চূড়ালাও নিজের যোগ সিদ্ধি সেই রাজাকে প্রদর্শন করেন নাই[৮।১১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! মহাযোগসিদ্ধিশালিনী চূড়ালার যত্নেও যখন শিখিধ্বজের প্রবোধ হইল না, তখন অপরে কিরূপে বুঝিবে[১২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! ব্যবস্থানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই উপদেশের ফল। হে রাঘব! কারণ সকল কেবল শিষ্যগণের বিমল প্রজ্ঞার দ্বারা ফলবান্ বা সফল হইয়া থাকে[১৩]। পুণ্য সঞ্চয় অথবা

বেদাধ্যয়ন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সর্প যেমন সর্পপদ জানিতে পারে, সেইরূপ, আত্মাই জ্ঞেয় পদার্থকে অর্থাৎ আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে[১৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিবর! গুরুপরম্পরায়, উপদেশই আত্ম-জ্ঞানের কারণ বলিয়া জগতে উল্লেখ আছে, তাহা হইলে ঐ কথার অর্থ কি[১৫]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিন্ধ্যারণ্যে অত্যন্ত কৃপণ এবং বহুধনধান্য সম্পন্ন এক বণিক বাস করিত[১৬]। একদা বন ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বণিকের নিকট হইতে এক কপর্দ্দক জঙ্গলমধ্যে নিপতিত হয়। অত্যন্ত কৃপণতা নিবন্ধন সেই বণিক সমস্ত বনের তৃণাদি অপসৃত করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিল। এই কপর্দ্দক হইতে চারিটী কপর্দ্দক হইবে, চারিটী হইতে অষ্ট, অষ্ট হইতে শত, শত হইতে সহস্র হইবে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দিবা রাত্রি অন-বরত তাদৃশী অবস্থায় সেই স্থানে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিল। সামান্য কার্য্যের নিমিত্তও যদি অধ্যবসায় অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেই বহু ফল লাভ হইয়া থাকে[১৭,২০]। দিবসত্রয়ান্তে সেই অরণ্য হইতে পূর্ণেন্দু সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এক অমূল্য চিন্তামণি সে প্রাপ্ত হইল [২১]। মণি লাভ করিয়া সানন্দ চিত্তে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত জগতের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি এইরূপ চিন্তা করিয়া শান্ত ভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিল[২২]। অহোরাত্র অবিশ্রান্ত অক্লান্তভাবে পরি-শ্রম করিয়া কপর্দ্দক অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কিরাটের ভাগ্যে অমূল্য রত্ন লাভ ঘটিল[২৩]। বেদাধ্যয়ন দ্বারাই যে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে এরূপ কার্য্য কারণ নহে। কেহ বা অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হয়, কেহ বা গুরুক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৪]। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, বেদাদির অগোচর। হে অনঘ! তাই বলিতেছি, কিরূপে বেদোপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইবে[২৫]। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, এ কথা সত্য; পরন্তু তৎপ্রাপ্তির জন্য নিজের দৃঢ় যত্ন করাও আবশ্যক। যেমন কপর্দ্দক অন্বেষণ বিনা চিন্তামণি লাভ হইতে পারে না[২৬]। অকারণও কখন কখন সকারণ হইয়া থাকে। যেরূপ কপর্দ্দক অনুসন্ধান করিতে করিতে চিন্তামণি লাভ হইল এই নিমিত্ত মহার্থ

তত্ত্বজ্ঞান গুরূপদেশ ব্যতিরেকেও কখন কখন লাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ যত্নাতিশয়ে অন্বেষণ করে, কেহ বা সহজে ফল উপভোগ করিয়া থাকে[২৭,২৮]। কেহ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া থাকে, কেহ বা তাহার ফল ভোগ করে। এই নিমিত্ত এই জগৎ ভ্রমময় এই কথাই বলিতেছি[২৯]।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃরশীতিতম সর্গ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, সন্তানাদি নষ্ট হইলে মনুষ্য যেমন শোকান্ধতমস দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অভিভূত হয়, তদ্রূপ, মহারাজ শিখিধ্বজ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া বনমধ্যে আগমন করিলেন[১]। মনুষ্য যেমন অগ্নি শিখাকে সুখালিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে না, তিনিও সেইরূপ, দুঃখাভিভূত হইয়া সমুদায় মণিমানিক্য ও অতুল ঐশ্বর্য্যকে অগ্নি শিখার ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন[২]। দুরাত্মা ব্যাধ হইতে দৈবাৎ রক্ষা পাইয়া মৃগাদি যেরূপ নির্জ্জন গিরি প্রদেশে কিম্বা নির্ঝরিণী তটে কিম্বা নিভৃত গুহা প্রদেশে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তদ্রূপ, তিনিও অরণ্য প্রদেশে আগমন করিয়া শান্তি লাভ করিলেন[৩]। হে মানদ রামচন্দ্র! মহারাজা শিখিধ্বজ দেবতা ব্রাহ্মণ ও স্বজনগণকে অত্যন্ত শ্লাঘনীয় গো ভূমি এবং হিরণ্যাদি দান করিয়াছিলেন[৪,৫]। তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত দুঃসহ চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তীর্থ, বনপ্রদেশ এবং আয়তন (পুণ্যস্থান) সকল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন[৭]। নিধ্যন্বেষী ব্যক্তি নিধিহীন ভূমি খনন করিয়া নিধি না পাওয়ায় যেমন অসন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ, মহারাজ শিখিধ্বজও কোন প্রকারে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না[৮]। সংসার ব্যাধি দুরীকরণাভিপ্রায়ে ঔষধ অন্বেষণের নিমিত্ত দিবা রাত্রি চিন্তা করিয়া দিন দিন কৃশতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন[৯]। রাজ্য বিষতুল্য, এইরূপ

চিন্তাপরায়ণ হইয়া দীন ও খিন্নচিত্ত হইয়া পুরোবর্ত্তী মহাবিভবও পরিলক্ষ্য করিলেন না[১০]। ইত্যবসরে এক দিবস চূড়ালা সমুপস্থিতা হইলে মহারাজ শিখিধ্বজ তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন[১১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমি বহু দিন রাজ্য ও বহু ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। এক্ষণে আমি তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া বন্ গমন করিতেছি[১২]। হে সুমধ্যমে! আমার তাহাতে দুঃখ বা সুখ, বিপদ বা সম্পদ, বিবেচনা করিতেছি না। বনবাসী মুনিদিগের সহিত এক্ষণে আমি ক্রীড়া করিতে অভিলাষ করিয়াছি[১৩]। দেশভঙ্গ, জনমোহ বা সংগ্রাম নিবন্ধন জনক্ষয় ইহাতে নাই। আমি বনবাসিমুনিদিগের সুখ রাজ্য-সুখ হইতে অধিক প্রিয়তর বলিয়া অনুভব করিতেছি[১৪]। কুসুমস্তবক যাহার পয়োধর স্বরূপ, রক্তপল্লব সমূহ যাহার পাণিতল, মঞ্জরীজাল সমাযুক্ত বিচঞ্চল অম্বুদ সমূহ যাহার অংশুক, পুষ্পপরাগ যাহার অঙ্গরাগ, কুসুম সমূহ যাহার ভূষণ, কাঞ্চনশিলা যাহার নিতম্বদেশ, মুক্তাকল্প তরঙ্গ-মালা সমাকুলা গিরিনদী সকল যাহার মুক্তামালা এবং মুগ্ধ মৃগকুল যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, স্বভাব সৌগন্ধ্য পূরিত ফল সমূহ যাহার ভোজ্য, ষট্‌পদশ্রেণী যাহার নয়নতুল্য, হে বরাননে! আমি এতাদৃশ রমণীয় বনভূমিতে যেরূপ শান্তি লাভ করিতে পারিব, আমি কৌমুদীরাশি পরিসেবিতা ব্রহ্মসদ্মকেও তদ্রূপ শান্ত্যাস্পদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না[১৫।২০]। অয়ি তনুমধ্যমে! তুমি আমার এই পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। কুলললনাগণ স্বপ্নেও পতির বাঞ্ছিত কার্য্যে বাধা প্রদান করেন না[২১]।

চূড়ালা বলিতে লাগিলেন, হে নরপতি! কাল প্রাপ্ত হইলেই কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। অকালে কৃত কার্য্য কখনই ফল প্রসব করে না। বসন্তকালে পুষ্প সঞ্জাত হইয়া থাকে এবং শরৎ কালে ফল প্রসব করিয়া থাকে[২২]। আধি ব্যাধি জরাযুক্ত দেহধারী গণের বনবাস আশ্রয় কর্ত্তব্য কিন্তু যুবগণ তাই বলিয়া বনবাসাশ্রয় করিবে, এরূপ কখনও সম্ভবপর নহে[২৩]। হে মহারাজ! যৌবন কালে বনবাসাশ্রয় কর্ত্তব্য নহে। পুষ্প কুসুমদাম পরিশোভিত তরুরাজি যতদিন কুসুমিত থাকে, ততদিন স্বাশ্রয়েরই শোভাস্পদ হইয়া থাকে। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিই

বনবাসাশ্রয় করিবে। হংস সকল সরোবর হইতে যেমন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ, আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন[২৪।২৬]। হে নরবর! প্রজাপালন পরিত্যাগ করিয়া অযোগ্য কালে বনবাসাশ্রয় করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে। অকার্য্যানুষ্ঠানকারী নরপতিকে প্রজাকুল প্রতিরোধ করিবে এবং ভূমিপতিও অন্যায়াচরণ হইতে প্রজালোককে নিবারণ করিবেন, ইহাই বিধান[২৭]।

শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, অয়ি নীলেন্দীবর লোচনে! আমার অভিমত কার্য্যে তোমার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে অতিদূরবর্ত্তী বনবাসগামী বলিয়া জানিবে[২৮]। অয়ি অনবদ্যাঙ্গি! তুমি বালা, তোমার বন গমন বিধেয় নহে। পুরুষ হইতে কঠিন হইলেও বনবাস তোমাদের পক্ষে সুদুষ্কর[২৯]। যোষিৎ সকল কঠিন হইলেও বনবাসক্ষম হইতে পারে না। কারণ কাননে কুসুম মঞ্জরী সকল ঝঞ্ঝাবাতাদি সহ্য করিতে পারে না[৩০]। অয়ি সুশীলে! তুমি রাজ্যেই অবস্থান কর, পতি গমন করিলে কুটুম্বভার বহন করা স্ত্রীগণের ব্রত[৩১]।

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, ইন্দুবদনা দয়িতাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া মহারাজ শিখিধ্বজ দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত স্নানার্থ উত্থিত হইলেন[৩২]। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী সূর্য্যদেব সমস্ত জনস্থানাদি পরিত্যাগ করিয়া শিখিধ্বজের বনগমনের ন্যায় প্রজালোকের কার্য্যাদি হইতে অপসৃত হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন[৩৩]। ভবন বিনিষ্ক্রান্ত নরপতির অনুগামিনী চূড়ালার ন্যায় প্রভা সমূহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিল[৩৪]। গঙ্গাধরকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত গঙ্গাদেবী যেমন আগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, ধূলিধূসরিত অবনীমণ্ডলে শ্যামা যামিনী সমাগতা হইলেন[৩৫]। তমালতরুরাজি পরিশোভিতা যমুনা নদী কৌমুদী সমাকীর্ণা হইলে যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, চতুর্দ্দিকে সন্ধ্যাকালীন দীপমালার দ্বারা পরিশোভমানা হইতে লাগিল। সেই সময়ে রাজদম্পতী মেরু প্রদেশের অপর দেশ গমন করিতে উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া বোধ হইল যেন দিনশ্রী ও দিনপতি প্রমোদোদ্যান গমন করিতেছেন[৩৬।৩৭]। মাঙ্গলিক কার্য্যোদ্দেশে দিগ্বধূকরপল্লবাঞ্জলি প্রক্ষিপ্ত লাজ সমূহের ন্যায় তারকারাজি গগনমণ্ডলে সমুদিত হইতে লাগিল। শ্যামা পরিশ্রান্তা কুমুদহাসিনী চন্দ্রাননা কমলকোরক পয়োধরা যামিনী যেন

যৌবন দশায় উপস্থিতা হইলেন৩৮।৪০। সাগর গর্ভে মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় চূড়ালার সহিত রাজা এক শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। গভীর রজনীযোগে জনপদ সমূহ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শান্তি লাভ করিতে লাগিলে যখন প্রকৃতিদেবী নিস্তব্ধা হইলেন এবং রাজ্ঞী চূড়ালা কমলোদরে নিদ্রাভিভূতা ভ্রমরীর ন্যায় দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ তাঁহাকে সেই সময়ে পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্রমণ্ডল রাহু নির্ম্মুক্ত হইলে কৌমুদী যেমন অল্পে অল্পে প্রসারিত হয়, সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল৪১।৪৪। সুনির্ম্মল কান্তিবিশিষ্ট চঞ্চল উর্ম্মিমালা মণ্ডিত ক্ষীরসমুদ্র হইতে হরি যেমন উত্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ, বধূবস্ত্রার্দ্ধ সংযুক্ত শয্যা হইতে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন৪৫।৪৬। বীরধর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্ত আমি যাইতেছি, তুমি এই ব্রত অবলম্বন কর বলিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য গমনে যাত্রা করিলেন। হে রাজলক্ষ্মি! আপনাকে নমস্কার, এই বলিয়া ভবন হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমুদ্রে যেমন নদ্যাদি গমন করে, তদ্রূপ, গ্রাম হইতে অরণ্যানী ও অরণ্যানী হইতে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন৪৭। ক্রমে ঘনান্ধকার সংশ্লিষ্ট ভূতগণ সমাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যমণ্ডলের সহিত জনশূন্য অরণ্য প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন৪৮।৪৯। সূর্য্যমণ্ডল অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে স্নানাদি পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার প্রভাত সমাগত হইলে গিরি নদী সকল উল্লঙ্ঘন করতঃ দূর বনে প্রবেশ করতঃ দ্বাদশ রাত্রি ঐরূপে অতিবাহিত করিলেন৫০।৫১। পরে জনদুর্গম ও অতিদূরস্থ জন কোলাহল বিবর্জ্জিত মন্দর পর্ব্বতের কানন ভূমি প্রাপ্ত হইলেন৫২। যে স্থানে জল প্রপাত সকল সশব্দে প্রবাহিত হইতেছে, বাপীকূলস্থিত পাদপ সকল জল বেগভরে পরিচালিত হইতেছে এবং যে স্থানে ভূতপূর্ব্ব আশ্রম সকলের চিহ্ন সকল অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রাণীবিবর্জ্জিত লতাবিতান সকল সিদ্ধচারণ গণের দ্বারা পরিসেবিত হইতেছে এবং বিটপীরাজি প্রাণ ধারণ যোগ্য ফল দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে, এতাদৃশ বন ভূমির অভ্যন্তর প্রদেশে আগমন করতঃ জলাশয় সেবিত ফল মূল দ্বারা সতত পরিসেবিত এক বিজন দেশে উটজ নির্ম্মাণ করিলেন৫৩।৫৬। মসৃণ

বৈনবদণ্ড, ফল ভোজন পাত্র, অর্ঘ্যপাত্র, পুষ্পভাণ্ড, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, শীত প্রতিরোধক কন্থা ও মৃগাজিন ও তাপসযোগ্য অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীও তথায় আনয়ন করিলেন[৭৭-৭৯]। সন্ধ্যোপাসনান্তর প্রাতঃকালে জপবিধি অনুষ্ঠান, তৎপরে দ্বিতীয় প্রহরে স্নান ও পুষ্পাহরণ করিতে লাগিলেন[৮০]। পরিশেষে কিঞ্চিৎ মাত্র বনফল ও কন্দমূলাদি আহরণ করিয়া ভোজনান্তর সন্ধ্যাকালীন জপবিধি সমাপনান্তে নিশা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন[৮১]। এইরূপে নবনৃপতি শিখিধ্বজ মন্দর পর্ব্বতের বিবিক্ত বন প্রদেশে স্বকীয় পর্ণোটজে অক্লিষ্ট হইয়া তপোবিধির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দিবস যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন[৮২]।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

——()•()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ শিখিধ্বজ বনবাসাশ্রয়ী হইলে, রাজ্ঞী চূড়ালা রাজভবনে যাহা করিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর[১]।

গভীর যামিনীযোগে মহারাজ শিখিধ্বজ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে চূড়ালা ভয়বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় জাগ্রতা হইলেন[২]। শশি দিবাকর বিরহিত অম্বরের ন্যায় পতিবিরহিত শয্যা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিহ্বলা হইলেন[৩]। ক্ষারাদি সংযোগে লতা যেরূপ পরিম্লানা হইয়া থাকে, সেইরূপ, খেদযুক্তা নিরুৎসাহা এবং পরিম্লানা হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন[৪]। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্না দিনশ্রীর ন্যায় অতি অপ্রসন্না ও বিমনায়মানা হইয়া উপবেশন করিলেন[৫]। ভাবিতে লাগিলেন, "রাজ্য কি কষ্টজনক!" প্রভু এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিয়াছেন। এই গাঢ় চিন্তায় চিন্তিতা হইয়া চূড়ালা শয্যোপরি কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন করিলেন এবং এক্ষণে আমি কি করিব, আমিও

তাঁহার নিকট গমন করি। কারণ ভর্ত্তাই স্ত্রীর প্রধানা গতি, আর্য্যগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন[৬।৭]। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া পতির অনুগমন করিতে অভিলাষিণী হইলেন। পরে আকাশ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে বনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন[৮]। বায়ুমার্গে যোগিনীগণ যেমন বিচরণ করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ সিদ্ধ যোগিগণের পক্ষে অদ্বিতীয় চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গগনমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন[৯]। খড়্গধর পতি যেখানে গমন করিয়াছেন, ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন[১০]। অনন্তর রজনীযোগে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় নিজ পতিকে কোন এক বিবিক্ত প্রদেশে অবস্থান করিতে দেখিয়া গগনমার্গ হইতে ভর্ত্তার ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন[১১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! যে ব্যক্তি যখন যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তাহাতেই সন্তোষ লাভ করে[১২]। চূড়ালা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমার স্বামীর এই প্রকারই ভবিতব্যতা। এই চিন্তা করিয়া তিনি প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। আমার গমনের আর প্রয়োজন নাই, আমি অবশ্যই অন্য এক সময়ে পতিপার্শ্বে শোভমানা হইব, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। চূড়ালা এই চিন্তা করিয়া পুনরায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রচূড়ের শিরোদেশে চন্দ্রকলা যেমন শোভমানা হইয়া থাকে, তদ্রূপ, তিনি পুনঃ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিতা হইলেন[১৩।১৪]। পরে কোন কারণ নিবন্ধন ভূপতি সম্প্রতি অন্যত্র গমন করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া পুরবাসিদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন[১৫।১৬]। ক্ষেত্রপালিকা যেমন কালে ধান্য সকল রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ, তোমরা এক্ষণে রাজ্য রক্ষা করিতে যত্নপর হও[১৭]। এইরূপে মহারাজ শিখিধ্বজের বনবাসাশ্রয়ে এবং মহিষী চূড়ালার অন্তঃপুরমধ্যে মাস পক্ষ অয়ন সকল অতিবাহিত হইতে লাগিল[১৮।১৯]। অধিক কি, এই ভাবে প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল[২০]। মহাত্মা শিখিধ্বজ কথিতরূপে বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন মন্দর শৈলে সময়াতিপাত করিলে, চূড়ালা নিজ পতি সমীপে গমন করা কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া রজনীযোগে আকাশ মার্গে অধিরোহণ করিলেন। রত্নাদি দ্বারা বিভূষিতা না হইয়া বায়ু পথে গমন করিতে লাগিলেন[২১।২২]। পূর্ণেন্দুকৌমুদীবর্ণাভা সিদ্ধাভিসারিকাগণ নন্দনোদ্যানে নিজ প্রিয়তমের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ

ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের গাত্রসংস্পৃষ্ট উত্তম গন্ধাঢ্য চন্দন গন্ধরুষিত পবন চূড়ালার গাত্র সংস্পর্শ করিতে লাগিল[২৬,২৭]। আকাশমার্গে জ্যোৎস্নারাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মেঘান্তরালে বিদ্যুৎ সমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন[২৮]। পতিবিচ্ছেদবিধুরা চূড়ালা পুনঃ পুনঃ এই সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন এবং আপনা আপনি খেদোক্তি করিতে লাগিলেন[২৯]। আমার স্বভাব শান্তি লাভ করিতেছে না, মনও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। হে প্রণয়প্রবণ মৃগেন্দ্রস্কন্ধ! আমি আবার কবে তোমাকে সন্দর্শন করিব, মন আমাকে এইরূপেই উৎকণ্ঠিত করিতেছে। মঞ্জরীযুক্ত লতা সমূহ মহাবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়াছে, আমি ইহা সন্দর্শন করিয়া তোমার উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। সিদ্ধাভিসারিকাগণ নিজ নিজ পতি সহ প্রেমালাপ করিতেছে, আমি কবে তোমার সহিত বিবিক্ত প্রদেশে আলাপ করিব, এই চিন্তা আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। এই মৃদুমন্দ পবন প্রবাহিত হইতেছে, এই নির্ম্মল শশিকর সকলকে আমোদিত করিতেছে, এই বনরাজি শোভা পাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার উৎকণ্ঠা পরিত্যক্ত হইতেছে না। অরে নির্ব্বোধ মন! তুমি কেন বৃথা বিড়ম্বিত হইতেছ[৩০।৩৪]। হে সাধো! আকাশের ন্যায় নির্ম্মল তোমার বিবেক বুদ্ধি এক্ষণে কোথায়? অথবা হে সখে! যে তোমার ভর্ত্তা তুমি তাহারই জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইতেছ[৩৫]। অরে নির্ব্বোধ চিত্ত! তোমার উৎকণ্ঠা এখন বৃথা। আমার ভর্ত্তা এখন বৃদ্ধ, তপস্বী, কৃশ, এবং ভোগ বাসনা বর্জ্জিত। আমি বুঝিতেছি, ইহার সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে[৩৬ ৩৭]। এখন ইনি একরস, একাত্মা, ইচ্ছাপরিহীন[৩৮]। আমার বোধ হইতেছে, আমার এই ভর্ত্তা এক্ষণে শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত। যাহাই হউক, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না, শীঘ্রই আমি ইহার তত্ত্বজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোমার সহিত যাবৎ প্রারব্ধ তাবৎ সংযোজিত করিয়া দিব। মতি অর্থাৎ জ্ঞান সমান হইলেই তোমার উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে। তখন আমরা পরম সুখে বাস করিব[৩৯।৪১]। আমার পতি যে চিন্তায় চিন্তিত আমিও এক্ষণে তাহার অনুষ্ঠান করিব। সমগ্র আনন্দ সমূহের তাহাই পরিণাম অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মানন্দ[৪২]। যাহাদিগের মনোবৃত্তি একজাতীয় তাহারাই সমাগম নিবন্ধন বিমলানন্দ

ভোগ করিয়া থাকে। চূড়ালা মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন[৩৩]। নানা দেশ ও নানা নদ নদী সকল অতিক্রম করিয়া মন্দর পর্ব্বতের দর্শন লাভ করিলেন এবং নভোদেশে থাকিয়া অদৃশ্য আকারে বনান্তরে প্রবেশ করিলেন[৩৪]। পরে বনমধ্যে পর্ণোটজ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ধ্যানাবলম্বী নিজ পতিকে দেখিতে পাইলেন। জীর্ণ পর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেরুকান্তি কৃশাঙ্গ পতিকে সন্দর্শন করিলেন[৩৫,৪৭]। কজ্জলাম্বুভর ভৃঙ্গীর (শিবদূত) ন্যায় নিস্পৃহ ও চীরবাস পরিহিত বিবিক্ত প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট নিজ পতিকে সন্দর্শন করিলেন। লম্বায়মান স্রজে কুসুমরাজি গ্রন্থনকারী নিজ পতিকে অবলোকন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পীবরস্তনী চূড়ালা কিঞ্চিৎ খেদগ্রস্তা হইয়া মনে মনে বলিলেন, যাহারা আত্মতত্ত্ব অবগত নহে তাহারা কি মূর্খ[৪৮,৫০]। মূর্খতা নিবন্ধন আমার পতি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মীবান্ ইনি-ই সেই রাজা, যিনি আমার প্রিয় পতি[৫১]। মোহনিবন্ধন অদ্য এই অশোভন দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি অদ্যই এই স্থানে ইহাকে ভোগ ও মোক্ষ কি, তাহা নিবেদন করিব। কিন্তু এ অবস্থায় যাওয়া আমার যুক্তিযুক্ত নহে। আমি অন্যরূপে ইহার সমীপবর্ত্তিনী হইব। যে হেতু আমি বালা, ইহার পত্নী, আমার কথা না শুনিলেও শুনিতে পারেন। এই নিমিত্ত তপস্বিবেশে ইহার সমীপে যাইয়া ইহাকে বুঝাইব। স্বামী এক্ষণে পরিপক্কমতি হইয়াছেন অর্থাৎ বুঝিবার পাত্র হইয়াছেন। এই বলিয়া দ্বিজবালক রূপে গগনমণ্ডল হইতে শিখিধ্বজ সম্মুখে উপনীত হইলেন। মহাত্মা শিখিধ্বজ সহসা অপূর্ব্বদৃষ্ট দ্বিজবালক সন্দর্শন করিলেন[৫২,৫৮]। ইনি বিগলিত কনকের ন্যায় গৌরবর্ণ মুক্তাহার বিভূষিত মূর্ত্তিমতী তপস্যার ন্যায় বনান্ত প্রদেশ হইতে বিনির্গত হইয়াছেন[৫৯]। এক্ষণে শুভ্র যজ্ঞোপবীত পরিশোভিত শুক্লবাসযুগ পরিহিত কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক শিখিধ্বজ নরপতির পুরোবর্ত্তী হইলেন[৬০]। আমণিবন্ধ (মণিবন্ধ=করমূল) মনোজ্ঞ দ্বিগুণিত অক্ষমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত ভূমিতলে উপস্থিত ভ্রমরপরিব্যাপ্ত কমলের ন্যায় কুন্তলজালাবৃত অজিন বিশিষ্ট স্বশরীরোদ্ভূত অংশু মালার দ্বারা নবোদিত অর্কমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া কুন্তলপরিবেষ্টিত বদন এবং নিজ জ্যোতির দ্বারা মন্দর পর্ব্বত আলোকিত করিয়া দ্বিতীয়

চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশমান হইলেন৬১।৬৩। বিজিতেন্দ্রিয় মনোজ্ঞ এবং শান্ত প্রকৃতি তথা ভস্মদ্বারা অলকাতিলকা মণ্ডিত, অতএব, সুমেরু শৃঙ্গে কজ্জলে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মুনি কুমারকে অবলোকন করিয়া নরপতি শিখিধ্বজ গাত্রোত্থান করিলেন৬৪।৬৫। দেবকুমার মনে করিয়া পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, হে সুরকুমার! আপনাকে নমস্কার, এই আসনে উপবেশন করুন৬৬। এই বলিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিষ্টর (পত্রাসন) দেখাইয়া কুসুম পেলব দ্বিজ পুত্রের হস্তে প্রদান করিলেন। চন্দ্র কুমুদ খণ্ডের ন্যায় পাণি পল্লব দ্বারা হে রাজর্ষি! আপনাকে নমস্কার বলিয়া তিনিও প্রতিনমস্কার করিয়া বিষ্টরে উপবেশন করিলেন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! হে মহাভাগ! আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন? আপনাকে যখন দর্শন করিলাম তখন আজ্ আমার দিন সফল হইল৬৭।৬৯। হে মানদ! এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই পুষ্প সকল গ্রহণ করুন, আপনার মঙ্গল হউক৭০।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! মহাত্মা শিখিধ্বজ এই বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্প ও মালা সকল তাঁহাকে প্রদান করিলেন৭১।

চূড়ালা বলিলেন, আমি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আপনার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হই নাই৭২। হে অনঘ! আপনার এই প্রকার সুমধুর প্রণয়নিস্বনে আমি মনে করিতেছি, আপনি দীর্ঘজীবী হউন৭৩। এবং শান্তমনা হইয়া নির্ব্বাণ লাভের নিমিত্ত যে তপশ্চরণ করিতেছেন তাহার ফল অনতিবিলম্বে ফলিত হইবে, ইহাও আমি ভাবনা করিতেছি৭৪। হে সৌম্য! যখন আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই মহাবনে আগমন করিয়াছেন, তখন, অসি ধারার ন্যায় আপনার এই ব্রত (অতিতীব্র তপস্যা ব্রত) সাফল্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই৭৫।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! আপনি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। লোকোত্তরী বুদ্ধির দ্বারা আপনি সমস্ত বুঝিতে পারিতেছেন। আপনার অঙ্গযষ্টি চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিনির্ম্মিত হইয়াছে, অথবা সমালোচনার প্রয়োজন নাই, স্থূল কথা, আপনাকে অমৃততুল্য অনুভব করিতেছি৭৬.৭৭। আমার সহধর্ম্মিণী এক্ষণে রাজ্য রক্ষা করিতেছেন, আপনার ন্যায় তাঁহারও অঙ্গযষ্টি এইরূপ সুন্দর

এবং শান্ত। আপাদ মস্তক আকৃতি মদ্দত্ত পুষ্পরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত। ভবদীয় বাহু শুভ্রাম্বুদরাশির দ্বারা আচ্ছন্ন মহীধর শৃঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে[৭৮,৭৯]। হে সুমনস্! আপনার কুসুমপেলব অঙ্গযষ্টি রবিকর দ্বারা ইন্দুকান্তির ন্যায় পরিক্লান্তি হইতেছে[৮০]। দেবকার্য্যের নিমিত্ত আমার এই সঞ্চিত পুষ্পরাশি আপনাতে অর্পিত হওয়ায় কৃতার্থতা লাভ করিল[৮১]। অদ্য অতিথি পরিচর্য্যার দ্বারা আমার জীবন সফল হইল। অতিথিগণ দেবতা হইতেও অধিক পূজার্হ হইয়া থাকেন[৮২]। এক্ষণে আপনি কাহার পুত্র? আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এস্থানে আগমন করিলেন? হে শশিমুখ! আমাকে বলিয়া সংশয়াপনোদন করুন[৮৩]।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, কোন্ ব্যক্তি এমন বিনীত প্রশ্নকারীকে বঞ্চনা করিয়া থাকে[৮৪]? শুনুন, একদা পুণ্যশীল শুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন কর্পূর তিলকের ন্যায় দৃশ্য নারদ মুনি পর্ব্বত গুহাতে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সুরতরঙ্গিণী জলে অকস্মাৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তিনি নদী তীরে আগমন করিয়া দেখিলেন, রম্ভা তিলোত্তমার ন্যায় স্বর্ণ পদ্মোপমস্তনবিভূষিত সুররমণীগণ পুরুষ বিবর্জ্জিত দেশে স্ব স্ব বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলকেলি করিতেছে[৮৫,৯০]। তিনি দেখিলেন, সুরললনাগণ লতা যেমন বৃক্ষকে অবলম্বন করে, তাহারা সেইরূপ, পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, হেম প্রবাহের ন্যায় উজ্জল কিরণ বিশিষ্টা রমণীগণ যেন কাম-মন্দিরের স্তম্ভ বিনির্ম্মাণ করিতেছে। অথবা চন্দ্রকান্তি কামিনীগণ স্বকীয় লাবণ্য দ্বারা অমরোদ্যানের পরিখা সদৃশী মন্দাকিনীর (স্বর্গীয় গঙ্গার) লাবণ্যকে পরাস্ত করিতেছে। তাহারা পরস্পর নির্ভয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। তাহাদের পয়োধর সমূহ যেন পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা বিস্তার করিতেছে। আলুলায়িত কেশপাশ সকল অসংযত থাকায় চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমরশ্রেণীর শোভা অনুকরণ করিতেছে[৯১,১০০]। চন্দ্রকলার ন্যায় সুন্দর এবং একত্র বহু সুরললনা গণের তাদৃশ সমাবেশ দেখিয়া মহাত্মা নারদ মুনির অন্তঃকরণ হইতে বিবেক বৃত্তি দূরীকৃত হইল এবং তাঁহার মন আনন্দে প্রমত্ত হইয়া

উঠিল। গ্রীষ্মাবসানে মেঘ হইতে জলধারা পতনের ন্যায়, অথবা ছিন্নশাখ বৃক্ষ হইতে রসস্রাবের ন্যায়, তাঁহার দেহ হইতে দেহসার শুক্র ক্ষরিত হইল। এই সময়ে তাঁহাকে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন শশাঙ্কের ন্যায় অথবা দ্বিধাকৃত মৃণাল তন্তুর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল[১০১।১০৪]।

মহারাজ শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, বহুজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, নিষ্পাপ, নিরভিলাষ, এবম্ভূত গুণসম্পন্ন নারদ মুনিও কি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন নাই[১০৫।১০৬]?

চূড়ালা বলিলেন, হে রাজর্ষি! এই ত্রিভুবন মধ্যে সমস্ত ভূতজাতি, এমন কি দেবতারাও স্বভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না[১০৭।১০৮]। এই জগৎ সুখদুঃখময়; যাহাতে যাহার তৃপ্তি সে তাহারই বশ্য হয়। কেহবা দীপালোক দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ আলোক মাত্র দেখিয়া, কেহবা চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা সুখ অনুভব করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ক্ষুধাদির দ্বারা দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন[১০৯।১১০]। নির্ম্মল সত্য বিস্মৃত হইলে অন্ধকার দ্বারা আকাশের ন্যায় স্বভাব কর্ত্তৃক চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে[১১১]। বর্ষা কালের মেঘ যেমন আনন্দ বিধান করে, তদ্রূপ, চিত্তাকর্ষক পদার্থের দ্বারা লোকের উল্লাস জন্মিয়া থাকে[১১২]। মণি প্রভৃতির আভার দ্বারা শুভাশুভ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ মণি স্ব প্রভাবে পুরোবর্ত্তী পদার্থগণের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া থাকে[১১৩।১১৬]। নারদ মুনি জীবন্মুক্ত হইলেও তাৎকালিক তাদৃশ বোধে অভিভূত হওয়ায় সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১১৭]। পদার্থের উপর বুদ্ধির দৃঢ়তা জন্মিলে বুদ্ধি তদ্বিষয়েই পরিচালিত হইয়া থাকে। যেমন কুঙ্কুম নষ্ট হইলেও বস্ত্র তাহার অনুরঞ্জন ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ, মূঢ় ব্যক্তিরা বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারে না। জীব সেই সেই রূপেই বন্ধ ও মুক্তির হস্তে পতিত হয়। যিনি বিষয়ানুরাগ বশতঃ বিষয় বুদ্ধির অনুগামী হন তিনি বদ্ধ হইয়া থাকেন আর যিনি বিষয়ে বিরাগ প্রদর্শন করেন, বিষয় যাহাকে রঞ্জিত করিতে পারে না, তিনিই মুক্তি লাভ করিতে পারেন[১১৮।১১৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, সুখ দুঃখের উৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা আমাকে বলুন। হে প্রভো! আপনি এই বিষয়টী বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ময়ূরগণ মেঘ দর্শনে অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে, আমিও

সেইরূপ আপনার এই সকল উদারার্থ এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছি[১২০।১২১]।

চূড়ালা বলিতে লাগিলেন, সুখের প্রকৃত উৎপত্তি নাই। কেননা তাহা আত্মার অন্তর্গত। তবে তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব লইয়াই উৎপত্তি অনুৎপত্তি কথা প্রচলিত আছে। সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব বুদ্ধির আবির্ভাবাদি ঘটিত। শরীর, চক্ষু এবং হস্তাদির দ্বারা নিকটস্থ ও শব্দ অনুমানাদির দ্বারা দূরস্থ হৃদ্য পদার্থ অনুভুত হইলে স্বাত্মসুখানভিজ্ঞ হৃদ্গত বুদ্ধিতত্ত্ব উল্লসিত হয় এবং তদনুক্রমেই জীব আপনাকে সুখী বিবেচনা করে। শরীরের জীবের সঞ্চরণ নাড়ী পথ একরূপ নহে, তাহা বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন। সুতরাং সুখভোক্তা জীব বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। লোকেও দেখা যায়, এক জন যাহাতে সুখ বোধ করে, অন্যে তাহাতেই দুঃখ বোধ করে। সুখের ন্যায় শান্তি পক্ষেও এইরূপ প্রণালী। জীব যাহাকে যে পরিমাণে শান্তির আশ্রয় বলিয়া মনে করে, তাহা হইতে সেই পরিমাণেই শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যে যাহা হইতে যে পরিমাণে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে তাহা হইতে সে সেই পরিমাণে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখ এবং দুঃখ বদ্ধ জীবের পক্ষে, মুক্ত জীবের পক্ষে নহে। সুখ দুঃখের অভাবই মোক্ষের হেতু, বিধতা ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুখ এবং দুঃখ সকল ইন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহ ও অনিগ্রহ নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে[১২২।১৩০]। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব শান্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ততক্ষণ সে সুখ ভোগ করিতে থাকে। সমুদ্র যেমন পূর্ণচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া থাকে, তদ্রূপ, জীবও সুখ প্রাপ্তে উল্লসিত হইয়া থাকে। আপাত-মধুর সুখোৎপাদক অর্থাদির বিনাশ হইলে আমিষলোভী মার্জ্জারের ন্যায় জীবকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখা যায়। অজ্ঞতাই তাহার কারণ। শুদ্ধ বোধের দ্বারায় জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে[১৩১।১৩৩]। যাহার সুখ দুঃখ বোধ নাই, তিনিই সৌম্যতা অর্থাৎ বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারেন[১৩৪]। জীব সকল যদি অভিহিত প্রকারে প্রবুদ্ধ হয় তাহা হইলে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে[১৩৫]। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে, চিদাকাশ যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, জীব তখনই শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩৬]। তৈলহীন প্রদীপ

ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সুখাদিরূপ স্নেহ সংক্ষয় হইলেও জীব তৈলবিহীন প্রদীপের ন্যায় শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩৭]। দ্বৈতভাব দূরীকৃত হইলে সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ঘটাকাশ পটাকাশ সমস্তই এক, এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইলে চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না[১৩৮]। ক্ষুব্ধ হইবে কেন? হইবার কারণ নাই। কেননা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অর্থাৎ দ্বৈত বোধ রহিত হইলে তখন জীবত্বও শূন্য হইয়া যায়। প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভ। তিনিই প্রথমে অহং আমিত্ব বোধের বশ্য হইয়া সংসারী হন, পরে আবার তিনি নাহং বোধের দ্বারা মুক্ত হন। সুতরাং অদ্যাপি বর্ণিত প্রকারের ভ্রম অক্ষুণ্ণ পথে চলিতেছে[১৩৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবপুত্র! জীব সুখসঞ্চরণ যোগ্য নাড়ী পথে বিচরণ করিলেও, তদুপলক্ষে নারদের বীর্য্য ক্ষরণ কিংবিধ ক্রমে হইয়াছিল?

চূড়ালা বলিলেন, স্ত্রীকায়া দর্শনে পূর্ব্বের রাগসংস্কার (স্ত্রী সম্ভোগ জনিত সুখানুভবের সংস্কার) উত্তেজিত হয়, তদ্বশে জীব চঞ্চল হইয়া পড়ে। জীব চঞ্চল হইলেই শরীরস্থ প্রাণ প্রভৃতি বায়ু বিচলিত হয়, তাহাতেই মজ্জাসার চরম ধাতু শুক্র শিরাপথে অধোগমন করে। যেমন বায়ুর চালনায় পুষ্পাদির সৌগন্ধ স্থানচ্যুত হয়, মেঘবৃন্দ হইতে বারি বহির্গত হয়, সেইরূপ[১৪০,১৪৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, ভাব অভাব ও পদার্থের গতি অগতি সমস্তই জানেন। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বভাব কাহাকে বলে, স্বভাব শব্দের অর্থ কি?

চূড়ালা বলিলেন, সৃষ্টির প্রথমে যে পদার্থ যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, যে বস্তু যদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়াছিল, পুনঃ প্রলয় পর্য্যন্ত সে সকল সেইরূপে সম্পন্ন হওয়ার নিয়মটী স্বভাব শব্দের অর্থ। এখন যে ঘটপটাদি পদার্থের স্বভাববৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, ইহারও মূল প্রাগুক্ত নিয়ম, পরন্তু তুমি স্বভাবকেও মায়া বিশেষ বলিয়া জানিবে[১৪৪।১৪৬]।

বর্ণিত লক্ষণ স্বভাব এই জগতে রূঢ় রহিয়াছে। ইহারই অধীনে চতুর্ব্বিধ প্রাণী ভ্রান্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন প্রাণী জ্ঞানী ও ক্ষীণ বাসনা হইয়া পুনর্জ্জন্ম বর্জ্জিত হইতেছে এবং কেহবা অজ্ঞান দেহী থাকিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেছে[১৪৭]।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ।

——()○()——

চূড়ালা বলিতে লাগিলেন, এই পরিদৃশ্যমান্ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্ম-স্বভাব বশতঃ সৃষ্ট হইয়াছে এবং বাসনার দ্বারা সংস্থান প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুগুণে পরিচালিত হইতেছে। হে মুনিবর! ত্যাগাভ্যাস দ্বারা ভোগবাসনা হ্রাস হইলে জীবের জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভাবও তাহাকে আক্রম করে না, আমরা এইরূপ অনুভব করিয়া থাকি[১,২]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বাগ্মিপ্রবর! আপনার এই উদারার্থসম্পন্ন যুক্তিপরিপূর্ণ অনিহতার্থ (অনিহত=অব্যর্থ) গূঢ়ার্থব্যঞ্জক এবং অপূর্ব্বার্থ-প্রতিপাদক বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি[৩]। হে প্রিয়দর্শন! অমৃত পান করিলে আত্মা যেরূপ শীতলতা অনুভব করে, আপনার এই অর্থসম্পত্তিশালী বাগমৃত পান অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া আমিও তাদৃশ প্রীতি লাভ করিয়াছি। অতএব, আপনি সত্বর আপনার জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন। জ্ঞানগর্ভ বাক্যরাজি আমি যত্নের সহিত শ্রবণ করি[৪,৫]। পদ্মযোনি ব্রহ্মার আত্মজ মহাভাগ নারদ কিরূপে নিজ স্খলিত বীর্য্য রক্ষা করিলেন, এবং অবশেষে তাহা কি হইল? তৎ-সমুদায় আপনি কীর্ত্তন করুন[৬]।

চূড়ালা বলিলেন, মদমত্ত মাতঙ্গকে যেমন রজ্জুর দ্বারা সুবৃহৎ আলানে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ, দেবর্ষি নারদ আপনার প্রভূত বিবেকরূপ আলানে অনপায়িনী বুদ্ধিরূপ রজ্জুর দ্বারা মনোরূপ হস্তীকে দৃঢ়তররূপে সংযত করিয়া, প্রলয়কালীন অগ্নিরাশির ন্যায়, বিগলিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, অথবা গলিত পারদাদি ধাতু রসের ন্যায়, সেই স্খলিত বীর্য্যকে পার্শ্ব স্থিত স্ফটিকনির্ম্মিত কুম্ভের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় স্বীয় বীর্য্য রক্ষা করিলেন। সেই কুম্ভ অতি দৃঢ় ও গভীর এবং তাহা প্রস্তরা-ঘাত সহ্য করিতেও সমর্থ। বিধি যেমন অমৃতের দ্বারা অম্বোধি সকল

(জলরাশির) পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তদ্রূপ, মহাত্মা নারদ মুনিও নিজ বীর্য্যের দ্বারা সেই কুম্ভ পরিপূর্ণ করিলেন[৭।১১]। কিছু দিন ঐরূপে অতিবাহিত হইল। পরে মুনিবর নারদ স্বকর্ত্তব্য হোমাদি বিধানে অনবধান হইলে সেই কুম্ভমধ্যে সেই বীর্য্যে জীব সঞ্চার হইল। ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে যেমন পত্রাবলী ও ফুল্ল কুসুমদলের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ, যথাকালে সেই কুম্ভমধ্যগত গর্ভ হইতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত শিশুর জন্ম হইল। কুম্ভ হইতে জন্ম হওয়ায় শিশুর নামও কুম্ভ হইল ১২,১৪। পরে সেই শিশু কতিপয় দিবস মধ্যে শুক্লপক্ষে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল[১৫।১৮]। একটী ভাণ্ড হইতে অপর ভাণ্ডে যেমন দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে পারা যায়, মহামুনি নারদ সেইরূপ নিখিল সংস্কার সম্পন্ন সেই বালকের উপর সমস্ত বিদ্যা আধান বা অর্পণ করিলেন। পরে এই অর্ভক অল্পদিবস মধ্যেই নিখিল বাঙ্ময়শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিলেন এবং মহামুনিও এই বালককে নিজ প্রতিবিম্বের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। (অর্থাৎ সর্ব্বদা তিনি তাঁহাকে সন্নিকটেই রাখিতেন) ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যে, যেন সায়ন্তনীন শশধর রত্নরাজিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। একদা মহাত্মা নারদ নিজ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ নিজ পিতৃদেব ভগবান্ চতুরাননকে অভিবাদন করিলেন। প্রজাপতি নিখিল শাস্ত্রবিৎ এবং কৃতাভিবন্দিত নিজ পৌত্রকে অতীব সাদরে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিলেন[১৯,২০]। কমলযোনি তাঁহাকে আশির্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী হইলে এবং তুমি আজ্ হইতে কুম্ভ নামে আখ্যাত হইবে[২১]।

কুম্ভ কহিলেন, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র, মহাত্মা নারদ মুনির পুত্র এবং আমারই নাম কুম্ভ। অর্থাৎ সেই কুম্ভই আমি। * আমি পিতার সহিত সেই অনন্যসাধারণ ব্রহ্মলোকে বাস করি[২২।২৩]। চতুর্ব্বেদ আমার লীলার সামগ্রী, আমার মাতৃভগিনী গায়ত্রীদেবী এবং আমার জননী স্বয়ং সরস্বতী[২৪।২৫]। আমি কামকারী হইয়া অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে পারি। আমি লীলার দ্বারা পরিপূর্ণ হই-

---

* চুড়ালা অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানরতা, সমস্তই তাঁহার আত্মভূত, সুতরাং তাঁহার পক্ষে "আমি কুম্ভ" এ উক্তি মিথ্যা নহে।

লেও কাহারও কর্ম্মের দ্বারা উদ্ভূত নহি। ধরামণ্ডলে আমার পাদপীঠ নিপতিত বা সংলগ্ন হয় না এবং রজস্পৃষ্ট হইলেও আমার অঙ্গ সকল ম্লান বা গ্লানিজনক হয় না। আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি এবং আপনাকে আমার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলাম[২৬।২৭]।

ভগবান্ বাল্মিকি বলিলেন, মুনিবর ঐরূপ কহিলে ভগবান্ মরিচিমালী অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলেন। তদ্দর্শনে সমাগত তপস্বিবর্গ সায়ংকালীন হোমাদি কর্ত্তব্য কার্য্যের উদ্দেশে সভা হইতে উত্থিত হইলেন, পরে সকলে স্নানার্থ গমন করিলেন। অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাতে পুনঃ সভা ও কথারম্ভ হইল[২৮।২৯]।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

——()*()——

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমার পুণ্য প্রভাব বশতঃ প্রভূত বায়ুচালিত জলধর পটলের ন্যায় আপনি এই পর্ব্বতে প্রেরিত হইয়াছেন। অদ্য আমি ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য হইয়াছি। যে হেতু আপনার এই অমৃত নিস্যন্দিনী বাণীপরম্পরা আমি শ্রবণ গোচর করিলাম। সাধু সমাগম লাভ করিলে আমি যেরূপ আনন্দিত হই, রাজ্য লাভ করিলেও আমি তাদৃশ বিমলানন্দ লাভ করিতে পারি না। যে স্থানে অনন্ত সুখ সামান্য কারণে বিজৃম্ভিত হয়, সে স্থানে বিষয় সুখের কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্র[১।৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভূপতির এবম্বিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ গোচর করিয়া দ্বিজবালকরূপিণী চূড়ালা পুনরায় কহিতে লাগিলেন। এ সমস্ত কথায় আর প্রয়োজন নাই, আপনি কি নিমিত্ত এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন এবং কত দিবসই বা এখানে আসিয়াছেন, আনুপুর্ব্বিক

সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করুন। হে মহাভাগ! তপস্বী ব্যক্তিরা কখন প্রবঞ্চনা দ্বারা অন্যকে মুগ্ধ করেন না। অথবা মিথ্যা কথা বলাও তাঁহাদের অভ্যস্ত নহে[৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবপুত্র! আপনি যখন সমস্ত লোকরহস্য অবগত আছেন, তখন আমার বিষয়ও অবশ্য অবগত আছেন। আমি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া এই বনান্তরে আগমন করিয়াছি, আমার নাম শিখিধ্বজ। আমি দেখিতেছি, জীব সকল জন্মের পর জন্ম দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ ভোগ করিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতেছে। এই নিমিত্ত আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই বনবাস আশ্রয় করিয়াছি[৮,১০]। নির্দ্ধন ব্যক্তি একটী অমূল্য রত্ন পাইয়াও যেমন শান্তি লাভ করিতে পারে না, আমিও তদ্রূপ, তপস্যার নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণ করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হে মহাভাগ! আমি তপস্যার নিমিত্ত অযত্নেই হউক অথবা কোন প্রকার ফলোৎপাদন না হয় এ রূপেই হউক, মূল ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় এই বনে বাস করিব। আমি দুঃখ হইতেও দুঃখ লাভ করিয়া যদি তপশ্চরণানুষ্ঠান না করিতে পারি তবে অমৃতও আমার পক্ষে বিষতুল্য হইবে[১১,১৪]।

তখন চূড়ালা কহিতে লাগিলেন, আমি একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলাম, হে প্রভো! জ্ঞান ও ক্রিয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী বিশেষ মঙ্গলপ্রদ আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

চতুরানন কহিলেন, জ্ঞান-ই পরম বস্তু, ইহাই কৈবল্য লাভের এক মাত্র উপায়। কেবল কালাতিবাহন ও চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান। হে পুত্র! যাহাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি নাই, ক্রিয়াই তাহাদের এক মাত্র আশ্রয়। কারণ যাহার পট্টবস্ত্র নাই সে কি কখনও কম্বল পরিত্যাগ করিয়া থাকে[১৬,১৭]? অজ্ঞ ব্যক্তিরা বাসনা চরিতার্থ হইলেই ক্রিয়া সফল জ্ঞান করে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বাসনা সংক্ষয় হইলে সমস্ত ক্রিয়াই অফল অনুমান করেন[১৮]। লতা সকল ফল ধারণ করিলেও যদি জলসেক প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহা যেমন অশুভ ফলদায়িনী হইয়া থাকে, সেইরূপ, বাসনা থাকিলে সমস্ত ক্রিয়াই অফলা বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন এক ঋতুর অবস্থান কালে অন্য ঋতুর সত্তা উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, বাসনার নাশ হইলে ক্রিয়া সকল অফল বলিয়া অনুমিত

হইয়া থাকে। হে সৌম্য! শরলতা (শর এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ) যেমন প্রকৃতি অনুসারে কখনও ফল প্রদান করে না, সেইরূপ, ক্রিয়া সকল অজ্ঞানীর ফল উৎপাদন করে না। বালক যেমন যক্ষ চিন্তা করিয়া কেবল যক্ষ দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞান ব্যক্তিরাও বাসনা বদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বহু আড়ম্বরযুক্ত হইলেও ক্রিয়া বহু ফল প্রদান করে না। কাশ লতা কেবল মাত্র ফুলই প্রসব করিয়া থাকে, কখনও ফল উৎপাদন করে না[১৯,২৩]। অতএব, অহঙ্কারাত্মিকা বাসনা বিশুদ্ধা থাকিতে পারে না। মরুপ্রদেশে যেমন সমুদ্রের উৎপত্তি হইতে পারে না সেইরূপ[২৪]। সমস্ত ব্রহ্মময়, এই চিন্তার দ্বারা যাঁহার মূর্খতা অপনোদন হইয়াছে, সেই সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে মরুভূমিতে সমুদ্রের উৎপত্তির ন্যায় বাসনার উৎপত্তি হয় না[২৫]। বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই জীব পুনর্জ্জন্ম রহিত হয় এবং জরা মরণ বর্জ্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৬]। বাসনাযুক্ত চিত্তই মন এবং বাসনা রহিত হইলেই মন জ্ঞান নামে কথিত হয়। জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম বস্তু জানিতে পারিলেই জীব পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে না[২৭]।

চূড়ালা বলিলেন, জ্ঞানই একমাত্র মঙ্গলময়, ব্রহ্মাদি দেবগণও এই-রূপ কহিয়া থাকেন। হে রাজন্! আপনি কি নিমিত্ত অজ্ঞানতা ভজনা করিতেছেন[২৮]? হে মহীপাল! আপনি এই দণ্ড, এই কন্থা, এই কমণ্ডলু, এই প্রকার অনর্থ চিন্তায় কি নিমিত্ত ক্লিষ্ট হইতেছেন[২৯]? আমি কে এবং কোথা হইতে জন্ম হইয়াছে? এবং ইহা কোথায় শেষ পাইবে? তাহাই চিন্তা করুন। মহারাজ! ঐ সকল বৃথা চিন্তা করিয়া কি নিমিত্ত খিন্ন হইতেছেন[৩০]? কি করিলে বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং কি উপায়েই বা অপবর্গ মার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সকল চিন্তা করিয়া যাঁহারা সংসার সমুদ্রের পরতীর গমন করিয়া চিন্ময় পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদের পদানুসরণ করি-তেছেন না[৩১]? শিলাকীটের ন্যায় কেবল ব্রতোপবাস দ্বারা আপনি কি এই বনমধ্যে কালাতিবাহিত করিবেন[৩২]? যাঁহারা তত্ত্বদর্শী ও সাধু, তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ এবং সজ্জন সেবার দ্বারা জীব পরমা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩৩]। অতএব, আপনি পুণ্যশীল সাধুদিগের সমাগম লাভ করতঃ স্তব্ধকীটের (স্তব্ধকীট=নিশ্চল নিস্পন্দ এক প্রকার

জীব) ন্যায় জীবনকে অতিবাহিত করুন[৩৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রাণানন্দদায়িনী দেবকন্যার ন্যায় চূড়ালা কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া মহারাজ শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন[৩৫]। হে দেবসুত! অদ্য আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমি এক্ষণে সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি যে, আর্য্যসমাগম-ই এক মাত্র অপবর্গ মার্গ প্রাপ্তির উপায়। হে অনঘ! আমি অদ্য সমস্ত পাপরাশি হইতে পরিমুক্তি লাভ করিয়াছি। অন্যথা আপনি কি নিমিত্ত আমাকে এবম্ভূত উপদেশ প্রদান করিবেন[৩৬,৩৭]। আপনি আমার পূজনীয় গুরু। হে শুভানন! আপনি শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করুন[৩৮]। হে অনিন্দিত দেহ! আপনি যে সকল উদারার্থ যুক্ত উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাতেই আমি পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়াছি এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপদেশ বলিয়া সে সকলকে অনুভব করিতেছি[৩৯]। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞান আছে। তর্কোপন্যাস দ্বারা জ্ঞানের বহু বিভাগ হইয়া থাকে। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি যে জ্ঞান একমাত্র কৈবল্য প্রদান করিতে সমর্থ, সেই জ্ঞান কিরূপ তাহা আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন[৪০]।

চূড়ালা বলিলেন, মহারাজ! যাহা অতিশ্রদ্ধেয় এবং আর্য্যগণের নিকট সমীচীন, আপনাকে আমি সেই সমস্ত কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন[৪১]। অনাস্থা সহকারে বাক্ বিন্যাস করিলে অন্ধকারে অক্ষবেত্তার অক্ষদর্শন চেষ্টার ন্যায় তাহার বাক্য সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে[৪২]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বেদ বিধির ন্যায় আপনা কর্ত্তৃক অবগত এই বাক্যপরম্পরা আমার সম্বন্ধে অবিচারিত ভাবেই থাকিবে, অর্থাৎ কুতর্কগ্রস্ত হইবে না, ইহা আমি আপনাকে সত্য করিয়া কহিতেছি[৪৩,৪৪]। আপনার বাক্য সকল আমার পক্ষে অতীব শ্রেয়স্কর। আমি অনন্যচিত্ত হইয়া এ সকল অনুভব করিতেছি[৪৫]।

চূড়ালা বলিলেন, আমি আপনাকে ভবভয় নাশন এবং অতি শ্রেয়স্কর মোক্ষপদপ্রদায়ক এক উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন[৪৬,৪৭]।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

—০০০—

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

——()•()——

চূড়ালা বলিলেন, পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হইলেও সমুদ্র যেমন বড়বানল ও অম্বুরাশির আধার, সেইরূপ, বিবিধ গুণসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী পরস্পর বিরুদ্ধ ধৈর্য্য ঔদার্য্য বৈরাগ্য প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন শ্রীমান পুমান্ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন[১]। তিনি কলাবিদ্যা বিশারদ, অস্ত্রবিৎ এবং ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ও অতি বিচক্ষণ এবং সঙ্কল্পিত কার্য্য নিঃশেষে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু বাসনা বহুল থাকায় তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান ছিল না[২]। বড়বাগ্নি যেমন সমুদ্র জল শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ, তিনি অতি আয়াসসাধ্য চিন্তামণি সংসাধনে সুদুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি তীব্র তপস্যার ফলে অচিরকাল মধ্যে চিন্তামণি সিদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যে হেতু উদ্যমশীল ব্যক্তিগণের প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তি যদি সমবায় প্রাপ্ত হয়, তবে, তাহাদের কোন বিষয়ই অপ্রাপ্য থাকে না। অকিঞ্চন ব্যক্তিও সুদুষ্প্রাপ্য ফলাহরণে সমর্থ হয়[৩।৫]। সুমেরু শৃঙ্গাগ্রভাগে নবোদিত শশিকলার ন্যায় নিকটস্থ মণি তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি চিন্তামণি ইহা বাস্তবিক বটে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহপরবশ হইলেন। অতি দীনদরিদ্র ব্যক্তি অকস্মাৎ রাজ্য পাইলে সে যেমন তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, তদ্রূপ, তিনিও মণি সিদ্ধি বিষয়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত এই মণি চিন্তামণি কি না, এবং স্পর্শ করিলে যদি ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, ইত্যাকার বহু সংশয় তাঁহার মনোমধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। পারলৌকিক ক্রম যেমন জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ, তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে মণি সিদ্ধ হইয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না[৬।১০]। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভ্রম বশতঃ লোকে যেমন চঞ্চল লতায় সর্প দর্শন করে, চন্দ্র এক হইলেও যেমন দুইটী বলিয়া প্রতীত হয়,

তদ্রূপ, আমিও ভ্রান্তিজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া এই মণি সন্দর্শন করিতেছি[১১]। আমার এমন কি সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে যে, আমি এই অত্যল্প কাল মধ্যেই সেই দুরারাধ্য মণি প্রাপ্ত হইব[১২]। যাঁহাদিগের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন এবং প্রভূত তপোবল আছে, তাঁহারাই সেই দেবদুর্লভ বস্তু লাভ করিতে পারেন[১৩]। আমি অতি অভাজন এবং আমার তপোবল অতি সামান্য, সুতরাং আমি কখন চিন্তামণি লাভের যোগ্য হইতে পারি না। এইরূপ স্থির করিয়া মূর্খতা নিবন্ধন তিনি সেই মণি পরিত্যাগ করিলেন[১৪।১৫]। অজ্ঞান অবস্থায় যদি শর ত্যাগ করা যায় তাহা হইলেও যেমন শর ধনুকের জ্যা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, চিন্তামণি, অবমাননাকারী সেই পুরুষের নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও যদি উপস্থিত সিদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অতিশয় সহায়শূন্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[১৬।১৭]। কিন্তু পুমান্ পুনরায় মণি লাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। যে হেতু অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি সকল ব্যর্থমনোরথ হইলেও কখন পশ্চাৎপদ হন না[১৮]। কিছু কাল অতীত হইলে তিনি অখণ্ড এক খণ্ড কাচ সন্দর্শন করিলেন। ভ্রমান্ধ ব্যক্তি মৃৎপিণ্ডে যেমন স্বর্ণরূপ সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, তিনি সেই কাচ খণ্ডকে চিন্তামণি বিবেচনা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন[১৯]। মনুষ্যের মোহ উপস্থিত হইলে তাহারা যষ্ঠে অষ্ট, শত্রুকে মিত্র, সর্পে রজ্জু, জলে স্থল এবং এক চন্দ্রে দ্বিচন্দ্র ভাবনা করিয়া থাকে[২০।২২]। পরে তদ্গ্রহণের পর ভাবিতে লাগিলেন, দেশই বা কি বন্ধুবর্গই বা কি, এই মণি হইতে আমি সর্ব্ব সম্পদ লাভ করিতে পারিব। অতএব, বন্ধুবর্গে বা দেশে আমার প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্বসম্পৎশালী হইয়া দূর দেশে বাস করিব। এই চিন্তা করিয়া নিবিড় অরণ্য প্রদেশে গমন করিলেন[২৩।২৫]। অতঃপর তিনি স্বাভিলষিত স্থানে গমন করিয়া মূর্খ ব্যক্তি যেমন বিপদরাশি সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, তিনি বিপদ সাগরে পতিত হইলেন[২৬]। জরা মরণে যে দুঃখ হয় না, অজ্ঞতা নিবন্ধন ততোধিক দুঃখে তিনি নিপতিত হইলেন। যেমন কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ হইলেও মস্তকের উপর শোভা পায়, তদ্রূপ, তাঁহার গুণরাশি থাকিলেও অজ্ঞতা নিবন্ধন বহু অনর্থ সঙ্ঘটিত হইল[২৭]।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনবতিতম সর্গ।

——()•()——

চূড়ালা বলিলেন, আর একটী অতি রমণীয় কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিন্ধ্যারণ্যে এক যূথপতি হস্তী বাস করিত। অগস্ত্য ঋষির আজ্ঞায় অদ্রিবর বিন্ধ্যাচল যেমন স্থির ভাবে ছিলেন, তদ্রূপ, বজ্রাগ্নি সদৃশ তেজঃ সম্পন্ন এবং সুমেরু উৎপাটনে সমর্থ দন্তদ্বয়ে পরিশোভিত সেই মহাকায় বারণ হস্তিপকের শাসনে স্থির ভাবে বাস করিত। ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক বলি যেমন বদ্ধ হইয়াছিলেন অথবা মুনীন্দ্র অগস্ত্য কর্ত্তৃক বিন্ধ্যাদ্রি যেমন বশতাপন্ন হইয়াছিলেন হস্তীবরও তদ্রূপ বশতাপন্ন হইয়াছিল। হস্তী লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দিবসত্রয় ঘোর যন্ত্রণা পাইতে লাগিল[১।৩]। নিগড় বদ্ধ হইয়া হস্তী অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিতে লাগিল এবং বারম্বার যন্ত্রণাসূচক ভয়ঙ্কর নাদ করিতে লাগিল। অসুরগণ যেমন সর্গদ্বার ভগ্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ, মদমত্ত মাতঙ্গ দন্তের দ্বারা লৌহ শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া ফেলিল[৭।৯]। হস্তিপক দূর হইতে বলিরাজ কর্ত্তৃক স্বর্গদ্বার ভগ্নের ন্যায় হস্তীকে লৌহ শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে দেখিল[১০]। হস্তিচালক দূর হইতে হস্তীর এতাদৃশ কার্য্য ও অবস্থা দর্শন করিয়া বিরোচন পুত্র কর্ত্তৃক ত্রিদশালয় উত্যক্ত হইলে সুমেরু শৃঙ্গ হইতে নারায়ণ যেমন তৎপুরোভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, হস্তিপক বৃক্ষারোহণ করতঃ লম্ফ প্রদান দ্বারা হস্তীর শিরোদেশে পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দৈব নিবন্ধন মহাবায়ু কর্ত্তৃক সুপক্ক ফল যেমন বৃক্ষতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ, হস্তিপক সেই হস্তীর শিরোদেশে পতিত না হইয়া তাহার পদতলে পতিত হইয়াছিল[১১]। হস্তীর পদতলে পতিত হইলে তির্য্যক্ জাতি হইলেও গজের অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। যে হেতু সাধু ব্যক্তি অকারণে শত্রুকেও পীড়া প্রদান করিতে ইচ্ছা করে না[১২]। পদতলগত এই দুর্ব্বল প্রাণীকে আমি পদ দলিত করিয়া কি পুরুষকার লাভ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া করিবর তাহাকে বধ

করিতে বিনিবৃত্ত হইল[১৩]। জলরাশি যেমন প্রবল বেগে সেতু ভগ্ন করিয়া গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ, ছিন্ননিগড় গজরাজ তথা হইতে অতি বেগে পলায়ন করিতে লাগিল[১৪]। অংশুমালী যেমন স্বীয় কিরণ দানে মেঘ সমূহ দূরীকৃত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তদ্রূপ, বারণও শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিল[১৫]। হস্তী গমন করিলে হস্তীর গমনের সহিতই গতব্যথা হইয়া হস্তিপক সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল[১৬]। তাদৃশ তুরারোহ সুউচ্চ তাল বৃক্ষের ন্যায় হস্তীর শিরোদেশ হইতে ভূমিপতিত হইয়াও হস্তীপকের কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হইল না। দুরাত্মা ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই এইরূপ কঠিনাবয়ব হইয়া থাকে। বর্ষাকালের মেঘ যেমন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ, অসাধু ব্যক্তি সকলের কুকার্য্য-বিষয়িনী চেষ্টা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হস্তিপরিচালক তৎকালে অধিকতর উদ্যমশীল হইয়া উঠিল[১৭,১৮]। হস্তী পলায়ন করিলে বারণারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং মেঘাচ্ছন্ন গগনতলে রাহু যেমন চন্দ্রমণ্ডলকে অন্বেষণ করিতে থাকে, সেইরূপ, বিবিধ পাদপ সঙ্কুল বনরাজি মধ্যে গজারি সেই মহাগজকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিয়ৎ দিন পরে এক নিবিড় বনমধ্যে বৃক্ষতলে সমর বিশ্রান্ত বীরের ন্যায় সেই হস্তীকে দেখিতে পাইল[১৯,২১]। অনন্তর তন্নিকটে গজবন্ধনোপযোগী এক সুবৃহৎ ও সোপকরণ খাত নির্ম্মাণ করিল। শরৎ কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ, লতা পত্রাদির দ্বারা সেই খাতের উপরিভাগ সম্যক্ আচ্ছাদন করিয়া দিল। পরে সমুদ্রে যেমন পর্ব্বত পতিত হয়, সেইরূপ, হস্তীও সেই দুরাত্মা করিনিসূদন কর্ত্তৃক খানিত সুগভীর খাত মধ্যে নিপতিত হইল। এবং সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত রত্নের ন্যায় গজরাজ খাত মধ্যে পতিত হইয়া সেই স্থানে কালাতিপাত করিতে লাগিল[২২,২৩]। বলিরাজ যেমন পাতাল পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ, গজরাজও নিজ কর্ম্ম দোষে পুনরায় খাতপতিত হইয়া তন্মধ্যে রহিল ও অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিল[২৭,২৮]। যাহারা অজ্ঞতা-নিবন্ধন পুরোবর্ত্তী শত্রুকে উপেক্ষা করিয়াও বর্ত্তমান কার্য্যের দ্বারা ভবিষ্যতের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা না করে, তাহারা এই বিন্ধ্য-গজের ন্যায় কষ্টাদপি কষ্টতম অবস্থা পাইয়া থাকে। আমি দুর্বৃত্ত শঠ পরিচালকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি এবং তাহা হইতে বহু দূর

দেশে সমাগত হইয়াছি, সে এক্ষণে আমার কিছুই করিতে পারিবে না, এইরূপ চিন্তা করিয়া হস্তী পুনরায় বন্ধন দশায় সমুপস্থিত হইল ও মহৎ দুঃখ পাইতে লাগিল। মূর্খতানিবন্ধন বন্ধনের হস্ত হইতে কে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে[২৯।৩০]। অজ্ঞানতাই অত্যন্ত বন্ধন, আত্ম-জ্ঞান দ্বারা তাহার ধ্বংস না হইলে জীব অপবর্গ মার্গ অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। হায়! আমি সতত বন্ধন দশায় আছি, কষ্ট পাইতেছি, আমার মুক্তি নাই, যিনি এইরূপ ভাবনা করেন তিনিই বদ্ধাবস্থায় থাকেন। পরন্তু সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমিই সমস্ত, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমা হইতে অভিন্ন, ইহা ব্রহ্মময়, এই-রূপ ধারণা করিয়া সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মময় বা আত্মময় ভাবনা করিবেক[৩১]। করিলে তাহা হইতেই জীব মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেক।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে অমরনন্দন! আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট মণিসাধক ও বিন্ধ্য হস্তীর উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণন করুন[১]।

চূড়ালা বলিলেন, হে মহারাজ! গৃহভিত্তিতে যেমন বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে, সেইরূপ, আমিও বাক্যার্থের দ্বারা আপনার চিত্ত বিনোদন করিব। হে মহীপতে! যিনি শাস্ত্রার্থদর্শী, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত, তিনিই মণিসাধক অর্থাৎ তিনি কাচ প্রাপ্ত হইয়া চিন্তামণি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সুমেরু শিখরে রবিমণ্ডল যেমন প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ, তুমি নিখিল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ। কিন্তু সলিলোপরি প্রস্তর খণ্ড যেমন ভাসমান হয় না, সেইরূপ, তোমারও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতেছে না[২।৪]। হে সাধো! কুটিলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ের আস্থা পরিত্যাগ করিলে চিন্তামণিকে জানিতে পারিবে।

তাহা হইলে বিচিত্র বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া সকল দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হইবে[৫]। হে অনঘ! শুদ্ধচিত্ত হইয়া সর্ব্বত্যাগ করিতে পারিলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিলে চিন্তামণি হইতে নিখিল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ সমস্ত কামনাই তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে সাধো! আপনি যখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অধঃকৃত করিয়াছেন এবং আপনার আত্মোদয় হইয়াছে[৬,৮]। ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে যেমন সৃষ্টিকার্য্য আরব্ধ থাকে না, সেইরূপ, আপনা কর্ত্তৃক সমস্ত রাজ্য ধন ও জন পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৈনতেয় গরুড় যেমন গজকচ্ছপকে ভোজনার্থ গ্রহণ করিয়া জগতের সীমান্ত প্রদেশে গমন করিয়াছিল, সেইরূপ, আপনিও স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি দূরস্থ হইয়া এই শান্তিরসাস্পদ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন[৯]। শরৎকালীন অভ্রনীহারাদি বায়ু কর্ত্তৃক যেমন বিতাড়িত হয়, তদ্রূপ, আমি আপনার এই সর্ব্বস্বত্যাগে দুঃখিতান্তকরণ হইয়াছি[১০]। ব্রহ্ম নিশ্চয় দ্বারা পরিত্যাগ করিলে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে বা ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু তোমার তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয় না হওয়ায় ত্যাগ করি, কি না করি, এই প্রকার বিকল্পাবস্থা হওয়ায় মেঘাবৃত আকাশের ন্যায় তোমার অন্তঃকরণ মলিন হইয়া রহিয়াছে[১১]। সর্ব্বপরিত্যাগ করিলে যে মহোদয় লাভ করা যায় ইহা সেরূপ পরমানন্দদায়ক নহে। কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ অখিন্নতা লাভ করিতে পারে[১২]? সঙ্কল্পকারীগণের চিন্তার দ্বারাই বাসনা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩]। পবনস্পন্দনযুক্ত তরুস্পন্দনের ন্যায় যাহার চিন্তার দ্বারা হৃদয় স্পন্দিত ও কলুষিত হইয়া থাকে, তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়[১৪]? চিন্তাই চিত্ত, সেই জন্য পণ্ডিতেরা ইহাকে সঙ্কল্প বলিয়া অপর একটী নাম দিয়াছেন। হে সাধো! যাহারা তদ্রূপ চিন্তাগ্রস্ত, তাহারা কিরূপে সেই নিত্য নিরঞ্জন পরম পুরুষকে ভাবনা করিবে[১৫,১৬]? যেমন কোনরূপ শব্দ উত্থিত হইলে কপোতাদি গ্রাম্য বিহঙ্গমকুল আকুল হইয়া ইতঃস্তত প্রোড্ডীয়মান হয়, সেইরূপ, হৃদয় মধ্যে সঙ্কল্প থাকিলে ত্যাগ করিবার শক্তি থাকে না[১৭]। হে সাধো! অন্তঃকরণে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত থাকিলে এই বাগুরাতুল্য সংসারে লোকে কিরূপে ত্যাগস্বীকার করিয়া নিত্য নিরঞ্জন

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আমন্ত্রণকারী কর্ত্তৃক পূজিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সুখী হয়। যদি তাহা না হয় তবে কি সে দুঃখিত হয় না? আপনি কাচকে মণিভ্রমে দর্শন করিয়াছেন। সলিল মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন প্রকৃত চন্দ্র বলিয়াই অনুভূত হয়, তদ্রূপ, ভ্রম জ্ঞানে আপনি কাচকে মণি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন[১৮।২০]। আপনি দুঃখ লাভের জন্যই এই তপশ্চরণ করিতেছেন। এই তপঃক্রিয়ার আদ্যন্ত সকলই দুঃখময়। আপনি অমৃতানন্দ পরিত্যাগ করিয়া অতি দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিমিত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অধিক আয়াসসাধ্য বস্তু লাভে উদ্যোগী হয়, সে শঠ[২১।২২]। আপনি যখন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তখন, এই কার্য্য আরম্ভ করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। আপনি অজ্ঞানতা নিবন্ধনই এই বন প্রদেশে আগমন করিয়াছেন[২৩]। রাজ্য বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া এই অরণ্য পথ আশ্রয় করিয়া দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইতেছেন[২৪]। বনবাস আশ্রয় করিয়া অজ্ঞানতা নিবন্ধন আপনি শীত বাত হইতে অধিক ক্লেশ পাইতেছেন। আপনি চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই চিন্তায় আপনি আরও বদ্ধ হইয়াছেন[২৫।২৬]।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

——()*()——

চূড়ালা বলিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে বস্তু সন্দর্শনের জন্য বিন্ধ্যহস্তীর বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিন্ধ্যাটবীতে যে হস্তীর কথা বলিয়াছি, সে আর কেহই নহে, আপনিই সেই হস্তী। বৈরাগ্য ও বিবেক নামে তাহার দুই দন্ত এবং যাহাকে হস্তিপক বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছি, সে আপনার এই অজ্ঞান, তাহারই নিমিত্ত আপনি এই দশায় উপনীত হইয়াছেন[১,৩]। শক্ত ব্যক্তি যেমন অতিশক্ত কর্তৃক দুঃখ হইতে অধিক দুঃখে নিপতিত হয়, বিভীষিকা হইতে অধিক বিভীষিকা দর্শন করে, হস্তিপক হইতে হস্তী যেমন দুঃখ হইতে অধিক দুঃখে নিপতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ, আপনিও মুর্খতানিবন্ধন অধিক দুঃখ পাই-তেছেন[৪]। যে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা হস্তী বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আশাপাশরূপ দুর্ভেদ্য জাল, তাহাতে আপনি বদ্ধ হইয়াছেন। আশাই বিষম বন্ধন রজ্জু। কালে লৌহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু তৃষ্ণা বা আশা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[৫,৬]। হস্তিপক যেমন দূর হইতে হস্তীকে লক্ষ্য করিতেছিল, অজ্ঞান কর্তৃক আপনিও সেইরূপ লক্ষীকৃত হইতেছিলেন। হস্তী যে শক্রর লৌহজাল সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল, আপনিও রাজ্যভোগরূপ ভীষণ ভোগজাল ছিন্ন করিয়াছেন[৭]। হে সাধো! শাস্ত্রদর্শনও সুকর হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগাশা বিনিবৃত্তি বড়ই দুষ্কর[৮]। বিরক্তি সহকারে জীব যদি ভোগাশা পরিত্যাগ করে তবে ছেদ্য বৃক্ষে পিশাচের ন্যায় তাহার অজ্ঞানতা স্পন্দিত হয়, কিন্তু বিবেকী পুরুষ যদি ভোগাশা হইতে বিনিবৃত্ত হন তাহা হইলে উন্মুলিত বৃক্ষে যেমন পিশাচ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ, অজ্ঞানতাও তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না[৯,১২]। আপনি যখন বনবাসাশ্রয় করিয়াছেন তখনই আপনি অজ্ঞানতা আশ্রয় করিয়াছেন। ত্যাগরূপ মহা অসির দ্বারা আপনি তাহা ছিন্ন করেন নাই[১৩,১৪]। পুনরপি তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই গহন বনে তাপসবৃত্তি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন[১৫]। গজবৈরী যেরূপ হস্তী আক্রমণের নিমিত্ত খাত প্রস্তুত করিয়াছিল, অজ্ঞানরূপ বৈরীও আপনার সম্বন্ধে সেইরূপ তপশ্চরণরূপ খাত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। হে নরবর! হস্তিপকের যে রাজরাজশ্রী তাহা নৃপতির অন্তঃকরণস্থা চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে মহারাজ! আপনিই সেই গজ। অজ্ঞানরূপ বৈরী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই বৃহদরণ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন। নব তৃণাচ্ছাদিত যে খাত অবলোকন করিতেছেন, ইহা অজ্ঞতা নিবন্ধন তপশ্চরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে[১৬,২০]। হে মহারাজ! বলিরাজা যেমন পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন সেইরূপ আপনিও এই তপশ্চর্য্যা নিবন্ধন সুদারুণ দুঃখজালে বদ্ধ হইয়া এই খাত প্রদেশে আগমন করি-

রাছেন। আপনিই এই সংসাররূপ মহাবনের গজ, আশাপাশ আপনার নিগড়, মোহ আপনার শত্রু এবং এই অত্যুৎকট বন্ধন আপনার নিপাতন খাত ও মহীতল বিন্ধ্য। আমি আপনাকে সমস্ত বৃত্তান্ত হস্তি-রূপকে বর্ণন করিলাম[২১।২২]।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

———*———
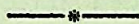
চূড়ালা বলিলেন, রাজন্! আমি আপনাকে অনন্যসাধারণ তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিতেছি। এ সমস্তই সত্য, অতি সত্য এবং অন্যেরও সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। হে নৃপসত্তম! যদি মদুক্ত কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে আপনার এই বাসনা পরিত্যাগ কোনও ব্যক্তি স্বীকার করিবে না[১।৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমি রাজ্য, দেশ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র এবং অধিক কি আমার অঙ্গাদিও ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি আমা কর্ত্তৃক কি সর্ব্ব ত্যাগ হয় নাই[৪]?

চূড়ালা বলিলেন, হে মহারাজ! ধন, দারা, গৃহ, রাজ্য, ভূমি, ছত্র, বন্ধু, বান্ধব, এ সকল আপনার নহে সুতরাং আপনি ত্যাগও করেন নাই[৫]। হে মহারাজ! আপনি এখনও অনুরাগ পরিত্যাগ করেন নাই। নিঃশেষে সেই অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই আপনি আর শোক তাপ প্রাপ্ত হইবেন না[৬]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, শৈল ও বৃক্ষ সকল গুল্ম পরিবৃত হইয়া থাকে। রাজ্যাদি তদপেক্ষাও অধিক জড়িত। আমি সেই রাজত্ব পরিত্যাগ করিলাম[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! কুম্ভের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিখিধ্বজ তৎক্ষণাৎ মনোরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষাকালিক

নদী তটগত সুতরাং পাংশুজালাচ্ছাদিত প্রবাহ রাশির ন্যায় সবেগে তিনি আপনাকে দৃঢ় নিশ্চয়ে জানিতে পারিলেন[৮.৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বৃক্ষ পর্ব্বত পল্বল এবং বন বাসনা এ সমস্তই আমি পরিত্যাগ করিলাম[১০]।

কুম্ভ বলিলেন, অদ্রি বন পল্বল সলিল পাদপ এ সমস্তই বনপ্রদেশে। তবে আপনা কর্ত্তৃক কিরূপে সমস্ত পরিত্যক্ত হইল[১১]? হে মহারাজ! এ সকল অপেক্ষা আপনি উৎকট অনুরাগ পরিত্যাগ করিলেই শোকাভিভূততা প্রাপ্ত হইবেন না[১২]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বাপী তড়াগ পল্বল উটজ প্রভৃতি যাহা কিছু আমার সে সমস্তই আমি অদ্য পরিত্যাগ করিলাম[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! জিতেন্দ্রিয় মহাবীর শিখিধ্বজ মহাত্মা কুম্ভের তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে ধ্যানস্তিমিত হইয়া প্রবুদ্ধান্তঃকরণ হইলেন। অর্থাৎ বাসনামলরহিত হইলেন। বায়ু যেমন পরিচালিত রজঃকণা সমূহে পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ, অন্তঃকরণও বাসনার দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে[১৪।১৫]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বৃক্ষ উটজ বীরুধ্ প্রভৃতি আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম[১৬]।

কুম্ভ বলিলেন, বৃক্ষ বাপী স্থল গুল্ম উটজ লতা এ সমস্ত কিছুই আপনার নহে, সুতরাং আপনা কর্ত্তৃক ইহাদিগের ত্যাগ সম্ভব হইতে পারে না[১৭।১৮]। হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বোচ্চ অনুরাগ পরিত্যাগ করিলেই অশোকতা লাভ করিতে পারিবেন[১৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, এই সমস্ত যদি আমার না হয়, তবে, কর্ম্ম ও কুটীরাদি আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই কথা বলিয়া শরৎকালীন মেঘমালা যেমন অচিরকাল মধ্যে অপসারিত হয়, সেইরূপ, বিমলাত্মা মহারাজ শিখিধ্বজ তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইলেন[২০]। মহাত্মা কুম্ভ নরপতির তাদৃশ কার্য্যাবলী অবলোকন করিয়া সুখিতান্তঃকরণে অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আপনি যাহা করিয়াছেন এবং করিলেন, এ সমস্তই পুণ্যপ্রদ, এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাবে নরবর শিখিধ্বজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শিখিধ্বজ আশ্রম হইতে

ভাণ্ডাদি ও সমুদায় উপকরণাদি আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলেন, এবং বলিলেন, আমার জ্ঞানোদয় না হওয়াতেই আমি এতাবৎ কাল এই সমস্ত বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে আমার ভ্রান্তি অপসারিত হইয়াছে। আমার এ সমস্ত দ্রব্যে আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি অক্ষমালাদি সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিসাৎ করিলেন। আমি ভ্রান্ত চিত্তে এই মৃগাজিন ধারণ করিয়াছি, অতএব হে অজিন! আপনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন, আপনার পথ সকল শুভ হউক। এই বলিয়া অন্যান্য দ্রব্যাদিও অগ্নিতে পরিত্যাগ করিলেন[২১।৩১]। আরও বলিলেন, হে কমণ্ডলু! তুমি আমার এতদিন মহান্ উপকার সাধন করিয়াছ, তুমি আমার প্রিয় সুহৃৎ মনোজ্ঞ এবং উপকারাস্পদ। দেহ অতি প্রিয়, তথাপি যেমন সেই দেহ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ, আমি আজ্ তোমাকেও পরিত্যাগ করিলাম। অতঃপর কুশাসনাদি ও অন্যান্য উপকরণ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুকেই ঐরূপ প্রিয় বচনের দ্বারা আমন্ত্রিত করিয়া তিনি সেই সমস্ত দ্রব্যনিচয় অগ্নিসাৎ করিলেন[৩২]।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর মহারাজ শিখিধ্বজ স্বকীয় অজ্ঞতা নিবন্ধন শুষ্ক পর্ণবিরচিত তৃণমন্দির ও তত্রস্থ অন্যান্য সমুদায় সামগ্রী অগ্নিসাৎ করিলেন[১।২]। কতকগুলি দ্রব্য অগ্নিদাহে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বীরভদ্র কর্ত্তৃক যেমন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ, তিনিও স্বকীয় আশ্রমপদ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন[৩।৪]। আশ্রম প্রদেশস্থ ভূভাগ হইতে মৃগকুল আকুল হইয়া রোমন্থন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইতে লাগিল। অগ্নিদাহে পুরী সকল নষ্ট হইলে ভীত জনের ন্যায় তাঁহাকে প্রতীত হইতে লাগিল। ভাণ্ডজাত অর্থাৎ সমুদায়

দ্রব্য অগ্নিসাৎ করিয়া নরপতি স্নেহ মমতা শূন্য হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন[৬]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অদ্য আমি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবপুত্র কর্ত্তৃক প্রবোধিতান্তঃকরণ হইলাম[৭]। অদ্য আমি শুদ্ধতাসম্পন্ন ও সুখোদ্বোধ প্রাপ্ত হইলাম। সঙ্কল্পজাত এই সমস্ত দ্রব্যাদিতে আমার কি হইবে[৮]। সমস্ত বন্ধন যখন দূরীকৃত হয়, তখন, পরমানন্দসম্ভূত নির্বৃতি আসিয়া উপনীত হয়[৯]। আজ আমি উত্তম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলাম অর্থাৎ শান্তি লাভ করিলাম। অদ্য আমি পরমা নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম। আজ আমার সমুদায় বন্ধন দূরীভূত হইল। অদ্য আমি সর্ব্বত্যাগী ও সুখী হইলাম[১০]। অদ্য আমি দিগম্বর দিক্‌সদন এবং দিক্‌সম অবস্থায় স্থিত হইলাম। হে দেবপুত্র! ইহা হইতে আর কি অবশিষ্ট আছে[১১]।

কুম্ভ বলিলেন, হে নরবর শিখিধ্বজ! আপনা কর্ত্তৃক এখনও সর্ব্বস্ব ত্যাগ সম্পন্ন হয় নাই। সমস্ত বস্তু পরিত্যাগের বৃথা অভিনয় করিবেন না[১২]। সমস্ত বস্তু হইতে অনুরাগ এখনও অপরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, অন্য পরিত্যাগে আপনি কি অশোকতা লাভ করিবেন[১৩]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজীবলোচন রামচন্দ্র! হে মহাবাহো! রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তাপরায়ণ রহিলেন। অতঃপর তিনি বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন[১৪]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিপোষিত রক্তমাংসময় এই দেহকে উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করিয়া আমি স্বীয় বিনাশ সাধন করিব। তাহা হইলেই আমি সর্ব্বত্যাগী হইব[১৫,১৬]। এই কথা বলিতে বলিতে রাজা শিখিধ্বজ সবেগে উত্থিত হইলে, কুম্ভ তাঁহাকে বলিলেন[১৭]। মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত এই নির্দ্দোষী দেহলতাকে উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করিতেছেন? দুর্ব্বুদ্ধি বৃষভই কুপিত হইয়া ক্ষুদ্র ও সদ্যোজাত বৎসকে হত্যা করিয়া থাকে[১৮]। হে মহারাজ! অজ্ঞানতা নিবন্ধন নির্দ্দোষী মূক জড় দেহকে পরিত্যাগ করিবেন না[১৯]। যেমন কাষ্ঠখণ্ড তরঙ্গের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ, এই দেহলতা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে[২০]। যেমন মত্ত তস্কর নিরপরাধী ব্যক্তিকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে, তদ্রূপ, এই শরীরও অন্য কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিপীড়িত হইয়া থাকে[২১]। শরীর নিবন্ধন

সুখদুঃখাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া কি শরীর অপরাধী হইবে? তাহা নহে। বায়ুচালিত হইলে ফলবান্ তরুর ফল ও পুষ্প পড়িয়া যায়, তাই বলিয়া কি বৃক্ষ দোষভাগী হইবে[২২।২৩]? পদ্মপত্রে জল যেমন অস্থির ভাবে থাকে, সেইরূপ, এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলে আপনা কর্ত্তৃক কি সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইল বিবেচনা করিতেছেন[২৩]? নিরপরাধী শরীরকে উচ্চ দেশ হইতে নিপাতিত করিলে আপনা কর্ত্তৃক সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইবে না। মত্ত মাতঙ্গ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত বৃক্ষের ন্যায় আপনা কর্ত্তৃকই এই দেহ পীড়িত হইতেছে। যদি আপনি এই শরীরকে পরিত্যাগ করেন, তবে, মহাত্যাগী হইলেও আপনি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ হইবেন[২৫।২৬]। হে মহারাজ! আপনাকে ত্যাগ করিলে অর্থাৎ অহং বুদ্ধি ত্যাগ করিলে দেহাদি সকল ত্যাগ করা হয়, অন্যথা ইহা নষ্ট হইলেও পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও দুঃখপ্রদ হয়[২৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন! এই দেহ কাহার দ্বারা চালিত হয়? এবং জন্ম কর্ম্মের বীজ-ই বা কি? কি পরিত্যাগ করিলে সকল পরিত্যাগ করা হয়? তাহা আমাকে বলুন[২৮]?

কুম্ভ বলিলেন, হে সাধো! দেহ ত্যাগ, রাজ্য ত্যাগ, গৃহ, উটজ প্রভৃতি ত্যাগ করিলেই সমস্ত ত্যাগ করা হয় না। যিনি সকলের বীজ, যিনি সমস্তের নিদান, সেই সর্ব্বভূতকারণ নিত্য নিরঞ্জন ভগবানে সমস্ত অর্পণ করিতে পারিলে সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে[২৯।৩০]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শিন্! সমস্ত বস্তুই অতি হেয় এবং সর্ব্বদা সমস্তই ত্যাজ্য এবং সর্ব্বই বা কি, তাহা আমাকে বলুন[৩১]?

কুম্ভ বলিলেন, হে পুণ্যশীল! প্রাণাদি নামক সর্ব্বগতাকার জীব জড়ও নহেন, অজড়ও নহেন, ভ্রান্ত চিত্তই সমস্ত নামে কথিত হয়। চিত্তই ভ্রম, চিত্তই নর, চিত্তই সংসার পাশ এবং চিত্তই সমস্ত[৩২।৩৩]। হে মহীপতে! তরু যেমন বৃক্ষেরই বীজ, সেইরূপ, মনই রাজ্য আশ্রম অথবা দেহাদি এই সমুদায়ের বীজ। (অর্থাৎ বাসনানুসারে এই সকল উৎপন্ন বা উপস্থিত হইয়া থাকে) হে মহারাজ! সমস্ত বস্তুর বীজ স্বরূপ একমাত্র মনকে পরিত্যাগ করিলেই সমস্ত ত্যাগ হয়। অথবা বাসনা পরিত্যাগ করিলেই সকল ত্যাগ হয়। তাহার অন্যথা হইলে ত্যাগ করা হয় না[৩৪।৩৫]। বাসনাযুক্ত জীবের বাসনানুসারে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রাজ্য

অথবা অরণ্য সম্ভোগ হইয়া থাকে। বাসনাবিহীন ব্যক্তির নিরন্তর সুখ হইয়া থাকে[৩৬]। বৃক্ষের বীজ যেমন আকারাদি পরিগ্রহ করিলে বৃক্ষ-রূপে দেখা যায়, সেইরূপ, বাসনার বিবর্ত্তন হেতু এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভোগাস্পদ হইয়া থাকে[৩৭]। যেমন ভূকম্পের দ্বারা পর্ব্বত আলোড়িত হয়, অথবা যেমন বাত্যাপ্রযুক্ত বৃক্ষ স্পন্দিত হয়, সেইরূপ, চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ এই দেহাদিরও স্পন্দন হইয়া থাকে[৩৮]। দেহধারী মাত্রেরই জরা ও মরণ আছে। মুনিগণের বাসনারহিত সুদৃঢ় মনকে চিত্ত বলিয়া জানিবেন না। জীব সকল মনের অবস্থানুসারে দেহাদি প্রাপ্ত হয়। হে মহীপতে! বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও প্রাণাদির ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা শান্তি লাভ হইয়া থাকে। চিত্তই সমস্ত, সেই চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ বাসনা ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইতে পারিলে আধি ব্যাধি হইতে বিমুক্তি লাভ করা যায় ও শান্তি পাওয়া যায়। হে ত্যাগবিদাম্বর! বাসনা ত্যাগই সর্ব্বত্যাগ বলিয়া কথিত হয়। সেই বাসনা ত্যাগ করিলে চির সত্য লাভ করা যাইতে পারে[৩৯,৪০]। চিত্ত সংযত হইলে দ্বৈতভাব দূরীকৃত হইয়া একত্বভাব আসিয়া উপনীত হয়। এবং তাহা হইলেই অনাময় পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারা যায়[৪১,৪৪]। তৈল বিহীন প্রদীপের দ্বারা যেমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং পক্ষান্তরে তৈলযুক্ত প্রদীপ দ্বারা সমস্ত দ্রব্য প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ, যিনি বাসনা ক্ষয় করিয়া চিত্তকে সংযত করিয়াছেন, তিনি সস্নেহ দীপের ন্যায় পরম ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন[৪৫,৫২]। বাসনা থাকিলে যেমন দ্রব্যান্তরের প্রতি আসক্তি জন্মায়, তদ্রূপ, বাসনা ত্যাগ করিলে কোন বস্তুর প্রতিই আর আস্থা থাকে না। হে মহারাজ! বস্তুর ধ্বংস হইলেও তখনও আপনি সেই একই পদার্থ থাকিবেন এবং তাহা হইলে আপনি নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারিবেন। সূর্য্য চন্দ্রাদি যেমন আকাশমার্গে উদিত হন, সেইরূপ, বাসনা রহিত হইলে তিনি শূন্যাত্মা হইয়া থাকেন। যাহারা ত্যাগ করিতে অসমর্থ তাহারা জরা মরণে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। চিত্রপটস্থ চন্দ্র যেমন আকাশমার্গে কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ্য হয় না, বাসনাত্যাগী জীবেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। বাসনা রহিত হইলে তিনি বিমলান্তঃকরণ হইয়া সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। বাসনা ত্যাগই পরমানন্দ, তদ্বিপরীত চিরদুঃখ। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা

সম্পন্ন করিতে পারেন। বাসনা পরিত্যাগ করিলে, যেরূপ নদীবাহিত জল সমুদ্রে মিশাইয়া যায়, তদ্রূপ, আপনি সমস্ত বিষয়ই আত্মতত্ত্বে মিশাইয়া উপভোগ করিতে পারিবেন। বাসনা ত্যাগ করিলে আপনি অতীব প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবেন। হে মহারাজ! আপনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরশান্তি লাভ করুন[৩৭।৩৮]।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

——()*()——

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামনা কুম্ভ পুনঃ পুনঃ চিত্ত পরিত্যাগ করিতে বলিলে মনোজ্ঞ মূর্ত্তি নরপাল শিখিধ্বজ গভীর গবেষণা সহকারে বলিতে লাগিলেন[১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, মন হৃদয়াকাশের পক্ষী অথবা হৃদয় বৃক্ষের মর্কট। উহাকে পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ করিলেও আমাকে উহা পুনঃ আক্রম বা আশ্রয় করে[২]। মৎস্য সকল জালবদ্ধ হইয়া যেমন আকুলিত হইয়া থাকে, হে মহাভাগ! আমিও তদ্রূপ মমতাক্রুষ্ট হইয়া ঐ চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না[৩]। হে মহাভাগ! আপনি কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক চিত্তের স্বরূপ কি এবং কি প্রকারে উহা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন? হে প্রভো! অভিহিত চিত্তকে আমি কি করিয়া পরিহার করিব, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। আমি উহাকে গ্রহণ করিতে জানি, ত্যাগ জানি না[৪]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! বাসনাই চিত্তের স্বরূপ, সেজন্য চিত্তের পর্য্যায় শব্দ (অন্য একটী নাম) বাসনা[৫]। উহার ত্যাগ অনায়াসসাধ্য। কেননা, কেবল ঔদাসীন্যের দ্বারা উহার ত্যাগ হইয়া থাকে। রাজ্য লাভ হইতেও তাহাতে অধিক আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। উহা কুসুম হইতেও অধিক স্পৃহণীয়[৬]। তৃণের মেরুতা এবং পামর ব্যক্তির সাম্রাজ্য যেমন

অসম্ভব, সেইরূপ, অজ্ঞ জনের সম্বন্ধে চিত্ত পরিত্যাগ অসম্ভব হইয়া থাকে[৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্তের স্বরূপ বাসনাময়, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তাহার ত্যাগ বজ্রাপেক্ষাও কঠিন বলিয়া বুঝিতেছি[৮]। অতএব, চিত্ত পরিত্যাগ অতীব দুষ্কর। হে মহাভাগ! সংসাররূপ সুগন্ধ পুষ্পের অথবা হৃদ্‌পদ্মের ভ্রমর, তথা দুঃখরূপ উত্তাপের বহ্নি, তথা শরীররূপ যন্ত্রের পরিচালক চিত্তকে আমি যাহাতে অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারি তাহার উপদেশ করুন[৯,১০]।

কুম্ভ বলিলেন, হে নরবর! পরিণামদর্শী ঋষিগণ বলেন যে, সমস্ত বস্তুর বিয়োগ হইলেও যাঁহারা তাহার স্মরণ না করেন অথবা স্মরণ করিয়া দুঃখিত না হন, তাঁহারাই চিত্তত্যাগ করিতে পারিয়াছেন[১১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! চিত্তত্যাগ অপেক্ষা চিত্তনাশ দুঃসাধ্য। তৎসিদ্ধির নিমিত্ত উপায়াবলম্বন আবশ্যক। মনুষ্যের চিত্তই ব্যাধি, তজ্জন্য তাহার চিকিৎসা অত্যাবশ্যক। নচেৎ অভাবজনিত বহু-প্রকার যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না[১২]।

কুম্ভ বলিলেন, শাখাপল্লববিশিষ্ট চিত্ত পাদপের বীজ "অহং" জ্ঞান। হৃদয়াকাশস্থিত সেই "অহং" জ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করুন[১৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! চিত্তের মূল কি? এবং অঙ্কুরই বা কি? ইহার শাখা প্রশাখাই বা কি? আর ইহার স্কন্ধদেশই বা কি এবং আমি কিরূপে ইহাকে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইব, তাহা আমাকে বলুন[১৪]?

কুম্ভ বলিলেন, অহংজ্ঞানই বেদনাত্মক চিত্তবৃক্ষের বীজ, এবং ইহার ক্ষেত্র পরমাত্মা। সেই ক্ষেত্র এখন মায়াজালে জড়িত আছে। সেজন্য উহাকে মায়াক্ষেত্র বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। এই মায়া ক্ষেত্র হইতে যখন অহং জ্ঞানের অনুভব বিকাশ পাইতে থাকে তখন তাহাকে অঙ্কুর কহে। নিশ্চয়াত্মিকা নিরাকারা বুদ্ধি যখন বিশেষরূপে পরিপাকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন, তাহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়। মনীষিগণ তাহাকেই চিত্ত বলিয়া থাকেন। শূন্যাত্মা জীব উহারই অন্তর্গত। সুতরাং মিথ্যা[১৫,১৬]। এতাদৃশ চিত্তবৃক্ষের বাসনার দ্বারা দূরবিলম্বী শাখা প্রশাখা সকল সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা এই চিত্তবৃক্ষের ফলাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা এই মহাবিটপীর শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে

মহারাজ! আপনি এই বৃক্ষের শাখা সকল ছিন্ন করিয়া মূলদেশ কর্ত্তন করিতে যত্নবান্ হউন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্তপাদপের শাখা সকল ছিন্ন করিয়া কিরূপে মূলদেশ কর্ত্তন করিব আপনি আমাকে তাহার উপদেশ করুন।

কুম্ভ বলিলেন, বিবিধ বাসনাই বিবিধ শাখা এবং তাহার স্পন্দনই ফল[২০,২৩]। যাঁহারা অনাসক্ত মৌনী এবং তত্ত্ববিচারে সক্ষম তাঁহারাই এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন[২৪]। আর যাহারা বিষয়াসক্ত তাহারা ইহাতে জড়ীভূত হইয়া থাকে। আপনি পুরুষকার দ্বারা এই চিত্তপাদপের শাখা প্রশাখা সকল ছিন্ন করুন[২৫]। যিনি স্থিরচিত্তে অর্থাৎ অচঞ্চল চিত্তে বা সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতে পারেন তিনি ইহার মূলোচ্ছেদে সমর্থ হন। শাখাচ্ছেদন ইহার গৌণ ও মূলোচ্ছেদ মুখ্য ফল। অতএব, আপনি চিত্তবিটপীর মূলোচ্ছেদে যত্নপর হউন[২৬।২৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অহং ভাবই চিত্ত বিটপীর বীজ। কোন্ অগ্নি এই বীজ দগ্ধ করিতে সক্ষম হয় আপনি তাহার উপদেশ করুন[২৮]?

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! আত্মবিচারই চিত্ত বৃক্ষের বীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়[২৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! আমি স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা বার বার বহুবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, এই বনরাজি পরিশোভিত অরণ্যপ্রদেশে কিম্বা বহুবৃক্ষসমাকুল গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গে কিম্বা বনরাজি-মধ্যে কিম্বা উপবনসমূহে, কুত্রাপি আমি অহং পদার্থ দেখিতে পাইতেছি না। জড়ত্বহেতু দেহাদি কিছুই নহে, অস্থিমাংস এ সকলও কিছুই নহে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিও কিছুই নহে। জড়তাপ্রযুক্ত আমি মনেরও অহংজ্ঞান থাকা দেখিতে পাইতেছি না[৩০।৩২]। সুবর্ণের দ্বারা হার কেয়ূরাদি প্রস্তুত হইলে যেমন তাহা সুবর্ণই থাকে, তদ্রূপ, আমি আত্মাতে অহং ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না[৩৩।৩৪]। পরন্তু হে ভগবন্! আমি অন্তর্জ্ঞান শিখিতে পারি নাই এ নিমিত্ত বহুকাল এই তপোনুষ্ঠান দ্বারা কালাতিপাত করিতেছি[৩৫]।

কুম্ভ বলিলেন, হে অনঘ! হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন! আপনি যদি এত-দূর জানিতে পারিয়াছেন তবে আপনি কি অর্থাৎ আপনি কিংস্বরূপ তাহা বলুন[৩৬]?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বিভুষাম্বর! যিনি চিরস্থির, নিত্যশুদ্ধ, সেই একমাত্র চিদ্রূপ, ইহা আমি এখনও স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি যাহাতে সেই পরম পদ লাভ করিতে পারি তাহা আমাকে বলুন[৩৭,৩৯]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহাবাহু! আপনি যাহাতে সংসারে ব্যাপারবান্ আছেন, সেই মহৎ ভাব কি অথবা কিংস্বরূপ তাহা বিবৃত করুন[৪০]?

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্ত বৃক্ষের যে বীজ আমাকে আকৃষ্ট করিয়া আছে আমি সেই বীজ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। যাহাতে ত্যাগ করিতে পারি তাহা বলুন[৪১]।

কুম্ভ বলিলেন, কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। কারণ হইতেই কার্য্য হয়। তাহা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। যে স্থানে কারণ নাই সে স্থানে কার্য্য হইতে পারে না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আপনি বীজানুসন্ধান করুন[৪২।৪৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! অহংজ্ঞানই চিত্ত বিকারের কারণ। আমি যাহাতে সেই অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে পারি তাহা বলুন[৪৪।৪৫]?

কুম্ভ বলিলেন, হে নরপাল! আপনি কারণজ্ঞ, অতএব, এই চিত্ত সন্তাপের কারণ আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। পরে আমি আপনাকে কারণ ও অকারণ বিবৃত করিব। অকারণও কারণ হয়, আবার কারণও অকারণ হয়[৪৬]। যাহাতে আপনার অকারণে কারণতকার হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন[৪৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! এই পরিদৃশ্যমান জগতীস্থ দ্রব্য সমূহের সদ্ভাব বা সত্তাবোধ হইতে দেহাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। বস্তু সমূহেরও উপাদান অন্তরস্থ বেদনা অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞান। শরীর মধ্যে যে বেদনাদির (বেদনা=বিশেষ বিশেষ অনুভব বস্তুজ্ঞান) আবির্ভাব হয় সে সকল বায়ুরাশির স্পন্দন নিবন্ধন মিথ্যা রেখাদির সদৃশ অর্থাৎ অসত্য। আমি সেই অসত্যভূত বস্তু সকল হইতে যে চিত্তবিকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহাও অসত্য[৪৮।৫০]।

কুম্ভ বলিলেন, যদি উপাদান সামগ্রী হইতে দেহাদির আবির্ভাব সত্য বলিয়া আপনার প্রতীত হইয়া থাকে, তবে তাহা আপনাতেও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর দেহাদির অসদ্ভাব হইলে তখন আর বেদনা জন্মিবে না। কোথা হইতে জন্মিবে[৫১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, যাহার একটা স্বরূপ অনুভব হয় তাহার নাস্তিতা কিরূপে সম্ভবে। হস্তপাদাদিবিশিষ্ট সতত বিনাশভাগী এই দেহকে কিরূপে অভাব অর্থাৎ নাই বলিয়া স্থির করিতে পারি?[৫২।৫৩]

কুম্ভ বলিলেন, হে ভূমিপাল! যে কার্য্যের কারণ নাই সেরূপ কার্য্য জগতে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অবয়বাদি কারণসম্ভূত নহে সুতরাং যাহার কারণ নাই এরূপ শরীরাদি থাকিতেই পারে না। যাহার বীজ নাই তাহা কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে[৫৪।৫৫]। যে কার্য্যের হেতু নাই তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। যিনি এই সকল কার্য্যকে সত্য বলিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিশ্চয় মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ন্যায় ভ্রমজালে পতিত হন[৫৬]। আপনিও মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ন্যায় ভ্রমজালে পতিত হইয়া তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করিবেন না[৫৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, দেহাদি যদি দ্বিচন্দ্রাদির ন্যায় অত্যন্ত মিথ্যা হয় তাহা হইলে কারণ অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। বন্ধ্যাপুত্রের শরীর ভূষিত করিবার চেষ্টা আর অত্যন্তমিথ্যা পদার্থের অনুসন্ধান করা সমান[৫৮]।

কুম্ভ বলিলেন, অস্থিপঞ্জর নির্ম্মিত এই শরীরাদি কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। হে মহারাজ! উৎপন্ন হইলেও ইহারা নষ্ট হইবে, আপনি তাহা পরিজ্ঞাত হউন[৫৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! হস্তপাদাদিযুক্ত শরীর যে পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, নিত্য দর্শনযোগ্য সেই পিতা কি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না[৬০]?

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! কারণের সত্তা না থাকায় পিতাও কারণ হইতে পারে না। যাহার সত্তা নাই তাহা অসৎ বা অলীক। আকাশ কুসুমের ন্যায় মিথ্যা। কার্য্য সকলের বীজই কারণ বলিয়া গণ্য হয়[৬১]। হে রাজন্! ব্রহ্মাণ্ডে বীজ ব্যতীত অঙ্কুর হইতে পারে না[৬২]। এই নিমিত্ত যাহার কারণ নাই সেরূপ কার্য্য হইতেই পারে না। যে স্থলে কারণের অভাব, সে স্থলে কার্য্যের প্রতীতি হইলেও তাহা ভ্রমজাল বলিয়া জানিবে[৬৩]। যাহার অসত্তা নিশ্চয় হইয়াছে, তাহার কারণানুসন্ধান মরুভূমিতে জলানুসন্ধানের ন্যায় অথবা বন্ধ্যা নারীর পুত্র প্রসবের ন্যায় মতিভ্রম বলিয়া জানিবেন[৬৪]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, পিতামহ, পিতা ও পুত্র, ইহাদের পরস্পর কেহই

প্রকৃত কারণ নহেন কেন? পিতার কারণ পিতামহ কি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না[৬৫]?

কুম্ভ বলিলেন, হে ভূপতে! যে পিতামহকে আদিভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন তাঁহারও সত্তা নাই। কারণের অভাব নিবন্ধন কোন কালেই তাঁহার সত্তা থাকিতে পারে না[৬৬]। কারণীভূত পিতামহের বীজ না থাকায়, এক ভ্রান্তি জ্ঞান হইতে যেমন অপর ভ্রম জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ, পিতামহেরও সত্তা ও কারণ নির্দ্দেশ করা ভ্রম জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না[৬৭]। মৃগতৃষ্ণিকা নিবন্ধন যেমন জলভ্রম হইয়া থাকে, পিতামহকে বীজভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সেইরূপ ভ্রম জ্ঞানের ফল[৬৮]। আপনি পিতামহকে পুত্রাদির কারণ বলিয়া যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছেন, আমি তাহা অপনোদন করিব[৬৯]। হে ভূমিপতে! যাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি দেবদেব, তিনি আত্মা হইতে অভিন্ন। সেই পরম পিতা চিরশান্তিপ্রদ ভগবান্ বিষ্ণু হইতে আপনি ভিন্ন নহেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাতেই মনোনিবেশ করুন[৭০]।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

—()—

শিখিধ্বজ বলিলেন, যদ্যপি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যই ভ্রমময় বা ভ্রান্তিনির্ম্মিত, তবে, এ সকলের অর্থক্রিয়া বা ব্যবহার নির্ব্বাহ কিরূপে হয়? এবং কি নিমিত্তই বা দুঃখোৎপাদক হইতেছে[১]।

কুম্ভ বলিলেন, এই জগদ্ভ্রম শৈত্যের দ্বারা জলের কাঠিণ্যের ন্যায় রূপান্তর মাত্র। অর্থাৎ অজ্ঞানের ঘনতায় জগৎ ও তদ্ব্যবহার নির্ব্বাহ হইতেছে[২]। অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মোহ দূরীকৃত হইলে এ সকলের মিথ্যাত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যাবৎ তাহা না হয়, তাবৎ হর্ষ বিষাদাদি

জন্মে ও সে সকল বিশেষ বিশেষ ভোগ বলিয়া গণ্য হয়[৩]। পূর্ব্ব-সংযোগ ধ্বংস হইলে তৎসমুদায় বস্তু নূতন বলিয়া যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি সে সকলের বিনাশ নিবন্ধন দুঃখও উপভোগ করেন[৪।৫]। হে মহারাজ! মৃগতৃষ্ণিকায় জল ভ্রমের ন্যায় আপনি পৃথক্ আদি পুরুষ থাকা অনুভব করিতেছেন। পিতামহাদি কর্ত্তৃক উদ্ভূত হইলেও এই সকল সন্তানাদি মিথ্যা। কারণ এই যে, অসত্য বস্তু হইতে কথনও সত্য বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে না[৬।৭]। যেমন শুক্তিকায় ভ্রান্তিজ্ঞান বশতঃ রজত জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু বিচার দৃষ্টির পরে যেমন আর তাহাতে রজত্ব জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ, আত্মতত্ত্ব বিচারের পরেও এ সকলের সত্যতা থাকে না। তদ্রূপ, মরীচিকায় জল ভ্রমের ন্যায় আপনি এই সকল দ্রব্যের স্বরূপে ভ্রান্ত হইয়াছেন। কারণ না থাকি-লেও কার্য্য হইতে পারে এবম্বিধ জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব হয় না[৮।৯]। মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা যাহা অবলোকন করা যায় তাহা কথন সত্য নহে। মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমে পতিত হইয়া কে কোথায় কবে ঘটপরি-পূর্ণ করিতে পারিয়াছে[১০]?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্ত শাশ্বত অব্যয় পরম ব্রহ্ম কি নিমিত্ত প্রথম সৃষ্টির কারণ নহেন[১১]?

কুম্ভ বলিলেন, পরম ব্রহ্ম কোন কারণাধীন নহেন। সুতরাং যাঁহার হেতু নাই তিনি অক্রিয় ও অকর্ত্তা। তাঁহার কারণও নাই কার্য্যও নাই। দ্বৈতবুদ্ধি তিরোহিত হইলে আত্ম-অভেদে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। যিনি তর্কের দ্বারা অগম্য, অহেতু, নিষ্ক্রিয়, তিনি কিরূপে কর্ত্তা হইতে পারেন[১২।১৩]? যিনি কার্য্যাদি ও কারণাদি রহিত, চিরশান্ত, অব্যয়, অতীন্দ্রিয় এবং অনধিগম্য, অথচ যাঁহাতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি কোন হেতুর অধীন নহেন এবং কার্য্যাদি বিরহিত হইয়া নিরন্তর অবস্থিত রহিয়াছেন[১৪।১৫]। অতএব, এই নিয়ত বা সদা পরিদৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে ইহা স্থির করিবে। ইহার সত্তা সতত অনশ্বর। তিনি ইহার কর্ত্তাও নহেন ও ভোক্তাও নহেন। সমস্ত শান্তিময়, এক অজ ও অব্যয়, সুতরাং কে কাহার কর্ত্তা ও ভোক্তা হইতে পারে[১৬]? কারণের অভাব হইলে কোন কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং ভ্রমজ্ঞান নিবন্ধন আপনি এই জগতের কর্ত্তৃতা ও কারণতা অনুভব করিতেছেন[১৭]।

অকার্য্যত্ব নিবন্ধন স্বর্গাদিও নাই, দ্রব্যাদির অভাব সংসিদ্ধি হওয়ায় এই জগৎ নশ্বর, এই প্রকার জ্ঞানোদয় হইলে দুঃখাদি অনুভূত হয় না, এবং দুঃখাদি অনুভব না হইলে আমি ইহার কারণ বলিয়াও প্রতীতি জন্মায় না। আপনি এক্ষণে বন্ধন ও মোক্ষ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট অতি চমৎকারিণী হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তি সকল শ্রবণ করিয়া বিমলাত্মতা লাভ করিলাম[১৮।২০]। কারণের অভাব হেতু কর্ত্তার সত্তা অনুমিত হয় না। এখন আমি এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না। কর্ত্তার অভাব বশতঃ ক্রিয়াধীন জগতেরও সত্তা থাকিতে পারে না[২১]। চিত্তাদি দুঃখের কারণ নহে এবং আমিও কিছুই নহি, এইরূপ বুদ্ধি হওয়ায় আমি বিশুদ্ধ ও বিমলাত্মা হইয়াছি অথবা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অবস্থায় রহিয়াছি, এইরূপ অনুমান হইতে থাকে[২২]। আকাশ যেমন সতত নির্ম্মল থাকে, মেঘাদির অভ্যুদয় হইলে তাহাতে কলঙ্কাদির আরোপ হয়, সেইরূপ, আত্মা সতত নির্ম্মল, অহংজ্ঞান দ্বারা জীব মোহিত হইলে চিত্ত কলুষিত হইয়া নানা প্রকার অনুভব করিয়া থাকে। অতঃপর আমিই সেই, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আমি স্বতন্ত্র নহি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা শিখিধ্বজ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[২৩]। দেশ কাল ও কলাদিরও ক্রিয়া সমূহের একত্র সমবায় এবং পদার্থ সমূহের একত্র সম্মিলন হইলে জগৎ নামক মিথ্যা পদার্থ নয়নগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল পদার্থ কখনও চিরস্থির নহে, কেবল সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই চিরকাল অনন্তরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি অদ্য উপশম প্রাপ্ত হইলাম, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলাম, বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলাম, আমার আর জন্ম অথবা মৃত্যু দুএর কিছুই নাই, উদয় অথবা ক্ষয় নাই। যেমন সর্ব্বমঙ্গলময় পরম ব্রহ্ম সতত মৌনাবস্থায় থাকেন, আমিও সেই আত্মার (ব্রহ্মের) দর্শন লাভ করিয়া কেবল শান্তিময় রূপে অবস্থান করিতেছি। মহারাজ শিখিধ্বজ এইরূপ অনুভব করিয়া চিত্ত সংযত করিলেন[২৪।২৫]।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়নবতিতম সর্গ।

—()○()—

মহারাজ শিখিধ্বজ এইরূপে নিরাময় পরম ব্রহ্মে শান্তি লাভ করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মহামনা কুম্ভ সকাশে নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সত্বর চেষ্টা করিতে লাগিলেন[১।২]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মোহজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, আপনার কার্য্যও নাই কারণও নাই। আপনি যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন, তখন আর আপনি কোনওরূপ অনিষ্টশঙ্কা করিবেন না। আপনি সমস্ত বেদনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেন[৩।৪]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ শিখিধ্বজ মহাত্মা কুম্ভ কর্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া মহা মোহজাল হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন[৫]। তিনি অত্যন্ত নির্ম্মল বুদ্ধি হইয়া অচিরকাল মধ্যে চিরপ্রার্থিত বস্তুর (ব্রহ্মজ্ঞান) দর্শন ও তজ্জনিত সুখ লাভ করিলেন এবং মুক্তাত্মা হইয়া এ সকলের অসত্যতা অনুভব করিতে লাগিলেন[৬]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে হর্ষদ! হে মানদ! আপনার কৃপায় আমি এক্ষণে বিদিতবৃত্তান্ত হইয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি আপনাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব, আপনি উত্তর দানে আমাকে নিরতিশয় সুখী করুন[৭]। মায়াবিরহিত অতএব শান্তরসাস্পদ পরম ব্রহ্মে আত্মা উপরত হইলে বিশ্বদর্শন বিষয়ে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য এ সকলের স্বরূপ কিরূপে অনুভবগম্য হইতে পারে[৮]?

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি অতি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছেন এবং আপনি ময়ূখমালা বিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল হইতেছেন, যে হেতু আপনি এই সকল হিতকর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে উদ্গ্রীব হই-

য়াছেন[৯]। এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পরিশোভিত যে জগৎ অবলোকন করিতেছেন এ সকলের কিছুই থাকিবে না, কল্পান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[১০]। তদনন্তর গাঢ় অন্ধকারের উদয় হইবে। তাহা হইতে তেজ অথবা অন্ধকার কিছুই উদ্ভূত থাকিবে না। কেবল মহাকল্পান্ত কালে অতি সত্য বস্তু (আত্মা) অবশিষ্ট থাকিবেন[১১]। কেবল বিমলাংশু চিৎ আকাশরূপে বর্ত্তমান থাকিবেন। সমস্ত ভোগ ও যন্ত্রণাদি হইতে বিরহিত হইয়া কেবল সেই চিৎ শক্তি বর্ত্তমান থাকিবেন[১২]। অতুাজ্জ্বল শান্ত স্বচ্ছ তেজস্তিমিত জ্ঞানমাত্র পরমাত্মা বিরাজিত থাকিবেন[১৩]। সেই পরম ব্রহ্ম তর্কের অতীত, দুরধিগম্য, অনিন্দিত, শিবরূপী, তিনি নির্ব্বাণ ব্রহ্ম এবং তিনি পূর্ণ হইতেও পূর্ণ[১৪]। তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, স্থির হইতেও স্থির, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! সেই নিয়ত চিরশান্তিপ্রদ পরম পুরুষ অতি সূক্ষ্ম পরমাণু পার্শ্বে মহামেরু যেরূপ, সেইরূপ তাঁহাতে জীব আত্মা প্রতিভাত হইয়া থাকে[১৫।১৬]। এই প্রকার সেই জীব আত্মার নিকটে জগৎ পরমাণুর সদৃশ, এবং তৎকালে এ সকলে সামান্যতঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, বিশেষ রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। বায়ু স্পন্দনাদির দ্বারা প্রবাহিত হইলেও তাহা যেমন বায়ু হইতে পৃথক নহে, শূন্যতা ও আকাশ যেমন পৃথক নহে, তদ্রূপ, পরমাত্মা আত্মা অহং জ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া বেদনাদি অনুভব করিয়া থাকেন। যখন অহং জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক অর্থাৎ অপৃথক থাকেন[১৭।১৯]। দেশকালাদির দ্বারা মতি পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ভেদ কল্পনা উৎপন্ন হইলে, জলের সহিত তরঙ্গের ও কটকাদির সহিত সুবর্ণের ভিন্নভাব যদ্রূপ, তদ্রূপ ভিন্নভাব অনুমিত হয়। প্রত্যুত জল ও তরঙ্গ একই পদার্থ, সুবর্ণও বলয়াদি হইতে অপৃথক। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড পৃথক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পরন্তু তিনি জগৎ রাজ্যের অধীশ্বর এবং অখণ্ড জগৎ হইতে পৃথক নহেন। যিনি জগৎ হইতে সেই পরম পুরুষকে পৃথক ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন তিনিই তৎকালে বেদনাদি অনুভব করেন[২০।২৩]। হে ভূপতে! তিনিই একমাত্র অবলম্বন সত্য পদার্থ, তাঁহা হইতে কিছুই পৃথক নহে। দ্বৈত ভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবেন না, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় পদার্থ কিছুই নাই, যখন যিনি আত্মতত্ত্ব লাভ করেন নাই তিনি তখন তাঁহাতে

মলিনভাব এবং অপূর্ণতা দেখিয়া থাকেন[২৪।২৫]। তিনি অদৃশ্য হেতু কার্য্য বা কারণ নহেন। অথচ তিনি সর্ব্ব এবং সমস্ত হইতে পৃথক নহেন[২৬]। তিনি প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে অনধিগমনীয়। অতএব, তাঁহা হইতে অধিক কি উৎকৃষ্ট বস্তু থাকিতে পারে? তিনি সমস্ত, সর্ব্বাত্মা এবং অতি সূক্ষ্ম। তিনি নিরাভাস আখ্যা ও অনাখ্যা বর্জ্জিত। তিনি সৎ এবং অসৎ। সুতরাং তিনি কিরূপে কারণতা প্রাপ্ত হইবেন?[২৭।২৮]। যিনি কাহারও বীজ নহেন এবং আখ্যা বিরহিত হওয়ায় কাহারও কারণ নহেন এবং যাঁহা হইতে কোনও বস্তুর উদ্ভব হয় নাই, যিনি অকর্ত্তৃক এবং অকর্ম্ম এবং চিরসত্য অক্ষত আত্মরূপ ও স্বয়ং জ্ঞাত। হে মুনিবর! তাদৃশ পরম ব্রহ্ম হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই[২৯।৩০]। অতএব, হে মুনে! যেমন জলে তরঙ্গোৎপত্তির কারণ আছে, সেরূপ কারণ না থাকায় জগৎকে সকারণ বলিয়া স্থির করা যায় না। ভ্রমসৃষ্ট পদার্থের ভ্রমই কারণ, অন্য কারণ নাই। সুতরাং কে কি দিয়া কি জন্মাইয়াছে? বোধগম্য করিবে।

শিখিধ্বজ বলিলেন, কারণাধীন জলাদিতে তরঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং অহংজ্ঞানাধীন জগতের কারণ অনুমান হয়।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহীপতে! এক্ষণে আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন[৩১।৩৩]। এই জগৎ, এই আমি, এ সকল প্রলয় কালে থাকিবে না। জগৎশব্দার্থরহিত শিবাত্মক ব্রহ্মই আছেন[৩৪]। আকাশ হইতে সূক্ষ্মতর আকাশে যেমন শূন্যতা অবস্থান করে, তদ্রূপ, ঈশ্বরে তন্ময় জগৎ বিদ্যমান আছে[৩৫]। নিজ রূপেই তাহা অভিব্যক্ত, অন্য রূপ তাহার উপলব্ধি অনুপলব্ধ, এইরূপ বোধ হইলে শিবরূপ জগৎ পরিদর্শন করিবেন [৩৬]। জ্ঞানের সম্যক বিকাশ হইলে বিষও অমৃতের ন্যায় কার্য্যকারী হয়। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ না হইলে এই অশিবাত্মক জগৎ, দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে[৩৭]। বিষবুদ্ধি প্রযুক্ত অমৃতও বিষ তুল্য হইয়া থাকে। ভ্রম বশতঃ যেমন বিচিত্রাকার নানা ভ্রম জন্মে, তদ্রূপ যে বস্তুতে যেরূপ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে তাহাতে চিত্ত তদাকারত্ব প্রাপ্ত হয়[৩৮।৩৯]। কিন্তু চিত্ত আত্মার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে কেবল ব্রহ্মদর্শনই হইয়া থাকে[৪০]। এই নিমিত্ত ভ্রম জ্ঞান হইলে জগদাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি অহংজ্ঞান

প্রযুক্ত নশ্বর জগতের প্রশ্ন করিবেন না। যাহা সত্য তদ্বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার দর্শন বিষয়ে প্রশ্ন করায় কোন ফল নাই। সন্নিবেশ বশতঃ সুবর্ণাদির সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে[৩১।৩৩]। অহং ভাব ব্যতীত ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি হয় না। কারণতা শূন্য হওয়ায় এই চরাচরের কোন সত্তা নাই। সুতরাং ইহা ব্রহ্মময়, এই প্রকার ধারণা যুক্তি সঙ্গত[৩৪]। এই নিখিল জগৎ সেই ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব নিবন্ধন যে জীবাদির সৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা মায়া প্রেরিত। সুতরাং জীবকে ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা প্রতারিত হইতে হয়। সমস্তই চিন্ময় এবং চিন্ময় ব্রহ্মে বস্তু সকল লীন থাকে[৩৫।৩৬]। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে তখন নানা জ্ঞান থাকে না। পূর্ণ হইতে পূর্ণ পদার্থেরই উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ণ হইতে পূর্ণই বিকাশ পাইয়া থাকে[৩৭]। পূর্ণাবয়ব হইতে পূর্ণই প্রকাশমান হইয়া থাকে এবং শেষে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। আত্মায় যেরূপ চিন্ময়াবির্ভাব হইয়া থাকে তদ্রূপ ইহাও চিন্ময়[৩৮]। যখন অকচিত ভাব অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণাবেশ হয়, তখন নিরুপাধি ব্রহ্ম জ্ঞান বিরাজিত থাকে। তাহা মায়াবরণে আবরিত হইলে উপাধিযুক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার অনুভূত হইয়া থাকে। অপিচ, তৎসঙ্গে অহং জ্ঞানের উদ্রেক হইয়া থাকে[৩৯]। নিরাময় পরব্রহ্ম তেজোময়, অনাদি ও অনন্ত। তিনি মনের অগোচর, তিনি সম্রাট্। মায়ার দ্বারা আহৃত হইলে সংসারের উপাধি ভাবনা হয় ইহা জ্ঞানের দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে[৪০।৪১]। তাই পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই শব্দ ও অর্থ যুক্ত অর্থাৎ নাম রূপ যুক্ত এই জগৎ বস্তুকল্পে নাই অথচ প্রতীতিকল্পে আছে। দ্বৈরূপ্য বশতঃ ইহা অব্যপদেশ্য অর্থাৎ আছে অথবা নাই বলিবার অযোগ্য। ইহার তত্ত্ব বা রহস্য এই যে, ইহা একই বস্তু। ব্রহ্ম বস্তু স্বপ্রকাশ। যাহা আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হয় ইহা তাহাই। ইহা যে দেখা যায়, এ দেখা তদাশ্রিত মায়া বিশেষ[৪২]।

ষড়নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

কুম্ভ বলিলেন, দেশ কাল অবস্থাদি পরিচ্ছেদ দ্বারা সুবর্ণে জন্য-জনকতা ভাব জন্মিয়া থাকে। সত্যতঃ কোন পদার্থ জন্ম গ্রহণ করে না এবং কিছুই লয় প্রাপ্তও হয় না[১]। নিরাভাস ব্রহ্ম স্ব সত্তায় অবস্থান করেন, তিনি কাহারও বীজ বা কারণ নহেন। তিনি নিত্যশুদ্ধ, তাঁহা হইতে অন্য কিছুই হয় নাই[২]। ব্রহ্ম অনন্ত এবং জগৎ ক্ষুদ্র।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! ব্রহ্মে জগৎ এবং অহং জ্ঞান সত্যতঃ নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সর্গাদি অনুভবাত্মক ইহা কিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে তাহা আপনি আমাকে সত্বর বলুন[৩]।

কুম্ভ বলিলেন, তিনি অনাদি অনন্ত জ্ঞানময়, ভুবনাদি তাঁহার বপু স্বরূপ। তিনি জ্ঞানের অতীত, তিনি শূন্য হইয়াও পরিপূর্ণ[৪।৫]। জলের দ্রবত্ব যেরূপ, সেইরূপ, অনুভব বিশেষ দ্বারা চিৎ জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা অচিৎ অর্থাৎ জড়, চিৎ তাহার কারণ, এতদ্রূপে নিরূপিত হইতে পারে না[৬]। সেই চিন্ময় পদার্থই মায়ার দ্বারা জগদাকারে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। এই বস্তু আছে ও এই বস্তু নাই, অথবা ইহা স্বচ্ছ ও তাহা অস্বচ্ছ, এই ভাব দ্বয়ের বিচার করিতে গেলে না থাকা ভাব অথবা অস্বচ্ছ ভাব মিথ্যা বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়। ভাবিয়া দেখ, আছে এই পক্ষই স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ প্রথমোদিত। এবং নাই বা অস্বচ্ছ এ পক্ষ তাহার বিপরীত। অতএব, থাকা পক্ষের স্থিরতা, না থাকা পক্ষকে দূরীকৃত করে, করিয়া থাকা পক্ষকে খাঁটি করে[৭]। তাই বলিতেছি একই পরম পদার্থের অন্যাকার প্রতীতি মায়িক, এবং মায়িক বলিয়া তাহার কারণ নিরূপণ অন্যায্য। মায়া দৃষ্টির কারণ মায়াই; অন্য কিছু নহে[৮]। অতএব, ব্রহ্ম কোন কিছুর উপাদান কারণ নহেন। তিনি তর্কের অগোচর, ইঙ্গিতের অবোধ্য[৯]। সৃষ্টি সত্য, এ পক্ষ

নিরূপণের কিছুমাত্র উপায় নাই[১০]। কেবল মাত্র এক নিত্য নিরবয়ব চিৎ পদার্থ নিত্য বিদ্যমান আছে, তদ্বিপরীত জড় কোনও কালে ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই। এই যে বিবিধাকার জগৎ দেখিতেছ, দেখা যায় বলিয়া ইহা লোকপ্রতীতির বিষয় হইতেছে বটে; বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে। অর্থাৎ ইহাকে যে ভাবে দেখিতেছ, এ ভাব ইহার প্রকৃত ভাব নহে। ইহার প্রকৃত ভাব সেই ব্রহ্ম নামক চিৎ পদার্থ। অতএব, অহংভাবে, জগৎ এই শব্দে ও জগৎ শব্দের অর্থে ব্যাসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণাভাব বশতঃ কার্য্যের অনুপপত্তি, তাই বলিয়া ইহা যাদৃচ্ছিকও নহে। ইহা সেই চিৎ পদার্থের রূপান্তর ও চমৎকার জনক[১১,১২]। দ্বিত্ব বহুত্বাদি শব্দ শব্দমাত্র, ঐ সকলের অর্থ আকাশ কুসুমের তুল্য। জগতীস্থ ঘটপটাদি বস্তু সকল চিতের রূপান্তর সত্য, পরন্তু এ রূপের নাশ বা পরিবর্ত্তন রহিয়াছে, সেজন্য এ সকল প্রকৃত চিৎ নহে[১]। এই যে নশ্বরের নাশ ও উৎপন্নের উৎপত্তি বর্ণন করিতেছি, ইহার উপলম্ভক কে? অর্থাৎ ইহার জ্ঞাতা কে? বলিতে বা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, চিৎ-ই জ্ঞাতা। এখন ভাবিয়া দেখ, যখন নাশ কালেও চিতের অস্তিত্ব তখন নাশ শব্দ শব্দমাত্র, উহার অর্থ খ-পুষ্প সদৃশ। কেননা, জড়ের দ্বারা জড়ের নাশ অসম্ভব। অভিপ্রায় এই যে, চিৎ-ই নিত্য বিদ্যমান, তদ্‌বিভিন্ন জগৎ মিথ্যা। মিথ্যার আবার উৎপত্তি বিনাশ কি[১৪]? আমার জগদ্বতর নিত্য উৎপত্তি ও নিত্য বিনাশ শব্দের দ্বারা স্বীকার করিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার চিদ্রূপতা স্বীকার করিতে বা জানিতে কষ্ট হয়। যাহাই হউক, ফলিতার্থে ইহা অর্থাৎ এই সকল দৃশ্য কেবলমাত্র চিত্তের মহিমা, অন্য কিছু নহে[১৫]। হে মহীপাল! কেবলমাত্র এক চিৎ পদার্থ আছে, অর্থাৎ অদ্বৈতই সত্য, দ্বৈত মিথ্যা। এই যে অহংজ্ঞান, এই অহংজ্ঞানকেই তুমি চিত্ত বলিয়া জানিবে। অহং ভাবই চিত্তের রূপ, অহম্ভাবের মিথ্যাত্ব চিত্তেরও মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়। যাহার বাসনা নাই, মন শান্ত হইয়াছে, যে আকাশের ন্যায় মৌনী, সে সদেহ বিদেহ সকল কালেই নিশ্চল ও নির্ব্বিকার। দ্বৈত পদার্থ নাই, এই বোধ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সে তখন চিত্ত ও তদন্তর্গত অহং এই দুএর অতীত হয়। চিত্তের অধিকার বা সামর্থ্য বা বিষয় না থাকায় চিন্তাও বিনিবৃত্ত হয়[১৬,২০]।

অতএব, নির্ম্মল, কার্য্যকারণাদিদশা পরিবর্জ্জিত, শাশ্বত, অনেকরূপী হইলেও এক আদ্যন্তরহিত সেই ব্রহ্মই আছেন এবং সমুদায় জগৎ তাহাই[৭১]।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

——()•()——

শিখিধ্বজ বলিলেন, যে যুক্তির দ্বারা আপনি চিত্তের সত্তা বা অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিলেন, তাহা পুনরায় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন[১]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! চিত্ত বলিয়া কোন পদার্থ নাই, তবে কদাচিৎ যে অনুভব হয় তাহা ব্রহ্ম স্বরূপ এবং অব্যয়[২]। যখন সমস্ত চিত্তাদি জগৎ অজ্ঞানাত্মক, তখন জ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞানাত্মক জগতের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না। অজ্ঞানের উদয় হইলে অহং ত্বং তৎ ইত্যাদি কাল্পনিক পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানের উদয় হইলে অহং ত্বং তৎ ইত্যাদি কল্পনা হইতে পারে না[৩]। কিঞ্চনোদিত অর্থাৎ মায়াপ্রসূত এই জগতের সত্তা নাই, একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মই সৎ রূপে চিরকাল বিরাজিত আছেন। এইরূপ জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে[৪]। মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্টি, অথবা সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়। এ কল্পনাও অজ্ঞানীর কল্পনা। ফলতঃ যদ্রূপ মহাপ্রলয়ে জগৎ ছিল না, তদ্রূপ পরেও নাই। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি শব্দের নির্দ্দেশ করিতেছি[৫]। আত্মাকারাদীর উপাদান কারণের অভাব বশতঃ এবং অশেষ ভাব পদার্থের অকারণত্ব হেতু ও অজ্ঞান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জগতের সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞান ভাব তিরোহিত হইলে জগতের সত্তা উপলব্ধি হয় না। তবে যদি কখনও ঐরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তবে তাহা ব্রহ্মেতর (ব্রহ্মভিন্ন) বলিয়া জানিবেন[৬।৭]। যাঁহার আখ্যা বা উপাধি নাই, যিনি অকর্ত্তৃক অবস্থায় নির্লিপ্ত ভাবে সতত বিরাজমান;

তিনি যে এই জগতের মূল ইহা অসৎ জ্ঞান। অনুপপত্তি হেতু আত্মসত্ত্ব উপলব্ধি হয় না[৮]। সোপাধি অনিরাকার আত্মবান্ ঈশ্বর জগদাদি বিনির্ম্মাণ করেন ইহা ইতিহাসাদির মত[৯]। ঐ প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে চিত্তের সত্তা বর্ত্তমান থাকে না। হে মহারাজ! জগদাদির যখন সত্তা নাই, তখন তদ্গত চিত্ত কিরূপে সত্তাবান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে[১০]। বাসনাবিষ্ট চিৎ চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সুতরাং বাসনাধীন জগৎও অসৎ। অসৎ পদার্থাত্মক চিত্তের সত্যতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে[১১]। ব্রহ্মই আপনাতে আপনার দ্বারা এই জগদ্ভাব রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাই সেই রচনার অর্থাৎ কল্পনার অপর এক নাম চিত্ত। অতএব, এই সকল দৃশ্য বস্তুতঃ উৎপন্ন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণের অভাব বশতঃ কোন কিছু উৎপন্ন হয় নাই। সে কথা চিত্ত শব্দেরও বিষয় অর্থাৎ চিত্তও সংগতঃ উৎপন্ন নহে। জগতের মূল চিদাকাশ, যাহা পরমাত্মশব্দে উক্ত হয়, সর্ব্বত্র তাহারই বিকাশ, চিত্তও তাহার বিকাশ, সেজন্য চিৎ ব্যতীত চিত্তের অনস্তিতা[১২।১৫]। এই দৃষ্ট জগৎ বাসনাধীন, আমাদিগের উৎপত্তিও বাসনাধীন। কারণের অভাব হইলেই মন নির্ব্বাসন হইয়া থাকে। স্বপ্ন যেমন অলীক, সেইরূপ, অহং ত্বং এই জগৎ ইত্যাদিও বাস্তবিক নহে[১৬]। যখন বাসনা বিরহিত হইয়া থাকে, তখন বাসনাধীন জগতেরও উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। অতএব, বাসনাত্মক চিত্তেরই বা কিরূপে সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে[১৭]। যাহাদিগের জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, তাহারাই এই ভ্রমাত্মক জগৎ অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমে নিরাকার এবং অসৎ চিত্তের উদ্ভব হইয়া থাকে[১৮]। কারণাভাব বশতঃ সৃষ্ট্যাদির প্রকৃত উদ্ভব হইতে পারে না। যদি জন্য জনক ভাব না থাকে, তবে জগৎ নিত্য এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে দৃশ্য বস্তু সকল উৎপত্তিধ্বংসাদি ক্রিয়া রহিত, ইহা কেবল জ্ঞানভেদ মাত্র[১৯]। অনাদিত্ব অজত্ব স্থূলাদি ও সাকারাদি ভাব, এ সমস্ত কেবল মাত্র অনুভব বিশেষ[২০]। মহাপ্রলয় প্রভৃতি লোকতত্ত্ব, শাস্ত্র ও অনুভব দ্বারা নাই বলিয়া প্রতিপাদন করা উচিত[২১]। লৌকিক ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় উপদেশ, বেদার্থ, এ সকলের দ্বারা ঐ সকল (মহাপ্রলয়াদি) বিদিত হইলেও প্রাগুক্ত কারণাভাব যুক্তিতে ঐ সকলের পারমার্থিকতা নাই বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে[২২]। শাস্ত্র প্রমাণ

নহে, বেদ অপ্রমাণ, এ কথা যাহারা বলে, তাহারা অসৎ, অতিমূঢ়; সাধু সজ্জনগণ তাহাদের সংশ্রব করেন না[২৩]। যদিও শ্রুতি ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়াছেন, তথাপি, তাহার তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায়, জগতের ব্রহ্মাভিন্নতা পক্ষেই পর্য্যবসিত। সুতরাং তাহা নিরাকার ব্রহ্মের সাকার কারণতা পক্ষ নিরাকরণ করিতে সমর্থ[২৪]। হে মুনে! এইরূপ এইরূপ আলোচনার পর নিশ্চয় হয় যে, জগৎ নাই, ইহার কোন কার্য্য-কারিতাও নাই। সমস্তই ভ্রম-প্রপঞ্চ[২৫]। তাই বলিতেছি, এ সমস্তই পূর্ব্বাপর উভয় কালেই নিরাময়[২৬]। ব্রহ্মই সর্ব্বরূপী, এবং ব্রহ্মই সৃষ্টি প্রলয়াদি রূপে বিরাজমান[২৭]। ব্রহ্ম আপনিই আপনার জগদ্রূপ শরীর দেখেন, আবার সে দর্শন ত্যাগ করিয়া স্ব স্বরূপে স্থিত হন[২৮]। শাস্ত্র শ্রবণ ও তাহার মননাদি জনিত আত্মরহস্যের প্রতীতি দৃঢ় হইলে ইহা তাহা জগৎ ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়। চিত্ত ও চিত্তের গোচরীভূত দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনাও অন্তর্হিত হয়[২৯]।

যে কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, সমস্তই নিরালম্ব বা নিরাধার, অর্থাৎ মিথ্যা বুদ্ধির মহিমা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। নানা অনানা, এক ও বহু, এ সকল ব্যবহারও নিরালম্ব। অতএব, যাহা থাকে থাকুক, তুমি কাষ্ঠের ন্যায় মৌন থাক[৩০]।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবনবতিতম সর্গ।

——()•()——

মহাত্মা শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! আপনার অসীম করুণা গুণে আমার মোহজাল অপসৃত হইয়াছে। আমি এক্ষণে বিমল বুদ্ধি ও পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিলাম, আমার সংশয় সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়াছে, আমি এক্ষণে আত্মদর্শন লাভ করিলাম[১]। দুস্তর অর্ণব সদৃশ মায়া সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ায় আমার চিরন্তনীন জ্ঞেয় পদার্থের

জ্ঞান লাভ হইল। আমি এক্ষণে চিরশান্তি লাভ করিলাম, এবং আমি অনুভূতির স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া নিরাময় হইলাম[২]। আমি ভবসাগরে বহুদিবস অপ্রবুদ্ধাবস্থায় ভ্রান্তিজালে বিজড়িত ছিলাম, এক্ষণে আমি অক্ষুব্ধ হইয়া অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইলাম[৩]। হে মুনিবর! এক্ষণে আমার অহং জ্ঞান তিরোহিত হইয়া পরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে[৪]।

কুম্ভ বলিলেন, প্রশান্ত অর্ণবোদরে আবর্ত্ত যেমন উদ্ভূত হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে, সেইরূপ, এই সংসার সমুদ্রে জীবও পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া আবার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৫।৬]। ইহা ব্রহ্মরূপ চিরস্থির শব্দজ্ঞানাধীন আকাশের যেমন সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ, এই আমি ও এই জগৎ ইহারও আভাস প্রতীত হইয়া থাকে[৭]। ইহা আদ্যন্ত রহিত, মায়া প্রভাবে চিত্ত চমৎকারের ন্যায় কদাচিৎ উদ্ভব হইয়া থাকে[৮]। সুবর্ণাদি যেমন কটকাদিতে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ, জগৎও মায়ার দ্বারা জীবাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব, সুবর্ণ যেমন কটকাদি হইতে পৃথক নহে, তদ্রূপ, জগৎও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে[৯]। যেমন স্বয়ম্ভু সঙ্কল্প দ্বারা উদ্ভূত সুতরাং সঙ্কল্পময়, তদ্রূপ, তদন্তর্গত জীবও সঙ্কল্পময় এবং বন্ধ মোক্ষও সঙ্কল্পের অধীন[১০]। হে মহারাজ! অহং বুদ্ধি হইলে বন্ধন দশা প্রাপ্ত, এবং সোহং বুদ্ধি হইলে অর্থাৎ অহং বুদ্ধির অভাব হইলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১১]। যে সাক্ষিচৈতন্য বন্ধ, মোক্ষ ও সঙ্কল্প প্রভৃতিকে জানিতেছে, প্রকাশ বা প্রথা প্রাপ্ত করিতেছে, সেই কেবল অনুভূতিরূপ চৈতন্যই ব্রহ্ম, এবং তাহাই তৎ ও সৎ প্রতিতি শব্দের বোধ্য[১২]। আমি আমি নহি, এতদ্রূপ জ্ঞানের নাম সিদ্ধি ও আমি অমুক, এতদাকার জ্ঞান আপদ অর্থাৎ বন্ধন। অতএব, আমি আমি নহি, পরন্তু ব্রহ্ম, এইরূপ বিশুদ্ধ বোধে স্থিত হও[১৩]। সঙ্কল্প ত্যাগ হইলেই কেবল ও বিশুদ্ধ বোধের উদয় হয়, সুতরাং সঙ্কল্প ত্যাগই সিদ্ধি লাভের উপায়। সঙ্কল্প পদার্থ অসৎ অর্থাৎ একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র, সেজন্য উহার ক্ষয় হইয়া থাকে[১৪]। ব্রহ্ম তর্কাদির অতীত, সেজন্য তিনি কোনও কিছুর প্রকৃত কারণ নহেন। অপিচ, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সুতরাং বুঝা উচিত যে অহং জ্ঞানেরও কারণ নাই। ব্রহ্মাতীত পদার্থ নাই, এ ভাব সিদ্ধ হইলে তখন আর এ সকলের

জ্ঞান জন্মে না। অহং জ্ঞানের কোন বাস্তব কারণ না থাকায় বুঝিতে হইবে যে উহার বাস্তব জন্মও নাই[১৫।১৬]। যদি অহং ভাব না থাকে তাহা হইলে সংসার কি তাহা বুঝিয়া দেখ। অর্থাৎ সংসারও থাকে না এবং সংসারের অভাবে পরমাত্মাই অবশেষিত হয়[১৭]। যে কিছু অবভাস, সমস্তই সেই পরমাত্মায়। অচল যেমন কেবল শিলাকীর্ণ, সেই-রূপ, এই নিখিল পদার্থও পরব্রহ্মে সমাকীর্ণ। অর্থাৎ তাহাতেই উদ্ভূত সুতরাং পরব্রহ্ম হইতে কিছুই ভিন্ন নহে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া তদাত্মতা লাভ করুন[১৮।১৯]। সঙ্কল্প নষ্ট হইলে সঙ্কল্পিত নগরের যেরূপ অবস্থা হয়, জগতের সেইরূপ অবস্থা অর্থাৎ অসন্ময়তা জানিবেন[২০]। জগৎ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যিনি জগৎ পরিদর্শন করেন, তিনি এই জগৎকে ছায়া পুরুষের সদৃশ বলিয়া অবগত হন[২১]। যিনি জ্ঞানে পার-দর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়াছেন পণ্ডি-তেরা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন[২২]। সুবর্ণ যেরূপ কটকাদি হইতে বিভিন্ন নহে, স্পন্দহীন বায়ু যেরূপ, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপও সেই-রূপ[২৩]। রূপ দর্শন ও মনের অবধারণা সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেমন উর্ম্মি শব্দের অর্থ রহিত হইলে বহু জল ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রতীতি জন্মে না, তদ্রূপ, সৃষ্টি পদার্থের অর্থ রহিত হইলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভব গোচর হয় না[২৪।২৫]। সৃষ্টিও ব্রহ্ম। সৃষ্টির দ্রষ্টাও ব্রহ্ম। সুতরাং সৃষ্টিশব্দও ব্যবহারিক রহিত হইলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভূত হয় না[২৬]। ব্রহ্ম শব্দের অর্থের দ্বারা সৃষ্টি ও সৃষ্টি শব্দের অর্থ সম্পত্তির দ্বারা ব্রহ্মই প্রতীত হয়[২৭]। সৃষ্টি শব্দ কেন, সমস্ত শব্দের ভাবনা অর্থাৎ অর্থ বিচার দ্বারা কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা নিশ্চয় হয়। সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলে বেদ্য ও বেদন এই দ্বি ভাবই বিনিবৃত্ত হয়, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না[২৮।২৯]।

যাহাতে নানা জ্ঞান উপশান্ত, তাদৃশ এক ব্রহ্মই আছে। তাহা জ্ঞপ্তিরূপ ও প্রস্তরের ন্যায় অন্তর্ব্বাহে একরূপ[৩০]।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

শততম সর্গ ।

—()—

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে! কারণ বা উপাদান যাহার যেরূপ তাহার কার্য্যও সেইরূপ সংসাধিত হইয়া থাকে[১]।

কুম্ভ বলিলেন, যেখানে কারণ বিদ্যমান থাকে, কার্য্যও সেই স্থানে হইয়া থাকে। যে স্থানে কারণতা নাই, কার্য্যও সে স্থানে হইতে পারে না[২]। এখানে অর্থাৎ তত্ত্ব বিচারণায় কোনও কারণ নাই সুতরাং কার্য্যও নাই[৩]। কারণাধীন যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহাই কারণ-বিশিষ্ট। যাহার উৎপত্তি হইতে পারে না তাহার সাদৃশ্য কোথায়[৪]। যাহার বীজ নাই তাহার উৎপত্তিও সম্ভবে না। যাহা তর্কের দ্বারা অনুমিত হয় না, যাহার সংজ্ঞা নাই, তাহার বীজ কিরূপে সম্ভবে[৫,৬]। যিনি কর্ত্তা ও কারণ উভয়ের অতীত, সেই শিব অর্থাৎ পূর্ণ মঙ্গল বস্তু কিরূপে সকারণ হইতে পারে? অতএব, জগৎ এই শব্দের অর্থ সেই জ্ঞপ্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৭]। ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ, এইরূপ বা এই উপদেশ তুমি গ্রহণ ও ধারণ কর। সম্যক্ জ্ঞান রহিত অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ যাহা বা যে বিষয় দেখে, জগৎ তাহাদের নিকট সেই বিষয়েই পরিব্যাপ্ত[৮]। প্রমাণেও পাওয়া যায়, কেবল মাত্র এক বিশুদ্ধ চিৎ অজয় ও অমর বস্তু আছে। এই জগৎ তাঁহারই বপু অর্থাৎ অজ্ঞদশায় বহির্দৃশ্য[৯]। হে রাজন্! চিত্তের যে অন্যথা ভাব, তাহাই তাহার নাশ, ইহা পণ্ডিতগণের অনুভব ও উক্তি[১০]। চিত্ত নাশস্বভাব বিশিষ্ট ও নাশাত্মক অর্থাৎ কল্পনা সকল ক্ষণে ক্ষণে মনোমধ্যে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে সুতরাং মানিতে হয় যে চিত্তেরও ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংস হইয়া থাকে। যাহার প্রতিক্ষণেই ধ্বংস হইয়া থাকে তাহাকেই চিত্ত বলিয়া থাকে[১১]। সঙ্কল্প সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই নষ্ট হইয়া যায়। উদারাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক সঙ্কল্প ব্যতিরেকে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না[১২]। যদি নাম মাত্রের দ্বারা বিশ্বের স্থিতিত্ব অঙ্গীকার করা

যায়, তবে নামার্থের দ্বারা তাহার স্থিতিত্ব কেন না অঙ্গীকৃত হইবে[১৩]? যিনি হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক আমি শূদ্র বলিয়া থাকেন, তিনি বিপ্র হইলেও কিরূপে তাহাতে বিপ্রত্ব থাকিতে পারে[১৪]? যিনি আমি মৃত হইয়াছি বলিয়া স্থিত হন, জীবিত থাকিতে তাহাতে মৃত্যুর আরোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে[১৫]? অলাত চক্রের তুল্য অথবা মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ন্যায়, অথবা প্রতিবিম্বিত অবস্থায় দ্বিচন্দ্রের ন্যায়, কিম্বা বালকের বেতাল ভীতির ন্যায় যাহা ভ্রমাকৃতি বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহাকে কি বলিয়া সত্য বলিয়া অনুমান করিব? চিত্ত অজ্ঞান ও ভ্রান্তিযুক্ত বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে[১৬।১৭]। চিত্ত ও অজ্ঞান একই বস্তু, তাহা অসৎ স্বরূপ হইলেও সৎ স্বরূপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সম্যক্ জ্ঞানই জ্ঞান, তদ্‌বিপর্য্যয় অজ্ঞান[১৮]। হে সাধো! যেমন ইহা মরীচিকা, এই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে ইহা জল এই অসম্যক্ জ্ঞান বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, ইহা জগৎ এই অসম্যক্ জ্ঞানও ইহা ব্রহ্ম এই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়[১৯।২০]। চিত্ত নাই, যাহাকে চিত্ত বলিয়া জানিতেছি, তাহা চিত্ত নহে, এই সম্যক জ্ঞান চিত্তের মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। যেমন রজ্জু এই জ্ঞান সর্প জ্ঞানের নাশক, সেইরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞানও চিত্ত জ্ঞানের বাধক। কেবল চিত্তজ্ঞানের নাশক বা বাধক নহে, সম্যক্ জ্ঞান সমস্ত ভ্রমসম্ভূত বিষয়ের বাধক অর্থাৎ নাশক[২১।২৩]। অতএব, চিত্ত নাই, অহঙ্কারাদিও নাই, সমস্তই ভ্রম, ভ্রমের বশে সঙ্কল্প ও চিত্তাদি কল্পিত হইয়াছে। তাই পণ্ডিতগণ বলেন, প্রবুদ্ধ হইলে সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগ, তৎসহ চিত্তকল্পিত সমস্ত বস্তুর পরিত্যাগ সিদ্ধ হয়[২৪।২৫]। সঙ্কল্পসৃষ্ট পদার্থ অসঙ্কল্প দ্বারা তিরোহিত হয়, ইহা বায়ু ও অগ্নি শিখার দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতে পারে (স্পন্দ ধর্ম্মের অভাবে বায়ুর বায়ুত্ব তিরোহিত ও জ্বলন ধর্ম্মের অভাবে বহ্নির বহ্নিত্ব তিরোহিত হয়)[২৬]। সমুদ্র যেমন কেবল বারিময়, পদার্থান্তর নহে, সেইরূপ, জগৎও নিবিড় আত্মতত্ত্ব, অন্য কিছু নহে[২৭]। আমি, তুমি, আমার ও দৃষ্ট, চিত্ত বা মন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়, এ সমস্তই সেই নির্ম্মল আত্মা[২৮]। আত্মাই ঘটপটাদির আকারে অবভাসিত হইতেছে। আমি তুমি চিত্ত, এ সকল কল্পনা মাত্র[২৯]। জগত্রয়ের কোনও কিছু জন্মে না, মরেও না। এ সকল চিতি-শক্তির উল্লাস অর্থাৎ

কাল্পনিক অবস্থা। সেই চিৎ-শক্তিই সৎ ও অসৎ রূপে ভাসমান[৩০]। সমস্তই আত্মা বা পরব্রহ্ম। ব্রহ্মই দ্বিত্ব ও একত্ব প্রকারে রাজমান। তাঁহাতে ভ্রমও সত্যতঃ নাই, অসন্ত্রমও সত্যতঃ নাই[৩১]। হে মহা-বুদ্ধে! তুমি ইন্দ্রিয়াদির আকারে অনুভূত হইতেছ। আকাশ যেমন দগ্ধ হয় না, সেইরূপ তুমিও দগ্ধ হও না[৩২]। বিনাশ ও বৃদ্ধি তোমার নহে। তুমি কেবল ও নির্ম্মল আকাশের সদৃশ[৩৩]। ইচ্ছা শক্তি ও অনিচ্ছা শক্তি ও অন্যান্য শক্তি তোমারই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট। চন্দ্র অংশু অর্থাৎ কিরণ ব্যতীত পদার্থান্তর নহে[৩৪]। যাহা আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা অজ, অজর, অমল, অনাদি, অনন্ত, সৎস্বরূপ, সদা একরূপ ও বিকারাদি ধর্ম্ম রহিত[৩৫]।

শততম সর্গ সমাপ্ত।

একশততম সর্গ।

—()ᵕ()—

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, কুম্ভের অমৃতনিস্যন্দী অকৃত্রিম বচন শ্রবণ করিয়া মহারাজা শিখিধ্বজ চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নব ভাব প্রাপ্ত হইলেন[১]। শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক স্তিমিতলোচন ও সংযত চিত্ত হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[২]। অনন্তর কুম্ভরূপিণী চূড়ালা মুহূর্ত্তমাত্র জ্ঞানসম্পন্ন রাজাকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন[৩]।

কুম্ভ বলিলেন, শুদ্ধ নির্ম্মল এই পথে নির্ব্বিকল্প ব্যক্তির ন্যায় আপনি বিশ্রান্ত হইতেছেন[৪]। কখন অন্তর্ব্বোধ প্রাপ্ত হইতেছেন, কখনও বা ভ্রান্তিজ্ঞানও প্রাপ্ত হইতেছেন। কখনও বা জ্ঞেয় পদার্থ নিরূপণ পূর্ব্বক দ্রষ্টব্য পদার্থ পরিদর্শন করিতেছেন[৫]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহ বশতঃ আমি উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়া সকলের উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছি[৬]। আমি

মহানুভব সাধু ব্যক্তিগণের বেদ্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছি। অপূর্ব্ব অমৃত সার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে মহামৃত শত শত জন্মে লাভ করিতে পারিতাম না, তাহাও অদ্য আপনার সমাগম বশতঃ লাভ করিলাম[৭।৮]। কিন্তু হে কমললোচন! ইতিপূর্ব্বে আমি কি নিমিত্ত আত্মপদ লাভ করিতে পারি নাই তাহা আমাকে বলুন[৯]?

কুম্ভ বলিতে লাগিলেন, ভোগ বাসনা তিরোহিত না হইলে, মন শান্তি প্রাপ্ত না হইলে, শুভাশুভ কর্ম্ম পাক প্রাপ্ত না হইলে, আত্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল হইলে চিত্ত যখন বিশ্রাম করিতে থাকে তখন গুরুর (উপদেষ্টা গুরুর) উপদেশ নিচয় কার্য্যকারী হয়। শুভ্র বস্ত্রেই কুসুম রঙ্গের রঞ্জনা জন্মে, মলিন বস্ত্রে নহে[১০।১১]। শরীরী মাত্রেরই অসংখ্য কষায় অর্থাৎ অশুভ সংস্কার থাকে, সে সকল পাক প্রাপ্ত না হইলে তত্ত্ববোধ জন্মে না। বহুকাল পরে তোমার কষায় অর্থাৎ অশুভ বাসনাদি পাক প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সাধো! যেমন বৃক্ষের ফল পরিপক্ক হইলে বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া যায়, তেমনি, দেহীদিগের কষায় গণও পক্ক হইলে শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়[১২।১৩]। অদ্য আপনি আমাকর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইলেন। হে মতিমন্! আপনার অজ্ঞানরাশি অদ্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে[১৪।১৫]। আপনি অদ্য জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, আপনি অদ্যই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং অদ্যই প্রবুদ্ধ হইলেন[১৬]। আপনার শুভাশুভ সমুদায় কর্ম্মেরই অদ্য সংক্ষয় হইল। সাধুজন সংসর্গে অদ্য আপনার বাসনা বিদূরিত হইল[১৭]। হে নরপতে! দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধের ন্যায় যতক্ষণ অজ্ঞান তিরোহিত না হয়, ততক্ষণ "অহং" "মম" ইত্যাকার অভিমানও দূরীকৃত হয় না[১৮]। এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনার বোধোদয় হইয়াছে। হে ভূপতে! আত্মাভিমান নষ্ট হওয়াতে আপনি বিশেষ প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হইয়াছেন[১৯]। যতক্ষণ হৃদয়ে মনের সত্তা থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞানও অবস্থান করে। চিত্তে চিত্তের অভিমান ভাগ পরিত্যক্ত হইলে জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়[২০]। চিত্তের অজ্ঞানতা নিবন্ধন দ্বিত্ব ও একত্বাদি জ্ঞান হয়, একত্ব দ্বিত্বের যখন তিরোধান হয়, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকে, তখনই পরমা গতি লাভ করিতে পারা যায়[২১]। হে নরপতে! আপনি প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, বিমুক্ত হইয়াছেন, আপনি অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি সদসৎ সমস্ত পরিত্যাগ

করিয়াছেন এবং সৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[২২]। আপনি বীতশোক, নিরভিমান এবং নিঃসঙ্গ হইয়া আত্মবান্ হইয়াছেন। আপনি মহাপ্রভাব সম্পন্ন নির্ম্মল ও মৌনী মুনিতুল্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[২৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! মূর্খ প্রাণীগণের চিত্তই এইরূপ হইয়া থাকে। হে প্রভো! প্রবুদ্ধ ব্যক্তির চিত্ত কখনও এরূপ হয় না[২৪]। যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারা কিরূপে বিহার করেন তাহা বলুন। যাঁহাদের কোনরূপ বাসনা নাই আপনাদের মত মহানুভাব তাঁহারা কি করিয়া থাকেন[২৫]। আপনি আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক সে সকল বলুন। আপনি আমার সম্বন্ধে অতীব প্রিয়তম, এইরূপ অনুভব করিতেছি। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না[২৬]।

কুম্ভ বলিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞ! আপনি যাহা বলিতেছেন সে সকলই সত্য তাহার অন্যথা নাই। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ন্যায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চিত্তের প্ররোহ নাই[২৭]। পুনর্ব্বার জন্ম যোগ্য বাসনা জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের নাই, যে বাসনার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ সে কর্ম্ম পরিগ্রহ করেন না, এইজন্য তাঁহারা আর ভব যন্ত্রণা ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করেন না। জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ সকল অবস্থাতেই সংযমী হইয়া থাকেন, তাঁহারা আসক্তি শূন্য হইয়া পরিভ্রমণ করেন[২৮,৩০]। চিত্ত যখন মোহ প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তখনই চিত্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং প্রবুদ্ধ হইলে উহা সত্ত্ব শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। অপ্রবুদ্ধ চিত্তস্থ আধী সমুদায় দূরীভূত হইয়া থাকে[৩১]। চিত্তই পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু সত্ত্ব পুনরায় উৎপন্ন হয় না। হে ভূপতে! অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, প্রবুদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন প্রাপ্ত হন না[৩২]। এক্ষণে আপনি সত্ত্ববান্ হইয়াছেন, মহান্ ও ত্যাগী হইয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকারেই চিত্ত পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন[৩৩]। হে রাজন্! অদ্য আপনি সমস্ত বাসনা হইতে বিরত হইয়াছেন। আকাশ যেমন নির্ম্মল, সেইরূপ, আপনিও সুনির্ম্মল হইয়া অবস্থান করিতেছেন[৩৪]। আপনি অত্যর্থ শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত সংস্থান প্রাপ্ত হইলেন। আপনা কর্ত্তৃক যখন সমস্তই পরিত্যক্ত হইল, তখন আপনিই ত্যাগী[৩৫]। হে সাধো! স্বর্গ অপবর্গ ও বিত্ত (ধনাদি) এ সকল

তপস্যার ফল, দানের ফল নহে। যাহারা চিত্ত পরিহার পূর্ব্বক সংযত হইয়া থাকে তপস্যাদি তাহাদের পক্ষে অধিক ফল নহে[৩৬।৩৭]। সদ্বস্তু কদাচিৎ নাশ প্রাপ্ত হয় না ও ভাবাভাবাদির দ্বারা পরিবেদন প্রাপ্ত হয় না[৩৮]। হে মানদ! দৃষ্ট পদার্থের সংস্থান সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। ক্রিয়া সমূহ সিদ্ধির দ্বারা শুভ হইয়া থাকে[৩৯]। যিনি সুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি কি পিত্তল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? (সুবর্ণ=তত্ত্বজ্ঞান। ক্রিয়াসিদ্ধি=পিত্তল। জ্ঞানীরাও নিরভিমানে ক্রিয়াসিদ্ধি গ্রহণ করেন)। চূড়ালা সংসর্গেও অনায়াসে আপনার জ্ঞাততা সম্পন্ন হইতে পারে[৪০]। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনর্থক তপোধর্ম্মে আত্মাকে বিনিযুক্ত করিয়াছেন। আশ্রমাদির বিকল্প কুকর্ম্মী ব্যক্তিই করিয়া থাকে[৪১]। হে সুমতে! তপোধর্ম্মের আদ্য ভাগ আচরণাবস্থা, অন্তঃভাগ ফলক্ষয়াবস্থা, মধ্য প্রদেশ স্বর্গাদি ভোগাবস্থা। তবে আপনি কি নিমিত্ত তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বদ্ধ দশায় রহিয়াছেন? চিত্তরূপ আকাশে সমস্ত ভাবই উদিত হইয়া থাকে[৪২।৪৩]। তাহাতেই সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্গণ এইরূপ কার্য্য ও সঙ্কল্প গ্রহণ করেন না[৪৪]। হে শিখিধ্বজ! বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ণতা লাভ কর। হে সখে! যে ইষ্ট প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই প্রার্থনা কর[৪৫]। অর্থাৎ আত্মলাভই লাভ, তাহা তোমার সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আর তোমার কিছুই প্রার্থিতব্য নাই। যে নারীর প্রণয়াস্পদ পতি আছে সে কি পত্যন্তর প্রার্থনা করে? তাহা করে না। সেইরূপ, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের কোনও কিছু প্রার্থিতব্য নাই। তাঁহারা জানেন, এ সকল সঙ্কল্পরচিত ও অরমণীয়[৪৬]। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ সমস্তই তাঁহাদের নিকট আত্মা[৪৭]। জগতের অসৎ অংশ মায়িক, সদংশ আত্মা। তুমি অসৎ অংশ ত্যাগ কর, নিস্পৃহ হও ও সদংশে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হও[৪৮]। মনঃকল্পিত পদার্থে আস্থা করিও না। চিত্তকে স্থির রাখিয়া অবস্থান কর। চিত্ত যদি ধাবমান না হয় তাহা হইলে সংসারও থাকে না[৪৯]। হে মহীনাথ! যে কিছু দুঃখ সমস্তই চিত্তচাপল্য জাত অর্থাৎ বাস্তব নহে। যাহার চিত্ত স্থির, চাপল্য রহিত, সে মহা-আনন্দী ও সেই পুরুষই মোক্ষ রাজ্যের রাজা[৫০।৫১]। হে তত্ত্বজ্ঞ!

চিত্তের গতি রুদ্ধ করিয়া, অথবা চাপল্য অচাপল্য সমান বোধ করিয়া, একভাবে স্থিতি কর[৫২]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বিভো! স্পন্দ ও অস্পন্দ এ দুটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কিরূপে উহার ঐক্য সিদ্ধ করা যায় তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন[৫৩]।

কুম্ভ বলিলেন, এ সমুদায় জগৎ চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন জলময় সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী উঠে, সেইরূপ, চিৎসমুদ্রেও বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী জন্মে। অর্থাৎ যেমন জলের স্পন্দন লহরী, তেমনি, বুদ্ধির স্পন্দন চিৎপদার্থেরই স্পন্দন বলিয়া গণ্য। যাহার ব্রহ্ম, চিৎ, সত্ত্ব, এই সকল নাম, সেই বস্তুকেই মূঢ়েরা জগদ্ভাবে দর্শন করে[৫৪,৫৫]। সেই যে মিথ্যা স্পন্দন তাহাই চিত্ত নামের নামী। এবং তাহারই মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ে স্পন্দ অস্পন্দের ঐক্য হয় এবং তাদৃশ সম্যক্ জ্ঞানে স্পন্দময় সৃষ্টির বিলয় সম্পন্ন হয়। যেমন রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রান্তি থাকে না, সেইরূপ[৫৬,৫৮]। স্পন্দনই চিত্ত, তাহা ক্ষুদ্র আর অস্পন্দনই মহান্। তাহা বাক্যের বোধ্য নহে[৫৯]। শাস্ত্রালোচনা, সাধুসজ্জনের সংসর্গ ও নিরন্তর অভ্যাস, এই সকল হইতে সেই পদ উদয় প্রাপ্ত হয়[৬০]। যে কিছু প্রকাশ সমস্তই আত্মার বিভূতি। যাহাদের আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহারাই আত্মার ঐ প্রকার স্বরূপ বুদ্ধিগোচর করে। এবং তদ্‌ঘটিত বাক্যও তাঁহাদের অনুভবে প্রকাশমান্ হয়[৬১]।

হে সাধো! তুমি এক্ষণে সার প্রাপ্ত হইয়াছ, আত্মপদে স্থিতি করিতেছ এবং শোকশূন্য হইয়াছ। এখন তুমি অনাদি অলক্ষ্য নিজ পদে স্থিতি কর[৬২]।

একশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

—()○()—

কুম্ভ বলিলেন, হে মহীপতে শিখিধ্বজ! যাহা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সে সমস্তের বৃত্তান্ত আপনার গোচর করিয়াছি[১]। হে মুনিনায়ক! এক্ষণে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, এবং বিবেচনা করিয়া, গোচরীভূত পদার্থ সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন[২]। অমর সভায় ব্রহ্মলোক হইতে ভগবান্ নারদ মুনি সমাগত হইয়াছেন। আমি এই পর্ব্ব কালে স্বর্গে গমন করিতেছি[৩]। আপনি যদি তথায় আমার সন্দর্শন না পান তবে কোপপরায়ণ হইবেন না। কারণ গুরুতর ব্যক্তি সকল উদ্বেজিত হন না[৪]। আপনি সঙ্কল্প সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ বস্তুও আপনার প্রার্থিতব্য নাই। আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন ইহাই পবিত্র দৃষ্টি[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুষ্পহস্ত শিখিধ্বজ পূজনীয় কুম্ভকে প্রণাম পূর্ব্বক বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তিনি তৎকালে অন্তর্দ্ধান করিলেন। যে হেতু সাধ্বী স্ত্রী সকল ভর্ত্তার প্রণাম গ্রহণ করেন না[৬]। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ, মহারাজ শিখিধ্বজ সম্মুখে আর কুম্ভকে দেখিতে পাইলেন না[৭]। কুম্ভ সহসা অন্তর্হিত হইলে শিখিধ্বজ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। উক্ত বিস্ময় জনক ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানের ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য। যেহেতু সমাগত কুম্ভকে আমি উপদেশ ব্যপদেশে সাক্ষাতে দেখিয়াও চিনিতে পারিলাম না[৮।৯]। নারদ পুত্র কুম্ভই বা কে? শিখিধ্বজ নামধারী আমিই বা কে? সমস্তই কালের গতি। পরে তিনি আমিই সেই, এইরূপে প্রতিবোধিত হইলেন[১০]। দেবপুত্র আমাকে যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। আমিও মোহ নিদ্রা হইতে সম্যক্ প্রকারে প্রতিবোধিত হইয়াছি[১১]। এই কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, এই কর্ম্ম

অনর্থের, এই প্রকার মিথ্যা মায়াচক্রে ক্রিয়াজালকুকর্দ্দমে আমি নিমগ্ন রহিয়াছিলাম[১২]। এক্ষণে বুঝিতেছি, ইহাই শুদ্ধ শীতল এবং স্বকীয় পদ। রসাঞ্জনের ন্যায় আমাকে শীতলতা প্রদান করিতেছে[১৩]। আমি শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি আর তৃণাগ্রও ইচ্ছা করি না, আমি সংস্থিত হইয়াছি[১৪]। নির্ব্বাণের অর্থাৎ অপবর্গ লাভের আশায় রাজা শিখিধ্বজ শৈলবাসে মৌনাবস্থায় অবস্থিত রহিলেন[১৫]। সঙ্কল্পরহিত হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তথায় গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অধিবাস করিতে লাগিলেন[১৬]। মহারাজ শিখিধ্বজ তথায় চিত্ত সংযমনাদির দ্বারা অচির কাল মধ্যে সুষুপ্তের ন্যায় বিচারসাধ্য পদ লাভ করিতে লাগিলেন[১৭]।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

——()•()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে চূড়ালা ও তাদৃশ শিখিধ্বজ রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন[১]।

কুম্ভবেশধারিণী চূড়ালা স্ব ভর্ত্তা শিখিধ্বজ রাজাকে প্রবোধ দিয়া অন্তর্হিত হইয়া সহসা আকাশ মণ্ডলে উত্থিতা হইলেন[২]। গগনমণ্ডলে মায়ারচিত দেবপুত্রাকৃতি পরিত্যাগ করিয়া লোকললামভূতা নয়নমনোরঞ্জন রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন[৩]। আকাশ মার্গে গমন করিয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এবং পৌরজনের দর্শনীয়া হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন[৪]। তিন দিবস পরে পুনরায় গগনমণ্ডলে অধিরোহণ করিয়া কুম্ভ, যোগের দ্বারা পুনরায় শিখিধ্বজ বনে প্রবেশ করিলেন[৫]। তিনি সেই বনভূমিতে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ, অতএব, দীর্ঘতর তরুবরের ন্যায় সুস্থির নিজ পতিকে সন্দর্শন করিলেন[৬]। আমি কি এক্ষণে এই স্থানেই বিশ্রাম করিব, পুনঃ পুনঃ এই বাক্যের আলোচনা

করিতে লাগিলেন[৭]। এক্ষণে ইনি কি এই স্থানে দেহ ত্যাগ করিবেন? অথবা আমি এই স্থানেই প্রবুদ্ধ করিব[৮]। অথবা ইনি কিয়ৎকাল রাজ্যেই হউক আর বনবাসেই হউক অবস্থান করুন, পরে উভয়েই দেহ ত্যাগ করিব[৯]। যাহাই হউক, মদীয় উপদেশ অতি বিষম পরিণাম প্রাপ্ত হইবে না অর্থাৎ আমার কথায় প্রবুদ্ধ হইবেন না। যাহা হউক, অভ্যস্ত যোগ দ্বারা আমি ইহাকে জাগ্রৎ করিব[১০]। চূড়ালা এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজ স্বামী শিখিধ্বজের অগ্রে ও সেই বনভূমিতে ভয়প্রদ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[১১]। পর্ব্বত শিখরে শিলা খণ্ডের ন্যায় রাজা ইহাতে বিচলিত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ সেইরূপ করিয়াও শান্ত রাজাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না[১২]। যখন তিনি রাজাকে পাতিত ও চালিত করিয়াও জাগরিত করিতে পারিলেন না, তখন, কুম্ভরূপিণী চূড়ালা অত্যন্ত চিন্তাকুলা হইলেন[১৩]। বিস্ময় সহকারে বলিলেন, ভগবান্ এক্ষণে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি ইহাকে কি উপায় দ্বারা প্রবোধিত করিব[১৪]। অথবা এই মহাত্মাকে আমি কি জন্য প্রতিবোধিত করিব? বিদেহ অনুভব প্রাপ্ত হইয়া যথাভিলষিত সুখে অবস্থান করুন[১৫]। আমিও এক্ষণে রমণী দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহারই সহিত পুনর্জ্জন্ম বিবর্জ্জিত হইয়া গমন করি[১৬]। এই বলিয়া নিজ দেহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়া পুনরায় মনস্বিনী চূড়ালা বিবেচনা করিতে লাগিলেন[১৭]। আমি মহীপতির এই দেহযষ্টি সন্দর্শন করি, দেখি, ইহার হৃন্মধ্যে কোন প্রকার অনুভব শক্তি আছে কি না[১৮]? বৃক্ষের মূল দেশে অমুস্তিম্ন কুসুমের ন্যায় হয় ত ইহার চিত্ত-কোষে জ্ঞানোদয় না হইতেও পারে[১৯]। এই প্রকারে হয় ত ইনি অত্যর্থ জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমিও ইহার সহিত গমন করি[২০]। এই প্রকার চিন্তা করিয়া বরবর্ণিনী চূড়ালা সশঙ্কিত ভাবে বলিতে লাগিলেন[২১]। সত্বশীল গণের হৃদয় কন্দরে অনুভব কারণ লুক্কায়িত থাকিতেও পারে। এবং উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা পুনঃ প্রবোধ জন্মিয়া থাকে[২২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অত্যন্ত শান্তভাবাপন্ন হইয়া কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় অবস্থান করিয়া ধ্যানশালিগণ কিরূপে পুনঃ প্রতিবোধিত হন[২৩]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, বীজে পুনঃ পুষ্প ফল যেমন পরম সূক্ষ্ম অবস্থায়

থাকে, সুতরাং নিতান্ত দুর্লক্ষ্য ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ, শান্ত ব্যক্তি দিগের হৃদয়ে জ্ঞানের মূল শক্তি স্থিত থাকে, কারণ উপস্থিত হইলে তাহা পুনঃ কার্য্যকারী হয়[২৪।২৫]। মহাত্মাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধিও নাই অন্তও নাই, সতত সমভাবেই থাকে[২৬]। যাহাদিগের স্পন্দন অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তাহারা অন্যরূপ দেহ ধারণ করিয়া থাকে[২৭]। জগতের স্থিতি সম্বন্ধে চিত্তের স্পন্দনই কারণ। কুসুমে যেমন মধু থাকে, তেমনি, ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে চিত্তের স্পন্দনও স্থিতিমান্ হইয়া থাকে[২৮]। হে রঘুদ্বহ! ক্ষয়শীল দেহে মুহুর্ম্মুহু চিত্তে শোক মোহ কোপ হর্ষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে[২৯]। সত্ব বর্জ্জিত শরীরে চিত্তের শান্তি হইলে বিকার সম্ভাবিত কার্য্যাদি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩০]। জলের শমতা হইলে যেমন তাহাতে তরঙ্গোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ, সত্বশীল ব্যক্তিদিগের হৃদয়েও চিত্তের বিক্ষোভ হয় না[৩১]। এই দেহে চিত্ত বা সত্ব নাই। তাপ প্রাপ্ত হইলে যেমন শীতলতা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহের সহিত সত্ব ও চিত্ত নষ্ট হইয়া যায়[৩২।৩৩]। শিখিধ্বজের দেহ তেজ দ্বারা অর্জ্জিত সত্বাংশে সংগ্রথিত। অতএব, গ্লানি তাহাতে স্পর্শ করিতে পারে না[৩৪]। বরাঙ্গনা চূড়ালা ভর্ত্তার সেই দেহ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া দেহ পরিত্যাগ না করিয়া অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণা হইলেন[৩৫]। পরে বলিলেন, চিত্ত! তুমি সর্ব্ব স্থানে যাইতে পার, এবং তুমি শুদ্ধ। তুমি আমার ভর্ত্তার অন্তঃকরণে প্রবেশ কর, করিয়া ইঁহাকে ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া দাও[৩৬]। আমি যদি ইঁহাকে না প্রবোধিত করি, অথবা যদি নিজেই প্রবুদ্ধ হন, তাহা হইলে আমি এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছি[৩৭]। চূড়ালা এই চিন্তা করিয়া দেহপঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া আদ্যন্তবর্জ্জিত স্থিতি প্রাপ্ত হইলেন[৩৮]। তিনি প্রভু সম্মুখে চেতনায় স্পন্দন উত্থাপিত করিয়া পক্ষিণী যেমন নীড় মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন[৩৯]। কুসুমোপরি ভ্রমরীবৃন্দের ন্যায় কুন্তাকৃতি চূড়ালা তাঁহার চিত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন[৪০]। স্তনশালিনী বরবর্ণিনী চূড়ালা ভ্রমরান্তর নিষ্পিষ্ট পদ্মিনীর ন্যায় মহীপতির দেহে প্রবেশ করিলেন[৪১]। অর্ক যেমন পদ্মিনীকে প্রবোধিত করে, তদ্রূপ, মহীপতিও প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া চূড়ালাকে প্রতিবোধিত করিলেন[৪২]। তৎপরে রমনীয় অবয়ব বিশিষ্ট অপর সাম-

বেদের ন্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় সামবেদের ন্যায় স্বীয় অগ্রে কুম্ভকে দেখিতে পাইলেন। কি আশ্চর্য্য! মুনিকুমার পুনরায় এস্থানে আসিয়াছেন! এই বলিয়া তাঁহাকে পুষ্পাদি প্রদান করিলেন[৪৩।৪৪]। বলিলেন, ভাগ্য ক্রমেই আপনার পবিত্র হৃদয়ে পুনর্দ্দর্শনের ইচ্ছা উদিত হইয়াছে। অথবা হে প্রভো! আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্যই আপনার এখানে আগমন হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তবে কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাহা বলুন[৪৫।৪৬]?

কুম্ভ বলিলেন, হে অনিন্দিত মহারাজ! যে দিন আপনার নিকট হইতে গমন করিয়াছি, সেই দিন হইতে আপনাতেই আমার চিত্ত সংলগ্ন হইয়াছে[৪৭]। আমি রমণীয় স্বর্গ ধামেও বাস করিতে চাহি না। সম্প্রতি আপনার নিকটেই অবস্থান করিব, আপনার নিকটেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে[৪৮]। আপনার ন্যায় বিশ্বস্ত সুহৃৎ মিত্র আমি জগতীতলে আর কাহাকেও দেখিতেছি না[৪৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অহো! কি আশ্চর্য্য! এই কুলাচলে অদ্য আমার পুণ্য পাদপ ফলিত হইল। যদি তাহা না হইবে তবে আপনি বীতস্পৃহ হইয়াও আমার সমাগম কি জন্য কামনা করিয়া থাকেন[৫০]। এই বনরাজী, এই বিটপী সমূহ, এবং যদি আমার প্রতি আপনার অনুকম্পা থাকে, এবং স্বর্গবাসে প্রবৃত্তি না থাকে, তবে হে প্রভো! আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন। আপনার যুক্তিযুক্ত যোগমার্গের আখ্যান সকল শ্রবণ করিয়া আমিও পরম সুখী হইব। যেখানে আপনার বিশ্রান্তি লাভ হইবে সেই স্থানেই অবস্থান করুন। আপনিই আপনার বিশ্রামের স্থান। আপনি স্বর্গে অথবা এই স্থানে যথা সুখে বিহার করিতে পারেন[৫১।৫৩]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি ব্রহ্ম বস্তু অবগত হইয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ করিতেছেন ত? সংসার দ্বৈতময়, এই ভেদ জ্ঞান আপনার ত তিরোহিত হইয়াছে[৫৪]। হে নরপুঙ্গব! আপাত রমণীয় পদার্থ বিশেষে আপনার অনুরাগ নির্ম্মূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে ত[৫৫]? নিন্দনীয় পদার্থে ও অনিন্দনীয় পদার্থে আপনার সমান অনুরাগ হইতেছে ত? অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত উদ্বেগ ও প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি অনুদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় কি[৫৬]?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহ নিবন্ধন আমি দৃষ্ট পথের অতীত পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সংসারের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইয়াছি, এবং যাহা লাভ করিবার বস্তু, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি[৩৭]। যাহা বহু দিনেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই পরম বস্তু অতি অল্প দিন হইল আমি প্রাপ্ত হইয়া নিরাময় হইয়াছি ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা লাভ করিবার এক মাত্র বিষয়, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়া শান্তি লাভ করিতেছি[৩৮]। আমি এক্ষণে বিগতজ্বর হইয়া সর্ব্বত্রই অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আমার সম্বন্ধে আর কিছু উপদেশ দিবার সামগ্রী নাই[৩৯]। যাহা অপ্রাপ্ত ছিল, তাহা এক্ষণে আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। যাহা ত্যক্ত তাহা আশ্রিত ও যাহা আশ্রিত তাহা ত্যক্ত হইতেছে। যাহা এক মাত্র সত্য বস্তু, সেই ব্রহ্ম বস্তুতে আমার মন নিবিষ্ট হইয়াছে[৪০]। আমি বিগতমোহ ও বীতভয় হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব বস্তুতে সমদৃষ্টি বিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শান্তি প্রাপ্ত হইয়া আকাশ কোশের ন্যায় অবস্থান করিতেছি[৪১]।

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম সর্গ।

—()○()—

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনা করতঃ বিচিত্র উপাখ্যান দ্বারা তাঁহারা উভয়ে তিন মুহূর্ত্ত কাল বনভূমি পর্য্যটন করিতে লাগিলেন[১]। কখনও পর্ব্বতের সানুদেশে, কখন বা সারস-কলহংস প্রভৃতি বিহঙ্গম কূজিত সরোবর তীরে, আনন্দিত মনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২]। সেই সকল রমণীয় উপাখ্যান কহিতে কহিতে এবং বন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদের অষ্ট দিন অতিবাহিত হইয়া গেল[৩]। অনন্তর কুম্ভ বলিলেন, আমরা অন্য বনে গমন করি। রাজা বলিলেন, আপনার যে প্রকার অভিরুচি আমি সেই প্রকারই করিব।

এই বলিয়া তাঁহারা বনান্তর প্রদেশে প্রবেশ করিলেন[৪]। তাঁহারা বহুবিধ বনরাজী, নানাপ্রকার তটভূমি, গুল্মজাল, সরিত্তট ও গিরিশৃঙ্গ সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[৫]। নদী, দেশ, গ্রাম, নগর ও বহু বিটপী সমাচ্ছাদিত বনভূমি, মনোহর শব্দযুক্ত গিরিপ্রদেশ, কুঞ্জ, কানন, তীর্থ ও আয়তন ভূমি সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[৬]॥ তাঁহারা সমবুদ্ধি, সমান স্নেহ, সমোৎসাহ সহকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[৭]। হে রাঘব! তাঁহারা পিতৃলোকের ও দেবলোকের পূজা পূর্ব্বক উত্তপ্ত অথবা শীতল প্রদেশে সমভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন[৮]। তমাল বৃক্ষ ও মন্দার বৃক্ষ সমাকীর্ণ গহন কানন মধ্যে প্রণয়পেশল দম্পতী স্নিগ্ধ বন্ধুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন[৯]। হে রামচন্দ্র! এই গৃহ, ইহা গৃহ নহে, এই প্রকার দ্বৈত ভাব তিরোহিত হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা বায়ুসেবিত অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১০]। কখনও ধূলিধূসরিত কখনও বা চন্দন চর্চ্চিত হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন[১১]। কখন দিব্যাম্বর কখনও বা চিত্রাম্বর, কখনও বা পল্লবসংছন্ন, কখনও বা কুসুমমণ্ডিত দেহে কাল যাপন করিতে লাগিলেন[১২]। এইরূপে কতিপয় দিবসের মধ্যে সমচিত্ত বশতঃ রাজা দেবপুর কুম্ভের ন্যায় হইয়া উঠিলেন[১৩]। অনন্তর মানিনী চূড়ালা দেবযোনির ন্যায় শিখিধ্বজকে সন্দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৪]। এই আমার অদীনাত্মা পতি সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন, এবং এই রমণীয় বনভূমি, তবে আমি কি নিমিত্ত অনায়াসলভ্য রতি সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছি[১৫]। জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণও যথাকালোৎপন্ন সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ করেন নাই। যাহারা পরিত্যাগ করে তাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে[১৬]। আমার স্বামী উদারচেতা এবং ব্যাধি-বিবর্জ্জিত ও পরিপূর্ণ যৌবন চিহ্নে সুশোভিত। এই কুসুম সমূহ আমাদের গৃহের কার্য্য করিতেছে, সুতরাং এরূপ স্থলে যে কামিনী স্বামিসম্ভোগ না করিয়া জীবন্মুক্ত পথ অনুসন্ধান করে, সে স্বামিসম্ভোগ ত্যাগ জনিত পাপে লিপ্ত ও লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকশিক্ষা প্রদান না করায় নিন্দাস্পদ হইয়া থাকে। বনজ কুসুমাকীর্ণ লতাগৃহে যে রমণী স্বামীকে স্বামিসৌভাগ্য লক্ষ্য ও তৎসহ রতিক্রিয়া না করে, সে নিশ্চই হতভাগিনী[১৭,১৮]। রমণীয় নির্জ্জন বিহার ভূমি এবং রমণীয় নিজ পতি প্রাপ্ত হইয়া যে সতী রমণী স্বামী সম্ভোগ না করে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত

হৃতভাগিনী[১৯]। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ যথাভিলষিত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া যদি তাহা পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহারা এতদপেক্ষা কি আর অধিক ফল পাইয়া থাকেন[২০]? অতএব, সেই নিমিত্ত অদ্য আমি ভর্ত্তা আমার সহিত যাহাতে সম্ভোগ করেন, এরূপ মায়া বিস্তার করিব[২১]। চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া গুল্মমধ্যস্থা কোকিলা যেমন কোকিলকে সম্ভাষণ করে, সেইরূপ, নিজ পতিকে বলিতে লাগিলেন[২২]।

কুম্ভ বলিলেন, অদ্য চৈত্রমাসীয় শুক্ল প্রতিপৎ। অদ্য স্বর্গে মহাদেবের উৎসব হইবে[২৩]। আমি অদ্য সেই স্থানে পিতার সমীপবর্ত্তী হইব। নিয়তি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার কাহারও শক্তি নাই[২৪]। যদ্যপিও আমি নিরুদ্বেগ অবস্থায় আপনার সহিত এই কুসুম সমাকীর্ণ বন প্রদেশে বাস করিতেছি, তথাপি, আমাকে তথায় তদনুরোধে যাইতে হইবে[২৫]। আমি অদ্য দিবাবসান সময়ে গগনমণ্ডল হইতে পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইব। স্বর্গ হইতেও আপনার সমাগমে অধিক সুখোপভোগ করিব[২৬]। এই বলিয়া নিজ প্রীতি বশতঃ নন্দনকুসুম নির্ম্মিত মঞ্জরী স্বীয় সুহৃৎকে প্রদান করিলেন[২৭]। আপনি সত্বর এখানে আগমন করিবেন, ভূপতি এই কথা বলিতে না বলিতে কুম্ভরূপিণী চূড়ালা শরৎ কালের মেঘের ন্যায় বনভূমি হইতে আকাশগামিণী হইলেন[২৮]। মেঘমালা যেমন বনবায়ু কর্ত্তৃক হিমসজ্ঞ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে কুসুমরাশি পরিত্যাগ (পুষ্পবর্ষণ) করিতে লাগিলেন[২৯]। ময়ূর যেমন এক দৃষ্টে মেঘমালা সন্দর্শন করিতে থাকে, সেইরূপ, মহারাজা শিখিধ্বজ আকাশমার্গে চাহিয়া রহিলেন[৩০]। শিখিধ্বজের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া আকাশমার্গে কুম্ভবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বকীয় চূড়ালা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন[৩১]। কল্পবৃক্ষ সকল মঞ্জরী সমাবৃত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ, তিনিও আকাশ পথ হইতে পরম রমণীয়া পতাকাপরিশোভিতা নিজ পুরী অবলোকন করিতে লাগিলেন[৩২]। এবং অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া মধুমাসে লতা সমূহ যেমন পরম রমণীয়া হয়, সেইরূপ, তত্রস্থ ললনাকুলের শোভা দেখিতে লাগিলেন[৩৩]। অল্প সময়ের মধ্যে রাজকার্য্য সমাপন করিয়া ফলপুষ্পের ন্যায় পুনর্ব্বার শিখিধ্বজ সম্মুখে আপতিত হইলেন[৩৪]। এবং তৎকালে শিশিরবিন্দুর দ্বারা পদ্মের ন্যায় অথবা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন শশিকলার ন্যায়

ম্লান মুখ দেখাইতে লাগিলেন[৩৫]। শিখিধ্বজ তাঁহার ঐরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া অতি যত্ন সহকারে তাদৃশ পরিম্লানির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন[৩৬]। হে দেবপুত্র! আপনাকে নমস্কার, অদ্য আপনাকে কি নিমিত্ত এরূপ অন্যমনস্ক দেখাইতেছে? হে কুম্ভ! আপনি দুঃখ পরিত্যাগ করুন এবং এই আসন গ্রহণ করুন[৩৭]। পদ্মপত্র যেমন জলের আধার হইয়াও জলসিক্ত হয় না, সেইরূপ, সাধুগণ কখনও দুঃখে লিপ্ত হন না[৩৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজাকর্ত্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া কুম্ভ আসন পরিগ্রহ করতঃ ভগ্ন বংশখণ্ডের ন্যায় ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন[৩৯]। দেহী সকল জীবন্মুক্ত হইলেও কর্ম্ম ফল অনুসারে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হয়[৪০]। হে নরশার্দ্দুল! যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা মূঢ়তা নিবন্ধন বালকের ন্যায় অনেক অযথা আচরণ করিয়া থাকে। সমদর্শিতা না থাকায় তাহারা কোন পদার্থ স্থির রাখিতে পারে না[৪১]। তৈল যেমন তিলের সত্তা মাত্রে অবস্থান করিয়া থাকে, সেইরূপ, দেহী মাত্রেই দেহ ধারণ নিমিত্ত হর্ষ গ্লানি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যিনি দেহ ধারণ করিয়া দেহসম্ভূত গ্লানি প্রভৃতি ভোগ না করেন, তিনি অসিপত্র দ্বারা (অসিপত্র=খড়্গ) শূন্য প্রদেশ ছেদন করিয়া থাকেন[৪২]। দেহ ধারণ করিয়া সমচিত্ততা নিবন্ধন যদ্যপি গ্লানি দুঃখ প্রভৃতির অনুভব না করেন, তথাপি, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবেই হইবে। কেবল মাত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়ের দ্বারা অবস্থান করা যায় না। এই দেহ ধারণ করিলে দুঃখ ও তদনুরূপ দশা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না[৪৩,৪৪]। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি প্রভৃতিও শরীর ধারণ করিয়া দুঃখাদি উপভোগ করিয়াছেন। দেহী মাত্রকেই ইহা ভোগ করিতে হইবে, ইহাই নিয়তির বিধান[৪৫]। জল যেমন অম্বুনিধির প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞই হউক, আর জ্ঞ-ই হউক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উদয় হউক বা না হউক, জীব মাত্রেই নিয়তির বশবর্ত্তী হইবে[৪৬]। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বুদ্ধ্যাদি বৃত্তির ও হস্ত প্রভৃতির সঞ্চালন দ্বারা অখণ্ডনীয় নিয়তির আদেশ সকল জীবিত কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন[৪৭]। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্ষোভ দুঃখ ও সুখ দ্বারা নিয়তির আদেশ সকল বহন করিয়া থাকে[৪৮]। এইরূপ সুখ ও দুঃখের দ্বারা

অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয়বিধ মনুষ্যগণ নিয়তির অখণ্ডনীয় নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া থাকেন[২৯]।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

—()○()—

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বেদবিৎ! যদি নিয়তির এই দুষ্পরিহার্য্য নিয়ম সমস্ত লোককে অবনত মস্তকে বহন করিতে হয়, তবে, আপনি কি নিমিত্ত এতদূর দুর্ম্মনায়মান হইয়া চিন্তিত হইতেছেন[১]।

কুম্ভ বলিলেন, হে বসুধাধিপতি! অদ্য স্বর্গে আমার সম্বন্ধে যে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে আপনার নিকট তাহা সমুদায় বিবৃত করিব[২]। দুঃখ সকল প্রিয় সুহৃদের নিকট ব্যক্ত করিলে তাহা অবসানকল্প হয়। দেখুন, মেঘ সকল ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে[৩]। সুহৃদ্ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলে চিত্ত অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া থাকে। কতক (ফলবিশেষ) দ্বারা জলের স্বচ্ছতা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে[৪]। আমি আপনাকে পুষ্পমঞ্জরী প্রদান করিয়া গগনমার্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অমরাবতী উপস্থিত হইলাম[৫]। এবং মহেন্দ্র সভায় মদীয় জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিয়ৎক্ষণ সে স্থানে অবস্থান করতঃ আগমন কালে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম[৬]। এবং এখানে আগমন করিবার নিমিত্ত স্বর্গ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নভঃ প্রদেশে উপস্থিত হইলাম, এবং ভগবান্ মরীচিমালীর অশ্বগণ সমভিব্যাহারে অনিলবর্ত্মে আগমন করিলাম[৭]। অনন্তর সূর্য্যদেব অন্য পথে গমন করিলেন। আমি আর এক পথে গমন করিয়া সমুদ্রে পতিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বোধ করিলাম, পরে আকাশমার্গে আগমন করিলাম[৮]। বারিপূর্ণ অভ্র প্রদেশে মেঘ মধ্যে ভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনিকে আগমন করিতে দেখিলাম[৯]। জলধরপটলসমাচ্ছন্ন বিদ্যুৎবলয়বিভূষিত মেঘসংস্পৃষ্টে চন্দন লেখা বিধৌত হওয়ায় তাঁহাকে অভিসারিকার ন্যায় (অভিসারিকা=যে প্রচ্ছন্ন ভাবে

প্রিয় সকাশে গমন করে) দেখাইতে লাগিল[১০]। ধরণীপৃষ্ঠদেশস্থ পাদপ-রাজি ছায়ার প্রদেশে বেগবতী নদীর ন্যায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ তপোলক্ষীর ন্যায় প্রীতত হইতে লাগিল[১১]। আকাশমার্গে অবস্থিত হইলেও আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। এবং বলিলাম, হে মুনিবর! নীলবর্ণ বস্ত্র পরিহিত হওয়ায় আপনি অভিসারিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন[১২]। হে মানদ! মুনিবর আমার উক্তবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে পয়োধরযুগল ও কেশপাশ পরিশোভিত এবং হাব ভাব বিলাসবতী রমণী হও, এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন[১৩]. আমি রজনী সমাযোগে রমণী হইব, পরিণতবয়স্ক দুর্ব্বাসার মুখে ঐ নিষ্ঠুর অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিলাম[১৪]। মুনিবর আমাকে ঐরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে রাজন্! আমি সেই জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছি[১৫]। আমি আপনার নিকট নিশাকালে আমার অঙ্গনা হইবার বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। দিবাভাগে পুংরূপ ধারণ করিয়া রজনীযোগে স্ত্রীরূপে কি করিয়া অবস্থান করিব, এই ভাবনায় আমি অত্যর্থ দুর্ম্মনায়মান হই-য়াছি[১৬]। রাত্রি কালে স্তনযুগশালিনী রমণী হইয়া কাল যাপন করি, আমি পিতার নিকট কিরূপে এ কথা ব্যক্ত করিব। আমি ভবিতব্যের অতি বিষম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি[১৭]। গৃধ্রগণ আমিষ দর্শন করিলে যেমন কলহ উপস্থিত করে, সেইরূপ, আমিও যুবকগণের দর্শন পথে পতিত হইলে আমাকে অপহরণ করিতে চেষ্টা করিবে। কি আশ্চর্য্য! আমি অদ্য কলহের বিষয়ে পতিত হইলাম[১৮]। আমি এক্ষণে লজ্জা বশতঃ স্বর্গধামে দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ গণের এবং কামার্ত্ত দেবকুমার-গণের অগ্রে কি করিয়া রজনী যাপন করিব, তাই ভাবিতেছি[১৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবহ! মুনি সকাশে এইরূপ কহিয়া কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করতঃ পুনরায় বলিতে লাগি-লেন। আমি কি নিমিত্ত অজ্ঞের ন্যায় বিলাপ করি, এবং কি নিমি-ত্তই বা পরিতাপ করি। আমার কর্ম্মানুসারে আমাকে নিশ্চয়ই স্ত্রী ও পুরুষ রূপে বিচরণ করিতে হইবে[২০,২১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! আপনার পরিদেবনায় কোন কারণ নাই। এই দেহ যে ভাবে থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই দোষ নাই, কারণ আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহেন। জীবের ভাগ্যে যে

সকল সুখ দুঃখের বিধান আছে, তাহা কেবল দেহের জন্যই। দেহোপলক্ষিত চিদাত্মাকে এ সকল ভোগ করিতে হয় না[২২,২৩]। জীব স্বকীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবন্ধন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আপনি জানিয়া শুনিয়া কি নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন[২৪,২৫]। আপনি নিখিল বেদাদি ও জীবের ভবিতব্য অবগত আছেন। জানিয়া শুনিয়া যদি পরিতাপ করেন, তবে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি উপায় করিবে? এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করুন[২৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে উভয়ে তাঁহারা কথোপকথন দ্বারা সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরিদশ্ব (সূর্য্য) এই সময়ে তৈলবিহীন প্রদীপের ন্যায় কুম্ভের স্ত্রীত্ব সম্পাদনের জন্যই যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। কমলিনী প্রিয় নায়কের অদর্শন নিমিত্ত সঙ্কুচিতা হইলেন[২৭,২৮]। পান্থ রমণীর ও পথিকগণের হৃদয় ভীত হইতে লাগিল। নিশাগমে বর্ত্ম সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দ্রষ্টব্য সকল অন্ধকারে লীন হইতে লাগিল। অন্ধকারে বিহঙ্গমগণ একত্র সমাবিষ্ট হইতে লাগিল[২৯]। তারকামণ্ডিত ভুবন সাম্যভাব ধারণ করিল। নভোমণ্ডলে তমোনুদ চন্দ্রবিম্ব প্রকাশ প্রাপ্ত হওয়ায় গগন যেন উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে লাগিল[৩০]। চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় এখন তাঁহারা উভয়ে যথোপযুক্ত প্রদেশে পৃথক্ অবস্থান জন্য উদ্যত হইলেন[৩১]। অনন্তর, গুল্মান্তরাচ্ছাদিত হইয়া বন্দনাদি কার্য্য সমাপন করতঃ কুম্ভ সত্বর রমণী বিগ্রহ ধারণ করিলেন[৩২]। এবং শিখিধ্বজের সম্মুখে পুনঃ উপস্থিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি ইঁহাকে অঙ্গযষ্টির দ্বারা পাতিত করিব, উজ্জ্বলীকৃত করিব এবং রঞ্জিত করিব। পরে বলিলেন, মহারাজ! আমি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া কি আপনি লজ্জা অনুভব করিতেছেন? হে মহারাজ! দেখুন, এক্ষণে আমার জটাজাল মুনিশাপে তারকাজাল সমাবৃত গগন মণ্ডলের ন্যায় কুসুমদাম পরিশোভিত নিবিড় কুন্তলজাল হইয়া শোভা পাইতেছে। আমার স্তনদ্বয় প্রোদ্ভিন্ন কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে[৩৩,৩৪]। আমার বস্ত্র আগুল্ফ বিলম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে[৩৫]। হে নাথ! দেখ, আমি কিরূপ অনুপমা রমণী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছি। বিবিধ ভূষণ ও রত্নরাজি সকল ধারণ করিয়াছি[৩৬]। কুসুম সকল বৃক্ষে সঞ্জাত হইয়া বৃক্ষেরই শোভা বৃদ্ধি করিয়া

থাকে, সেইরূপ, আমার অঙ্গ সকলও আমার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেখুন, আমার অঙ্গ সকল শশিদ্যুতি ধারণ করিয়াছে[৩৮]। পর্ব্বত শৃঙ্গে তুষার পাতের ন্যায় আমার শিরোদেশে পট্টাংশুক শোভা পাইতেছে। হে মানদ! এক্ষণে আমার সমস্তই রমণীয় হইয়াছে[৩৯]। হায়! আমাকে ধিক্! আমার কি কষ্ট! এক্ষণে আমি কি করিব, আমি কাহার নিকট গমন করিব। হা কষ্ট! এক্ষণে আমি রমণীরূপে এই দীর্ঘ নিশা অতিবাহিত করিব[৪০]। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার গুরু নিতম্ব ও জঘন প্রদেশ আমাকে মন্থর করিতেছে। কুম্ভ বনমধ্যে এই সকল বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন[৪১]। রাজাও তাঁহার তদবস্থা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিখিধ্বজ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে সাধো! আপনি যাহা জানিবার তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। আপনাকে অধিক কি বলিব; নিয়তির সমস্ত পথই অবগত আছেন। যাহা হউক, আপনি মহাসত্ত্বগুণাবলম্বী, আপনাকে যে এরূপ রমণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা আর কি পরিতাপের বিষয় আছে[৪২।৪৩]। যাহা হউক, অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে পরিতাপিত হওয়া ভবাদৃশ মহদ্ব্যক্তির উচিত নহে। আমি জানি, সুধী ব্যক্তিও দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্ম ফলে গ্লানি ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এইরূপ এইরূপ কারণে কেবল মাত্র দেহ জনিত কষ্ট ভোগ করে না, পরন্তু তাহারা চিত্তেও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে[৪৪]।

কুম্ভ বলিলেন, যাহা হউক, আমি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রজনী যাপন করিব, নিয়তি কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। আমি আর পরিতাপ করিব না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য উদ্দীপ্ত করিলেন[৪৫।৪৬]। তাঁহারা যেন মনোদুঃখ হ্রাস করিবার নিমিত্তই রাত্রি কালে এক শয্যায় শয়ন করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে রজনী যাপন করিলেন। কুম্ভ প্রভাত কালে পুনরায় যৌবনদৃপ্ত স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিলেন[৪৭]। এবং কুম্ভসদৃশ কুচদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া রাজমহিষী বরবর্ণিনী চূড়ালা কুম্ভমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন[৪৮]। দিবাভাগে কুম্ভমূর্ত্তি এবং রজনী যোগে রমণী রূপে সেই বনমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন[৪৯]। মহিষী চূড়ালা ঐরূপে নিজ প্রিয়তম ভর্ত্তার সহিত কখন মহেন্দ্র পর্ব্বতে, কখন হিমগিরিতে, কখন সুমেরু পর্ব্বতের সানুদেশে যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন[৫০]।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ুত্তরশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অভিহিতরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে এক দিবস চূড়ালা কুম্ভরূপ ধারণ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজীবলোচন নরপতে! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি প্রতিদিন রজনী যোগে অঙ্গনা রূপ ধারণ করিয়া থাকি। সুতরাং আমি স্ত্রী ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত বিবাহ বিধির দ্বারা ভর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠা করিয়া কোন এক মহাপুরুষকে আমার চিত্ত ও আত্মা সমর্পণ করিব[১।৩]। সে মহাপুরুষ অন্য নহে। আপনাকেই এই ভুবন ত্রয়ের মধ্যে ভর্ত্তৃরূপে বরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনি রজনী যোগে আমাকে ভার্য্যা পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রহণ করুন[৪]। হে সাধো! প্রিয় সুহৃদের সহিত আমি অযত্নোপনত স্ত্রীসুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন[৫]। অদ্য অবধি এই অপ্রবৃত্ত মনোরম সুখ আপনি প্রকৃত রূপে পরিণত করুন। এবং ইহাতে আপততঃ কোন দোষও পরিলক্ষিত হইতেছে না[৬]। যাহারা ইচ্ছার ফল পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সমস্ত বস্তুতেই সমদর্শন করিয়া থাকে[৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, সখে! যদ্যপি আপনার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে, তাহাই হউক। আমি ইহার শুভাশুভ কিছুই জানি না[৮]। আমি সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জগত্রয় এক্ষণে আমার আত্মারই স্বরূপ[৯]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহীপাল! এক্ষণে যদ্যপি আপনার অভিমত হইয়া থাকে, তবে, অদ্য শ্রাবণী পৌর্ণমাসী এবং লগ্নাদিও শুভজনক। আমি গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছি। অতএব, অদ্য রাত্রি কালেই আমরা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিব[১০।১১]। এই মহেন্দ্র পর্ব্বতের রমণীয় সানুপ্রদেশস্থ রত্নালোক বিশিষ্ট মণিময় গহ্বর প্রদেশে যে স্থানে কুসুমভারাবনত তরু ও গুল্মরাজি সমধিক নয়নপ্রীতিদায়ক হইতেছে,

এবং যে স্থানে লতা সমূহ পুষ্প বিতানে সুসজ্জীভূত হইয়া কুসুমালঙ্কার পরিশোভমানা রমণী গণের ন্যায় লাস্য ক্রীড়ায় অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়াছে, এবং যে স্থানে গগনমণ্ডলে তারাধিপ অসংখ্য রমণী বেষ্টিতা নায়কের ন্যায় নক্ষত্র বিমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, তাঁহারাই আমাদের এই বিবাহ ব্যাপার অবলোকন করিবেন[১২,১৩]। হে প্রিয়! হে রাজন্! এক্ষণে উত্থান করুন, চলুন, বিবাহোপযোগী চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া আমরা অবস্থান করিতে থাকি[১৫]। কুম্ভ এইরূপ বলিয়া রাজার সহিত উত্থান করিলেন এবং পুষ্প ও রত্ন সকল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন[১৬]। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রত্নময় সানুপ্রদেশে তাঁহারা বিবিধ কুসুম সংগ্রহ করিলেন। এবং বিবিধ প্রকার রত্নরাশিও সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কাঞ্চনকন্দরে দেবপূজাদির নিমিত্ত রত্ন ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া মন্দাকিনী তীরে স্নানার্থ গমন করিলেন[১৭,১৯]। তথায় কুম্ভ গজস্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট রাজা শিখিধ্বজকে মজ্জনপূর্ব্বক অত্যন্ত আদরের সহিত স্নান করাইয়া দিলেন[২০]। মহারাজ শিখিধ্বজও ভবিষ্যৎ ভর্ত্তা হইবার নিমিত্ত কুম্ভরূপধারিণী চূড়ালাকে স্নান করাইয়া দিলেন[২১]। এবং তথায় তাঁহারা দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিতে লাগিলেন। অন্য লোকে ক্রিয়া ফল ইচ্ছা করিয়া যেরূপে পূজা করিয়া থাকেন ফল ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহারা সেইরূপ পূজাদি করিলেন[২২]। নিত্য জ্ঞান বলে পরিতৃপ্ত হইয়া জগতের ব্যবস্থানুসারে তাঁহারা পরম পবিত্র ভোজনাদি সম্পন্ন করিলেন[২৩]। কল্পবৃক্ষ হইতে শুভ্র বাস পরিধান করিয়া বিবিধ প্রকার স্বাদু ফল ভোজন করিয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন[২৪]। এই সময়ে ভগবান্ কমলিনীনায়ক যেন তাঁহাদের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্তই অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন[২৫]। সন্ধ্যা সমাগতা হইলে অঘমর্ষণাদি ব্যাপার সমাধা করিলেন। তারাবলী যেন তাঁহাদের বিবাহবিধি দেখিবার নিমিত্ত আকাশপটে একে একে প্রকাশ পাইতে লাগিল[২৬]। সেই কুসুম বিকাশা ত্রিযামা এইরূপে তথায় সমাগতা হইলেন। তিনি যেন দম্পতী যুগলের সখ্য বন্ধন করিবার জন্য তুষারকণা সকল বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন[২৭]। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন গগনমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণের স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ, কুম্ভ সেই সানুপ্রদেশে বহুসংখ্যক রত্নদীপ প্রজ্বালিত

করিলেন[২৮]। যামিনী যোগে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া মহারাজ শিখিধ্বজকে চন্দন অগুরু প্রভৃতির দ্বারা বিভূষিত করিলেন[২৯]। হার বলয় মাল্য ও কুসুম স্রজ দ্বারা তাঁহাকে সজ্জীভূত করিয়া দিলেন[৩০]। কল্পলতা মন্দার ও পারিজাত কুসুম প্রভৃতি পুষ্প ও বিবিধ প্রকার রত্ন দ্বারা তাঁহাকে পরিশোভিত করিলেন[৩১]। কুম্ভ এই সময়ের মধ্যে বিপুল পয়োধরা-ক্রান্তা এবং হাবভাববতী বিলাসিনী রমণী হইয়া উঠিলেন[৩২]। এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে ভোগবিলাসিনী রমণী হই-য়াছি। পরন্তু এই সময়টীও কামোপভোগের উপযুক্ত হইয়াছে[৩৩]। আমি আপনার স্ত্রী এবং আপনি আমার স্বামী। অতএব, হে স্বামিন্! আপনি আমাকে যথেচ্ছ উপভোগ করিতে পারেন[৩৪]। এই বলিয়া রতি মদন সমীপে যেরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ, গহন বন-স্থিত উদয়োদ্যত রবির ন্যায় ভর্ত্তার সমীপে উপগতা হইলেন[৩৫]। হে মানদ! আমার নাম মদনিকা, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমাকে স্নেহ নয়নে অবলোকন করুন; বলিয়া তাঁহার সমীপস্থা হই-লেন[৩৬]। ঐ সকল কথা বলিয়া সেই অনিন্দনীয়রূপ ও শোভনকান্তি-বিশিষ্ট রমণী লজ্জাবনত মুখে কাঞ্চন মণ্ডিত অলকদামপরিশোভিত মস্তক তাঁহার পাদপ্রদেশে উপস্থাপিত করিলেন[৩৭]। এবং বলিলেন, হে নাথ! আপনি আমাকে বিচিত্র অলঙ্কার রাশির দ্বারা পরিশোভিত করতঃ অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক মদীয় পাণি গ্রহণ করুন[৩৮]। হে রাজন্! রতি পরিণয়কালে মদনের শোভাকেও লজ্জীকৃত করিয়া আপনি সমধিক দ্যুতিমান হইয়া আমাকে মদনের রতিতুল্য প্রিয়কারিণী করিয়াছেন[৩৯]। হে মহারাজ! চন্দ্রকিরণশালিনী বিচিত্র মাল্যাম্বর ধারণ করিয়াছেন। সুমেরু প্রদেশে গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় আপনার বক্ষঃস্থলে চারু হার শোভা পাইতেছে[৪০]। হে নৃপ! কনক পদ্মে ভৃঙ্গ রাজির ন্যায় আপ-নার শিরোদেশে মন্দারকুসুমদাম পরিশোভিত অলকদাম শোভা পাই-তেছে[৪১]। আপনি রত্নাংশু বিমণ্ডিত কুসুম রাশির দ্বারা রত্ন মণ্ডিত সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন[৪২]। এইরূপ কথোপকথন দ্বারা সেই ভাবী দম্পতী আপনাদের পূর্ব্ব প্রণয় সঙ্গোপন করতঃ সন্তুষ্ট মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন[৪৩]। অনন্তর মহারাজ শিখিধ্বজ মণিময় পর্য্যঙ্কে মদনিকাকে উপবেশন করাইয়া আপনি বিচিত্র আভরণ দ্বারা

সাজাইতে লাগিলেন[৪৪]। কর্ণভূষণ, মাল্য, বস্ত্র, মণিরত্ন অলঙ্কার, অঙ্গরাগ এবং নানা প্রকার কুসুম দ্বারা তঁহার অঙ্গযষ্টি সাজাইতে লাগিলেন[৪৫]। বিকসিত নীলেন্দীবরনয়না রাজ্ঞী মদনিকা ভ্রমরমালাবৃত পদ্মিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[৪৬]। রাজা শিখিধ্বজ ঐরূপে সাজাইয়া বলিলেন, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষীর ন্যায় শোভা পাইতেছ। ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় ও শঙ্করের গৌরীর ন্যায় তোমার মঙ্গল হউক[৪৭,৪৮]। তুমি রক্তবর্ণ পাণিতলসুশোভিত, বিপুল পয়োধরযুগলশালিনী কামকল্পপাদপের লতার ন্যায় শোভমানা হইয়াছ[৪৯,৫০]। কর্পূরকুন্দধবলা পদ্মহাসিনী পূর্ণেন্দুকান্তিবিশিষ্টা হাস্যের দ্বারা এই দেশকে তুমি অত্যন্ত প্রসন্নময় করিতেছ। অনন্তর মহারাজা শিখিধ্বজ পুনর্ব্বার বলিলেন, অয়ি বরারোহে! চল বৈবাহিক বেদীর উপর যাই[৫১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুষ্প ও লতাজাল দ্বারা পরিশোভিত সেই বেদী যজ্ঞভূমির ন্যায় মুক্তাপদ্মরাগাদি পরিশোভিত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। সেই বেদীর চতুঃপার্শ্বে নারিকেল ফল প্রদান করা হইয়াছিল[৫২,৫৩]। গঙ্গাবারিপূর্ণ কলসসকল আরোপিত করা হইয়াছিল। এবং তন্মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইয়াছিল[৫৪]। প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিসমীপে আসনোপরি পূর্ব্বাভিমুখে নবদম্পতী উপবেশন করিলে শিখিধ্বজ বিল্বাদির দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন[৫৫,৫৬]। অনন্তর সেই বনে ভব ও ভবানীর ন্যায় সমাগত হইয়া নিজ প্রণয়িণীর কর ধারণ করিলেন। নবদম্পতী অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া স্বকীয় হৃদয় পবিত্র মনে করিলেন[৫৭,৫৮]। পরস্পর মৃদুমধুর হাস্য বিনিময় পূর্ব্বক অগ্নি ত্রি প্রদক্ষিণ করিয়া লাজাদি অগ্নিতে প্রদান করিলেন[৫৯]। এইরূপে নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় মুখকান্তিবিশিষ্ট নবদম্পতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা পরস্পর হস্ত পরিত্যাগ করিলেন[৬০]। এবং তাঁহারা পূর্ব্বরচিত কুসুম শয়নে গমন করিবার নিমিত্ত কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে চন্দ্রমণ্ডল আকাশ মার্গে চতুর্থভাগাবশিষ্ট হইলেন অর্থাৎ রজনীর শেষ যামে উপস্থিত হইলেন[৬১]। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নবদম্পতীর শোভা সন্দর্শন উদ্দেশে, লতাকুঞ্জে কামুক ব্যক্তি যেমন ললনা ছিদ্র দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে, সেইরূপ, ভীত হইয়া

অল্পে অল্পে কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাবিধ বিশ্রম্ভালাপ দ্বারা রজনী যাপন করিতে লাগিলেন৬২।৬৩। নবদম্পতী লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কে যেন তাঁহাদের জন্য কুসুম শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে৬৪।৬৫। এবং চতুর্দ্দিকে মুক্তাকলাপের ন্যায় কুসুমরাশি শোভা পাইতেছে এবং গ্লানিবিবর্জ্জিত অম্লান মন্দার কুসুমরাশি তদুপরি শোভা পাইতেছে৬৬। ক্ষীরোদ সাগরে কৌমুদীরাশি পতিত হইলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ, তুষার-ধবল-কুসুম-বিরচিত মনোজ্ঞ শয়নে নবদম্পতী শয়ন করিয়া নানাবিধ প্রণয়পেশল বাগ্বিন্যাস দ্বারা তাঁহারা কথোপকথন করিতে ও শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের এই সুখ রজনী যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অস্তগমন করিল৬৭।৭০।

ষড়ুত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তোত্তরশততম সর্গ।

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর ভগবান্ অংশুমালী স্বীয় লোহিত বর্ণ কিরণ দ্বারা ত্রিভুবন রঞ্জিত করিলে, রাজমহিষী মদনিকা পুনরায় কুম্ভরূপ ধারণ করিলেন১। শিখিধ্বজ ও কুম্ভ উভয়ে দেব দম্পতীর ন্যায় সেই অনিন্দনীয় মহেন্দ্র পর্ব্বতের কন্দর প্রান্তে, নিভৃত গুহা প্রদেশে, লতাকুঞ্জে, তমালজাল পরিশোভিত মন্দার গহন স্থানে, সহ্য, দর্দ্দুর, কৈলাস, মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য এবং লোকালোক পর্ব্বত প্রান্তে আপনাদের ইচ্ছামত বিহার করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন২।৩। নিজ প্রিয়তম নিদ্রাগত হইলে চূড়ালা তিন দিন ব্যাপিয়া রাজভবনে গমন পূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেন ৭। সেই দেব দম্পতী সর্ব্বদা নানাবিধ কুসুম রাশির দ্বারা সুশোভিত হইয়া তথায় বিহার করিতে লাগিলেন৮। সরল পাদপ-সমন্বিত সুরম্য

মহেন্দ্র পর্ব্বতের রত্নময় সানুপ্রদেশে জনগণ পূজিত হইয়া এক মাস বাস করিলেন[৯]। যে স্থান হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া অনায়াসে মন্দার কুসুম সকল আহরণ করা যাইতে পারে তাঁহারা সেই শুক্তিমান নামক পর্ব্বত স্থিত লতাগৃহে এক পক্ষ অবস্থিতি করিলেন[১০]। মৈনাক পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ স্থিত দক্ষিণ দিকৃতটে যে দেবভোগ্য কুসুম স্তবকের চির প্রসূনাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পারিজাত কাননে তাঁহারা দুই মাস বিহার করিয়াছিলেন[১১]। মেরুর দক্ষিণ ভাগে জম্বু নদীর তটে যে স্থান হইতে জম্বুখণ্ড সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা জম্বুফলাসব পান করিয়া স্থির যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে এক মাস কাল অতিবাহিত করিলেন[১২]। এইরূপে উত্তর কুরু মণ্ডলে দশ দিন, উত্তর কোশল দেশে সপ্তবিংশতি দিবস যাপন করিলেন[১৩]। সেই নবদম্পতী রজনী যোগে উভয়ে সম্মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ বন পর্ব্বত ও বিচিত্র অন্যান্য দেশ সমূহ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন[১৪]। এইরূপে কতিপয় মাস অতীত হইলে দেবপুত্ররূপিণী নৃপভামিনী চূড়ালা অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণা হইলেন[১৫]। আমি প্রকৃত ভোগ বাসনার অনুকূল দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা নৃপতিকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, ইনি কোনরূপ ভোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হন কি না[১৬]। চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সেই বন প্রদেশে অপ্সরোমণ্ডল বিভূষিত দেবেন্দ্রের আবির্ভাব করাইলেন[১৭]। মহারাজ শিখিধ্বজ সপরিবার সুরপতির আগমন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার যথোচিত পূজোপহার প্রদান করিলেন[১৮]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবরাজ! আপনি কি নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া দূর প্রদেশ হইতে আমার নিকট আগমন করিলেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার আগমন প্রয়োজন বলুন[১৯]।

ইন্দ্র বলিলেন, যেরূপ পক্ষিগণ হৃদয়স্থিত বাসনা সূত্র অনুসারে (ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া) বন প্রদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকে, সেই প্রকার, আমিও আপনার গুণপরম্পরার পক্ষপাতী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি[২০]। অতএব, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া আমার সহিত স্বর্গে আগমন করুন। আপনাকে দেখিবার জন্য অমর পুরবাসী সকলেই অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন[২১]। আপনি পাদুকাদি

গ্রহণ পুরঃসর সিদ্ধ মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্বর্গ গমনে সমুদ্যত হউন[২২]। আপনি সেই দেবেন্দ্র পুরীতে বিবিধ ভোগসুখে তৃপ্তমনা হইয়া জীবন্মুক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবেন[২৩]। সাধুগণ বাঞ্ছা করিয়া যে সকল সুখের আস্বাদনে অধিকারী হন না, আপনি সেই স্থানে গমন পুর্ব্বক তিরস্করণী বিদ্যার সহিত বিবিধ ভোগের দ্বারা পরিসেবিত হইবেন[২৪]। আপনি তথায় নির্ব্বিঘ্নে সুখে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন। ভগবান্ হরি যেমন ত্রিজগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই-রূপ, আপনিও অমরাবতী গমন পূর্ব্বক অমরাবতী পবিত্র করুন[২৫]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবনায়ক! আমি সকল প্রকার সুখদায়ক বস্তু অবগত আছি। এই নিমিত্ত আমি যেথানেই থাকি, সেই স্থানেই আমার স্বর্গ বোধ হইয়া থাকে[২৬]। হে প্রভো! আমি সর্ব্বত্র সন্তুষ্ট ভাবে অবস্থিতি করি, সেই জন্য আমার সর্ব্বত্রই আনন্দ বিদ্যমান্ থাকে। আমার মনে কোনও কামনা নাই বলিয়া আমি সর্ব্বত্র সদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকি[২৭]। হে শক্র! স্বর্গ আমার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি আজ্ঞা পালনে সম্মত নহি[২৮]।

ইন্দ্র বলিলেন, হে সাধো! যাঁহারা জ্ঞেয় পদার্থ অবগত আছেন, সেই সকল প্রতিভাসম্পন্ন সাধুগণের ভোগ সুখকে সজ্জনগণ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় বলিয়া তাহার আচরণ করিয়া থাকেন[২৯]। দেবেন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্র যেই মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন, অমনি সুরপতি "তবে কি আমি এখান হইতে যাইব না" এই কথা বলিয়া আপনার ও কুম্ভের মঙ্গল হউক; এই কথা বলিতে বলিতে অন্তর্দ্ধান করিলেন[৩০।৩১]। সেই সকল দেববৃন্দও তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্রের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। যেমন সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে কল্লোলরাশি জলেই বিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ, তাঁহারাও চলিয়া যাইলেন এবং বাক্য পরম্পরার ধ্বনি তিরোহিত হইল[৩২]।

সপ্তোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টোত্তরশততম সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, চূড়ালা এই প্রকারে আত্মমায়ার বিস্তার ও তৎপরে তাহার শমতা করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বসুধাধিপতি ভাগ্যক্রমে নানা প্রকার ভোগে নিপতিত হইয়াও তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন না[১]। কি আশ্চর্য্য! ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাবে যিনি শান্তভাবাপন্ন এবং নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন আকাশের ন্যায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তিনিই নির্ভয়ে ও অবলীলাক্রমে অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজোপকরণাদি আহরণ করিতে গমন করিতেছেন[২]। নৃপমহিষী চূড়ালা নৃপতি পুনর্ব্বার যাহাতে বুদ্ধিভ্রংশকর রাগ-দ্বেষাদি প্রপঞ্চের অধীন না হইয়া পড়েন, এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন[৩]। ঐ রূপ চিন্তা করিয়া যৎকালে বনমধ্যে বিমল শশাঙ্ক কিরণ প্রতিফলিত হয় সেই সময়ে দিব্যকান্তি অঙ্গনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কমনীয়াকৃতি মদনিকা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যে সময়ে মধুরামোদদায়ি ফুল্ল কুসুম সৌরভ সমীরণ সহযোগে প্রবাহিত হইতে থাকে, যে সময়ে নদীতীরে শিখিধ্বজ সন্ধ্যোপাসনায় নিরত থাকেন, এবং শ্রেষ্ঠ কুসুম দ্বারা গহন সকল নীরন্ধ্র থাকে, যে সময়ে মদনিকা বনদেবীর ন্যায় মধুর মূর্ত্তিতে তথায় প্রবেশ করিয়া থাকেন[৪।৬]। উক্ত দম্পতী যে সময়ে মিলিতা হইতেন সেই সময় অতীত হইল দেখিয়া কুসুম শয়নে যুবক যুবতী যেমন কণ্ঠলীন হইয়া অধিশয়ান হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ পরস্পর গলদেশে হস্তালিঙ্গন দ্বারা আবদ্ধ করতঃ অধিশয়ান হইলেন[৭]। মহারাজ শিখিধ্বজ কুঞ্জ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে লতাগৃহ মধ্যে অনবদ্যাঙ্গী মদনিকাকে দেখিতে পাই-লেন[৮]। তাঁহার সচন্দন মনোহর কুন্তলজাল শয়নে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন নিবন্ধন ইতস্ততঃ বিস্ফুরিত হইয়া রহিয়াছে[৯]। নয়নাভিরামা বালা শয্যোপরি তুষারধবল বাহু কপোলে সংন্যস্ত করিয়া অধিশয়ানা রহি-

য়াছেন[১০]। অনন্তর সেই নিভৃতে পরস্পর বিশ্রব্ধ প্রণয় সম্ভাষণ দ্বারা এবং কুসুম লতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রণয়ী যুগল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[১১]। চঞ্চল কুসুম-শয়নে মদন পরিপীড়িত হইয়া অঙ্গরাগচ্ছলে পরস্পর আলিঙ্গন প্রদান করিলেন[১২]। তাঁহাদের পরস্পর বক্ষতাড়নায় স্তনদ্বয় পীড়িত হইতে লাগিল, এবং বদনকমল সাতিশয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল[১৩]। শিখিধ্বজ এইরূপ অবলোকন করিয়া আমরা আজ যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ সাগরে ভাসিতেছি তাহা অন্যের অনমুমেয় এই বলিয়া নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন[১৪]। পরে তিনি, হে মানিনি! তুমি যথাসুখে এ স্থানে বিহার কর, হে ভীরু! আমি তোমার কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিব না, এই বলিয়া তিনি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন[১৫]। অনন্তর নৃপভামিনী চূড়ালা মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার মায়া সঙ্গোপন পূর্ব্বক কাম ভোগ নিপুণ অর্থাৎ পর প্রেম মুগ্ধ স্বকীয় শরীর সন্দর্শন করিয়া লতা কুঞ্জ হইতে বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন[১৬]। এবং দেখিলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক হৈমময় শিলাতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং তাঁহার নীলেন্দীবর সদৃশ নয়নদ্বয় ঈষৎ বিকসিত রহিয়াছে[১৭]। মদনিকা তথায় আগমন করিয়া ব্রীড়া বশতঃ আপনার মুখ কমল অবনত করিলেন। এবং খিন্ন ও পরিক্লান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলেন[১৮]। মহারাজা শিখিধ্বজ কিঞ্চিৎ কাল মধ্যে বীতসমাধি হইয়া মধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অতি শ্রবণাভিরাম বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন[১৯]। অয়ি তন্বি! কি নিমিত্ত তুমি এত সত্বর প্রণয়োপভোগ ত্যাগ করিলে। জন্তু সকল আনন্দের নিমিত্ত এই ভুবনত্রয়ে বিচরণ করিয়া থাকে[২০]। তুমি প্রণয় পরিচারণ দ্বারা তোমার মনোবৃত্তির সন্তোষের নিমিত্ত পুনরায় গমন কর। এই জগতে পরস্পরের প্রণয় অতি দুর্লভ[২১]। অয়ি মানিনি! আমি ইহাতে কিছু মাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না। লোকের বাঞ্ছনীয় বিচিত্র ঘটনাবলী দেবপ্রসাদে সম্পন্ন হইয়া থাকে[২২]। তুমি দুর্ব্বাসার শাপে মদনিকা হইয়াছ। এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে রত হইতে পার[২৩]।

মদনিকা বলিলেন, হে মহাভাগ! রমনীগণ স্বভাবতঃ এইরূপ চঞ্চল হইয়া থাকে। পুরুষাপেক্ষা রমণীগণের কামবৃত্তি অষ্ট গুণ অধিক।

অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন২৪। আমি অবলা, এই রাত্রি কালে গহন কাননে একাকিনী বিচরণ করিয়া থাকি। আপনি সায়ং-কালীন জপে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে আমি একাকিনী কি করিব২৫? অবলা কুমারী-ই হউন, আর তরুণী-ই হউন, উপপতি প্রাপ্ত হইলে তাহারা রতি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না২৬। রমণীগণ পুরু-ষের সহবাসে সুন্দরতা লাভ করিয়া থাকে। আপনি যদি বলেন যে, "আমি আপনার বিবাহিতা পত্নী, সুতরাং পরপুরুষ সমাগম দ্বারা পাতিব্রত্য ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তোমার প্রতি আমার অনুরাগ না থাকিলেও পারে"২৭।" সে পক্ষে আমার কথা এই যে, আমি মূঢ়া বিদ্যাবুদ্ধি পরিহীনা অবলা, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন, সাধুগণ সর্ব্বদাই ক্ষমাপরায়ণ হইয়া থাকেন২৮।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে সুন্দরি! গগনতলে যেমন বৃক্ষ কখনও থাকিতে পারে না, সেইরূপ, আমার হৃদয়ে রাগও থাকিতে পারে না। কেবল সাধুগণের নিন্দাভয়ে তোমাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না২৯। যাহা হউক, হে বরারোহে! তুমি এই বনপ্রদেশে পূর্ব্বের ন্যায় যথাসুখে বিহার কর৩০।

"মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপ ভাবে সমভাব পরায়ণ হইয়া মহাত্মা শিখিধ্বজ অবস্থান করিলে চূড়ালা, রাজা শিখিধ্বজের ঐরূপ রাগদ্বেষাদি শূন্য অন্তঃকরণ অনুভূতিগোচর করিয়া অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন৩১। কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে ইনি পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া ভগবত্তা প্রাপ্ত হই-য়াছেন। রাগ দ্বেষ পরিশূন্য হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন৩২। সুখ দুঃখ আপদ সম্পদ এবং ভোগাদি কিছুতেই ইহার চিত্ত বিচলিত হইবে না ৩৩। এক্ষণে আমি ইঁহাকে নারায়ণের ন্যায় দেখিতেছি৩৪। অতএব, আমার সমুদায় আত্মবৃত্তান্ত ইহাকে স্মরণ করাইয়া দিই। আমি কুম্ভ রূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় চূড়ালা রূপে ইঁহাকে দর্শন দিই৩৫। চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ মদনিকা দেহ ত্যাগ করিয়া চূড়ালা রূপে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিতা হইলেন৩৬। অচিরকাল মধ্যে মহারাজ শিখিধ্বজ প্রণয়পেশলা নিজ দয়িতা চূড়ালাকে সন্দর্শন করি-লেন। ভগবান্ কমলাপতি কমলার সহিত মিলিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, ভূমিতল হইতে লক্ষ্মীরূপিণী জনকনন্দিনীর উদ্ভব হইলে যেরূপ

শোভা হইয়াছিল, রত্নাধার হইতে রত্নজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ, নিজ প্রণয়িনীকে সম্মুখে উপগতা ও সুশোভিতা হইতে দেখিলেন[৩৭।৩৯]।

অষ্টোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততম সর্গ।

—()○()—

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাসত্ব রাজা শিখিধ্বজ নিজ প্রণয়িনী চূড়ালাকে সন্দর্শন করিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, পরে তাঁহাকে বলিলেন[১]। অয়ি সুন্দরি! তুমি কে? অয়ি পদ্মপত্রাক্ষি! তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে? তুমি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ এবং কি নিমিত্তই বা এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ[২]? অঙ্গসৌষ্ঠব, ব্যবহার এবং মধুর হাস্য দ্বারা আমি তোমাকে আমার নিজ দয়িতার ন্যায় দেখিতেছি[৩]।

চূড়ালা বলিলেন, হে প্রভো! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহাই ঠিক্। আমি চূড়ালা, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি অকৃত্রিম দেহ ধারণ করিয়া অদ্যই এ স্থানে আসিয়াছি[৪]। কুম্ভাদি দেহ ধারণ করতঃ নানাবিধ মায়া প্রপঞ্চের দ্বারা এই বনান্তরে আপনাকে প্রতিবোধিত করিতেছিলাম[৫]। আপনি যখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মোহ বশতঃ তপস্যাদির নিমিত্ত বনমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি সেই দিন হইতেই আপনাকে প্রতিবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্নশীলা হইয়াছি[৬]। কুম্ভদেহ ধারণ করিয়াই আপনাকে প্রতিবোধিত করিয়াছি। আপনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই কুম্ভাদি দেহ ধারণ করিয়াছিলাম[৭]। হে মহীপতি! আমি মায়ার দ্বারা কুম্ভাদি দেহ ধারণ করিয়াছিলাম জানিবেন, তাহা সত্য নহে। এক্ষণে আপনি ধ্যানমার্গ দ্বারা সমস্তই বিদিতবেদ্য হইয়াছেন[৮]। আপনি ধ্যানমার্গ দ্বারা সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন। অনন্তর চূড়ালা কর্ত্তৃক ঐরূপে বিদিত হইয়া রাজা

ধ্যানযোগে রাজ্য পরিত্যাগাবধি চূড়ালা দর্শন পর্য্যন্ত সমস্ত দেখিতে পাইলেন[৯।১০]। মুহূর্ত্তমধ্যে রাজ্য পরিত্যাগাবধি চূড়ালার ক্রম ও দর্শন বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইলেন[১১]। রাজা সমস্ত অবলোকন করিয়া সমাধি হইতে বিরাম লাভ করিলেন, এবং পুলকিত হইয়া নয়নাম্বুজ উন্মুক্ত করিলেন[১২]। সত্বর বাহু প্রসারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন[১৩]। নকুল যেমন নকুলীকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করে, তদ্রূপ, রাজা মহারাণীকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন[১৪]। এতদুভয়ের মিলনে যেরূপ আনন্দ উত্থিত হইয়াছিল, স্বয়ং বাসুকী শত জিহ্বা দ্বারাও তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন না। শৈল সকল যেমন পরস্পর দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ, তাঁহারাও আলিঙ্গন প্রদান করিয়া সংলগ্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অতি পুলকিত ও দেহ হইতে স্বেদ জল সকল নির্গত হইতে লাগিল [১৫।১৬]। তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল। ক্রমে বাহুদ্বয় শিথিলভাব ধারণ করিল[১৭]। মহারাজ তদীয় রমণীর চিকুরদেশে হস্ত সংলগ্ন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। যোষিৎ কুলের মধ্যে তুমি পরম রমণীয়া ও অতিমধুরা[১৮।১৯]। অদ্য পুণ্যরাশি চতুর্দ্দিকে স্ফুরিত হইতেছে, তোমার সঙ্গ অমৃত অপেক্ষাও সুখের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অয়ি নবোদিত শশিকলার ন্যায় মনোহারিণি! তুমি কি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না[২০]। তুমি ভর্ত্তার জন্য অতি কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়াছ, এবং আমি দারুণ সংসারকুহর হইতে তোমার নিমিত্ত উদ্ধার পাইয়াছি। অরুন্ধতী, শচী, গৌরী, গায়ত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী হইতেও তুমি আধিক্যবতী হইতেছ [২১।২২]। হে তন্বি! অদ্য সকল রমণী অপেক্ষা তোমার গুণ বিবৃদ্ধ হইয়াছে। ধী, লক্ষ্মী, কান্তি, ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা এ সকলকেও তুমি গুণদ্বারা পরাস্ত করিয়াছ[২৩]। অয়ি সুন্দরি! আমি অদ্য তোমা হইতে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। এক্ষণে কি প্রত্যুপকার করিয়া তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব, তাহা আমাকে অনুজ্ঞা কর। আমি দারুণ মোহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। স্নেহান্বিতা কুলযোষিৎগণ যেরূপ উদ্ধারসমর্থা, শাস্ত্র, গুরু ও মন্ত্রাদি সেরূপ সমর্থ নহে[২৪।২৫]। স্নেহময়ী কুলাঙ্গনারা ভর্ত্তার সখার, ভ্রাতার, সুহৃদের, গুরুর, মিত্রের ও ধনসম্পত্তির স্বরূপ[২৭]।

কুলাঙ্গনারা ভর্ত্তার নিকট শাস্ত্র, দাস ও গৃহাদির স্বরূপ। সেইজন্ত কুলস্ত্রী ভর্ত্তার সর্ব্বদা মাননীয়া[২৮]। সাধ্বী রমণীরা স্বামীর ইহ-পর-উভয় লোকের সুখস্থান এবং সংসার সমুদ্রের পারনেত্রী[২৯]। আমার মনে হয়, তুমি সমুদায় কুলনারীকে জয় করিলে[৩০]। যে স্থানে অথবা যখন যখন নারীদিগের সদ্‌গুণের উল্লেখ হইবে, তখন তখনই তুমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণনীয়া হইবে। আরও মনে হয়, বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়া অরুন্ধতী প্রভৃতির কোপস্থান হইয়াছেন। তুমি সতী সাধ্বী ও অতিশয়শালিনী। এক্ষণে আইস, আমি তোমাকে পুনরালিঙ্গন করি।

বশিষ্ঠ বলিলেন, শিখিধ্বজ ঐরূপ বলিয়া চূড়ালাকে পুনরালিঙ্গন করিলেন[৩১।৩৩]।

চূড়ালা বলিলেন, হে দেব! আপনাকে আমি নীরস ক্রিয়াতৎপর দেখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতাম। সেইজন্ত আমি তোমার তত্ত্বজ্ঞান উদয়ের জন্ত যত্ন করিয়াছি। ঐ যত্নে আমারই স্বার্থ ছিল, সুতরাং উহাতে আমি আপনার প্রশংসাপাত্রী নহি[৩৪।৩৬]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, তুমি যেমন সখা হইয়া স্বার্থ সম্পাদন করিলে, আজ্‌ সমুদায় কুলনারী এইরূপ স্বার্থ সম্পাদন করুক।

চূড়ালা বলিলেন, হে কান্ত! আপনি বোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে সংসার সাগরের তটে স্থিতি করতঃ বিশ্রাম সুখ অনুভব করুন[৩৭]। এখনও কি পূর্ব্বের সেই কঠোর তপস্যাদি মনে করেন? সে সকল মনে করিয়া এখন বোধ হয় মনে মনে হাস্য করিতেছেন। সে সকল কেবল মনঃকল্পনার কুহক[৩৮।৩৯]। হে দেব! আকাশে যেমন পর্ব্বতের স্থিতি দৃষ্ট হয় না, তেমনি, এখন আপনাতে কোনও দৃশ্যের দর্শন হয় না। এখন আপনি কোথায় এবং কি বাঞ্ছা করেন[৪০]? এখন কি কোনরূপ দেহ আছে?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে নীলাব্জলোচনে! এখন আমি নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, নিরংশ, স্বস্থ ও নিস্পৃহ[৪১।৪২]। এখন আমি শান্ত, অরূপ ও মোহবর্জ্জিত। এখন আমি পরমার্থে অবস্থান করিতেছি[৪৩]। হরি হর ব্রহ্মা প্রভৃতি যে অবস্থার প্রতিবেধ করিতে পারেন না, আমি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি চিন্মাত্র ও স্বস্থ[৪৪]। এখন

আমি সংসার ভ্রমের অতীত সুতরাং এখন আমি রুষ্ট তুষ্ট খিন্ন, কিছুই নহি[৪৫]। হে সুন্দরি! আমি স্থূল নহি, সূক্ষ্ম নহি, অসত্য বা মিথ্যা নহি। এখন আমি সত্য ও ক্ষয়াদি রহিত। এখন আমি শান্ত স্বরূপ প্রাপ্ত, নিরাশয় ও সাম্যপ্রাপ্ত[৪৬,৪৭]। হে পতিব্রতে! আমি এখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ও যাহা ছিলাম তাহাই। অন্য কিছু হইও নাই এবং হইবও না। হে চপল নেত্রে! তুমি আমার গুরু, সে ভাবে তুমি আমার নমস্যা। তোমারই প্রসাদে আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি[৪৮-৪৯]। আর আমার মালিন্য হইবে না। আজ্ আমি শান্ত স্বস্থ ও রাগাদি বিহীন[৫০]। আমি সর্ব্বাতীত ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বগামী।

চূড়ালা বলিলেন, হে মহামতে! হে হৃদয়প্রিয়! যদি তাহাই হয়, তবে এখন বলুন, আপনার কি ভাল লাগে?

শিখিধ্বজ বলিলেন, ইহা ভাল নহে অথবা ইহা ভাল, তএর কিছুই জানি না[৫১,৫২]। হে তন্বি! তুমি যাহা কর, এবং ভাল মনে কর, আমার পক্ষে তাহাই হউক[৫৩]। আমি ভাল মন্দ অনুসন্ধান করি না। এক্ষণে তুমি যাহা জান তাহাই কর[৫৪]। মণি যেমন প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ, আমি তোমার অভিমত আচার ধারণ করিব। আমার নিজের কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই। আমি স্তুতি নিন্দা করিব না, তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণ কর।

চূড়ালা বলিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে, আমার মনোগত কথা শ্রবণ করুন[৫৫,৫৬]। আপনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় অদ্বৈত জ্ঞানে কিছু কাল অবস্থান করুন[৫৭]। আমরা এখন উভয়েই নিরীচ্ছ, আকাশের ন্যায় নির্লেপ, এখন আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, চেষ্টা অচেষ্টা, সমান[৫৮]। আমরা আদ্যন্তরহিত ও চিন্মাত্র। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমরা আয়ুঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে থাকিব। পরে যথাকালে বিদেহ হইব।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমরা আদি মধ্য শেষ, এই তিন কালে কিং-স্বরূপ তাহা বল[৫৯,৬১]। আয়ুঃ শেষ হইলে আমরা কিরূপ অবস্থায় থাকিব, তাহা বল।

চূড়ালা বলিলেন, আমরা আদিতে মধ্যে ও অন্তে সমান রাজমান[৬২]। মোহ অতীত ও মোহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে সেই রাজমান থাকিব[৬৩]। এখন আপনি পূর্ব্বের ন্যায় আপন নগরে ও আপন

সিংহাসনে রাজা হউন, আমিও আপনার লোকললামভূতা মহিষী হইয়া থাকিব। পুরবাসী নগরবাসী ও রাজ্যবাসী মানবেরা হৃষ্ট পুষ্ট থাকুক[৬৪]। রাজপ্রসাদে পতাকা উড্ডীন হউক, নানাবিধ বাদিত্র ধ্বনি উত্থিত হউক, পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা নগর ভূষিত হউক[৬৫]। বসন্ত কালে যেরূপ লতা-বল্লী প্রভৃতি শোভমানা হয়, নগর শীঘ্রই সেইরূপ শোভমান হউক।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চূড়ালা ঐ সকল কথা বলিলে রাজা শিখিধ্বজ হাস্য সহকারে ও অতিমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন—হে প্রিয়ে! যদি সেরূপ ইচ্ছা হয় ত আমি তাহাই করিব। এই মনুষ্যলোকেই আমি স্বর্গলোকের সুখ অনুভব করিব[৬৬,৬৭]।

চূড়ালা বলিলেন, হে মহারাজ! আমার আর ঐশ্বর্য্যাদি ও ভোগ্য বস্তুতে স্পৃহা নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে আমি তাহা-তেই তৃপ্ত আছি[৬৮]। স্বর্গ, রাজ্য, এ সমস্ত আমার সুখের বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। অবিক্ষুব্ধ অবস্থাই আমার সুখের কারণ[৬৯]। ইহা সুখের, ইহা দুঃখের, ইত্যাদি প্রকার দ্বৈতভাব তিরোহিত হওয়ায়, আমি সর্ব্বত্রই সুখে বিচরণ করিব[৭০]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অয়ি বিলোলাক্ষি! তুমি যথার্থই বলিয়াছ। রাজ্যাদির কি প্রয়োজন? সুখ দুঃখাদি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিগত মৎসর হওয়াই কর্ত্তব্য। তথাবিধ অবস্থায় আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিব[৭১,৭২]। এইরূপে নবদম্পতী কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে দিনমান যেন অতি সত্বর অতিবাহিত হইয়া গেল[৭৩]। অনন্তর তাঁহারা সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সান্ধ্য বিধির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বর্গসিদ্ধিও অনাদর করিয়া উভয়ে নানাবিধ প্রণয়ালাপ দ্বারা রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রণয়পেশল বাক্যসকল শ্রবণ কামনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রজনী যেন অতিবাহিতা হইয়া গেল[৭৪,৭৫]।

নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততম সর্গ ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রত্নাধার হইতে যেমন কান্তি বহির্গত হইতে থাকে, সেইরূপ, ভগবান্ মরিচীমালী তমোরাশি ধ্বংস করিয়া গগনমার্গে উদিত হইলেন[১]। অরবিন্দ যেমন সূর্য্যোদয়ে বিকসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ, মানবগণের নয়ন সূর্য্যোদয়ে বিকসিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ রাত্রি অবসানে জনসমূহ জাগরিত হইতে লাগিল। এবং জনসমূহ যেমন স্ব স্ব আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, তদ্রূপ, সূর্য্যরশ্মি সকল তাহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল[২]। পূর্ব্বোক্ত দম্পতী প্রভাত আগত দেখিয়া পত্রাসনে অবস্থিত হইয়া প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবিধির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর নৃপভামিনী চূড়ালা, সম্মুখস্থিত সপ্তসমুদ্র-সলিলপূর্ণ রত্নকুম্ভ লইয়া রাজাকে অভিষেক করিতে সঙ্কল্প করিলেন[৩।৪]। এবং সেই মঙ্গল কুম্ভসলিল দ্বারা পূর্ব্বমুখোপবিষ্ট স্বকীয় স্বামীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন[৫]। সঙ্কল্পমাত্রে উপস্থিত হেমময় বিষ্টরে রাজাকে উপবিষ্ট ও অভিষিক্ত করিয়া দেবরূপিণী চূড়ালা এইরূপ বলিতে লাগিলেন[৬]। হে প্রভো! আপনি এতদিন মুনিগণের উপযোগী যে সমস্ত তেজ সমাশ্রয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অষ্টলোক-পালের তেজ অর্থাৎ রাজপ্রতাপ ধারণ করুন[৭]। অরণ্যমধ্যে চূড়ালা কর্ত্তৃক রাজা শিখিধ্বজ এইরূপে প্রতিবোধিত হইলে চূড়ালা বলিলেন; আপনি অদ্য এস্থানে মহারাজ হইলেন[৮]। তখন রাজা প্রতিহারপদস্থিতা মানিনী চূড়ালাকে রাজ্ঞীপদে প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া সরোবর হইতে জল আনয়ন পুরঃসর অভিষেক করতঃ নিজ দয়িতাকে রাজ্ঞীপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন[৯।১০]। এবং বলিলেন, হে প্রিয়তমে! হে পদ্মপত্রাক্ষি! মহাবিভব সংযুক্ত সৈন্য সকল তুমি সংগ্রহ করিবার যোগ্য হইতেছ[১১]। বরবর্ণিনী চূড়ালা দয়িতের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের জল সৃষ্টির ন্যায় সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিলেন[১২]। তখন তাঁহারা বাজী বারণ ও পতাকা সম্বলিত রথসঙ্কুল সৈন্যরাশি

অবলোকন করিতে লাগিলেন[১৩]। সেই নিবিড় বনভূমি ও সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত গুহা ভেরী নিনাদে নিনাদিত হইতে লাগিল। এবং সৈন্যগণের শিরস্ত্রাণ স্থিত রত্ন সমূহ দ্বারা তমোরাশি ধ্বংস হইতে লাগিল[১৪]। পরে সেই হৃষ্ট পুষ্ট সৈন্য সামন্তাদির দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া সেই নৃপ-দম্পতী রথারোহী হইলেন[১৫]।

তদনন্তর মহাবল রাজা শিখিধ্বজ রাজ্ঞী চূড়ালার সহিত পদাতি রথ গজ বাজী সঙ্কুল সৈন্য পরিচালন করতঃ সেই মহেন্দ্রাদ্রি হইতে বি-নির্গত হইলেন। পথিমধ্যে অনেক পর্ব্বত, বহু দেশ, অনেক নদী, গ্রাম, বিবিধ অরণ্য সন্দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন[১৬।১৮]। এবং পূর্ব্বে অর্থাৎ স্বনগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যাশ্রম করিবার সময়ে পথিমধ্যে যে সকল বিষয় দেখিয়াছিলেন, নিজ প্রেয়সীকে সে সকল দেখাইতে দেখাইতে সুষমাময়ী নিজ রাজধানীতে সমুপস্থিত হইলেন[১৯]। তখন অমাত্যবর্গ মহারাজের নগরাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তদাগমনে সন্তুষ্টচিত্ত হইল। তন্মুহূর্ত্তেই উৎকণ্ঠার সহিত সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্মুখে আগমন করিয়া জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল[২০।২১]। পুরবাসীগণ লাজ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। তিনি নগরের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী শ্রেণীনিবদ্ধ বণিক-পথ সকল সন্দর্শন করিতে লাগি-লেন[২২]। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে নিজ পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, পতাকা শ্রেণীর দ্বারা পুরী বিচিত্র শোভায় শোভমানা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধাকারে গ্রথিত মাল্য সকল সংন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পরকীয়া রমণীগণ নৃত্য গীত প্রভৃতির দ্বারা আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। বলিতে কি, সত্বর সেই পুরী কৈলাশ পর্ব্বতের ন্যায় অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। লোকপ্রসিদ্ধ দূর্ব্বাক্ষত প্রভৃতি, মাঙ্গল্য দ্রব্যের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া রাজা নিজ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং যে সকল প্রজাপুঞ্জ তথায় সমুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন[২৩।২৪]। অনন্তর সপ্ত দিন যাবৎ পুরীমধ্যে বিশেষ উৎসব করিয়া স্বকীয় অন্তঃ-পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। এবংক্রমে পৃথিবীতে চূড়ালার সহিত দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহ পরিত্যাগ করি-লেন। তৈলবিহীন হইলে দীপ যেমন নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ, তিনি পুনর্জ্জন্মবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষধামে গমন করিলেন[২৫।২৭]। দশ সহস্র

বৎসর ঐরূপে সমদৃষ্টির দ্বারা রাজ্য পালন করিয়া তিনি নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২৮]। তৎপরে বর্ণিত প্রকারে বিগতভয় বিগতবিষাদ ও জীবন্মুক্ত হইয়া মহামতি শিখিধ্বজ সমদৃষ্টির দ্বারা দশ সহস্র বর্ষ প্রজা পালন করিয়াছিলেন[২৯]। পৃথিবীতে নানাবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া রাজগণের চূড়ামণি হইয়া, অশেষ সুখ সম্ভোগ করতঃ মহাত্মা শিখিধ্বজ সসাগরা পৃথিবী প্রতিপালন পূর্ব্বক সংসারমুক্ত হইয়াছিলেন। রাম! তুমিও তদ্রূপ জীবন্মুক্ত ও বিশোক হইয়া যথোপস্থিত কার্য্যের অনুসরণ কর, পশ্চাৎ তুমিও তাঁহার ন্যায় নির্ব্বাণ পদে স্থিতি করিও[৩০]।

দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চূড়ালোপাখ্যান সমাপ্ত।

একাদশোত্তরশততম সর্গ।

—()○()—

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট শিখি-ধ্বজ রাজার উপাখ্যান সবিশেষ বর্ণন করিলাম। যদি তুমি এই পথ অবলম্বন কর, তবে তুমি কখনও ক্লিষ্ট হইবে না[১]। তুমি এই প্রকার রাগ দ্বেষ বিনাশিনী সমদৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধিতে বিষয়বাসনা শূন্য ব্রহ্ম পদ লাভ করতঃ অবস্থান কর[২]। রাজা শিখিধ্বজ যেমন এইরূপে অশেষ রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমিও এইরূপে রাজ্য রক্ষা করতঃ ভোগ ও মোক্ষ পদ লাভ কর[৩]। হে রামচন্দ্র! শিখিধ্বজের সর্ব্বত্যাগানুসারে বৃহস্পতির পুত্র কচ যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে প্রভো! ভগবান্ বৃহস্পতির পুত্র মহাভাগ কচ যেরূপে তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, আপনি সংক্ষেপে তাহা কীর্ত্তন করুন[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন! দেবগুরুনন্দন কচ যেরূপ শিখিধ্বজের ন্যায় অত্যুত্তম আত্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ

করত। কচ বাল্যকাল অতিক্রমের পর সংসার সমুত্তরণের ইচ্ছায় এই মহাবাক্যের মর্ম্মাবগত হইয়া পদ পদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" পিতা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন[৭]।

কচ বলিলেন, হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আপনার কর্ম্ম প্রভাবে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ জীবগণ কি উপায়ে এই সংসার পঞ্জর হইতে নির্গত হয়, তাহা আমাকে বলুন[৮]।

বৃহস্পতি বলিলেন, হে পুত্র! জীবগণ অনর্থরূপমকরসঙ্কুল সংসার সমুদ্র হইতে সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে[৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কচ পিতার নিকট এই প্রকার পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ বিজনবনে গমন করিলেন[১০]। ইহাতে বৃহস্পতির মনে কোনও উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় নাই। কারণ মহানুভবগণ ইষ্ট বিয়োগে বা অনিষ্ট সংযোগে কখনই বিধুর হইয়া উঠেন না[১১]।

অনন্তর, কোন মহারণ্যে ক্রমে অষ্টবর্ষ অতীত হইলে পরমাত্মা কচ এক সময়ে পুনর্ব্বার বৃহস্পতিকে দেখিতে পাইলেন[১২]। অনন্তর কচ নানাবিধ পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা বৃহস্পতির পূজা করিলে বৃহস্পতি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কচও বৃহস্পতিকে এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন[১৩]।

কচ বলিলেন, অদ্য অষ্ট বর্ষ যাবৎ আমি সর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। হে তাত! তথাপি আমি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না[১৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কচ এইরূপে কাতর হইয়া বনমধ্যে বৃহস্পতির নিকট এই প্রকার বলিলে বৃহস্পতি বলিলেন, তুমি সমস্ত পরিত্যাগ কর, এই বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন[১৫]। বৃহস্পতি গমন করিলে কচ বল্কল প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। এবং শরৎকালীন আকাশ যেমন চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও মেঘমণ্ডলের অনুদয়ে শোভা ধারণ করে, সেইরূপ সৌসাদৃশ্য লাভ করিলেন[১৬]। এবং পুনর্ব্বার সেই কাননে বর্ষত্রয় অতিবাহিত করিলেন। শরৎকালীন মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া শোভা ধারণ করে, সেইরূপ সৌসাদৃশ্য লাভ করিলেন[১৭]। দিগন্তের এক দেশে অবস্থান করতঃ শান্ত ও শূন্য ভাব ধারণ করিলেন। এবং বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরে ক্ষুব্ধ হইতে

লাগিলেন। এইরূপ সময়ে বৃহস্পতি পুনরায় তাঁহাকে দর্শন দিলেন[১৮]। কচ তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। অনন্তর কচ পবিত্র বাক্যের দ্বারা পুনরায় সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন[১৯]।

কচ বলিলেন, হে তাত! আমি কন্থাও বেণুদণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। এখন আমি কি করি[২০]?

বৃহস্পতি বলিলেন, যদিও তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ, কিন্তু চিত্তকেই পণ্ডিতেরা সকল পদার্থময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তুমি সেই চিত্ত পরিত্যাগ কর, চিত্ত ত্যাগ ব্যতিরেকে সর্ব্বত্যাগ সম্ভাবনা নাই[২১]। যাঁহারা সর্ব্ব পদার্থের মর্ম্মগ্রাহী, তাঁহারা চিত্তত্যাগকে সর্ব্বত্যাগ বলিয়া স্থির করিয়াছেন[২২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৃহস্পতি পুত্রকে এই প্রকার উপদেশ দিয়া পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। কচও অখিন্নমনে চিত্তত্যাগে সঙ্কল্প করিলেন[২৩]। তিনি বনবাসী থাকিয়া যে সময়ে চিত্ত পদার্থের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেন না, সেই সময়ে পিতৃসন্দর্শন লালসায় সুরলোকে গমন করিলেন। কচ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সুরলোকে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে পিতৃ চরণে অভিবাদন ও প্রণাম করিলেন[২৪,২৫]। অনন্তর তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! চিত্ত পদার্থ কি? এবং ইহার স্বরূপই বা কি? এবং আমি কি করিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে পারি[২৭]?

বৃহস্পতি বলিলেন, যাঁহারা চিত্ত পদার্থের স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা চিত্তকে অহঙ্কার বলিয়া জানেন। জীবের অন্তঃকরণে যে অহং ভাবের উদয় হয় তাহাই চিত্ত[২৮]।

কচ বলিলেন, হে মতিমন্! আপনি ত্রয়স্ত্রিংশকোটী প্রমাণজ্ঞ বুধগণের গুরু। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে চিত্তের স্বরূপত্ব নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা কি প্রকার আমাকে বলুন[২৯]? আমি চিত্ত ত্যাগকে সুদুষ্কর বলিয়া অনুমান করি। এবং জানি ইহাকে ত্যাগ করিতে না পারিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। যাহা হউক, হে যোগীন্দ্র! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কি করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি[৩০]?

বৃহস্পতি বলিলেন, কুসুমদলাদি মর্দ্দন ও নয়ন বিমীলন অপেক্ষা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অতি সহজ। আমার বিশ্বাস ইহা পরিত্যাগে কোন ক্লেশ নাই[৩১]। হে পুত্র! ইহা বস্তুতঃ যে প্রকার, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যখন জীবের প্রকৃত পদার্থ জ্ঞান হয়, তখন অজ্ঞানের আশ্রয়ে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়[৩২]। হে পুত্র! মিথ্যা ভ্রম যে প্রকার, বস্তুতঃ ইহাও তাই। অহঙ্কার বলিয়া কোন পদার্থ নাই। বালকের বেতাল ভয় যে প্রকার, ইহাও সেই প্রকার। ইহার কোন সত্ত্বা নাই[৩৩]। রজ্জুতে যেমন সর্প প্রতীতি হয়, মেরুপ্রদেশে জল বুদ্ধি হয়, সেই প্রকার মিথ্যাময় অহঙ্কার মিথ্যা রূপে প্রকাশ পায়[৩৪]। যেমন চন্দ্র এক হইলেও মোহবুদ্ধি বশতঃ চন্দ্রের দ্বিত্ব অনুভূতি হইয়া থাকে[৩৫]। এই সংসারে অন্য পদার্থ আর কিছুই নাই, কেবল আদি ও অন্ত বর্জ্জিত আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ সকলের জ্ঞানগম্য এক নিত্য পদার্থ আছে[৩৬]। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে সকল পদার্থে এবং সকল প্রাণীতে বিরাজিত আছেন। তিনি বিলোল বীচি বিশিষ্ট সমুদ্রে জল রূপে অবস্থিতি করেন[৩৭]। এই মহা ভাব কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহা হইতে রজোরাশি উদ্ভূত হইয়াছে, জল হইতে কাহার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং অনল হইতেই বা কাহার উৎপত্তি হইয়াছে[৩৮]। আমি সেই, এই প্রকার মিথ্যা প্রত্যয়কে পরিত্যাগ কর। কারণ উহা অতি তুচ্ছ ও পরিমিতাকৃতি এবং উহাতে দিক্ কাল সকল সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে[৩৯]। যিনি দিক্ এবং কালাদি হইতে অনবচ্ছিন্ন স্বচ্ছ বিস্তৃত নিত্যোদিত সর্ব্বার্থময় এবং অমল চৈতন্য স্বরূপ, তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হও[৪০]। সমস্ত দিগাবস্থিত ফল কুসুম দলের রসের ন্যায় তুমি এই জগতে চিরন্তন আছ। বিমলতর চিত্ত নিত্য, সেই পদার্থ হইতে তুমি ভিন্ন নহ[৪১]।

একাদশশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

——()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে অতি উৎকৃষ্টতর যোগমার্গোপদেশ লাভ করিয়া বৃহস্পতি সুত কচ জীবন্মুক্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[১]। হে রামচন্দ্র! কচ যেমন নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া প্রশান্ত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ, তুমিও অবিকৃত চিত্ত হইয়া অবস্থান কর[২]। অহঙ্কারকে অসৎ বলিয়া জানিও এবং এই আশ্রম পরিত্যাগ করিও না। যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা নাই তাহার আশা অসম্ভব[৩]। অহঙ্কার নষ্ট হইলে মরণ ও জন্ম উপলব্ধি হইতে পারে না। আকাশে বীজ বপন করিয়া কে কবে ফল সংগ্রহ করিয়াছে[৪]? যাহার কোন অংশ নাই সঙ্কল্পাত্মক মনোময় এবং পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম চিন্ময় মাত্র অবস্থিত আছেন[৫]। তরঙ্গ সকল যেমন জল ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে এবং কটকাদি যেমন সুবর্ণ হইতে অভিন্ন, সেইরূপ, অহংজ্ঞান পরিশূন্য হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়[৬]। যাহার জ্ঞান নাই সেই অবোধ ব্যক্তিই এই জগৎকে মায়াময় বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন[৭]। হে অনঘ! তুমি দ্বৈত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম বুদ্ধি অবলম্বন কর, মিথ্যা পুরুষের ন্যায় অসৎ কল্পনার দ্বারা দুঃখিত হইও না[৮]। এই সংসার দুষ্পার মায়াময়, উহা ক্রমসঃ গাঢ় হইতেছে, শরৎকালীন শিশিরের ন্যায় উহার পরিক্ষয়ে যত্নবান্ হও[৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, আমি আপনার কথামৃত দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। কারণ চাতক মেঘের জল পান করে, কিন্তু যদি প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না[১০]। আমি অমৃত বর্ষণ দ্বারা অত্যন্ত শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপিও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না[১১]। ইন্দুসুধা পান করিয়া চকোর যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ, আমিও আপনার বাক্যসুধা পান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না[১২]। যদিও আমি

প্রশ্নানুরূপ উত্তর লাভ করিতেছি, তথাপি আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে অভিলাষ হইতেছে। কারণ অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা না করে[১৩]। হে মুনিবর! পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা পুরুষ কি? তাহা আমাকে বলুন[১৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! মিথ্যা পুরুষ বোধের নিমিত্ত তোমাকে একটী আশ্চর্য্য ইতিবৃত্ত বলিতেছি[১৫]। হে মহাবাহো! মায়াময় নামে এক পুরুষ ছিলেন। তিনি বালকের ন্যায় সর্ব্বদা অজ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা আবৃত থাকিতেন[১৬]। সেই মিথ্যা পুরুষ কেহ কখনও দেখে নাই, এইরূপ জন্মিয়াছিল এবং সেই স্থানেই থাকিত। তাহার জন্ম ও স্থিতি মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ও আকাশে কেশণ্ড্রাকের ন্যায় (কেশণ্ড্রাক অর্থ মেঘের সংস্থান জনিত মিথ্যা আকৃতি)[১৭]। সে জন্য সে ছাড়া সে স্থানে আর কেহ বাস করিত না। যদি কিছু থাকিত তাহাও তদাভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই দুর্ম্মতি সে রহস্য বুঝিতে পারে না[১৮]। তাহার সঙ্কল্প সেই স্থানেই (কার্য্য করিবার চিন্তা অর্থাৎ নানা প্রকার চিন্তা) জন্মিতে ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার চিন্তার বিষয় এই যে, আকাশেই আমার জীবন আকাশেই আমার রক্ষক অতএব আমি আকাশ অবলম্বন করিয়াই থাকিব[১৯]। আমি একটী আকাশ স্থাপন করিয়া তাহারি রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকি, কেননা আকাশই আমার আদরের বস্তু। সেই মিথ্যাপুরুষ এইরূপ চিন্তা করিয়া আকাশ রক্ষার জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিল[২০]। হে রঘুনন্দন! সে গৃহাকাশে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারি রক্ষায় নিযুক্ত হইল[২১]। বায়ুর দ্বারা তরঙ্গ যেমন ভগ্ন হইয়া যায়, ঋতুবৈপরীত্যে অব্দাদি যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ, কিছু দিন পরে তাহার গৃহাদি নষ্ট হইয়া গেল[২২]। তখন সে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল, হা গৃহ! হা গৃহাকাশ! তোমরা কোথায়? তোমরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলে[২৩]। এইরূপে বিলাপানন্তর সে এক কূপ প্রস্তুত করিল। সেই কূপ কূপাকাশে পরিণত হইল[২৪]। অনন্তর কালবশে সেই কূপাদিও নষ্ট হইয়া গেল। কূপাকাশ নষ্ট হইলে পুনরায় বিলাপ আরম্ভ করিল[২৫]। কূপাকাশ নষ্ট হইলে পুনরায় কুম্ভ প্রস্তুত করিল। কুম্ভাকাশ প্রস্তুত করিয়া সে সন্তুষ্ট হইল[২৬]। হে রঘুদ্বহ! এইরূপে কুম্ভও নষ্ট হইয়া যাইল। তখন

সেই দুর্ম্মতি দিগাশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু যে দিক্ আশ্রয় করিতে লাগিল, সেই দিক্ই নষ্ট হইতে লাগিল[২৭]। কুম্ভ নষ্ট হইলে কুণ্ড প্রস্তুত করিতে লাগিল। সেই কুণ্ডও কুণ্ডাকাশে পরিণত হইল[২৮]। তখন সেই কুণ্ডও ক্রমে নষ্ট হইয়া গেল। তেজ রাশির দ্বারা অন্ধকার যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ, সেই কুণ্ডও নষ্ট হইয়া যাইলে, সে অতিমাত্র শোকার্ত্ত হইয়া উঠিল[২৯]। কুণ্ড নষ্ট হইলে সে আত্ম রক্ষার্থ এক চতুঃশালা প্রস্তুত করিল। সেই মহাশালাও কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া গেল[৩০]। জীর্ণ পত্রপুঞ্জ যেমন কাল প্রভাবে পতিত হয়, সেইরূপ, তাহার সেই গৃহাদি নষ্ট হইলে, সে অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল[৩১]। অনন্তর সেই মহাশালা গৃহাদি বিনষ্ট হইলে আকাশ রক্ষার জন্য এক কুণ্ডল (ভাষা কথা গোলা মরাই) প্রস্তুত করিল[৩২]। কাল তাহাকেও যথা সময়ে বিনষ্ট করিল এবং সে শোকেও সে পরিতপ্ত হইতে লাগিল[৩৩]। এইরূপে সেই মিথ্যা পুরুষের কাল ক্রমে অতীত হইতে লাগিল। সে উক্তরূপ গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াও কিছুতেই সংকল্পের সীমা শেষ করিতে পারিল না[৩৪]।

হে রাম! সেই মিথ্যা পুরুষ মূঢ়বুদ্ধি বশতঃ সেই গুহাপ্রদেশে (সেই দুষ্প্রবেশও দুর্ব্বোধ্য) উক্ত রূপে অবস্থান করতঃ এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখ ভোগ করিতে রহিল। তাহার গমনাগমনের শেষ হইল না[৩৫]।

দ্বাদশশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোত্তরশততম সর্গঃ

——()•()——

রামচন্দ্র বলিলেন, মিথ্যা নরের প্রসঙ্গে আপনি যে মায়া পুরুষের কথা বলিলেন, তাহা কি[১]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ঐ কথা আমি বিশদ করিয়া বলি, শ্রবণ

কর[২]। হে রঘুনাথ! আমি যে তোমাকে মায়াযন্ত্রময় পুরুষের অর্থাৎ মিথ্যা পুরুষের কথা বলিয়াছি, তাহাকে তুমি অহঙ্কার বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ অহঙ্কারকেই আমি মায়াপুরুষ বলিয়াছি এবং শূন্যকে আকাশ অথবা আকাশকে শূন্য বলিয়াছি[৩]। হে সাধো! ঐ আকাশেই এই জগৎ অবস্থিত। ঐ আকাশ অসীম এবং উহা সৃষ্টির আদি ও স্বয়ং আবির্ভূত[৪]। উহা সকলেরই অন্তরে স্থিত অথচ দুর্লক্ষ্য। ব্রহ্ম প্রায় আকাশের সদৃশ, সেইজন্য ব্রহ্মেই আকাশ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি। বায়ুতে যেমন স্পন্দন জন্মে, তেমনি, ব্রহ্ম হইতে অহঙ্কারের জন্ম হয়[৫]। ঐ অহঙ্কার প্রবৃদ্ধ হইলে ঐ ব্রহ্মাকাশে আত্মভাব (আমিত্ব) কল্পন করে। যাহা আত্মা নহে, সে তাহাতেই আত্মভাবনায় ভাবিত হয়[৬]। অবশেষে সে অনাত্মস্বভাব দেহে আত্মভাব স্থাপন করে এবং তদুপলক্ষ্যে নানা প্রকার কল্পনা করিতে থাকে। দেহ বার বার বিনষ্ট হয়, তন্নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, হইয়া বার বার সেইরূপে পুনঃপুনঃ দেহ সৃজন করে। সেই দেহ সৃজনকেই আমি মায়াপুরুষ ও মিথ্যাপুরুষের কার্য্য বলিয়াছি। ... ও অসৎ এবং তদুত্থ দেহাদিও অসৎ[৭]। পূর্ব্বে যে কূপ, কুণ্ড, চতুঃশাল, গৃহ ও কুম্ভের কথা বলিয়াছি, সে সকলকে তুমি দেহ বলিয়া জানিবে। সেই অহঙ্কার সেই সেই দেহের কল্পনা করে, তাহার রক্ষার্থ ব্যাকুল হয়, এবং তাহাতেই আমিত্ব স্থাপন করে[৮।৯]। হে রঘুনাথ! সেই অহঙ্কারের নাম বলি, শ্রবণ কর। জীব, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, মায়া, প্রকৃতি, সঙ্কল্প, কল্পনা, কাল ও কলা। এই সকল নামের নামী অহঙ্কার দ্বারা জগদ্ভ্রম ও মোহ জন্মিতেছে[১০।১১]। ঐ সকল নাম ব্যতীত তাহার আরও অনেক নাম আছে। সে সহস্র সহস্র নাম ধারণ করিয়া কল্পিত বিষয়ে বিচরণ করিতেছে[১২]। শূন্যাত্মা ভূতাকাশ বিস্তৃত করিয়া তাহাতে এই ভিত্তিশূন্য জগৎ প্রস্তুত করতঃ উক্ত মিথ্যা পুরুষ সুখ দুঃখ মোহ অনুভব করিতেছে[১৩]। মিথ্যা পুরুষ যেমন শূন্যে আমিত্ব স্থাপন করতঃ ঘটাকাশাদির জন্য ক্লেশ পাইয়াছিল, তুমি যেন সেরূপ ক্লেশ না পাও[১৪]। যে আত্মা আকাশাদি হইতেও মহান্ শুদ্ধ সূক্ষ্ম শিব ও শুভ, সে আত্মা কোথায় কিজন্য কাহার দ্বারা ক্লেশ পাইবে? তাহার আবার রক্ষা কি[১৫]? ভূত সকল শরীররূপ গৃহের বিনাশে বৃথা শোক করে, বলে—আমি মরিলাম[১৬]। যেমন ঘটাদি পদার্থের

বিনাশে আকাশের বিনাশ সিদ্ধ হয় না, তেমনি, দেহের বিনাশে দেহীরও বিনাশ হয় না[১৭]। যে দেহী সে শুদ্ধস্বভাব, চিন্মাত্র, সর্ব্বত্র অলিপ্ত এবং এই ভূতাকাশ অপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম। সে অনুভূতি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহার জন্ম নাই, বিনাশও নাই। তাহাই ব্রহ্ম ও জগদ্ভ্রান্তির আধার[১৮।১৯]। হে রামচন্দ্র! তাহাই সত্য, এক, শান্ত, আদ্যন্তবর্জ্জিত ও অহং ভাবের অতীত, এইরূপ জানিয়া সুখী হও[২০]।

তুমি সর্ব্বপ্রকার আপদের আলয়, অনিশ্চিত অবিবেকরূপী অহঙ্কার ত্যাগী হও। তাহা হইলে উত্তম পদ প্রাপ্ত হইবে[২১]।

ত্রয়োদশশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশশততম সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, পরব্রহ্ম হইতে প্রথমে মন জন্মে। সেই মন মননাত্মক (মনোবৃত্তি সদৃশ) এবং তাহাতেই জগতের স্থিতি[১]। যেমন পুষ্পে সুগন্ধ, সাগরে তরঙ্গ, সূর্য্যে কিরণরাশি, হে রামচন্দ্র! সেইরূপ, ব্রহ্মে মন[২]। এই জগৎ অন্য কোথা হইতে আইসে নাই। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ তেমনি এই মনের আত্মতত্ত্বে আত্মতত্ত্ব বিস্মরণে জগৎ[৩]। যে ভাবে রশ্মিজাল সূর্য্য হইতে ভিন্ন, সূর্য্য তাহার নিকট ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হয়[৪]। যে ভাবে, হার কেয়ূর বলাদি হইতে সুবর্ণ পৃথক পদার্থ, সুবর্ণ তাহারই নিকট ভিন্ন হয়[৫]। যে ব্যক্তি জানে, রশ্মিজাল আদিত্যই, আদিত্য ভিন্ন নহে, আদিত্য তাহার নিকট রশ্মি হইতে অভিন্ন হয়[৬]। যে জানে, যাহা জল তাহাই তরঙ্গ, জলতরঙ্গ তাহার নিকট অভিন্ন[৭।৮]। যে হার বলয়াদিকে সুবর্ণ বলিয়া জানে, হার কেয়ূরাদি তাহার নিকট সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৯]। যে জ্বালা পদার্থকে (জ্বালনকে) অগ্নি বলিয়া জানে, তাহার নিকট জ্বলনপদার্থ বহ্নিই, অন্য কিছু নহে[১০]। বুদ্ধি যখন যে ভাবে বর্ত্তিত হয়, তখন তাহা

সেই ভাবেই স্থিতি করে[১১]। জলনে যাহার অগ্নিবুদ্ধি," তাহার সেই বুদ্ধি বিকল্প শূন্য[১২]। ঐ রূপে যে নির্ব্বিকল্প হয়, বিকল্পবুদ্ধির অতীত হয়, সে-ই মহান্। সেই ব্যক্তিই প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়, সে আর কোনও কিছুতে মগ্ন হয় না[১৩]। হে রাম! তুমি বিকল্প অর্থাৎ নানাত্ব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চিন্মাত্রে স্থিতি কর[১৪]। ঐ রূপে আত্মা আপনিই আপনার যখন সঙ্কল্প শক্তির উদ্রেক করেন, তখনই তিনি যেন পৃথক্ হইয়া পড়েন। মনই বিশ্বাত্মা অর্থাৎ সংকল্পের দ্বারা বিশ্বরূপ হন। মন যখন যে কল্পনা করে তৎক্ষণাৎ তাহা দৃষ্ট হয়[১৬।১৭]। মনই কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, বায়ু প্রভৃতি ও পর্ব্বতাদি কল্পনা করিতেছে, মনই জীব, চিত্ত, অহঙ্কারাদি নাম ধারণ করিতেছে[১৮]। ঐরূপ মনস্তত্ত্বেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। মন আপনি আপনার ভাবনার দ্বারা সেই সেই আকারে প্রকটিত হয়[১৯]। সুতরাং এই জগৎ কেবলমাত্র সংকল্প, সংকল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। স্বপ্ন যেরূপ, জগদ্দর্শনও সেই রূপ। অথবা মনোরাজ্য যেরূপ, এই জগত সেইরূপ। ইহাকে আমরা ব্রহ্মের মনোরাজ্য বলিয়া জানি[২০।২১]। এ সকল যদি পরমার্থ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় তাহা হইলে এ সকল কিছুই নহে বলিয়া স্থির হইবে[২২]। তদ্ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ অবিচার চক্ষে দেখিলে এ সকল শত শাখায় বিস্তৃত হয়। জল যদ্রূপ ঊর্ম্মি লহরী প্রভৃতি নানা বিভাগে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ[২৩]। সমুদ্র যেমন তরঙ্গাদি রূপে স্ফুরিত হয়, তেমনি একাদ্বয় চিৎপদার্থও বিশ্বাকারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে[২৪]। ছিলনা হইল, এরূপ হয় না, ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ হইলে সমস্ত এক হইয়া যায়। গমন, আগমন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ব্যবহারে একাদ্বয় ব্রহ্ম চৈতন্যই বিভিন্নভাবে বিজৃম্ভিত হইতেছে। যে কিছু, সমস্তই ব্রহ্মবিৎ[২৫।২৬] এই সমস্ত জগৎ সেই সম্বিৎ, অন্য কিছু নহে। এ সকল সেই ব্রহ্ম-পদার্থেরই অবান্তরে স্ফুরিত হইতেছে। সুতরাং একমাত্র সম্বিদ্ব্যতীত অন্য পদার্থ নাই। এই জগৎজালকে তুমি ব্রহ্মেরই বিস্তৃতি বলিয়া জানিবে, এবং ইহা আছে তাহা নাই এ সকল ভাব কাল্পনিক। সম্বিৎই আছে, তাহার প্রলাপ্য অর্থাৎ সম্বেদ্য নাই। সুতরাং বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। বন্ধমোক্ষও কাল্পনিক[২৭।২৯]।

এই মোক্ষ, এই বন্ধন, এ সকল চিন্তা ত্যাগ কর। নিষ্কাম

অভিমান বর্জ্জন কর। করিয়া মৌনী বশী মোহ বর্জ্জিত ও মহাত্মা হইয়া স্থিতি কর। অনাসক্ত চিত্ত ও নিরহঙ্কার হইয়া কার্য্য করিয়া যাও[৩০]।

চতুর্দ্দশশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশশততম সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! তুমি মহাকর্ত্তা, মহাভোক্তা ও মহাত্যাগী হও। সর্ব্ব প্রকার শঙ্কা পরিত্যাগ কর, এবং ধৈর্য্যবান্ হও[১]।

রাম বলিলেন, মহাকর্ত্তাদি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ কি? অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তি মহাকর্ত্তাদির বাচ্য[২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! পূর্ব্বকালে মহাদেব ভৃঙ্গীশ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐ তিন ব্রতের বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন। তৎ শ্রবণে ভৃঙ্গীশ সর্ব্ব ক্লেশ বিমুক্ত হইয়াছিলেন[৩]। শশিকলাধর পূর্ব্ব সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর শৃঙ্গে সপরিবারে অবস্থান করিতে ছিলেন। ভৃঙ্গীশ তৎসকাশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সেই উমাপতিকে বক্ষ্যমান কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন[৪]।

ভৃঙ্গীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! হে পরমেশ্বর! আমি আপনার নিকট যাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছি তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন[৬]। হে নাথ! এই জলতরঙ্গের ন্যায় বিরচিত সংসার দর্শনে আমি মোহগ্রস্ত হইতেছি, শান্তি পাইতেছি না[৭]। আপনি তাহাই আমাকে বিস্তারের সহিত বলুন, যাহাতে এই সংসাররূপ জীর্ণ গৃহে নির্ভয়ে থাকিতে পারি[৮]।

ঈশ্বর বলিলেন, হে অনঘ! তুমি সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মহাভোক্তা মহাকর্ত্তা ও মহাত্যাগী হও[৯]। ভৃঙ্গীশ বলিলেন, হে প্রভো! মহাভোক্তা মহাকর্ত্তা ও মহাত্যাগী কাহাকে বলে, আপনি বিশদরূপে তাহা বলুন[১০]। ঈশ্বর বলিলেন, হে মহাভাগ! যিনি ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম এতদুভয়ে ...ক্তা বির-

হিত হইয়া অর্থাৎ ইহাতে ধর্ম্ম হইবে এবং ইহাতে অধর্ম্ম হইবে এই-রূপ আশঙ্কা পরিত্যাগ: করিয়া কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন তিনিই মহা কর্ত্তা[১১]। রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ফলাকাঙ্খা না করিয়া যিনি নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করেন তিনিই মহাকর্ত্তা[১২]। যিনি মৌনী নিরহঙ্কার, নির্ম্মল চিত্ত এবং বিগত মৎসর এবং যিনি চিন্তা পরিশূন্য তিনিই মহাকর্ত্তা[১৩]। যিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বোধে কুশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া শুভাশুভ কার্য্যাদির বিবেচনা না করিয়া অর্থাৎ এই কার্য্য করিলে ইহাতে ধর্ম্ম হইবে; এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ইহাতে অধর্ম্ম হইবে; এইরূপ আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যাঁহার চিত্ত সতত নির্ম্মল এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল বিষয়ে যিনি লিপ্ত না হন, তিনিই মহা-কর্ত্তা[১৪]। যিনি: সর্ব্ব বিষয়ে বিগত স্নেহ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া সাক্ষির ন্যায় অবস্থান করেন এবং যাঁহার কার্য্য বিষয়ে আশক্তি নাই, তিনি মহাকর্ত্তা[১৫]।

নির্ম্মল বুদ্ধির দ্বারা উদ্বেগ ও আনন্দ রহিত হইয়া যিনি দুঃখ বা আনন্দ উপভোগ করেন না তিনিই মহাকর্ত্তা[১৬]। যিনি কালভোগানু-সারে অনাসক্ত হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যানুসারে অবস্থান করেন তিনিই মহাভোক্তা[১৭]। যিনি উদাসীন হইয়া কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন এবং যিনি উভয়বিধ কার্য্যা-কার্য্যের সমভাব প্রদর্শন করেন তিনিই মহাকর্ত্তা[১৮]। যিনি স্বভাবত স্থির এবং সমভাব করণ পরিত্যাগ করেন না, যিনি শুভাশুভ কার্য্যা-দির অনুষ্ঠান করিয়া ফল নিবন্ধন উৎকণ্ঠিত হন না তিনিই মহা-কর্ত্তা[১৯]। জন্ম, স্থিতি এবং বিনাশ উদয় এবং অস্ত অর্থাৎ বৃদ্ধি ও সম যাঁহার নিকট একই বলিয়া প্রতীত হয় তিনিই মহাকর্ত্তা[২০]। যিনি কোন বিষয়েই দ্বেষ করেন না অথবা কোন বস্তুতেই যাঁহার স্পৃহা নাই এবং যিনি প্রারব্ধ উপস্থিত পদার্থ ভোগ করিয়া থাকেন তিনিই মহা ভোক্তা[২১]। যিনি কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না, দান করিয়া দানের ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না, ভোগ করিয়া ও ভোগ নিমিত্ত ব্যাকুলতা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিই মহা ভোক্তা[২২]। যিনি অখিন্নকামী হইয়া সাক্ষির ন্যায় লোক ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং বিগতস্পৃহা হইয়া ভোগ করেন তিনিই মহা ভোক্তা[২৩]।

যিনি সুখ ও দুঃখজনক ক্রিয়াদির লাভ বা ব্যয় নিবন্ধন উৎকণ্ঠিত হন না তিনিই মহা ভোক্তা[২০]। জরা মরণ আপদ ও রাজ্যাদি এবং দরিদ্রতা এ সমুদায় যিনি রমণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন অর্থাৎ রাজ্য প্রাপ্তিনিবন্ধন অতিশয় আনন্দ অথবা দুঃখ দরিদ্রতা নিবন্ধন কষ্ট ভোগ না করেন তিনিই মহা ভোক্তা[২৫]। সাগরে জল যেন সতত সমভাবে অবস্থিতি করে সেইরূপ যিনি সুখ ও দুঃখকে সমভাবে দর্শন করেন তিনিই মহা ভোক্তা[২৬]। চন্দ্র প্রতিবিম্বের ন্যায় যাঁহার অহিংসা তুষ্টি সমতা সঞ্জাত হইয়া ও অসঞ্জাত হইয়া অবস্থিতি করে তিনিই মহা ভোক্তা[২৭]। কটু অম্ল তিক্ত মধুর এবং উত্তম ভোজ্য ও অধম ভোজ্য সকল যিনি তুল্য রূপে ভোজন করেন তিনিই মহা ভোক্তা[২৮]। হে সৌম্য! যিনি সরস ও নীরস পদার্থে আনন্দ দায়ক ও দুঃখদায়ক উভয় বিধ পদার্থে যিনি সম প্রদর্শন করেন তিনি মহা ভোক্তা[২৯]। শর্করা নির্ম্মিত খাদ্য দ্রব্যে এবং শুভ ও অশুভ উভয় বিধ দ্রব্যেই যিনি সর্ব্বদা সমভাব প্রদর্শন করেন তিনিই মহা ভোক্তা[৩০]। ইহা ভোজ্য ইহা অভোজ্য ইত্যাকার বিকল্প বা দ্বৈধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া যিনি স্পৃহা বিবর্জ্জিত হইয়া ভোগ করেন তিনিই মহা ভোক্তা[৩১]। যিনি তুল্য বুদ্ধির দ্বারা আপদ, সম্পদ, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, একরূপ বিবেচনা করেন তিনিই মহা ভোক্তা[৩২]। সম বুদ্ধি দ্বারা যিনি ধর্ম্ম অধর্ম্ম সুখ ও দুঃখ এবং মরণ ও জন্ম এ সকল মিথ্যা প্রপঞ্চ মাত্র। এইরূপ অনুভব করিয়া যিনি এই সকলে বিগতস্পৃহ হন তিনিই মহাত্যাগী[৩৩]। যিনি সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা, সর্ব্ববিধ শঙ্কা এবং সর্ব্বপ্রকার কায়িক বাচনিক এবং মানসিক চেষ্টা এবং সর্ব্বপ্রকার নিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিই মহাত্যাগী[৩৪]। দেহাদির সত্যতা নিবন্ধন যিনি দুঃখভোগ দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করেন না, ইন্দ্রিয়াদির স্থিতি নিবন্ধন যিনি মনের চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা পরিচালন হইলেও যিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন তিনিই মহাত্যাগী[৩৫]। ইহা আমার কেহ নহে এবং আমার জন্ম বা মৃত্যু নাই এবং কর্ম্মে বা অকর্ম্মে আমার কোন অস্তিত্ব নাই, এইরূপ যিনি অনুভব করেন তিনিই মহাত্যাগী[৩৬]। যাহাতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম হয়, যাহাতে দুঃখ বা সুখ হয়, যিনি এই সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ

করেন তিনিই মহাত্যাগী[৩৭]। যিনি সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা এই সকল দৃশ্য বস্তুর বশীভূততা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাত্যাগী হইয়াছেন[৩৮]।

হে অনঘ! রামচন্দ্র পূর্ব্বকালে দেব দেব ঈশ্বর ভৃঙ্গীশকে এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন অতএব তুমি এই প্রকার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বিগত সন্তাপ হও[৩৯]। সর্ব্বদা সত্য নিয়ত অবস্থিত বিমলরূপ আদ্যন্ত রহিত ব্রহ্মই নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরঞ্জন সাশ্বতনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া বিমল শান্তি প্রাপ্ত হও[৪০]।

হে অঙ্গ! এই সংসারে যে কিছু বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত বস্তুতেই আজন্মাবধি সর্ব্বকার্য্যের বীজভূত আদ্যন্তরহিত স্বয়ং জন্মাদিবিকার রহিত পরমাত্মা রূপী ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিও না এবং সেই ব্রহ্মই সর্ব্বভাব বিকল্পিত হইলেও নিরন্তর আকাশের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। মেঘ সকল যেমন আকাশে উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশ তাহাতে যেমন সংসক্ত থাকে না তদ্রূপ ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুতে থাকিয়াও দর্পণ প্রতিবিম্বের ন্যায় অসংসক্ত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন[৪১]।

হে সাধো! ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, যদি কিছু থাকে তবে তাহা সৎ হইলেও অসৎ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সমস্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ কর[৪২]। হে সাধো! যদি তুমি অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর তবে তুমি কখনও খেদ প্রাপ্ত হইবে না[৪৩]।

পঞ্চদশশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্দশশততম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ! অহঙ্কার নামক গলিত বা গলচ্চিত্তে মনের স্বরূপ কি প্রকার হয়, তাহা বলুন[১]। বশিষ্ঠ

বলিলেন, জল যেমন সরোরুহে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পরকর্তৃক সম্পাদিত লোভ মোহাদি দোষ সকল নির্ম্মল মনে লিপ্ত হয় না[২]। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিষাদ হেতু পাপ সকল ভস্মীভূত হইলে মুদিতাদি শোভা কখনই ত্যাগ করে না[৩]। সকল বাসনাগ্রন্থিই ছিন্ন হয়। ক্রোধ, মদ, মোহাদিও নষ্ট হয়, কাম ও লোভ দূরে পলায়ন করে। ইন্দ্রিয়গণ উচ্চ উল্লাস পরিত্যাগ করে, খেদ ও স্ফূর্ত্তি পায় না। দুঃখ বৃদ্ধি পায় না, সুখও সঞ্চরণ করে না। এক মাত্র নির্ম্মল সুশীতল সমতাই হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকে[৪।৫।৬]। যদিও কখন সাধুদিগের বদনে সুখ দুঃখাদির চিহ্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তুচ্ছত্ব নিবন্ধন সুখ দুঃখাদি তাঁহাদের মনে লিপ্ত হয় না[৭]। দেবগণও স্পৃহনীয় বস্তুর স্পৃহা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের নির্ম্মল সুশীতল সমতা সর্ব্বদাই হৃদয়ে উদিত থাকে[৮]। অপরের অনিষ্ট নাহয় এইরূপ কমনীয় শান্তিই সেব্য, দেবগণ ঐ শান্তিই বহন করিয়া থাকেন[৯]। সাধুগণের এই সংস্থিতি বিভ্রম, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্রের দ্বারা বিচিত্র ও বিষম হইলেও সুখকর বা দুঃখকর হয় না[১০]। জ্ঞানালোকের দ্বারা লভ্য নিরাপদ ব্রহ্ম বস্তুতে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত না হয়, সেই নরাধমের জীবনে ধিক্[১১]।

হে রাম! দুঃখ রত্নের আকর জন্ম মৃত্যুরূপ সাগর পারেচ্ছুক পুরুষের মধ্যে নিরতিশয় পরমাত্মাতে চির বিশ্রান্তি লাভের অধিকারী আমি হইতে পারিব না। এই জগৎ বা কিরূপ পদার্থ, পরমাত্ম তত্ত্বই বা কি, তুচ্ছ ভোগবাসনাই বা কি, চিরাভ্যস্ত বৈরাগ্যময়ী বুদ্ধিই এক মাত্র আত্মতত্ত্ব লাভের উপায়। তুমি এইরূপ বুদ্ধিকে আশ্রয় কর[১২]।

ষোড়শশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশশততম সর্গ।

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন। হে রামচন্দ্র! তোমাদের আদিপুরুষ ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা ছিলেন, তুমি সেই ইক্ষ্বাকু রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর[১]। মহারাজা ইক্ষ্বাকু নিজ রাজ্য পালন করিতে

করিতে একদা একান্তে অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন[২]। এই জরা, মরণ, সুখ, দুঃখময় দৃশ্য প্রপঞ্চের কারণ কি?[৩]। তিনি এই জগতের বিষয় কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া এক দিন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় নিজপিতা মনুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া চরণ বন্দনা পূর্ব্বক ইক্ষ্বাকু বলিতে লাগিলেন, হে করুণা নিধে! আমি ধৃষ্টতায় পরিচালিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি[৪]। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই জগতের বীজ কি তাহা বলুন। এই জগৎ কাহা হইতে উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা উৎপন্ন হইল এবং আমরা কেনই বা ইহাতে মোহিত হই তাহা কীর্ত্তন করুন[৫।৭]। পক্ষী সকল বাওয়া হইতে যেরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে সেইরূপ আমাদের কিরূপে এই সংসার জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি তাহার উপায় বলুন[৮]। মনু বলিতে লাগিলেন, তুমি অতি অনাময় প্রশ্ন করিয়াছ এই জগৎ যাহা কিছু দেখিতেছ প্রত্যুত ইহা কিছুই নহে[৯]। হে নৃপতে! তোমাকে অধিক কি বলিব এই যে সকল দৃশ্য পদার্থ দেখিতেছ স্বপ্নাবস্থায় গন্ধর্ব্বনগর সৃষ্টি এবং মরুপ্রদেশে বারিসন্দর্শনের ন্যায় ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিও[১০]। যদ্যপি ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অতীত মনকে পদার্থ বলিয়া মনে কর কিন্তু তাহাও কিছুই নহে এইরূপ অনুমান করিও। যাহার ধ্বংশ নাই সেই পদার্থ জগতে সদাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে[১১]। যেরূপ মহাদর্শে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে সেইরূপ, হে রাজন্! এই যে পরিদৃশ্যমান সর্গ পরম্পরা বিরাজিত রহিয়াছে ইহারা উক্ত সদাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত করে, এবং তাহাতেই উহাদের অনুভব হইয়া থাকে[১২]। ব্রহ্মের যে চৈতন্যময় স্ফুরণ শক্তি তাহা স্বভাবানুসারে কতক ব্রহ্মাণ্ড এবং কতকাংশ জীবাদি রূপে পরিণত হইয়া থাকে[১৩]। অন্য শক্তি অন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এইরূপে জগতের স্থিতি হইয়া থাকে জানিও সংসারে বন্ধ বা মোক্ষ কোন পদার্থ নাই, তবে কেবল একমাত্র নিরাময় ব্রহ্ম সতত বিরাজমান রহিয়াছেন। একও নাই দুইও নাই তিনিই কেবল সার পদার্থ[১৪]। তরঙ্গ ভঙ্গ দ্বারা জল যেমন নানা হয় বস্তুত জল একমাত্র সেইরূপ এক ব্রহ্ম নানারূপ ভেদ ঘটাইয়া নানাত্ব রূপে কল্পিত হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে অতএব হে মহারাজ

তুমি দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভবভয় বারণ অভয় ব্রহ্মপদ চিন্তা কর[১৫]।

সপ্তদশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোত্তরশততম সর্গ।

মহাত্মা মনু বলিতে লাগিলেন, হে ভূমিপ! জলের ন্যায় চৈতন্য মাত্রের উদয় হইলে সংস্কারাদির বিচিত্রতা হেতু জীব অন্তঃকরণের দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার অনুভব করিয়া থাকে[১]। জীবগণ এই জগতে পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া থাকে, সুখ, দুঃখ, মায়া, মোহ সকলই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে[২]। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে কাল যাপন করে, সেইরূপ অনুভব দ্বারা আত্মার দর্শন লাভ হইয়া থাকে[৩]। শাস্ত্র অথবা গুরু দ্বারা পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয় না, স্বত্ব বুদ্ধির উদয় হইলে নিজেই পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া থাকে[৪]। রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ নির্লিপ্ত পথিকের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে[৫]। ইহাদিগের প্রতি আদর প্রদর্শন করিতে নাই, বরং অনাদর করিতে হয়, (অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত।) উদাসীনের ন্যায় সহাস্য মুখে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য[৬]। উদাসীনের ন্যায় দৃঢ় হইবে, দেহাদির প্রতি মমতা বিসর্জ্জন করিবে এবং অন্তঃকরণের স্থিরীকরণ সম্পাদন দ্বারা সর্ব্বদা আত্মময় হইবে[৭]।

এই দেহই আমি এই প্রকার বুদ্ধিই সংসারের বন্ধন প্রযোজিকা। মুমুক্ষুগণ এইরূপ বুদ্ধি কখনও গ্রহণ করেন না[৮]। আমি গগনাপেক্ষা সূক্ষ্ম চিন্মাত্র স্বরূপ এই প্রকার যে স্থিরনিশ্চয়, সংসার বন্ধনের কারণ হয় না[৯]।

সুবর্ণ হইতে যেরূপ অঙ্গদাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত বস্তুই আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়[১০।১১]। মহাসমুদ্রে বাড়বানল থাকে এই নিমিত্ত ইহা ভীমদর্শন, সেইরূপ মায়াময় ভাব জগতে ভূতাদিও সংসারের তরঙ্গের মত দর্শন করিয়া থাকে[১২]। কালসমুদ্রে একজন নিয়ন্তা আছেন,

হে রাজন! সেই নিয়ন্তা আত্মাকে অগস্ত্য বলিয়া মনে করিও[১৩]। এই দেহাদিতেও সেই আত্মায় অবস্থান আছে, ইহা জানিয়া তুমি আত্মময় হইয়া অবস্থান কর[১৪]। কুক্ষি মধ্যে সুপ্ত সন্তানকে বিহ্বল করিয়া জননী যেমন পরিতাপ করেন, সেইরূপ যিনি আত্মদর্শন লাভ করেন নাই, তিনিও তদ্রূপ রোদন করিয়া থাকেন[১৫]। আত্মাকে অজর ও অমর জানিতে না পারিলেই দুঃখিত হইয়া থাকে। আমি হত হইলাম, আমি অনাথ হইয়াছি, ইত্যাদি ভাব বিলাপ জনক অনাজ্ঞ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে[১৬]। জলের পরিস্পন্দন নিমিত্ত তরঙ্গ নানা আকারে হইয়া থাকে, সেইরূপ সঙ্কল্প নিবন্ধন বদ্ধ হইয়া জীব সকল রোদন করে। হে মহারাজ! তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় ভাবনা দ্বারা সুস্থ-চিত্ত হইয়া কাল যাপন কর[১৭,১৮]।

অষ্টাদশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

একোনবিংশোত্তরশততম সর্গ।

—)০()—

মনু বলিতে লাগিলেন, বালকগণ যেমন কোন্ প্রকার উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রেরিত না হইয়া নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে, তদ্রূপ ভগবান স্পন্দন দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং সংহারাত্মক শক্তির দ্বারা সর্গাদি নাশ করেন এবং নিজেই তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট থাকেন[১]। অজ্ঞান-মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি মায়াবশে এই জগত নিরীক্ষণ করিয়া সুখ ও দুঃখ নিমিত্তক আহ্লাদ ও শোক অনুভব করিয়া থাকে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্তই আত্মময় বিবেচনা করিয়া দুঃখিত বা সুখে উদ্বেলিত হয়েন না। এই নিমিত্ত যাহাদিগের রাগ ও মোহ নষ্ট হয় নাই, তাহারা স্বকীয় শক্তি দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে যাহারা বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ইহাতে লিপ্ত হয় না[২]। প্রভাসমূহের প্রভেদ বশতঃ চন্দ্রাদির যেমন বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, সেইরূপ জগতের বৈচিত্র্য নিবন্ধন তত্তৎ বিষয়ে বুদ্ধির বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। বৃক্ষের পত্রসমূহ ও নির্ঝরিণীর জলকণা

বস্তুতঃ তত্তৎ পদার্থ হইতে পৃথক নহে[৩]। সেইরূপ ভ্রম জ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মে জগৎ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে এবং অজ্ঞান নিবন্ধন তাহাতেই দুঃখের উদয় হইয়া থাকে[৪]। মায়ার কি আশ্চর্য্য বিশ্ব বিমোহিনী শক্তি! সর্ব্বত্র আত্মা বিরাজিত হইলেও আত্মা আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না[৫]। জগতে চিত্তময় ভাবনা দ্বারা যিনি বিরাজমান আছেন, তিনিই শান্তিসুখ উপভোগ করেন[৬]। অহম্ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সমস্তই শূন্যময়, কেবল একমাত্র ব্রহ্ম সতত সত্য রূপে বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে[৭]। ইহা রমণীয় অথবা সুখপ্রদ নহে, এই দুঃখদায়ক এই প্রকার ভাবনাই দুঃখময়, সাম্যবুদ্ধি দ্বারা এতদুভয় দগ্ধ করিয়া সর্ব্বদা সুখী হও[৮]। হে রাজন্! অভাব রূপ অস্ত্র দ্বারা রম্যারম্য বিভাগ করিবে অর্থাৎ রমণীয় বলিয়া ও কোন পদার্থ নাই, সন্তাপ বলিয়াও কোন পদার্থ নাই, কেবল মাত্র অতিশয়িত পুরুষকার দ্বারা স্থিরভাবে অবস্থান কর[৯]। অভাব দ্বারা কর্ম্মাদির ভাবনা করিয়া অপগত শোক হইয়া কালযাপন কর। অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য শোক বা দুঃখে অভিভূত হইও না[১০]। বিবেকরূপ সমাধি দ্বারা বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া পরমানন্দের রসাস্বাদন পুরঃসর চিরশান্তি লাভ কর[১১]।

একোনবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

বিংশোত্তরশততম সর্গ।

———*———

মনু বলিতে লাগিলেন, শাস্ত্র ও সজ্জন ব্যক্তির সমাগম দ্বারা প্রথমত প্রজ্ঞা শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যোগিগণের যোগমার্গের ইহাই প্রথম সোপান[১]। বিচার শক্তি ইহার দ্বিতীয় মার্গ, সম্ভাবনা তৃতীয় সোপান, বাসনা নাশাত্মিকা বিলাপনী, ইহার চতুর্থ সোপান, শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ আনন্দময়, পঞ্চম সোপান অর্দ্ধ সুপ্ত ও অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় অব-

স্থান কর[২।৩]। ব্রহ্মা কারাত্মিকা সম্ভাবনা অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, এই প্রকার ভাবনা করা ষষ্ঠ ভূমিকা। আনন্দময় সুষুপ্ত অবস্থা সপ্তম অবস্থা, ইহাই তুর্য্যাবস্থা মুক্তির হেতু, সমতা সচ্ছতা সৌম্যভাব ইহাতেই প্রকটিত হইয়া থাকে[৪।৫]। তুর্য্য অবস্থার পর যে অবস্থা, তাহাই নির্ব্বাণরূপিণী, তাহাই সপ্তমী ভূমিকার প্রোক্তাবস্থা[৬]। ইহাতেই পূর্ব্বাবস্থাত্রয় জাগ্রত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, চতুর্থী স্বপ্নাবস্থা জগৎ স্বপ্নময়। পরমানন্দ স্বরূপত্ব প্রতীত হইলে সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়[৭।৮]। অসংবেনরূপই (কোন বাহ্য বিষয় চিন্তা না করাই) ভূমিকা। তুর্য্যাতীত অবস্থাই সপ্তমাবস্থা অপেক্ষাও উত্তম, তাহা মন ও বাক্যের অগোচর[৯]। মহা সমতা দ্বারা চেত্য এবং চিত্ত বিভাবনা হইয়া থাকে, ইহাই মুক্তি[১০।১১]। যখন মরণ জীবন ইত্যাদি বোধ হইবে না, তখন আত্মারাম হইবে[১২]। ব্যবহারে উপশান্ততা নিবন্ধন গৃহস্থই হউন বা পথিকই হউন আমি কিছুই নই, জীব এই প্রকার অনুভব দ্বারা শোক প্রাপ্ত হন না[১৩]। আমি অজর অমল শান্ত বাসনা রহিত নির্ম্মল, এই প্রকার ভাবনা দ্বারা জীব শোক অনুভব করেন না[১৪]। আমি আদ্যন্ত রহিত অজর ও অমর এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা জীব শোক প্রাপ্ত হন না[১৫]। তৃণাগ্রে আকাশে সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বত্রই আমি বর্ত্তমান আছি, এই প্রকার অনুভব করিয়া জীব শোকাচ্ছন্ন হন না[১৬]। যিনি চতুর্দ্দিকস্থ যজ্জাবতীয় বস্তুতে নিজের ব্যাপকতা লক্ষ্য করেন অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই আপনা হইতে অপৃথক্ প্রত্যেক বস্তুতেই নিজের সত্তা অনুভব করেন, অনন্ত বিলাসা শ্রয় সেই মহাত্মা ব্যক্তির ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ তিনি নিজের অমরত্ব দর্শন করেন[১৭]। যিনি কামনার দ্বারা বদ্ধ হন, তিনি আপাত রমণীয় সুখজনক বস্তুর সেবা করেন, যে বস্তু সুখের নিমিত্ত প্রতীত হয়, তাঁহার পক্ষে সেই দ্রব্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের কারণ হইয়া থাকে[১৮]। সুখ ও দুঃখের অবিনাভাবই অর্থাৎ সহাবস্থিতি নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে, যাঁহার বাসনা অল্প তিনি বাসনা বিহীন হইয়া দ্রব্যাদির সেবা করেন[১৯]। হে অনঘ! ইহা সুখের জন্যও নহে এবং দুঃখের জন্যও নহে, এইরূপ ভাবে ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলে, সুখ বা দুঃখের কারণ হয় না[২০]। দগ্ধবীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কারণ

রূপে কল্পিত হইয়া থাকে[২১]। হে অঙ্গ! সর্ব্ব প্রকার ভাব হইতে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ভাব হইতে নির্গত অহংভাব পরিত্যাগ করিলে একই কর্ত্তা ও একই ভোক্তার অনুভূতি হইয়া থাকে[২২]। তাঁহার পক্ষে শশাঙ্কের শীতলতা এবং রবিমণ্ডলের উষ্ণতা একই রূপ অনুমিত হয়, ক্রিয়মাণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মও একরূপ বোধ হয়[২৩]। কর্ম্ম সকল কালে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের ধ্বংশ হয় না[২৪]। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ধান্য যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গে উপস্থিত হইলে দিন দিন জ্ঞান কার্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৫]। যেমন সরোবরে ও সমুদ্রে একই জলের স্বচ্ছতা অনুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত মায়িক দ্রব্যে অভেদ জ্ঞান দ্বারা অনন্ত বিশ্বরূপ এক আত্মারই স্বরূপতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাৎপর্য্য এই যে, আধার ভেদে জলের উপাধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জল একই প্রকার থাকে, সেইরূপ হে অঙ্গ! এই নিখিল জগৎ ভ্রম জ্ঞান দ্বারা উপাধি বৈচিত্র্য দ্বারা ভিন্নভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা অমুক, ইহা অমুক নহে ইত্যাকার ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের তিরোধান হইলে একমাত্র আত্মারই অভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে[২৬]।

বিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশোত্তরশততম সর্গ।

——()•()——

মনু বলিতে লাগিলেন, যতক্ষণ বিষয় ভোগের আশা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার জীব আখ্যা হইয়া থাকে, এই প্রকার বিষয়ভোগাশা অবিবেক নিবন্ধন হইয়া থাকে, বাস্তবিক এই প্রকার আশা হইতে পারে না[১]। বিবেকের উদয় হইলে বিষয় ভোগের আশা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই সময়ে আত্মার জীবত্বোপাধি নষ্ট হইয়া অনাময় ব্রহ্মসংজ্ঞক হইয়া থাকে[২]। বিষয় ভোগাশা হইলে যে চিন্তা দ্বারা অঘটে

ঘটভাব হইয়া থাকে, এরূপ চিন্তায় চিন্তিত হইও না, এইরূপ চিন্তার দ্বারা উর্দ্ধ হইতে অধঃ এবং তথা হইতে আরও অধঃ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা না হইলে পুনরূর্দ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩]। ইহা আমার, আমি ইহার, এই প্রকার ব্যবহার ভ্রম জ্ঞানাধীন, যাহারা এই প্রকার মোহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৪]। আমি ইহার, ইহা সেই, এই প্রকার মোহ বুদ্ধির অপনোদন হইলে উর্দ্ধ হইতেও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৫]। হে নৃপ! এই জগৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপ, আত্মা হইতে অভিন্ন এবং চিদাকাশ স্বরূপ অবলোকন করুন[৬]। যখন চিত্তের এই প্রকার অবস্থা হয়, তখনই আত্মার পরমেশ্বরত্ব উপনীত হইয়া থাকে[৭]। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ যাহা করিতে পারেন, আমিও সেই সকল সম্পন্ন করিতে পারি, এই প্রকার অনুমান করিবে[৮]। শাস্ত্রে যেখানে যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, হে অঙ্গ! সে সকলই সত্য[৯]। চিন্মাত্রত্ব লাভ হইলে তিনি পরমানন্দের উপভোগ করিয়া থাকেন তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না[১০]। অশূন্যও কিছুই নাই এবং শূন্যও কিছু নাই, রূপও নাই চিন্ময়ও নাই। আত্মার রূপও নাই এবং অন্য রূপও নাই, এইরূপ ভাবনা করুন[১১]। ইহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে প্রকৃতি স্বাভাবিকাত্মরূপতা শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন দেশ বা মোক্ষকাল বা স্থিতি বলিয়া কোন বিষয়ের সত্তা অনুভব হয় না[১২]। অহংভাব অপগত হইলে মোহ ক্ষয় হইয়া থাকে, প্রকৃতির অপর নাম ভাবনা, মোক্ষও ভাবনাত্মক[১৩]। শাস্ত্রার্থ বিচার লৌকিক বিচার পরিশূন্য এবং বিকল্পাদি রহিত হইয়া বিশ্বাত্মক হইয়া নিয়ত সুখে অবস্থান করুন[১৪]।

একবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোত্তরশততম সর্গ।

—()○()—

মনু বলিতে লাগিলেন, যাহার আত্ম পর ভিন্নভাব নাই, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, শয়নাশয়নে ভেদ জ্ঞান নাই, তিনিই সম্রাটের ন্যায় অবস্থান করেন[১]। কেশরী যেমন পঞ্জর হইতে নির্গত হয়, তিনিও সেই প্রকার ঘন ধর্ম্মাশ্রম আশ্রমাচার শাস্ত্রীয় নিয়ম হইতে বহির্গত হইয়া সংসার জ্বালা হইতে দূরে অবস্থান করেন[২]। শরৎ কালের নভোমণ্ডল যেমন মেঘ নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তিনিও বাক্যের অতীত বিষয় ও বিষয়াশা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন[৩]। পর্ব্বত প্রদেশে প্রসন্ন গম্ভীর হ্রদের ন্যায় পরানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষুব্ধ ভাবে আত্মায় অবস্থিতি করেন[৪]। যিনি সকল কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করেন এবং নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয়, তিনি পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হন না[৫]। স্ফটিকের প্রতিবিম্বের ন্যায় আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন[৬]। জনতাবৃন্দে অবস্থিত হইয়া দেহাদির কর্ত্তন বা পূজন নিবন্ধন খেদ বা হর্ষের দ্বারা অভিভূত হন না[৭]। নিন্দোত্র নির্ব্বিকার পূজ্য ও পূজা বিবর্জ্জিত, সংযোগ বা বিয়োগ দ্বারাও তিনি উদ্বেজিত হন না[৮]। রাগ দ্বেষ ভয় ও আনন্দ দ্বারা লোক সকল বা তিনি লোকের দ্বারা উদ্বেজিত হন না অর্থাৎ সাংসারিক লোকের কোন কার্য্যেই তিনি বিরক্ত হন না, এবং তাঁহার কৃতকার্য্যেও কেহ বিরক্ত হয় না[৯]। কোন বস্তু মধ্যে গণ্য হন না। প্রমেয় বিষয়ে অন্তর্ভাব প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধ চিত্ততা নিবন্ধন তাঁহাতে পরিচ্ছিন্ন করিতেও কেহ শক্ত হন না[১০]। তীর্থ স্থানে দেহাদি ত্যাগ বা গৃহে দেহত্যাগ করিলেও তাহার সমভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে[১১]। জ্ঞানমার্গ প্রাপ্ত হইলে বিগতাশয় হইয়া মুক্তি পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অহং ভাব বন্ধের কারণ, মোক্ষ জ্ঞান দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে[১২]। তিনি পূজনীয়, তিনি স্তুত্য এবং যত্ন তিশয়ে নমস্কার্য্য। বিভূতি বিভব দ্বারা যিনি পরিপুষ্ট হন, তিনিই

নিরীক্ষণীয়[১৪]। হে অঙ্গ! বাসনাব্যাধি হইতে দূরে অবস্থান করেন, এই প্রকার বাসনা বিহীন জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের পূজার দ্বারা যে পদ লাভ হইয়া থাকে, যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতির দ্বারা সে পদ লাভ করিতে পারা যায় না[১৪]।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ মনু এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্মগৃহে গমন করিলেন, এবং ইক্ষ্বাকুও সেই দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হইলেন[১৫]।

দ্বাবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোত্তরশততম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তবে অপূর্ব্বাতিশয় কি হয় তাহা বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, নিত্য তৃপ্ত প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি আত্মাতেই উপরমিত হন[২]। মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, তন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা আকাশ গমনাদি অনুষ্ঠিত হইলে অপূর্ব্বের প্রয়োজন হয় না[৩]। যদিও মন্ত্র সিদ্ধির দ্বারা অনিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেও অপূর্ব্বের প্রয়োজন হইয়া থাকে[৪]। তত্ত্ববিদ্গণ মন্ত্রসিদ্ধি ও অপূর্ব্বের মধ্যে অপূর্ব্বের আতিশয্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কারণ সর্ব্বাবস্থাতেই মনের বিরাগত্ব ও অমলত্ব লাভ হইয়া থাকে, এবং ইহা বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না[৫]। চিরভ্রম নিবৃত্তি নির্ব্বিঘ্নন পরমানন্দ প্রাপ্ত, অলিঙ্গ-মূর্ত্তি, (উপাধি শূন্য) তত্ত্ববিৎ পুরুষেরও ইহাই লিঙ্গ বা চিহ্ন যে ইহাতে শান্তভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এবং ইহার কামাদি বাসনাসমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়[৬]।

ত্রয়োবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোত্তরশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অপরাপর সিদ্ধিলাভ অপেক্ষা আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষই নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়া থাকে এবং ব্রহ্ম স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেই আত্মার নিরতিশয় আনন্দ লাভ হয় অন্যথা আত্মার অনুৎকর্ষই হইয়া থাকে, যেমন কোন ব্রাহ্মণ স্বীয় সাত্ত্বিকভাব উপেক্ষা করিয়া কোন শূদ্রার উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বর জীবত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন[১]। ভূত সকল দ্বিবিধ, এক প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ নিষ্কারণ হইতে সমুৎপন্ন তাহাই কর্ম্মাদি নিরপেক্ষ হওয়ায় বলিয়া উক্ত হয়[২]। ঈশ্বর হইতে আগত হইয়া জীব সকল নিজ কর্ম্মের দ্বারা পুনর্ব্বার জন্ম ও মরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩]। জন্ম ও কর্ম্মের এইরূপ কার্য্য কারণ ভাব প্রসিদ্ধ। জীব সকল পরমপদ পরমেশ্বর হইতে আপনাপনিই নিঃসৃত হইয়া থাকে[৪]। পশ্চাৎ তাহাদের স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলই সুখ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে এবং আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সঙ্কল্পই কর্ম্মের কারণ[৫]। সঙ্কল্পই বন্ধের কারণ, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে, মোক্ষপদার্থ নিঃসঙ্কল্পিত, অতএব তাহার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ যত্নপরায়ণ হইবে[৬]। গ্রাহ্য ও গ্রাহকের ভ্রম বশতঃ অর্থাৎ গ্রাহকের গ্রাহ্য পদার্থে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা নিবন্ধন অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি হইলে সঙ্কল্প দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব তাহা হইতে সাবধান হইবে[৭]। গ্রাহ্য গ্রাহকভাব লিপ্ত হইবে না, সমস্ত ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া তন্ময়তা অবলম্বন করিবে[৮]। জীব সর্ব্বদা সঙ্কল্পযুক্ত হইলে তাহাতেই বদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং বৈরাগ্যের উদয় হয় না, অতএব অনুরাগ দ্বারা বদ্ধ হইও না[৯]। যাহা দ্বারা অনুরাগ জন্মে, তাহাতেই বদ্ধ হইয়া থাকে, আর যাহাতে অনুরাগ না হয়, জীব তাহাতেই মুক্ত হইয়া থাকে[১০]। এই নিমিত্ত সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরাগ হও[১১]। যাহা করিবে, যাহা আহার করিবে, যাহা হোম করিবে, যাহা দান করিবে, তাহার কর্ত্তা বা ভোক্তা হইবে না।

তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শমতা লাভ করিবে[১২]। সাধু সকল অতীত কার্য্যের নিমিত্ত শোক করেন না, ভবিষ্যতের নিমিত্তও চিন্তা করেন না, বর্ত্তমানই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ কর্ম্মের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা অচিন্তিত[১৩]। তৃষ্ণা, মোহ, মদাদি মনেরই ভাব, অর্থাৎ মনেই ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, হে রামচন্দ্র! তুমি মনের দ্বারাই সে সকলের ছেদন করিবে[১৪]। লৌহের দ্বারা যেমন লৌহ ছেদন করা যায়, সেইরূপ তীব্র বিবেক শক্তি দ্বারা মনের বাসনা সকল ছেদন করিবে[১৫]। পণ্ডিতগণ মনের দ্বারাই মনের ক্ষালন করিয়া থাকেন, কারণ বিষের দ্বারাই বিষাপনোদন হইয়া থাকে[১৬]। স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরভেদে জীবের তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যাহা পররূপ, তাহারই ভজনা করিবে, অপর দুই মূর্ত্তি ত্যাগ করিবে[১৭]। হস্ত পদাদি বিশিষ্ট এই দেহ ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে, ভোগের নিমিত্ত যে দেহ, তাহা স্থূল দেহ[১৮]। সঙ্কল্পাত্মক ও ভাবি সংসার কারণ যে, চিত্ত স্বরূপ, তাহাই সূক্ষ্ম আতিবাহিক রূপ[১৯]। এবং আদ্যন্ত রহিত সত্য ও চিন্মাত্র নির্ব্বিকল্প রূপই তৃতীয় রূপ, ইহারই স্বরূপতা উপলব্ধি করিবে[২০]। ইহাই তুরীয় রূপ এবং শুদ্ধ, ইহাতেই বদ্ধপদ হইবে। পূর্ব্ব দুই রূপ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই মতি স্থির রাখিবে[২১]।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে মুনিনায়ক! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তাবস্থায় অলক্ষিত তুরীয়-রূপের বিশেষ কি, তাহা বলুন[২২]। বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া যাহা সৎ, তাহাই তুরীয় মূর্ত্তি[২৩]। যাহা স্বচ্ছ, শম এবং শান্ত, তাহাই জীবন্মুক্ত এবং তাহাই সাক্ষী অর্থাৎ উদাসীনের ন্যায় তুরীয় মূর্ত্তি[২৪]। ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তাবস্থায় কিংবা সঙ্কল্পের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না[২৫]। প্রবুদ্ধগণের পক্ষে এই জগৎ যেরূপ, অবুদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে তুরীয় রূপও সেই প্রকার[২৬]। অহংভাব পরিত্যাগ করিলে সমতার উদ্ভব হইলে উক্ত তুরীয় মূর্ত্তির বিকাশ হইয়া থাকে[২৭]। হে বিবুধোপম! এই সম্বন্ধে তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর[২৮]। এক কানন প্রদেশে মহামৌন (সর্ব্ব চেষ্টা রহিত) এক ব্যক্তি অবস্থান করিতে ছিলেন, এক লুব্ধক (ব্যাধ) সেই মুনিকে পলায়িত মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন[২৯]। হে মুনিবর! আমার বাণবিদ্ধ মৃগ কোন দিকে গমন করিল, তাহা

বলুন[৩০]। মুনি বলিলেন, মৃগ কোন দিকে গমন করিল? আমার বনবাসী এবং সকলের প্রতি সমশীল[৩১]। ব্যবহারক্ষম অহঙ্কার আমাদের নাই, মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে[৩২]। অহঙ্কারাতিশয্য বশতঃ কাহারও জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তাবস্থা জানিতে পারিতেছি না[৩৩]। তুরীয়মাত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং তাহাতে দর্শনক্ষমতা নাই। মুনির এই বচন শ্রবণ করিয়া সেই লুব্ধক তাহার অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল। অতএব হে মহাবাহো! তুরীয় মূর্ত্তির অন্য কোন দশা নাই[৩৪।৩৫]। নির্ব্বিকল্প মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, অন্য ভাব ইহাতে নাই, চিত্তের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তাবস্থা ভেদে তিন প্রকার রূপ আছে[৩৬]। ঘোর, শান্ত ও মূঢ়ভাব চিত্তেই অবস্থান করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত চিত্ত ঘোর, জাগ্রৎ, শান্ত ও স্বপ্নময় হইয়া থাকে[৩৭]। আর মূঢ় সুষুপ্তভাব হীন হইলে মৃত হইয়া থাকে। যে চিত্ত মৃত, তাহাতেই সমতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যোগিগণ সেই চিত্ত প্রাপ্তির নিমিত্তই যত্ন করিয়া থাকেন[৩৮]। সমস্ত সঙ্কল্প-বিনাশ মুক্ত হইয়া তুরীয় পদে অবস্থিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ভেদ বুদ্ধি রহিত, মহাত্মা সাধু সকল যে পথে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই মুক্ত হইয়া থাকেন[৩৯]।

চতুর্ব্বিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোত্তরশততম সর্গ।

—•—

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের সকল প্রকার দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলোপনই মুখ্য সিদ্ধান্ত, ইহাতে কোন প্রকার অবিদ্যা বা মায়ার সম্বন্ধ নাই, সমস্তই শান্ত ব্রহ্মময়[১]।

আত্মা অর্থাৎ জীব নিতান্ত নির্ম্মল সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মায় যখন একীভূত হয় তখন তাহার অপর নাম ব্রহ্ম। যাহারা জগতের মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করে তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার কল্পনা আবির্ভূত হয়। কেহ

বলে, শূন্য, কেহ বলে, কেবল বিজ্ঞান, কেহ বলে, ঈশ্বর[৩]। হে অনঘ! তুমি বাদীগণের কল্পনা সমূহ পরিত্যাগ করিয়া মহামৌনী, নির্ব্বাণ, নির্ম্মল, অচিন্ত ও বুদ্ধির অতীত হও[৪]। আপনাতেই দ্বৈত-রহিত তাহারা থাক[৫]। তুমি কার্য্য কর পরন্তু জাগ্রৎ থাকিয়া সুষুপ্তের ন্যায় কার্য্যবান্ হও। অর্থাৎ অন্তরে সর্ব্ব পরিত্যাগী ও বাহিরে (লোকে দৃষ্টিতে) কার্য্যবান্ হও[৬]। চিত্ত থাকাই দুঃখ কারণ, এবং নিশ্চিত্ত অবস্থাই সুখ। অন্তরস্থ চিত্তকে তুমি চিদাত্মায় লীন করিয়া দাও[৭]। যেমন প্রস্তরের রম্য অরম্য (ভাল মন্দ) জ্ঞান শূন্য, সেইরূপ তুমিও রম্য অরম্য জ্ঞান শূন্য হও। ঐরূপ হইতে পারিলে তুমি সংসার জয়ে সমর্থ হইবে[৮]। সুখ অসুখও তদন্তর বুদ্ধি কিছুই অনুভব করিও না, তাহা হইলেই তোমার দুঃখের অন্ত হইবে[৯]। যে ব্যক্তি জগতের সেই মূলতত্ত্ব পরব্রহ্মকে জানে, সেই ব্যক্তিই ত্রিভুবনের যাহা সার তাহা জানে এবং সে ব্যক্তি বাহিরে কর্ম্ম করিলেও অন্তরে কিছু করে না[১০]।

পঞ্চবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশোত্তরশততম সর্গ।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগীদিগের যোগভূমি (যোগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা বা সোপান) সাত প্রকার, যোগীরা সে সকল কিরূপে অভ্যাস করেন, আয়ত্ত করেন, এবং সে সকলের চিহ্ন কি[১]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুরুষ দ্বিবিধা প্রবৃত্তি প্রধান ও নিবৃত্তি প্রধান। প্রবৃত্তির দ্বারা স্বর্গ ও নিবৃত্তির দ্বারা অপবর্গ (মোক্ষ) হইয়া থাকে। উক্ত উভয়ের লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর[২]।

নির্ব্বাণ লাভ কি? সুখ কি? কিছু নহে। এইরূপ ভাবিয়া যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা প্রবৃত্তিপ্রধান[৩]। সংসারটা অসার, ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা, অতএব আমার সংসার উচ্ছেদ প্রাপ্ত হউক, এইরূপ বুদ্ধিতে যে কার্য্য করে, সে নিবৃত্তিপ্রধান। নিবৃত্তিপ্রধান বিবেকী নয় জন্ম জন্মান্তরের অন্তে কদাচিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে[৪।৫]। যাহার অন্তরে তারতম্য রহিত নিষ্ক্রিয় অবস্থাই ভাল, এইরূপ নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে নিবৃত্তি বলা যায়[৬]। কিসে আমি বৈরাগ্য লাভ করিব? সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইব? বুদ্ধি যখন এই চিন্তায় রত হয়, তৎ ভোগের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, দিন দিন শৌচ সন্তোষ ঈশ্বরোপাসনা ও জপাদি কার্য্যে সুখ বুদ্ধি জন্মিতে থাকে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে,[৭।৮] পামর জাগরিত কার্য্য হইতে বিরত হইতে থাকে, পরদোষাদি অন্বেষণে ইচ্ছা জন্মে না, নিরন্তর সৎকার্য্যে রতি ও সৎকার্য্য সেবায় প্রবৃত্তি জন্মে, মনে উদ্বেগের আবির্ভাব হয় না, পাপে ভয় ও ভোগে অনিচ্ছা জন্মে,[৯।১০] স্নেহ ও প্রণয়পূর্ণ মনোরম বাক্য নির্গত হইতে থাকে, তখনই জানিবে, যোগী প্রথম ভূমিকায় আরূঢ় হইয়াছে। এইরূপ প্রথম ভূমিকাস্থ যোগী মনের দ্বারা, শরীরের দ্বারায় ও বাক্যের দ্বারায় সজ্জনের সেবা ও অসতের পরিহার করিতে পারিয়া থাকেন[১১।১২]। ঐরূপ গুণশালী পুরুষ সৎ শাস্ত্রের শ্রবণ মননাদি তৎপর হন ঐরূপ শুভেচ্ছাই যোগের প্রথমা ভূমি। পরে তিনি ক্রমে দ্বিতীয় ভূমিকায় প্রবিষ্ট হইতে থাকেন। দ্বিতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে বিচার অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক উপস্থিত হয়। তখন তিনি শ্রুতি স্মৃতি ও সদাচার নিষ্ঠ হইয়া ধারণা ও ধ্যানাদি কার্য্যে রত হন এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের নিকট হইতে ঐ সকলের তত্ত্ব কথা শুনিতে রত হন[১৩।১৪।১৫]। তখন তিনি কর্ম্মকাণ্ডের রহস্য ও জ্ঞানকাণ্ডের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হন কোন কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাও তিনি স্থির করিতে পারেন[১৬]। অভিহিত অবস্থার যোগী লোক মর্য্যাদার অনুরোধে বাহিরে যৎকিঞ্চিৎ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি প্রকাশ করিলেও অন্তরে সে সকল সর্প নির্মোকের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে[১৭]। এই সকল ব্যক্তি গুরু শাস্ত্রে ও সজ্জনের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আত্মরহস্য বুঝিতে সমর্থ হন[১৮]। পরে তিনি তৃতীয়া যোগ ভূমিকায় অধিরোহণ করেন।

তাহাতে তিনি শাস্ত্র বাক্যকে তাৎপর্য্যার্থে মন নিবিষ্ট করিয়া রাখেন এবং অধ্যাত্ম কথায় কাল হরণ করিতে থাকেন[১৯,২০]। এই সকল সংসার নিন্দুক ও বৈরাগ্যবান্ লোক শিলাশয্যায় অবস্থান দ্বারা আয়ুঃ ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হন[২১]। ইহাতে চিত্ত বনবাস বিহারে রুচিমান্ ও সংসর্গ ত্যাগকেই সুখ বিবেচনা করে[২২]। সৎ শাস্ত্রের আলোচনা, গুরু সেবা ও পবিত্র কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাদৃশ জীবের তত্ত্ব দৃষ্টি সুপ্রসন্ন হয়[২৩]। তৃতীয় ভূমিকাস্থিত যোগীরা দুই প্রকার অসঙ্গতা অনুভব করেন। এক সামান্য অসঙ্গতা, অপর উত্তম বা বিশেষ অসঙ্গতা। আমি কর্ত্তা ভোক্তা বাধ্যবাধক কিছুই নহি, এতাদৃশ অসঙ্গতা সামান্য-তর অর্থাৎ সামান্য নামের নামী সুখ দুঃখ বিষাদ প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল ও ঈশ্বরের অধীন, সুতরাং এ সকল আমার কর্ত্তৃত্বা-ধীন নহে। লোকে যাহাকে ভোগাভোগ বলে, বস্তুতঃ তাহা একপ্রকার মহারোগ। যাহাকে সম্পদ বলে, ফলতঃ তাহা মহাবিপদ[২৪,২৫,২৬,২৭]। সংযোগ মাত্রেই বিয়োগান্ত, বুদ্ধির ব্যাধি আধি, অথবা আধির পরি-ণাম ব্যাধি, কাল সর্ব্ব ভক্ষ ও সদা ভক্ষ,[২৮] এইরূপ এ সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মে, সেই অনাস্থা ভাবনার দ্বারা শ্রবণ মননাদির সাহায্যে গুরূপদিষ্ট মহাবাক্য নিচয়ের যাহা অর্থ তাহা জানিতে পারে, জানিয়া তাহাতেই ব্যাসক্ত থাকে[২৯]। প্রাগুক্ত ক্রম পরম্পরা, মহাপুরুষদিগের সংসর্গ, অসৎসঙ্গ বর্জ্জন, তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস, এইরূপ এইরূপ পুরুষকার প্রয়োগের ফলে পরম বস্তু পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত প্রকাশ প্রাপ্ত হয়[৩০,৩১]। সেই পরম বস্তু সংসার সমুদ্রের পরপারে ও তাহাই পরম কারণ। এতাদৃশ যোগী কোনও কিছুকে নিজের কর্ত্তৃত্বাধীন মনে করেন না। ইহারা জানেন, ঈশ্বর অথবা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমুদায় বিষয়ের কর্ত্তা[৩২]। এইরূপ স্থিরতর সিদ্ধান্তের বশে অবস্থান করিতে করিতে যে অসঙ্গতা জন্মে সে অসঙ্গতাই শ্রেষ্ঠ[৩৩]। অন্তর, বাহির, অধঃ, উর্দ্ধ, দিক্, আকাশ, পদার্থ, অপদার্থ, জড় ও চেতন, কোনও কিছুতে সংসক্ত না হওয়া, তথা আদি, অন্ত আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র সমান ভাব, এরূপ অসঙ্গতাও শ্রেষ্ঠ[৩৪]। সন্তোষ যাহার সুগন্ধ, সৎকার্য্য যাহার পল্লব, যাহা চিত্তরূপ মৃণালে আরূঢ়, বিঘ্ননিচয় যাহার মৃণালকণ্টক, বিচাররূপ সূর্য্য যাহাকে প্রফুল্লিত করে, বিবেক নামক পদ্ম অন্তরে

উৎপন্ন হইলে তাহারই ফল অসঙ্গ নাম্নী তৃতীয়া যোগভূমি[৩৫।৩৬।৩৭]। তত্ত্বদর্শীগণের সংসর্গে ও বিবিধ পবিত্র কর্ম্মের সঞ্চয়ে কাকতালীয় সংযোগের অনুরূপে প্রথমা ভূমিকার উদয় হয়। তাহাকে বিবেক দ্বারা রক্ষা ও যত্নসহকারে পালন করা কর্ত্তব্য[৩৮।৩৯]। বৈরাগ্য আদ্যভূমিকায় অথবা শান্তি যে অংশে অঙ্কুরিত হউক, বিচারনিষ্ঠতার দ্বারা তাহারই বৃদ্ধি সাধন করিবেক[৪০]। কেন না প্রথমোদিত ভূমিকা হইতেই দ্বিতীয়াদি ভূমিকা জন্ম লাভ করে। এই যে, শ্রেষ্ঠ অসঙ্গতা, ইহাতে তৃতীয় ভূমিকা আরূঢ়[৪১।৪২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! যাহারা অসৎকুলোৎপন্ন, মূঢ়, কোন প্রবৃত্তিমান্ ও অত্যন্ত অধম, তাহাদের উদ্ধার আছে কি না, যদি থাকে ত তাহার প্রকার কি? তাহারা ত যোগীদিগের সংসর্গ প্রাপ্ত হয় না[৪৩]? অপিচ, এক, দুই, তিন অথবা আরও অধিক ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া যাহারা মৃত অথবা ভ্রষ্ট হয়, তাহাদের গতি কি হয় তাহা আমাকে বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মূঢ়দিগের সংসার অতি বিস্তৃত। তাহাদের শত শত জন্ম অতীত হইতে হইতে যদি দৈবাৎ কোনও জন্মে সাধুসঙ্গ লাভ অথবা বৈরাগ্য লাভ হয়, তাহা হইলে সেই জন্মে তাহাদের প্রথমা ভূমিকার উদয় হইবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে সংসার বিনাশ, ইহাই শাস্ত্রার্থ বলিয়া নিশ্চিত। যে ব্যক্তি যোগভূমিকায় থাকিয়া মৃত হয়, ভূমিকা অনুসারে তাহাদের দুষ্কৃতি ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহারা নানাপ্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করে এবং সুকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে যোগীদিগের বংশেও বিশুদ্ধ সাধু সচ্চরিত্রদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে[৪৪।৫০]। অনন্তর যোগসেবায় প্রবৃত্ত হয়, ক্রমে উত্তরোত্তর ভূমিকারূঢ় হইতে থাকে[৫১]। হে রঘুনাথ! অভেদ বুদ্ধি হয় না, সেই জন্য শাস্ত্রে বর্ণিত ভূমিকাত্রয় জাগ্রৎ শব্দে উক্ত হয়। ঐ অবস্থায় সদ্গুণের উৎকর্ষ ও মুমুক্ষার উদয় হইয়া থাকে[৫২।৫৩]। যোগযুক্ত যোগীয়া আর্য্য শব্দের অভিধেয় হন। যিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান, অকর্ত্তব্যের পরিহার পূর্ব্বক আচারনিষ্ঠ হন, পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে আর্য্য বলিয়া থাকেন[৫৪]। ইঁহারা আবার শাস্ত্র, আচার ও মন, এই তিনের সামঞ্জস্যে লোক ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন[৫৫]। আর্য্যতা প্রথম ভূমিকায় অঙ্কুরিত হয়,

দ্বিতীয় ভূমিকার বিকাশ প্রাপ্ত ও তৃতীয় ভূমিকায় ফলবতী হয়[৫৬]। আর্য্যতা প্রাপ্ত যোগী মরণের পর কিছু কাল পবিত্র কর্ম্মের ফলভোগ করেন, পরে পুনর্ব্বার যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন[৫৭]। ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাসে অজ্ঞানের ধ্বংস হয়, তন্নিবন্ধন তত্ত্ব জ্ঞান পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদয় প্রাপ্ত হয়[৫৮]। যোগীরা চতুর্থী ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া এ সমুদায়কে একাদ্বয় ব্রহ্মে পরিশোষিত দেখেন। সেই অদ্বৈতভাব যখন দৃঢ় হয়, দ্বৈতভাব প্রশমিত হয়, তখন তাঁহারা এই লোক ত্রিতয়কে স্বপ্ন তুল্য সন্দর্শন করিতে থাকেন। অর্থাৎ স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল যেমন মিথ্যা দৃষ্টি-নির্ম্মিত, এই জগৎ তাঁহারা মিথ্যা দৃষ্টিনির্ম্মিত দেখেন, সেই জন্য শাস্ত্র-কারেরা চতুর্থী ভূমিকাকে স্বপ্ন সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন[৫৯।৬০।৬১]। পরে তাঁহাদের পঞ্চমী ভূমিকা আগত হয়, তাহাতে তাঁহারা স্বপ্নে বিভাগও বিনিবৃত্ত হয় সুতরাং সে অবস্থার সংজ্ঞা সুষুপ্ত। অশেষ বিশেষ ভাব নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহারা বিভাগ বর্জ্জিত মাত্র অদ্বৈত সম্পন্ন হন, বহি-র্মুখী চিত্তবৃত্তি লুপ্ত ও অন্তর্মুখী নির্ব্বিভেদ আনন্দময়ী বৃত্তি উদিত হইতে থাকে[৬২।৬৩।৬৪], এই অবস্থায় যোগীরা লোক দৃষ্টিতে সদানিদ্রালুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকেন। ইহারা যে কিছু করেন সমস্তই পূর্ব্বোভ্যাস বশতঃ ও অনাসক্তের ন্যায়। ইহারই পরে ষষ্ঠী ভূমিকা আইসে। এই ষষ্ঠী ভূমিকা তত্ত্বশাস্ত্রে তুর্য্য নামের নামী। তুর্য্যপদ প্রাপ্ত যোগীর সৎ অসৎ (আছে নাই) অহং নাহং (আছি আছে, নাই বা থাকিবে না) এ সকল আদৌ থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়। এই সকল যোগীরা লোকে ও শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত বলিয়া খ্যাত। দ্বিত্ব একত্বাদি, ও অন্য ন্য মানসী কল্পনা কিছুই থাকে না[৬৫।৬৬।৬৭]। চিত্র লিখিত যেমন নির্ব্বাণ অনির্ব্বাণ দুইএর অতীত, জীবন্মুক্ত যোগীরাও তদ্রূপ নির্ব্বাণ অনির্ব্বাণ দুএর অতীত অথবা আকাশস্থ কুম্ভের ন্যায় অন্তর্ব্বহিঃ শূন্য[৬৮]। অথবা সমুদ্রমগ্ন কুম্ভের ন্যায় অন্তরেও পূর্ণ ও বাহিরেও পূর্ণ[৬৯]। কিছু কাল ষষ্ঠী ভূমিকায় অবস্থান করার পর তাহারা সপ্তমী ভূমিকা প্রাপ্ত হন। সপ্তমী ভূমিকাই বিদেহ মুক্তি বলিয়া গণ্য। সে অবস্থা বাক্যের অবর্ণ-নীয়, অর্থাৎ বাক্য নাই যাহারা ঐ ভূমিকা বুঝান যাইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত উহাকে শিব, কোন ঋষি উহাকে ব্রহ্ম, কোন যোগী উহাকে প্রকৃতি পুরুষের বিবেক বা বিচ্ছেদ বলিয়া বর্ণনা করেন।

আরও অনেক তত্ত্ব চিন্তক আরও অনেক কথা বলিয়া থাকেন। হে রঘুনাথ! আমি তোমার নিকট সাত প্রকার যোগ ভূমি বর্ণনা করিলাম, তুমিও শ্রবণ করিলে[১০,১১,১২,১৩]। এ সকল অভ্যস্ত হইলে দুঃখানুভব তিরোহিত হয়। একটা হস্তিনী আছে, সে সদা মদোন্মত্তা ও সদা যুদ্ধপ্রিয়া। ইহার দুইটা ভীষণ দন্ত আছে, এই হস্তিনী অত্যন্ত অনিষ্টকারিণী। যদি এই হস্তিনীকে বিনাশ করা যায়, তাহা হইলে সমুদায় যোগভূমি আয়ত্ত হইতে পারে। যাবৎ সে হত না হয়, তাবৎ যোগভূমি জয় করা যায় না[১৪,১৫,১৬]।

রাম বলিলেন, প্রভো! সেই হস্তিনী কে? তাহার বিলাস স্থান কোথায়[১৭]? কি প্রকারেই বা তাহাকে নষ্ট করা যায় এবং সে কোথায় বিচরণ করে, তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমার ইহা হউক, তাহা হউক, ইত্যাকারের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাই হস্তিনী[১৮]। এই হস্তিনী শরীররূপ বনে বিচরণ করে এবং সদা উন্মত্তাবস্থায় থাকে। এই হস্তিনীই বিবিধ আকারের উল্লাস জন্মায়, প্রমত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ইহার নায়ক[১৯]। এ মনোরূপ গুহায় লীন থাকে এবং দুই প্রকার (শুভ ও অশুভ) কর্ম্ম ইহার দুই দন্ত। ইহার মন্দ বাসনা[২০], হে রাম! সংসার দর্শন ইহার সমর ভূমি। জন্তু সকল যাহাতে পুনঃ পুনঃ জয় পরাজয় অনুভব করে শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই সংসার দর্শন বলেন[২১]। এই যে ইচ্ছা হস্তিনী এ শত শত অজ্ঞানী জীবের বিনাশকারিণী। বাসনা, স্পৃহা, চেষ্টা, মন, চিত্ত, সঙ্কল্প, ভাবনা, এ সকল ঐ হস্তিনীর অন্য নাম। কেবল ধৈর্য্য নামক মহা অস্ত্রের দ্বারা ইহার জয় সাধন করা যায় পরন্তু যাহাতে এই ইচ্ছা হস্তিনী সর্ব্বতোভাবে বিজিত হয়, তাহা করিবেন। অন্তরে যত কাল 'এই' 'তাহা' 'ঐ' ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান থাকিবে, তাবৎ সংসার, যাহাকে পণ্ডিতগণ বিষ ও রোগ বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করেন। সংসার কি? 'আমার ইহা' ইত্যাকার মনই সংসার[২২,২৩,২৪,২৫] উহার উপনামই মোক্ষ। ইচ্ছা জয়ী মন নির্ম্মল, উপদেশ বাক্য সকল তাদৃশ মনেই স্বার্থ প্রকাশ করে[২৬] এবং সংসারের অঙ্কুর স্বরূপ, ইহার অনুদ্রেক কেবল বিষয় বিস্মরণ হইতেই সম্পন্ন হয়[২৭]। কদাচিৎ কদাচিৎ যদি অনর্থকারিণী ইচ্ছার উদয় হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিস্মরণ

রূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিবেক[৮৮]। ইচ্ছার বশ্য জীব দুঃখ পরিহারে সমর্থ নহে। সুতরাং কেবল আত্মতত্ত্বে মনঃসমাধান করতঃ নির্ব্বিক্ষেপ ভাবে থাকিবেক[৮৯]। নির্ব্বিক্ষেপ ভাব অভ্যাস কালে তীব্র প্রযত্ন আবশ্যক, পরন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইলে তখন তাহা সহজেই সম্পন্ন হয়। অহে শ্রোতৃগণ! তোমরা প্রত্যাহার (প্রত্যাহার—যোগের তৃতীয় অঙ্গ) রূপ বড়শির দ্বারা ইচ্ছা মৎস্যকে সংযত করিও[৯০]। আমার ইহা হউক, তাহা হউক, এতদ্রূপ মনোবৃত্তিকে পণ্ডিতগণ কল্পনা ও বিষয়-বিস্মরণ অর্থাৎ উহার বিপরীত বৃত্তিকে কাল্পনা-ত্যাগ নামে ব্যবহার করেন[৯১]। স্মরণই সঙ্কল্প ও অস্মরণই শিব অর্থাৎ মঙ্গল। যে কিছু পূর্ব্বানুভূত, সে সমুদায়কে অননুভূতের ন্যায় ভাবিবেক[৯২]। বিষয় অনুভূত হইলেও অননুভূতের ন্যায় বিস্মৃত হইবে। তোমরা এ সমুদায় বিস্মৃত হও, বিস্মৃত হইয়া কাষ্ঠ যেমন সদা বিক্ষেপহীন (অচঞ্চল) সেইরূপ নির্ব্বিক্ষিপ্ত হও[৯৩]। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি, তথাপি কেহ আমার সে কথা শুনিতেছে না। "সঙ্কল্প পরিত্যাগ পরম মঙ্গল।" সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে অন্তরে ও বাহিরে নির্ব্ব্যাপার হইতে পারিলে ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়। হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মপদের নিকট সম্রাটের পদ তৃণ অপেক্ষাও লঘু। পথিক যেমন গম্য স্থান পাইলে পদস্পন্দ পরিত্যাগ করে (পদস্পন্দ=গতি),[৯৪।৯৫]। তোমরা সেইরূপ ব্রহ্ম স্থান পাইয়া নির্ব্ব্যাপার হও[৯৬]। এ বিষয়ে আর অধিক বলিব না, সংক্ষেপে বলি, সঙ্কল্পই বন্ধন ও তাহার অভাব বা পরিত্যাগই মোক্ষ[৯৭]। এ সমস্তই জন্মাদি-রহিত, শান্ত, ধ্রুব, ও অব্যয় ব্রহ্ম। তোমরাও জগৎকে ঐরূপে জয় কর ও সুখে থাক[৯৮]। জ্ঞান যদি তদ্রূপে পরিণত হয় তাহাই পরম যোগ। হে রঘুনাথ! তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে[৯৯]। পণ্ডিতগণ সংবেদনাভাবকেই যোগ বলেন এবং তাহাকে চিত্তবিনাশও বলেন। উহাই অকৃত্রিম। তুমি তন্ময় হও ও বর্ণিতভাবে অবস্থান কর[১০০]। হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মবোধরূপী পরব্রহ্ম জন্মাদি বিক্রিয়া রহিত, তদ্ভাবে ভাবিত হওয়াই সর্ব্বত্যাগ, এইরূপ সর্ব্বত্যাগী হইয়া কর্ম্মাচরণ করিবে[১০১]।

রঘুনাথ! যাবৎ আমি ও আমার; এতদ্বিধ জ্ঞান পুষ্ট থাকিবেক, তাবৎ দুঃখে বিমুক্তি হইবে না। ঐ বোধ তিরোহিত হইলেই দুঃখের

অস্ত হইবে। অতএব রাম! আমি উভয় কথাই বলিলাম, এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করিবে[১০২]।

ষড়্‌বিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোত্তরশততম সর্গ।

---*---

ভরদ্বাজ বলিলেন, মুনিগণাগ্রগণ্য সেই মুনিসত্তমের প্রমুখাৎ সম্প্রদায়াগত জ্ঞানসার শ্রবণ করিয়া নির্ম্মলমতি, বোধপূর্ণ ও সুখপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন[১]।

ইনি অর্থাৎ শ্রোতা রঘুনাথ সামান্য পুরুষ নহেন। ইনি পরম যোগী, জগন্মান্য, দেবগণেরও ঈশ্বর, জন্ম-মরণ বর্জ্জিত, চিদানন্দময়, গুণাধার, লোকত্রয়ের জনক, রক্ষক ও অনুগ্রাহক[২]।

ভগবান্ বাল্মীকি বলিলেন, কমললোচন রাম গুরু বশিষ্ঠের বেদান্তসার বাক্যনিচয় শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তেকের জন্য মৌনী রহিলেন। কিছুই ইহার অবিদিত ছিল না, পরন্তু বাক্য-শ্রবণ জনিত অখণ্ডাকারা মনোবৃত্তির উদয় বশতঃ ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বিকার চিদ্‌ঘন হইয়া রহিলেন[৩,৪]। ইহা প্রশ্ন, তাহা প্রত্যুত্তর, এ সকল বিভাগ বিস্মৃত হইয়া রোমাঞ্চিত শরীর ও আনন্দামৃতে পরিপূর্ণ হইলেন[৫]। মনোরথ ইহার নিকট তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য সমুদায় ইহার অধীন এবং ইনিই সেই ব্রহ্মনাম ও সর্ব্বব্যাপিনী চিৎ[৬]।

ভরদ্বাজ বলিলেন, অহো! রাম পরমপদ সম্পন্ন হইয়াছেন। হে মুনিনাথ! আমাদের এরূপ না হইল কেন, আমরাও শ্রবণ করিলাম, অথচ আমাদের ঐ উত্তমা গতি লাভ হইল না, অতএব হে মুনিনাথ! আমাদের ন্যায় মূর্খ, অহমভিমানী, অল্পজ্ঞ ও পাপী আর কে আছে[৭,৮]? রামের ঈদৃশী স্থিতি ব্রহ্মাদির পক্ষেও দুর্লভা। হে মুনীশ্বর! হে গুরো! কি প্রকারে আমি বিভ্রান্ত হইব ও কি উপায়ে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, তাহা শীঘ্র বর্ণন করুন[৯]।

বাল্মীকি বলিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের বৃত্তান্ত, বশিষ্ঠ যাহা রামকে বলিয়াছেন, তাহা তোমরা আদ্যোপান্ত স্মরণ কর, এবং মনে মনে বিচার কর, অপর যাহা বলি, তাহাও শ্রবণ কর[১০]।

এই সকলই অবিদ্যার বিস্তৃতি, অন্য কিছু নহে। ইহাতে অল্পমাত্রও সত্য নাই। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, পরন্তু যাহারা বিবেকী নহে, তাহারাই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ লইয়া পরস্পর বিবাদ করে, অর্থাৎ নানা জনে নানা কথা বলে[১১]। যখন চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তখন আর প্রপঞ্চের দ্বারা তোমার রোধসম্ভাবনা কি? তুমি প্রণব, তত্ত্ববোধক মহাবাক্য ও উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ-বুদ্ধি হও[১২]। প্রপঞ্চে চিত্তবৃত্তি উদিত রাখা আর জাগ্রৎ নিদ্রা সমান। যাহার অন্তরে কেবল চিৎ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত, সে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই জাগ্রৎ—প্রকৃত জাগ্রৎ[১৩]। হে সখে! ভরদ্বাজ! এই প্রপঞ্চ মূল-রহিত ও অসার, সে জন্য ইহার প্রতি অনাস্থা স্থাপনই পাণ্ডিত্য[১৪]। এই প্রপঞ্চ বস্তুতঃ না থাকিলেও অনাদি বাসনাপুঞ্জের প্রভাবে সৎ, অর্থাৎ থাকার ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এই বহু বিভ্রমময় সংসার গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় মিথ্যা[১৫]। কেন তুমি বৃথা বাসনারূপ বিষ-বল্লীতে অধ্যস্ত হইয়া মুগ্ধ হইতেছ?[১৬] তুরীয়াবস্থা লাভের পূর্ব্বেই এ সকল নিপতিত থাকে, পরে নহে। ইহা নিরালম্ব-চিন্তক তত্ত্বজ্ঞ যোগীদিগের অনুভব সিদ্ধ[১৭]। সংবিৎ নদী তাবৎ কাল তরঙ্গান্বিতা থাকে, যাবৎ না তাহা আত্মরূপে দর্শন করা যায়[১৮]। হে সখে! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, যাহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, তাহা মধ্যেও নাই। অতএব, এই প্রপঞ্চদর্শন আর স্বপ্ন, উভয়ই সমান[১৯]। বুদ্বুদ যেমন জলে ও জলেরই প্রভেদ, সেইরূপ, এ সকল অবিদ্যারই প্রভেদ, অন্য কিছু নহে। এই প্রপঞ্চ বুদ্বুদ ক্ষণকালের নিমিত্ত উদ্ভূত হয় বটে, পরন্তু ইহা পুনর্ব্বার জ্ঞানসমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হয়[২০]। তুমি সুশীতল জ্ঞান-সলিলের নদীতে অবগাহন কর, বহির্ভ্রান্তির নিদাঘ (গ্রীষ্ম) অতি সহজে উপশম হইবে[২১]। এক অজ্ঞান-সমুদ্রই বিশ্ব বিপ্লাবিত করিয়া রহিয়াছে, সেই অজ্ঞান-সমুদ্রের প্রধান তরঙ্গ অহং—আমি ইত্যাকারের বোধ। ইহা অবিদ্যাবায়ুর তাড়নায় উৎপন্ন[২২]। চিত্তবিক্ষেপ, ভেদবুদ্ধি ও রাগ-দ্বেষাদি উহার লহরী অর্থাৎ ক্ষুদ্রতরঙ্গ। মমতা উহার আবর্ত্ত[২৩], এই

সমুদ্রের প্রধান জলজন্তু বিষয়াসক্তি ও দ্বেষ। ইহাদের দ্বারা গৃহীত হইলে অনর্থ-পাতালে প্রবেশ ঘটনা হয়[২৪]। হে ভরদ্বাজ! তুমি প্রশান্ত-কল্লোল অমৃতসমুদ্রে মজ্জন কর, দ্বৈতরূপ ক্ষারসমুদ্রে মজ্জন করিও না[২৫]। কোথায় সংসার? সত্য সত্যই কি সংসার আছে? কে কাহার? কেইবা কোথা হইতে হইল ও আসিল? তুমি সংসার মায়ায় মগ্ন হইও না[২৬]। আত্মাই একাদ্বয় তত্ত্ব, জগৎও তাহাই। সুতরাং তুমিই সব, কিছুই তোমার অতিরিক্ত নহে। সুতরাং শোকের বিষয় নাই[২৭]। এই সমস্ত জগৎ অজ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মবিবর্ত্ত (ব্রহ্মই কল্পিত) পরন্তু জ্ঞানীর নিকট পরম আনন্দ[২৮]। বিবেকবিহীন নর নিষ্কারণে শোকাচ্ছন্ন ও হর্ষাবিষ্ট হইতেছে। ইহা দেখিয়া রহস্য-জ্ঞানীরাও হাস্য করেন, মোহের বিড়ম্বনা তাহাদের নিকট পরাভূত[২৯]। সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত, তাই তাহারা জলে স্থল ও স্থলে জল দেখার ন্যায় দেখি-তেছে। জগৎ যদি মহাভূতের অথবা পরমাণুপুঞ্জের রচনা বিশেষই হয়, তথাপি ইহার জন্য শোক ও দুঃখ করা বিধেয় নহে[৩০।৩১]। অস-তের অর্থাৎ কাল্পনিক পদার্থের বাস্তব জন্ম বা উৎপত্তি নাই এবং যাহা সৎ যথার্থ সদ্বস্তু, তাহার অভাবও অসম্ভব। আবির্ভাব ও ক্রিয়াভাব, এ দুটীই মায়ার পরিপাটী মাত্র। অতএব, দেহাদি ভোগের উৎসাহী হইলে পরে এই সকল বিষে পরিণত হইবে। এ রহস্য যদি মনকে বিকৃত করিতে না পারে, তাহা হইলে জগদ্গুরু পরমেশ্বর ভজনা কর, অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত হও, পরে পাপক্ষয়ের প্রান্তে ঐ রহস্যের বোধ জন্মিবে[৩৩]। বোধ হয় তোমার সমস্ত দুষ্কৃত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাণীর পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মই দেব দেব পশুপতির পাশ, অর্থাৎ তাহাদের বন্ধনরজ্জু[৩৪]। যাবৎ না তোমার চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাবৎ তুমি সাকার ঈশ্বরের ভজনা করিবে, তৎপরে তোমার নিরাকার স্থিতি সফল হইবে[৩৫]। আগে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব, তৎপরে অজ্ঞানের মোহ শক্তির অভাব, তৎপরে গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাস, তৎপরে যম নিয়মাদি রূপে যোগপথের পথিক হইবে[৩৬]। তুমি ক্ষণকাল প্রত্যগা-ত্মায় সমাহিত হও, শেষে বুঝিতে পারিবে, তোমার পূর্ব্ববুদ্ধিরূপ রজনী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নরগণ পুরুষকার অবলম্বন করুক বা না করুক, কর্ম্মনিষ্ঠ হউক বা নাহউক, মহেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়।

হে সখে! প্রাণিগণের পূর্ব্ব কর্ম্মই অতীব বলবান্। তাহার নিকট আভিজন্ত্য, চরিত্র, নীতি, বিক্রম, এ সকল পরাভূত। যাহার প্রতীকার তর্কের অগোচর, তাহার জন্য অবসন্ন হইও না। ইহাই স্থির জানিবে যে, ঈশ্বরও ললাট লিপির (প্রাক্কৃত কর্ম্ম সংস্কারের শক্তি) বিলোপে অসমর্থ[৩৭।৩৮।৩৯।৪০]। ঈশ্বর কৃত নিয়তি অচিন্তনীয়। বক্তৃতা ও পাণ্ডিতা তাহার নিকট পরাভূত[৪১]।

হে ভরদ্বাজ! তুমি বিবেকশক্তির দ্বারা মোহজয়ী হও। তাহা হইলেই সেই অসাধারণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে[৪২]। মহাসত্ত্ব রাজা যুদ্ধাদি উদ্দাম বিপথেও অবসন্ন হয় না, কিন্তু অল্পসত্ত্ব নর অতি যৎসামান্য বিপদে অবসন্ন হয়[৪৩]। তত্ত্ববোধ পুণ্যের অধীন, এবং উহা বহু জন্মের অতি-পাতে প্রকটিত হয়। ইহা আরও জীবন্মুক্তদিগের কার্য্য দৃষ্টে অনুমিত হয়[৪৪]। বৎস! যেমন প্রতিকূল কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন তেমনি অনুকূল কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ[৪৫]। বর্ষা যেমন দাবানল বিনাশ করে, তদ্রূপ সাধুদিগের সাধুকর্ম্মের বেগও সঞ্চিত পাপ বিনাশ করে[৪৬]। হে সখে! যদি তুমি সংসারচক্রের আবর্ত্তে ভ্রামিত হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে সমুদায় কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর ও ঈশ্বর ভক্ত হও[৪৭]। কল্লোল-ময় জলেই সমুদ্রের বিক্ষেপ জন্মে, কেবল জন্মে নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এই কাল্পনিক এই জগৎ তাবৎ বিদ্যমান থাকে যাবৎ বহির্দৃষ্টির বিলোপ না হয়[৪৮]। কেন তুমি অন্ধতাজনক শোক অব-লম্বন করিতেছ? বিবেক (প্রজ্ঞা) যষ্টি অবলম্বন কর[৪৯]। হর্ষ শোকাদি যাহাদিগকে তৃণ তরঙ্গের ন্যায় বশীভূত করে তাহারা নগণ্য[৫০]। হে সখে! এই জগৎ দিবারাত্র হর্ষ বিষাদিরূপ দোলায় দোলায়িত হই-তেছে। কাল এই জীব জগৎকে উক্ত দোলায় দোলায়িত করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। কাল লৌকীক সমুদায়ের উৎপত্তি, নাশ, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার প্রভৃতি নানা ভাব উত্থাপন করিয়া ক্রীড়া করি-তেছে[৫১।৫২]। এ সমস্তই কালসর্পের ভক্ষণ দ্রব্য[৫৩]। মরণশীল জীব দূরে থাকুক, দেবতারাও কালের ভক্ষ্য[৫৪]। কেন তুমি সম্পৎকালে প্রীত হইয়া নৃত্য কর, আর বিপদ কালে অবসন্ন হইয়া রোদন কর? তুমি নির্ব্বিকার থাকিয়া সংসার নাট্য দর্শন কর, স্বয়ং নাচিও না[৫৫]। হে ভরদ্বাজ! বিবেকশালী পণ্ডিতেরা ক্ষণভঙ্গুর জগতের বিবিধ ভঙ্গীতে

মুগ্ধও হন না, বিষণ্ণও হন না[৫৩]। অমঙ্গল্য শোক পরিত্যাগ কর, যাহা মঙ্গল তাহারই চিন্তা কর। সদাকাল আপনাকে নির্লিপ নির্ম্মল আনন্দ ঘন চেতনরূপী বলিয়া ধ্যান কর[৫৭]। দেবে, দ্বিজে ও গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্ হও এবং সদা শাস্ত্র প্রমাণ উপর নির্ভর কর। তাহা হইলে তুমি মহেশ্বরের কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইবে[৫৮]।

ভরদ্বাজ বলিলেন, হে ভগবান্! আমি আপনার প্রসাদে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, বৈরাগ্য অপেক্ষা বন্ধু ও সংসার অপেক্ষা শত্রু নাই[৫৯]। এক্ষণে আমি ভগবান্ বশিষ্ঠের কথিত উপদেশ বাক্য সমূহের সার সঙ্কলন কি? তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি[৬০]।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! তুমি মুক্তিপ্রদ মহাজ্ঞানের কথা শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে তুমি ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হইবে না[৬১], যিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা, যিনি এক হইয়াও বিবিধ রূপে স্থিত আছেন, আমি সেই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি[৬২]। এই জগৎ প্রপঞ্চের লয় কালে যে তত্ত্বের প্রকট ছিল, সেই তত্ত্বের উপদেশ শ্রবণ কর। তুমিও ত পূর্ব্বাপর সমস্তই বিদিত ছিলে, সে সকল বিস্মৃত হইলে কেন[৬৩,৬৪]? স্বয়ং স্বচিত্তে বিচার কর, সৎ সঙ্গ ও সৎ শাস্ত্র অবলম্বন কর, বৈরাগ্যবান্ হও, তাহা হইলে আর শোক মোহ থাকিবে না[৬৫]।

সপ্তবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টবিংশোত্তরশততম সর্গ।

——()•()——

বাল্মীকি বলিলেন, যাবৎ না চিত্ত প্রসন্ন হয় তাবৎ শম দম উপরতি (কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিত্যাগ) বিষয়াসক্তি শূন্য ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া যোগাসনে উপবেশন করতঃ অন্তর ও বাহ্য উভয়েন্দ্রিয় সংযত করিয়া ওঁ এই শব্দের উচ্চারণ করিতে থাকিবেক। পরে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবেক এবং তৎসঙ্গে বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ

ধ্বংস করিবেক১,২,৩। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব যাহা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবেক, পরে সে সকলকে স্ব স্ব কারণে লীন করিবেক। প্রথমে ভাবনার দ্বারা বিরাটে সমষ্টি স্থূল-শরীরাভিমানী আত্মার স্থিতি, পরে সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভে, তৎপরে মায়াধারী ঈশ্বরাত্মার ও তৎপরে তাহাও পরম কারণ পরমাত্মার বিকাশিত করিবেক৪,৫। ভাবনার দ্বারা দেহের মাংসাদি বিভাগ পৃথিব্যা-ভূতে, রক্তাদিভাগ জলভূতে, জলভাগ তেজোভূতে, তেজোভাগ বায়ুভূতে, বায়বীয় ভাগ আকাশভূতে লয় করিয়া দিবেন (মাংসাদি পার্থিব, সুতরাং মাংসাদি নাই, এইরূপ ভাবনার দ্বারা মাংসাদির জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিবেক, ইত্যাদি)৬,৭ ঐ প্রকারে অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা শ্রবণে-ন্দ্রিয়কে দিক্ পদার্থে, ত্বগিন্দ্রিয়কে বিদ্যুতে, চক্ষুরিন্দ্রিয়কে সূর্য্যদেবতায় জিহ্বেন্দ্রিয়কে বরুণদেবতায়, প্রাণকে বায়ুদেতায়, বাগেন্দ্রিয়কে বহ্নিদেব-তায়, পদকে বিষ্ণুদেবতায়, আয়ুকে মিত্রদেবতায়, উপস্থেন্দ্রিয়কে কশ্যপে, মনকে চন্দ্রদেবতায় ও বুদ্ধিকে ব্রহ্মার বিলাপিত করিবেক। (অর্থাৎ দৃঢ় ভাবনার দ্বারা ঐ সকলকেও ভুলিতে হইবে)৮,৯,১০,১১। শ্রুতি অনুসারে আমি ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উপদেশ করিলাম। অভিহিত প্রকারে আমিই বিরাট অর্থাৎ সর্ব্বস্থূলাভিমানী আত্মা, এইরূপ ভাবিবেক১২। যিনি এক হইয়াও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত বা ব্যাপ্ত, যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর ও সকলের আধার, যিনি সর্ব্ব কারণ, যিনি যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার দ্বারা সর্ব্বসমুদায় জগৎ ব্যাপার নির্ব্বাহিত হই-তেছে, তিনি ও আমি এক বা অভিন্ন, এইরূপ চিন্তা করিবেক। পৃথি-বীর দ্বিগুণ জল, জলের দ্বিগুণ তেজ, তেজের দ্বিগুণ বায়ু, বায়ুর দ্বিগুণ আকাশ, এতাদৃশ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমি ব্যাপ্ত। ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে অর্থাৎ অগ্নিকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে ও আকাশকে সমুদায়ের উৎপত্তি কারণ মহত্তত্ত্বে (প্রকৃতিতে) নিবিষ্ট করিয়া দিবেক ১৩,১৪,১৫,১৬,১৭। যোগী কিছুকাল কেবলমাত্র লিঙ্গশরীর তদবস্থাধারী হইয়া থাকিবেন। বাসনা, সূক্ষ্মভূত, কর্ম্মসংস্কার, অবিদ্যা, পাঁচ জ্ঞানে-ন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই গুলির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর বলা যায়। ইহারই পরে 'আমি আত্মসম্পন্ন হইয়াছি' এইরূপ ভাবি-বেক১৮,১৯। ঐরূপ হিরণ্যগর্ভ ভাবনা। সিদ্ধ হইলে জড়ে জড়ভাগ

চিতে চিদাভাস (জীব ভাব) বিকাশিত করতঃ মাত্র অব্যক্ত নিষ্ঠ হইবেক[২০]। যারা এই সকল নাম রূপের অতীত ও যাহাতে জগতের স্থিতি (গঠন) তাহাকে কোন কোন ঋষি প্রকৃতি, কোন কোন ঋষি মায়া, কেহ কেহ পরমাণুরাশি ও কেহ কেহ অবিদ্যা সংজ্ঞা দিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রকৃতিতে অথবা মায়ায় সমস্তই লয় হয় সুতরাং অব্যক্ত সম্পন্ন হয়। যোগীরাও সাধনার দ্বারা অব্যক্ত সম্পন্ন হন, নিঃসম্বন্ধ ও নিরাস্বাদ অবস্থায় পুনঃসৃষ্টি পর্য্যন্ত স্থিত থাকেন[২১,২২,২৩]। অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও প্রতিলোম ক্রমে সংহার বা লয় হইয়া থাকে। তৎপরে যোগী তুরীয় পদ প্রাপ্ত (পরব্রহ্ম) হয়, সে পদ অব্যয়[২৩]। ধ্যানের দ্বারা লিঙ্গশরীরও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, তদবস্থায় ভূতপঞ্চক, ইন্দ্রিয়-গণ, মন বুদ্ধি, কর্ম্মসংস্কার, প্রাণবায়ু এবং অজ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেননা, ঐ সকল পদার্থই লিঙ্গ দেহের অধীন বা আশ্রিত। আশ্রয়ের বিলয়ে আশ্রিতের বিলয় সুপ্রসিদ্ধ[২৫]।

ভরদ্বাজ বলিলেন, এক্ষণে আমি বুঝিলাম ও লিঙ্গবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম[২৬]। যে হেতু আমি উপাধিকৃত চিদংশ, সেই হেতু উপাধি বিলয়ে আজ্ আমি অসীম চিদানন্দ সমুদ্রে মিলিত হইলাম। অথবা ভেদ না থাকায় পরমাত্মসম্পন্ন হইয়াছি[২৭]। আমি নির্ব্বিকারস্বভাব, কেবল, ব্যাপী, এবং চিৎ অচিৎ যে কিছু সমস্তই আমি। যেমন ঘটের অভাবে ঘটাকাশ ও মহাকাশ অভিন্ন, তেমনি লিঙ্গবিলয়ে আমি পরমাত্মা[২৮]। শ্রুতি সকল এই তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলেন। অগ্নি অগ্নিতে ক্ষিপ্ত হইলে সমান হইয়া যায়, প্রভেদ থাকে না। তৃণ লবণাকরে নিক্ষিপ্ত হইলে তৃণও লবণ হয়[২৯,৩০]। অজ্ঞানীর দৃশ্য এই অচেতন জগৎ চেতনেই ন্যস্ত বা প্রবিষ্ট রহিয়াছে। যেমন সিন্ধুতে সৈন্ধব (লবণ) সেইরূপ। সমুদ্রে প্রবিষ্ট লবণ সমুদ্র ব্যতীত পদার্থান্তর নহে। জলে জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, ঘৃতে ঘৃত মিলিলে সে সকল বিনষ্ট হয় না, কেবল বিশেষত্ব বর্জ্জিত ও নাম রূপ রহিত হইয়া যায়। তদ্রূপ আমিও আজ্ চেতনে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইয়াছি[৩১,৩২,৩৩]। ইহাই নিত্যপদার্থ, আনন্দ ঘন, সর্ব্বজ্ঞ, পরমকারণ, সর্ব্বব্যাপী, নিরবদ্য, নিরঞ্জন ও শান্ত[৩৪]। অকিঞ্চন নিরংশ নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ ও ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় নহে, হেয় নহে, উপাদেয়ও নহে, পরন্তু কেবল ও পাপপুণ্য রহিত। এই ব্রহ্মই

জগৎ কারণ, দ্বিতীয় রহিত, সর্ব্বজ্যোতি। শাস্ত্রে এই ব্রহ্মই সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণের অতীত ও ঐরূপ গুণযোগী বলিয়া বর্ণিত হয়। জীব সর্ব্বদা এই ব্রহ্মের ধ্যান করিবেক। অভ্যস্ত হইলে মন তদ্বলে ব্রহ্মে অস্তগত হইবে, মন অস্তগত হইলেই আত্মার প্রকাশ হইবে, আত্মার প্রকাশে সর্ব্বদুঃখের অবসানও আত্মসুখের অভিব্যক্তি আপনা আপনিই হইবে। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, আমিই চিদানন্দময় ও আমা ছাড়া কিছুই নাই[৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০]। আমি এক ও ব্রহ্ম, ইত্যাকারেই পরমাত্মার প্রকাশ হয়[৪১]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে সখে ভরদ্বাজ! যদি তুমি সংসাররূপ আবর্ত্তে ভ্রাম্যমান হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মভক্ত হও।

ভরদ্বাজ বলিলেন, গুরুদেব! আপনার উপদিষ্ট জ্ঞানসার আমি বুদ্ধিস্থ করিয়াছি[৪২]। আমার বুদ্ধি মালিন্যশূন্য হইয়াছে, শীঘ্রই আমার সংসার অস্তগত হইবে। এক্ষণে আমি জানিতে চাই, জ্ঞানীদিগের কর্ম্ম কিরূপ?[৪৩] তাঁহাদের কর্ম্ম কি প্রবৃত্তি ঘটিত? অথবা নিবৃত্তি ঘটিত?

বাল্মীকি বলিলেন, যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা এমন কর্ম্ম করিবেন না, যাহা করিলে দোষ হয়। অর্থাৎ যাহা মুক্তির বাধাদায়ক, তাহা করিবেন না[৪৪]। বিশেষতঃ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে পরিত্যাজ্য। জীব যখন মনোগুণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মগুণে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধীনতা ত্যাগ করিয়া কেবল হয়, তখনই জানিবে যে, সে সর্ব্বব্যাপী হইয়াছে। জীব যখন আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপরবর্ত্তী, এইরূপ ধ্যান করিতে পারে, তখনই জানিবে যে, সে মুক্ত হইয়াছে এবং সে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধি বর্জ্জিত হইয়াছে[৪৫।৪৬।৪৭]। তখন সে সুখ দুঃখ মুক্ত। জীব যখন সর্ব্ব ভূতে আত্মদর্শন ও আপনাতে সর্ব্ব ভূতের অবস্থান দর্শন করে, তখনই জানিবে যে, সে মুক্ত হইয়াছে। জীব যখন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয় অতিক্রম করিয়া আনন্দপ্রচুর তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনই জানিবে যে, সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। তুরীয় পদে অর্থাৎ পরমাত্মায় স্থিতিই মুক্তি[৪৮।৪৯।৫০]। জাগ্রৎ স্বপ্নাদির বীজ বাসনাদিযুক্ত অজ্ঞান, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিলে যে কেবলা ও সুখময়ী চিৎ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় ও সুখ মাত্রের

উপলব্ধি স্থায়ী হয়, তাহাই যোগের নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি[৫১]। মন অস্তগত হইলে আত্মাতিরিক্ত পদার্থ উপলব্ধ হয়[৫২]। অতএব, হে ভরদ্বাজ! দ্বৈতরূপ ক্ষারসমুদ্রে মজ্জন করিও না। জগদ্গুরু পরমেশ্বরের ভজনা কর[৫৩]। বশিষ্ঠোপদেশের সার কথা তোমাকে বলিলাম, তদুক্ত জ্ঞান অথবা যোগ আশ্রয় করিলে সর্ব্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রার্থের অনুশীলন, গুরুবাক্যের অর্থবোধ, এই দুই উপায়ে তোমাতে সর্ব্বজ্ঞতা স্থিতি লাভ করিবে[৫৪।৫৫]। শাস্ত্রবাক্যের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ আবৃত্তিও সিদ্ধি লাভের উপায়। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অভ্যাসনিষ্ঠ হও[৫৬]।

ভরদ্বাজ বলিলেন, হে মুনে! রাম বশিষ্ঠের পরম উপদেশে যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ তিনি ব্যবহারে রত রহিলেন, ইহার মর্ম্ম কি? জানিতে পারিলে আমি সদা অভ্যাসরত ও ব্যুত্থান কালে ব্যবহাররত হইতে পারিব[৫৭।৫৮]।

বাল্মীকি বলিলেন, এই সময়ে মহামনা বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন[৫৯]।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে মহাভাগ! হে ব্রহ্মপুত্র! আপনি মহাপুরুষ। আপনি শক্তিপাত,* দ্বারা অতি শীঘ্র গুরুত্ব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ আপনার কৃপাদৃষ্টিতেই ইনি ব্রহ্মসমাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন[৬০]। যিনি দৃষ্টির দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা ও বাক্যরচনার দ্বারা শিষ্যদেহে শিবশক্তি সমাযোগ করিতে পারেন, তিনিই উত্তম গুরু[৬১]। এই বিশুদ্ধাত্মা বৈরাগ্যবান্ রামে সে যোগ স্বতঃই বিদ্যমান্, তথাপি ইনি বিশ্রান্তি ইচ্ছায় আপনার উপদেশ শ্রবণ করতঃ উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[৬২]। শিষ্যের প্রজ্ঞাই (বুদ্ধিবল) গুরুবাক্যে জ্ঞান লাভের কারণ হয় বটে, পরন্তু যাহাদের মনোমল পরিপাক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা শত শত গুরুবাক্যেও তত্ত্ববোধে সমর্থ হয় না[৬৩]। যাহারা উত্তম শিষ্য অর্থাৎ অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই শিষ্যেই গুরুবাক্য সফল। গুরু ও শিষ্য, উভয়ে যদি যোগ্য হয়, তবে তত্ত্ববোধ সহজ সিদ্ধ হইয়া থাকে[৬৪]। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি রামকে ব্যুত্থিত করুন, অর্থাৎ রামকে

---

* শক্তিপাত। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে অর্থাৎ জীব শক্তি চক্রাষ্টক ভেদ করাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ শিবতত্ত্বে মিলাইয়া দেওয়া।

নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে আকর্ষণ করুন এবং ব্যবহার যোগ্য করুন। কেন না, আমরা কার্য্যার্থী, রামের দ্বারা আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। আমার যে কার্য্য (যজ্ঞ সিদ্ধ করা), তাহা স্মরণ করুন এবং তদ্ব্যতীত অনেক দেবকার্য্যও রামের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সে সকল যেন বৃথা না হয়[৬৫।৬৬]। হে মুনে! দেবতাদের জন্যই রামের অবতার, তাহা যেন অন্যথা না হয়। আমি আমার সিদ্ধাশ্রমে লইয়া যাইব। রাম রাক্ষস বিনাশ করিবেন। তৎপরে অহল্যার শাপ মুক্ত করিবেন, তৎপরে হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। অনন্তর পরশু-রামের দর্প বিনাশ করিবেন[৬৭।৬৮।৬৯]। ক্রমে পিতৃ পিতামহের রাজ্যে নিস্পৃহ হইয়া বনবাস আশ্রয় করিবেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কার্য্য রামের দ্বারা সম্পন্ন হইবেক। ইনি অনেক তীর্থস্থান নিষ্কণ্টক করিবেন এবং বিবিধ প্রাণীর উদ্ধার করিবেন। ইনি সীতাহরণের দুর্গতি দেখাই-বেন ও রাবণাদি রাক্ষসকে বধ করিবেন। যুদ্ধমৃত বানরদিগের প্রাণদান, সীতার পরীক্ষা ও জীবন্মুক্ত হইলেও ইনি লোকশিক্ষার্থ ক্রিয়াকাণ্ডে রত হইবেন[৭০।৭১।৭২।৭৩]। এক স্থানে জ্ঞানের ও কর্ম্মের সমন্বয় প্রদর্শন করিবেন এবং যাহারা ইঁহাকে দেখিবে, যাহারা ইঁহাকে স্মরণ করিবে, যাহারা ইঁহার কথা শ্রবণ করিবে, তাহাদিগকে ইনি মুক্তি প্রদান করিবেন। লোকত্রয়ের অশেষ কার্য্য এই মহাপুরুষ রামের দ্বারা সাধিত হইবেক এবং আমারও যজ্ঞ-সিদ্ধিরূপ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবেক। আমি ইঁহাকে নমস্কার করি, হে জনগণ! তোমরাও ইঁহাকে প্রণাম কর, তোমরাও বিনা সাধনে জয়লাভ করিবে। তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় কোন না কোন মহাপুরুষ নির্ব্বিকল্প পদে বিশ্রান্ত হইয়াছ[৭৪।৭৫,৭৬]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রাগুক্ত কথা বলিলে, সভাস্থ লিঙ্গাদি জনগণ ও বশিষ্ঠদেব সকলেই রামপাদপদ্ম স্মরণে মনোনিবেশ করিলেন[৭৭।৭৮]। ভগবান্ বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষি, সকলেই রামকথা শ্রবণজনিত তৃপ্তির কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন না। অর্থাৎ আরও শুনিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিকে বলিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বিশ্বামিত্র! হে মুনে! আমরা জানিতে চাহি, আপনি বলুন, এই রাজীবলোচন রাম কি? ইনি মানুষ? অথবা অন্য কেহ[৭৯।৮০]?

বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করুন। আমি বলিতেছি, ইনি সেই পরমপুরুষ। ইনি বিশ্বের উপকারার্থ অবতীর্ণ। ইনিই সেই শাস্ত্ররহস্যের বেদ্য পূর্ণানন্দ ও শ্রীবৎসলাঞ্ছন। এই রাম সুপ্রসন্ন হইলে সমস্ত প্রাণী সুখ লাভ করিতে পারে[৮১।৮২]। ইনি কোপাবিষ্ট হইয়া সংহার করেন, এবং ইনিই ইচ্ছার দ্বারা সৃজন করেন। ইনিই বিশ্বের আদি, বিশ্বের জনক, বিশ্বের বিধাতা, বিশ্বের ভরণকর্ত্তা[৮৩]। ইনিই সেই বীতরাগ মহাপুরুষগণের অবগাহন স্থান—আনন্দসমুদ্র[৮৪]। কখন ইনি মুক্তপুরুষের ন্যায় আত্মস্থ, কখন তুরীয়পদে স্থিত; কখন প্রকৃতির পরিচালক, কখন বা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা[৮৫]। ইনিই বেদপুরুষ ও গুণাতীত। ছয় বেদাঙ্গ ইঁহাকেই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে[৮৬]। ইনিই সেই চতুর্ভুজ বিষ্ণু, ইনিই বিশ্বের স্রষ্টা চতুর্মুখ এবং ইনিই সেই সংহার কর্ত্তা মহাদেব[৮৭]। ইঁহার জন্ম মরণ নাই, সেই জন্য ইনি অজ। অথচ মায়াসংযোগে জন্মবান্ হন। এই বিশ্বরূপী সদা জাগরূক ভগবান্ উক্ত প্রকারে বিরূপ। পরাক্রম যেমন জয় বহন করে, তেজ যেমন প্রকাশ করে এবং শাস্ত্র চর্চ্চা যেমন প্রজ্ঞার উৎকর্ষ বহন করে, তেমনি গরুড় ইঁহাকে বহন করে[৮৮।৮৯]। এই দশরথ রাজাও ধন্য। কেননা, যিনি পরমপুরুষ, তিনি ইঁহার পুত্র। আর দশবদন রাবণও ধন্য। কেননা, ইনি তাঁহাকে আপনার প্রতিযোদ্ধা জ্ঞানে চিন্তা করিয়াছেন[৯০]। হায়! স্বর্গ আজ ইঁহার পরিত্যাগে শূন্য, পাতালও শূন্য। ইঁহার আগমনে আজ এই মর্ত্তলোক ধন্য[৯১]। যিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্, তিনি আজ্ রামরূপে এতল্লোকে অবতীর্ণ[৯২]। যোগিগণ জানেন, ইনি জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয়ের বশ্য নহেন। কিন্তু আমরা জানিতেছি, ইনি মনুষ্যরূপী[৯৩]। ইনি রঘুরাজার পাপ ক্ষয়কারী। হে বশিষ্ঠ! এক্ষণে তুমি ইঁহার কৃপায় ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাক[৯৪]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহামুনি বিশ্বামিত্র ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া বাক্যবিশ্রান্তি অবলম্বন করিলেন। পরে মহাতেজা বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন[৯৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু রাম! হে চিন্ময় মহাপুরুষ! এখনও তোমার বিশ্রামের কাল উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং তুমি এক্ষণে

লোকসমূহের আনন্দ বর্দ্ধন কর[৯৬]। লোকসকল যাবৎ না উত্তম অধিকার লাভ করে, তাবৎ যোগীদিগের নির্বীজসমাধি অবলম্বন বিধেয় নহে[৯৭]। হে পুত্র! নশ্বর রাজ্যবিষয়ের পরিচালনা কর; দেবতাদিগের অভিলষিত কার্য্য সকল নির্ব্বাহ কর এবং সুখে অবস্থিতি কর[৯৮]।

বাল্মীকি বলিলেন, বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলেও রাম কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না, সমাধিলীন হইয়াই রহিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ বশিষ্ঠ যোগবলে সুষুম্না পথে তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। বায়ু যেমন বীজ মধ্যে লোকের অলক্ষ্যে প্রবিষ্ট হয়, হইয়া তাহা অঙ্কুরিত করে; বশিষ্ঠও সেইরূপ দর্শকগণের অলক্ষ্যে রাম শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন[৯৯]। প্রথমে তিনি শরীরস্থ প্রাণাদি পদার্থের মূলস্বরূপ আধার শক্তিতে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী স্থানে, পরে প্রাণস্থানে, তৎপরে মনঃস্থানে, তৎপরে তত্রস্থ চিদাভাসে অর্থাৎ জীবতত্ত্বে আবিষ্ট হইলেন এবং সমুদায় নাড়ীছিদ্রে সঞ্চরণ করিয়া তদীয় জ্ঞান, ক্রিয়া, ইচ্ছা, সমুদায় সামর্থ্যকে সুপুষ্ট করিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইল, তিনি দেখিলেন, গুরুদেব বশিষ্ঠ ও অন্যান্য সভাগত পুরুষ সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে এবং আপনার ব্যুত্থান অবস্থা আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে[১০০]। অতঃপর রামচন্দ্র গুরুদেব বশিষ্ঠ মহর্ষির বাক্যনিচয় শ্রবণ করতঃ মনে মনে চিন্তা করিলেন, গুরুবাক্য অবশ্য পালনীয়[১০১]।

পরে বলিলেন, আমি আপনার প্রসাদে বিধি নিষেধের অতিবর্ত্তী হইয়াছি। তথাপি, গুরু যাহা বলিলেন, তাহা আমার করণীয়[১০২]। হে মুনিবর! বেদ, আগম, পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিহিত আছে, গুরুবাক্যই বিধি, যাহা তাহার বিপরীত তাহাই নিষেধ[১০৩]। করুণানিধান রাম ঐ বাক্য বলিয়া গুরুদেব বশিষ্ঠের চরণদ্বয় শিরোপরি ধারণ করিলেন এবং সভাগত জনগণকে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরাম বলিলেন, তোমরা সকলে শ্রবণ কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। তত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই[১০৪।১০৫]।

সিদ্ধগণ বলিলেন, হে রাঘব! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই সকলের মনে নিশ্চয় আছে, সেই নিশ্চিতার্থ আজ্ তোমার প্রসাদে দৃঢ়ীকৃত

হইল[১০৬]। হে মহারাজ! হে রামচন্দ্র! তুমি সুখী হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। এক্ষণে আমরা বশিষ্ঠের অনুমতি লইয়া যথাগত স্থানে গমন করি[১০৭]।

বাল্মীকি বলিলেন, সভাসদ্‌গণ ঐরূপ বলিয়া সভাভঙ্গ করিলেন, পরে রামচন্দ্রের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল। হে ভরদ্বাজ! আমি তোমাকে সমুদায় রাম-কথা বলিলাম। তুমি এই সকল তত্ত্বকথা শুনিয়া সুখী হও। রঘুপতি রামের সিদ্ধিলাভঘটিত এই সকল কথা তোমাকে বলিলাম। এ সকল মুনিবরের কথিত, ইহা সমুদায় কবির ও যোগীর সেব্য। ইহাই পরমগুরু পরমেশ্বরের দয়ায় মুক্তিপথের প্রদর্শক। রাম ও বশিষ্ঠ উভয়ের এই সকল কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে বিমুক্ত ও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়[১০৮।১০৯।১১০।১১১]।

অষ্টাবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

নির্ব্বাণ প্রকরণে পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত।

আছে

কৃ

ধারণ

শ্রী

হইবে।

নাই১০৪।

গিজ্ঞগণ

মনে নিশ্চয়